

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়
স্রাতিশ্রিত



অবির লেখা
কোলে
বিস্কুট, নাজস ওটফি
বিস্কুট কোম্পানী, এম্বিলেট লি.
সিঙ্গাপুর-১০



৫৬-৬৭ বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড
১ম-২য়-৩য় সংখ্যা

—উপহার দিবার উপযোগী ভাল ভাল বই—

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত

মেঘদূত

নিখিল বিরহী-জন-হিয়ার প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে
অমর কবি কালিদাস তাঁর অতুল্য কাব্য “মেঘদূত”-এর
শ্লোকে শ্লোকে—বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি করে
গেছেন—ইহা সেই অমর “মেঘদূত” কাব্যের অল্লসিত
বাংলার স্বচ্ছন্দ কাব্যোজ্য। নয়নমুগ্ধকর চিত্রাবলীতে
হৃসজ্জিত। দাম—সাত টাকা

রোবাইয়াৎ-ই-

ওমর খৈয়াম

বিশ্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবির তিন শতাধিক রোবাই বহু যুগে
তাঁহাদের মূলগত তত্ত্বানুসারে এবং ভাবানুযায়ী পাঁচটি বিভি
অংশে বিভক্ত হইয়া বিরাট কলেবরে প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত
বহু দ্বিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রের সমাবেশে অনবদ্য।

দাম—সাত টাকা

273929.

৷ উৎকৃষ্ট মুদ্রণ—চিত্রের প্রাচুর্য প্রত্যেক বইখানির বৈশিষ্ট্য ॥

উপহার দিয়া অথবা উপহার পাইয়া

আপনাকে খুশি হইতেই হইবে

বর্তীশ্রদ্ধা সেনগুপ্ত-সম্পাদিত

কুমার-সন্তুব

হাজাৰ হাজাৰ বছর পরেও যে মহাকাব্যখানি রসলিপ্য
শ্রেণিকগণের নিকট অসীম আমদের উৎস-স্বরূপ হইয়া
আছে—ইহা তাহারই বাংলা কাব্যোজ্য।

বহুবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত। দাম—পাঁচ টাকা

দীপেন্দ্রনাথ রায় মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

ঋতু - সন্তার

পৃথিবীর নিত্য-মুতন রূপ-পরিবর্তনের মাঝে আবোগ্রবণ
শ্রেণিকচিত্ত বাহ্য অধেবণ করিয়া ফিরে—এই মহাকাব্য।
আছে তাহারই অপূর্ণ আশা। দাম—পাঁচ টাকা

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২১

অতুল্য কাব্যগ্রন্থ।

সুরেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

কু ল-ল জুয়া

বালাকাংক কল্পে শিক্ষিতা হইলে নিঃশব্দে সঙ্কলকে প্রখী
করিতে পারিবে—তালাই মূবর প্রাঞ্জল ভাবায় বুকান
হইয়াছে। দাম—দুই টাকা



একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্ডারাইডিন হেয়ার অয়েল



ভেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্ডারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে
আপনার কেশম-কামল ঘন তাল পূর্ণ হইবে 'কাঁচলতা' ও
মৃদুতা অধিক হইবে ও তাল পড়া বন্ধ করিতে সাহায্য
করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কাবুল • সিট

প্রবাসী

ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

পড়েছেন কি ?

বাংলার চিত্তাঙ্গীল জনপ্রিয় একমত বাহ্যিক জন লেখকদের জ্যেষ্ঠ রচনা
যাঙ্গ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় সাহিত্যে এধরণের প্রচেষ্টা হয় নি। লেখকদের প্রদান-গুণ ও মাধুর্য্যে
প্রত্যেকটি গল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ

বইখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট শত
কাশ সাটিক ডবল ক্রাউন

আট পেপারে ছাপা, ছবি ও
বাঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য মাত্র
বার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

এতে পাবেন

প্রবাসী প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র,
প্রসঙ্গ, রাষ্ট্র প্রসঙ্গ, অর্থনীতি,
দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজ
সঙ্গীত, ভাষাবর্ষ, চিত্রকলা, ইতিহাস
চর্চা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা
ভাষা ও সাহিত্য, মহিলা-বিভাগ, বিবিধ।

আমরা নিঃসন্দেহ যে, সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাই এই গ্রন্থটি পড়ে আনন্দ পাবেন

প্রকাশক—প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৭৭-২-১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ (ফোন নং—২৯-২২২০)

কিরন

তৈমনি উজ্জ্বল তৈমনি দীর্ঘায়ু

কিরন ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ
ল্যাম্পগুলির মতক। তাবৎ সর্বদৈনিক ব্যবহার
বস্তু সেবা কাঁচামাল বেছে এগুলি তৈরি। এবং এর
পেছনে রয়েছে দীর্ঘ জীবন বহুবেলা অসীমতা প্রাপ্ত কারিগরী দক্ষতা।

প্রস্তুতকারক : ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ
১৯, গভেষ্ট্রনাম মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

এজেন্ট : সি ওরিয়েন্টাল মার্কেটাইল কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই মার্কেট থিলা কানপুর

স্থায়ীকন সুখোপাধ্যায়ের
আধুনিকতম উপস্থাপন

সরোবর

সংবাদ প্রকাশিত হ'ল।

অভাবগ্রস্ত একটি কোট্টায়—তাব তবৎ দাপতীর কীর্তনে
পড়েছে নৈরাশ্রের ছায়া। বৈদ্যমনি অভাব-অতিশয়
তাঁদের দুটি মনের মাঝখানে এক দুর্লভা জাতির বাড়ি
ক'লেছে—তাঁদের পারম্পরিক আকৃষ্টিকে যেন লক্ষ্য হ'তে
বিজে -। জীবনের মূল্যবান ভাঙলে কি ঐশ্বর্যের খানট
সব চেয়ে ক'ল 'সরোবর'-এ পাওয়া যাবে তাই উত্তর।

দায়—২'০০

জগদীশ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩১/২, বিধান মন্ডল,
কলিকাতা—৩

—প্রকাশিত হইতাজে—

অধ্যাপক ডঃ জীবনলাল দত্তবাব, এম. এ, ডি.লিট,

কর্ক দম্প্রসিট

বঙ্গিমচঞ্জের

কপালকুণ্ডলা ৩,

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪, জনা ৪,

বিক্রমলালের

চন্দ্রগুপ্ত ৪, মাজাহান ৪,

মেবার-পতন ৪,

পারশদ কথিকা, চরিত্র-আলোচনা ও সীকামহা। চার
ছাত্রীসংগে লক্ষ্য মূল্যবান ও অপরিহার্য সংগ্রহণ।

জগদীশ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩১/২, বিধান মন্ডল,
কলিকাতা—৩

— * বিবিধ প্রসঙ্গ —

৫৩শেখর মুখোপাধ্যায়

উদ্ভাস-প্রথম ২,

১৯৩৩ সালের ১৩তম প্রকাশিত জীবনী-প্রসঙ্গ
ঐতিহাসিক সত্যেন্দ্র নাথ বসু ২-৫০

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হে মহাজীবন (জীবনী) ৩

ঈশ্বরেন্দ্রনাথ বসু-অমরেন্দ্রনাথ

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩

ঈশ্বরেন্দ্রনাথ বসু-অমরেন্দ্রনাথ

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমি প্রকাশনা গ্রন্থ।

১ম খণ্ড (২য় সং.)—২ ২য় খণ্ড—৫

ঈশ্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কবি জয়দেব ও গ্রীণাতগোবিন্দ ৭

পদাবলী-পরিচয় ৫

হরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

পারস্য (পরলোক-তথ্য) ৩-৫০

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সিরাজদ্দৌলা ৩

ডাঃ মাখনলাল চার্য্য প্রণীত

জাহানারার আত্মকাহিনী ৩-৫০

চক্ৰবর্তীর উইলের সমালোচনা ৭

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

আয়ুর্বেদ-সোপান ৪-৫০

ডাঃ জ্যোতির্ময় বোস প্রণীত

প্রজ্ঞাশেখর পরে (বাচ্য-তথ্য) ২-৫০

নটান সেনগুপ্ত প্রণীত

মানবতার সাপেক্ষ-সম্বন্ধে (মিঃ) ৬

বাংলার নাটক ও নাট্যশালা ৪

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এম্. এম্.

২-৫১১১, বিধান সরণী, কলিকাতা-২

ঐতিহাসিকোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত

বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী ৬-৫০

মহাত্মার বাসনামানী বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। মণ্ডিত।

ঐশ্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ধর্ম-পরিচয় (১ম) ২

মহাত্মার প্রকাশিত হইল।

ডাঃ বিমলকান্তি সন্দিকার প্রণীত

রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫-৫০

ঈশ্বরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

নবভারতের বিজ্ঞানসাধক ১-৭৫

ভারতের রাষ্ট্র প্রণীত

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস

(১ম খণ্ড) ১০, (২য় খণ্ড) ১২

সাংখ্য ও যোগ (ভারতীয় ধর্ম) ৪

পাশ্চাত্য ধর্মের ইতিহাস

৩য় খণ্ড (সমসাময়িক ধর্ম) — ১০

গজেন্দ্রনাথ বোস প্রণীত

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান (মিঃ) ৫

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দিল্লীধরী (মিঃ) ২

হরিশ্চন্দ্র ও নৃত্যরাজ্যের জীবন-কথা।

বোম্বেনগর প্রকাশিত প্রণীত

কোন পথে? ২-৫০

আটটি জ্ঞানপত্র প্রকাশ।

বীণেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

স্বপ্ন ৩-৫০

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

১৯৩৩ বিজ্ঞানবিশেষ প্রণীত

নবপ্রথম

মণ্ডিত

মহাত্মা ৭

ওমর বৈরাগ্য ৭

উইলিয়াম অক্সফোর্ড কবি

গ্রন্থ। মণ্ডিত।

কালক্রমিক রচনীকাণ্ডের

বাণী ২

আনন্দময়ী ১

শেখর ১-২৫

বর্তমান পরিচয় বাগদার

কালক্রমিক রচনীকাণ্ডের

এ উচ্চ-বৈদ্য প্রণীত

যোগাযোগ প্রণীত

মুদ্রন প্রকাশন :

১৩৭৬ সালের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হল

ওয়ারেনটোরের মন্ড্র-বোনাং, দীঘাচল্লের মন্দির-প্রাচীর,
কলার ভাও, বিজয়গড়া অমরাবতী ও মাদার্ন মাদ্রাসে,
শৈলভীর ইনসলন মন্ড্রমন্দির ও ত্রিভুজিত্তে অস্ত্রের রূপ
ও সংস্কৃতির আনন্দিক পথিচর মিলবে।

উপস্থান-রসনিক মন্ড্র-কালী

মন্ড্রের মাধ্যমে ভারত আবিষ্কার

রম্যাণি বীক্ষ্য

অঙ্ক শব্দ

রীক্ষপুস্তকগ্রন্থে পঞ্জিমান লেখক

ঐন্দ্রবাহুস্মার চক্রোত্তী প্রণীত

যদিও সংস্কৃতের মধ্যে শিল্প ও সভ্যতার জন্মোত্তির কত বিচিত্র কথা, অজ্ঞানোৎপত্ত জীব ও মনুষ্য, যাতায়াত
স্রাব্যের স্বর্গস্থ থেকে হৃদয়বাহ্যের পত্তন পর্যন্ত কথা একালের ব্যতিক্রমিক ভিত্তিকাল আকর্ষণ করবে। মূল্যমান
আলোকচিত্র সম্বলিত এই গ্রন্থ পাঠককে মুগ্ধ করবে সন্দেহ নাই। মূল্য : ২.০০

এ ছাড়া আমরা আরো ১২খানি পুঁই প্রকাশ করেছি :— হাবিড় পর্ব, কালিকো পর্ব, রামহান পর্ব, ধোরাট্ট পর্ব,
মহারাট্ট পর্ব, উৎকল পর্ব, মগধ পর্ব, কোল পর্ব, হিমাচল পর্ব, কাশ্মীর পর্ব, গাঁড় পর্ব।

খ্যাতি যাঁদের জগৎ-জোড়া

"বিশ্বনাথিত্যের রূপরেখা" প্রণেতা

ঐনির্মলেন্দু রায়চৌধুরী প্রণীত

প্রতি অধ্যায়ে সরল ভাষায় উত্তমূলক ভূমিকাত্ত হওয়ার চেষ্টায় মূল অপরিশীল। সাধারণ পাঠক, বিশেষ করে
শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং প্রোগ্রামের পক্ষে অপরিসংখ্য। মূল্য ৭.০০

ভারতের শিল্প ও আমার কথা

এই গ্রন্থে একটি শিল্পপ্রাণ মূল্যমীম বিদগ্ধ মাতৃবের
জীবনালেখ্যের সঙ্গে হান পেয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর
কলকাতা সহরের ইতিহাস, বাগানী অস্তিত্বাত পরিবারের
জীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও দেশাঙ্গের কলকাতার জীবন-

ঐন্দ্রবাহুস্মার রূপোপাখ্য (ও, সি, গম্বুলী)

জঃ হুমীত্বাহার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা সম্বলিত।

চিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ, এই শতকের গোড়াত্তে কলকাতার নৃক বে মনোচিত্রকলার আন্দোলন পড় উঠেছিল
তার বাগ্যাত্তিক ইতিহাস ও ভারতের তথা মনস্ত্র ইউরোপের কলারোমী, শিল্পবিদ ও শিল্পমহানীরের কর্তৃত্ত।
মূল্য : ১.৫০০

প্রকাশক

এ. মূখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২, বহিষ চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২

“আপনি কি সুখী হতে চান ?”

- × পরিবার পরিবর্তনের মাধ্যমে ছোট পরিবার গড়ে, আপনি প্রকৃত সুখী হতে পারেন।
- × এই পদিকল্পনার সাহায্যে আপনার আর অলুচায়ী, কত বৎসর অন্তর আপনার সম্ভাবন চলে ভাল হয়, তা আপনি নিজেই স্থির করতে পারবেন, ফলে আপনার সংসারের অর্থ-নৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।
- × বহু সন্তান জন্মানোর ফলে মাতের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে সংগে সংগে গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, পরিকল্পিত ছোট পরিবারে এসব ঘটতে পারে না।
- × আপনার সৌমিত্র সংখ্যক সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও তাদের ভালভাবে মানুষ করার দিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিতে পারেন।
- × বিবাহিত জীবন কোনরূপ দুঃস্থিভাষিত না করে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন।
- × এ'বিধে স্থানীয় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবার পরিবর্তন বিভাগ আপনাকে পছন্দমত পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করবে।
- × যাতায়াত, খাদ্য ও চিকিৎসার ইত্যাদির জন্য আপনাকে অর্থ সাহায্যও করা হবে।

যে কোন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পরিবার পরিবর্তন কেন্দ্রে থেকে বিনামূল্যে সব রকম সাহায্য পাবেন,.....যোগাযোগ করুন।

‘ভারতবর্ষ’ সূচী

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—বিত্তিক ৪৩—১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা

পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন—১৩৭৫

লেখ-দ্রষ্টা

লেখ-দ্রষ্টা

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ১। হিন্দুধর্ম ও ধর্ম | ৬। জীবন ভিত্তি |
| ২। বাণী সম্বন্ধে | ৭। ঐশ্বর্যকল্পের দ্বিত |
| ৩। বাণীকাল—১৩ | ৮। বহুভাষা |
| ৪। বাণীকাল—১৩ | ৯। প্রভাত বর্ণনাপাঠ্য |
| ৫। পতিতা ও পতিতপারন | ১০। স্বদেশে বাসে (নাটক) |
| ৬। পতিতপারন | ১১। স্বদেশে চরিত্র |
| ৭। প্রবন্ধ কাব্যসংগ্রহ | ১২। মহর্ষি ঐশ্বর্যকল্পে প্রবন্ধ |
| ৮। পুণ্যদেবী সম্বন্ধে, প্রতিষ্ঠাবর্তী | ১৩। মহর্ষি ঐশ্বর্যকল্পে প্রবন্ধ (বহুভাষা) |
| ৯। কঠোরনিষেধের মাধ্যমে পথ—(প্রবন্ধ) | ১৪। বর্ষকর্মল ভিত্তি |
| ১০। ঐশ্বর্যকল্পে কাল বর্ণনাপাঠ্য | |

কপচক্ষ্য
কে. হোড্জের
প্রমাধলী



ক. হোড্জ ২৩ কোং . কলিকাতা-৩৪

পঞ্চ-সূচী	লেখ-সূচী
১০। বিশ্বভাষা পত্রিকা (প্রথম) অধ্যাপক ভ্রামনকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	১১। বিশ্ববৈদ্য (ভ্রামনকাহিনী) ভ্রামনক চট্টোপাধ্যায়
১১। বন্দরের বন্দন অক্ষয়কুমার দত্ত	১২। প্রতিদ্বন্দ্ব (কবিতা) শ্রীঅজিতেন্দ্র দত্ত
১২। তালগাছের কথা শ্রীহরী শঙ্কর ...	১৩। বিভাষ বাহ ভ্রামনক চট্টোপাধ্যায়
১৩। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ সেন ...	১৪। গ্রহমণ্ডল (হাতেব কথা) অখাচাণী
১৪। অসংসারী (উপন্যাস) শ্রীমদীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫। একটা ঘৃণা (কবিতা) শান্তিনন্দ দাস
১৫। মেঘের কথা— (ক) রবীন্দ্র নাথিতো নারী	১৬। বিদ্যার বসন্ত শ্রীমদীন্দ্রনাথ দত্ত
নৌকা বিভাষ (খ) শ্রীমদীন্দ্রনাথ 'অপগাধী' ভূমিকা	১৭। অশ্রুতী (কবিতা) সত্যেন্দ্র কুমার অধিকারী ...
বর্তমান সমাজ চিত্র অশ্রু চক্রবর্তী ...	১৮। বিভিন্ন বিশ্ব (অধিবাস ও অণুজাতিক কাহিনী) পরিমল ভট্টাচার্য
(গ) রূপ চর্চা— রূপালী সেনা	১৯। নিশ্চিন্তি (কবিতা) শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত
(ঘ) শিল্পের লক্ষ্য কোট শোভনা দেবী ...	২০। স্বপ্ন বাসব (গল্প) বীরা দাস

—প্রকাশিত হইল—

শ্রীপ্রকাশন ঘোষালের

অসংসারী হত্যাকাণ্ড ও ভাষাভাষ্যকর অপহরণের তদন্ত-বিশদী

মেরুয়া হত্যার মানমালা

১৮৮০ সনের ১লা জুন। মেরুয়া মানমালা এক সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ড ও রহস্যময় অপহরণের সংবাদ পৌঁছাল। কুমার শ্যেনকথ থেকে এক খবর প্রকাশিত হইল। উহাও আর সেই কথারই নামে লেখা আছে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সুওচীন বৈদ্য। এর পর থেকে শুরু হ'লো পুলিশ অফিসারের তদন্ত। সেই মূল তথ্যের বিবরণেই আপনাদের সামনে ফেলি দেওয়া হ'য়েছে। প্রতিদিনের বিবরণেই পড়ে পুলিশ-স্থানর যে যত্নবা করেছেন বা তব্বতের ধারা সযত্নে যে গোপন নির্দেশ দিয়েছেন, তাও আপনি দেখতে পাবেন। শুধু তাই নয়, তব্বতের সময় পেরুল সাগর পর্দা, মেঘের মেঘাচার ফুল, নুতন বরনের ফেনলাই-কাটি ইত্যাদি পাওয়া যায়—তাও আপনি এন্ট্রিবিট হিসাবে সবই দেখতে পাবেন। কিন্তু সত্যকথের অস্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার কিনারা ক'রে পুলিশ-স্থানের যে শেষ মেমোটি ভাষ্যের পথে গিলে কড়া অবস্থায় দেওয়া আছে, মিলে গুলে তা দেখার আগে নিজেই এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন কিনা তা খেন আপনারা একটু ভেবে দেখেন।

বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নুতন টেকনিকের বই।

লাস—জুলা টাক।

	লেখক-দ্ব্য	প্রিন্সিপালকুমার রায়ের
২৬। তরুণাঙ্গী কালোবাড়ী (প্রবন্ধ)	শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য্য	উপস্থাপন : অষ্টম বার্ষিক বটে ৪৪. অষ্টমবর্ষ
২৭। জনপাটওড়ি (কবিতা)	চিরিৎতা ঘোষ	১২৪ অষ্টমবর্ষের বটা ৯, অষ্টমবর্ষের পৌর্ণমাস ৩
২৮। সূর্য্যাসার বাহ	কুমারবহ	১২৮ অষ্টমবর্ষের বটপত্র ১০, অষ্টমবর্ষের পূর্বাংশ ৯, ছায়ার
২৯। সাময়িকী	কুমারবহ	আলো ৯, সোদা ৮, বোতাল ৯, বিচারিত ২৬০,
৩০। কবিতা কবিতা কবিতা (কবিতা)	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী
৩১। কিশোরের রস	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১২৯ নাটক : ত্রিখারিতী রাজকল্প ২৪০, ইন্দির ৯,
৩২। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৩৩ মীরা কুমারবহ ৯।
৩৩। কিশোরের রস	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৩৭ ভ্রমণ : মেঘে মেঘে চলি উড়ে ৪০, ভ্রাম্যমাণ ১৪০।
৩৪। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৪১ কলিযুগকল্পিতাঙ্গি : প্রবন্ধ ৮, পুষ্টিভাষণ
৩৫। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৪৫ (১ম পত্র) ১২, ই (২য় পত্র) ৩০, পুষ্টি
৩৬। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৪৯ শ্রীমদভগবদ্গীতা ১০, শাস্ত্রিকী ২৪০, ছান্দিকী
৩৭। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৫৩ (১ম পত্র), মহাভারত বিজ্ঞান ১।
৩৮। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৫৭ কবিতা : অনাবী ৪০, (বার ১০) ৪৮-
৩৯। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৬১ কবিতাঙ্গি : শ্রীবিহার (১ম পত্র) ৮, ই (২য় পত্র)
৪০। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৬৫ ৮, বিজ্ঞানগীতি ৮, হাদির গান-এর বদলি ৯
৪১। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৬৯ বাহির হইল বাহির হইল
৪২। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৭৩ অশ্রুসুপ্তকল্প
৪৩। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৭৭ শ্রীদ্বন্দ্বকর রায়ের কবিতা গান ও নানা অমৃতবাহ। পেনে
৪৪। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৮১ ইন্দিরা দেবীর ভাষাঙ্গি : অমৃতবাহ। শ্রীমদভগবদ্গীতা
৪৫। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৮৫ শ্রীমদভগবদ্গীতা ১০, শাস্ত্রিকী ২৪০, ছান্দিকী
৪৬। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৮৯ শ্রীমদভগবদ্গীতা ১০, শাস্ত্রিকী ২৪০, ছান্দিকী
৪৭। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৯৩ শ্রীমদভগবদ্গীতা ১০, শাস্ত্রিকী ২৪০, ছান্দিকী
৪৮। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	১৯৭ শ্রীমদভগবদ্গীতা ১০, শাস্ত্রিকী ২৪০, ছান্দিকী
৪৯। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	২০১ শ্রীমদভগবদ্গীতা ১০, শাস্ত্রিকী ২৪০, ছান্দিকী
৫০। শ্রীমদভগবদ্গীতা	শ্রীদ্বন্দ্বকর ভট্টাচার্য্য	২০৫ শ্রীমদভগবদ্গীতা ১০, শাস্ত্রিকী ২৪০, ছান্দিকী

অমৃতকল্প দেবীর

— অমৃত সাহিত্য-সাধনা —

গরীবের মেয়ে (ছাপাচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

পোষাপুত্র ৪-৫০

বিবর্তন ৪

পথের সাথী ৬

বাগ্‌দত্তা ৫

রামগড় ৪-৫০ হারানো খাতা ৬

১। বাহিরদী মল্লিকার অবদানে বাঙালি সাহিত্যের বিগত অর্থ শতাব্দীর ইতিহাস সন্ধ্যা হইয়া আছে—উপরেই এই তালিকা
২। অমৃতকল্প দেবীর সাহিত্য-কীর্তি। নৃত্য শক্তির বিশালতা—লিপিভাষ্য ও চিত্র-বিশেষণে মল্লিকা-উপস্থাপিকা-বর্ণনের মধ্যে
তিনিই স্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো,
সবচেয়ে ভাল ?

এগুলোর কোনটাতেই আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব এই যে, আমরা

আপনার ব্যাঙ্ক

আপনার শুভেচ্ছাই

আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন। আমাদের

সবচেয়ে বড় পুরস্কার আপনার

সন্তুষ্টি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস :

৪, ট্রাউট গার্ট স্ট্রিট, কলিকাতা-১

আমরা
সেবার সারে
দিই
আরও কিছু

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

~~সত্যের উদ্ধার~~

সত্যেশ্বর গায়ের লম্বা নানা লোকে নানা কথা বলে
কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক
কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেহারা করে
দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ভাকাত,
পরের খন মুটেপুটে পাওয়ারাই ছিল তাঁর কাম। লোকে
তাকে ভয় করতো। বেন লাল বা বাঘের চেয়েও বেশি।
আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক খাঁটা-
খাঁটি করেছেন—ব'লতে গেলে একবারে শোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সত্যেশ্বর এক বিধব সৎতা। কার
কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক গ্রন্থের
জীবনে দেখের সঙ্গে মেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে
অধিকৃত হ'য়েছেন বন ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আদানে, তিনি
আবার সৎতা আভ্যন্তরীণ হতে নিছকই বা হ'লেন কেন?
এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ী ভকতী বিধবা স্ত্রী-ই বা
বলেন কি? বাব—পেটাকা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

লিলাসা

অশোকমুখো তরুণ অধ্যাপক—আর বিদিশা একজন
কলেজে-পড়া ছাত্রী। অশোক নিরীশ, লম্বা, আর
বেধাবী—কিন্তু বিদিশা মুখরা, নির্ভীক আর উগ্র আধু-
নিক। তারপর কবির ভাবার ব'লতে গেলে—"না জানি
কী করিয়া নিগন হ'ল দৌড়ে, কী ছিল বিধাতার মনে!
এই বলে যে বিবকুলের বীজ রোপিত হ'ল, তা কল্কমূত
উদ্ধার মত তেঁলে দিলে হ'লনকে জীবনের হ'লতে।
কিন্তু তাদের কন্যা রাজির রক্তেও কি বিদিশারই যৌবনের
উজ্জ্বল?

বাব—০'৫



দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা

ষট্টিপঞ্চাশত্তম বর্ষ

হিন্দু জাতি ও ধর্ম

স্বামী সদানন্দ

য্যোত বিদ্যমান হেতু নদীও অগ্নির নাম য্যোতবিনী।
যে নদীতে য্যোত নাই তাকে য্যোতবিনী বলাসে উক্ত
নামের অপব্যবহার করা হয়। য্যোতবিনীও য্যোতে
পতিতজ্ঞা সৃষ্টি হবার আগে তার সংস্কার সাধন না
করলে, য্যোতবিনী দীর্ঘে দীর্ঘে মলে গিয়ে অরণ্যে পরিণত
হয়, বস্ত্রপত্তর আবাসস্থল হয়ে পড়ে। তখন য্যোতবিনীও
বস্ত্রানন্তর্য দেখে তার দ্ব্যবসর পূর্বের তপ কল্পনা করা
সম্ভব হয় না। অসামান্য সনাতন হিন্দুধর্মের বস্ত্রধারী রূপ
দেখে—তার অতীত গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি মানসনেমে
কল্পনা করা সম্ভব হয় না। এতদ্বারা প্রসারের অভাবে যে
কোন সমাজ মৃতসন্ধায়ে পরিণত হয়। আমাদের সনাতন
হিন্দুধর্মের বহুদিন পূর্বের উপদ্রুত প্রচার প্রচার না থাকতে
পশ্চিম আফ্রিকাও সৃষ্টি করে আজ মৃতসন্ধায়ে পরিণত
হবার উপক্রম হয়েছে।



ভারতবর্ষ

সংগঠিত কাল থেকে হিন্দুজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর বাহ্যিক সভ্য সমাজকে জানানোকে বিস্তরণ করে মোহান্তিকের দ্বারা বিস্তারিত ছিল। হিন্দুজাতি এখন শিক্ষাব্যবস্থা জানাবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সীমায় উন্নীত হয়েছিল তখন পৃথিবীর অগ্রগত সভ্যজাতির সীমানে সন্নিবেশিত অগ্রগত, তাকে ভারতীয় শিক্ষাশক্তির আশ্রয়কে। সেই কথা বহু মহাশয় বলেছেন—

এতদেবপ্রাপ্তত সভ্যতাব্যগ্রহণঃ ।

অং অং চহিয়ে শিকেরন পৃথিব্যে স্বর্গদানবাঃ ।

পর্বেশ্বর ভারতীয়ের নিকট পৃথিবীর মানবসমাজ বীর চরিত্রবীতি লাভ করেছে। বিস্তারিত ও শিক্ষাব্যবস্থা হিন্দুজাতিই প্রাপ্তগত আদর্শ অগ্রগত করেছিল। ভারতে শুধু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অন্বেষণ হত না, ভাগ্যভিত্তিক বিজ্ঞানও প্রচুর উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ছাংগো উপনিষদের নারিকবি উদীর প্রথম গুরু লক্ষ্মণমহাশয়ের নিকট বীর অসীম বিজ্ঞানগুরু পণ্ডিত প্রমাণে বলেছেন যে তিনি—চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চমহাভাষ্যবর্ণ, পিতৃলোক সম্পত্তিক বিজ্ঞান, গণিত, কলিত্যোতিষ, বসিভাবিহা, উর্ধ্বপাত্র, প্রথমবিজ্ঞান, দ্বিত্যবিজ্ঞান, তৃত্যবিজ্ঞান, চতুর্থবিজ্ঞান, পঞ্চবিজ্ঞান, সপ্তবিজ্ঞান, নৃত্যবিজ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতে পণ্ডিত্যের অন্বেষণ হত।

সদ্যপনি মূনির অজ্ঞানসীমার তলবানু ঐক্য হুং-বেদান্তসহ চতুর্বেদ, মন্ত্র, বেদান্ত ও জ্ঞানের সহিত বহুবেদ, মহাবীর বর্ধমান এবং বীরাধোনি বর্ধমানের বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।

পৃথিবীর সমস্ত জাতিসমূহের বাহ্যিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতাই তাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করে তাদের শিক্ষা-বীজ-সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে। পরাবীর জাতির বর্ষ ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ প্রচুর প্রকার সম্ভব হয়না। ভারতীয় হিন্দুজাতি হতবিন পূর্ণ স্বাধীন ছিল ততদিন পৃথিবীর অবিকাশমূল্যে তাদের বর্ষ, শিক্ষা ও সভ্যতা প্রকার লাভ করেছিল। হলে বলে কলে কোশলে নয়, ভারতীয় হিন্দুজাতি প্রেম, ঐতি,

করণ, বৈদ্য ও জাতীয়ের উদার আদর্শে অগ্রগতি হইয়া গমনবাহীর দ্বারা অগ্রগত সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় হিন্দুজাতির বর্ষ ও সংস্কৃতির উদারতা ও বহুবেদ আদর্শে বহু বিশেষজ্ঞাতি হিন্দুজাতির বহুবেদান্তে আদর্শ প্রাপ্ত করেছিল। তখন বহির্ভাষ্যে মেলুজিহান, চীন, পারস্য, ইরান, মাক্কা, বাবী বোনিও প্রকৃতি দেশ, যৌগ ও যৌগান্তে ভারতীয় বর্ষসংস্কৃতির প্রচার প্রকার ঘটছিল।

ভারতে এখনও যেসমস্ত বড় বড় মন্দির আছে পৃথিবীর অগ্র কোন দেশে তত বড় মন্দির দৃষ্টগোচর হয়না।

কাথোডের পেরো এনও হিন্দুজাতি। তারা নিবেদন 'Indian' বলে। তাদের দেশে হিন্দুসংস্কৃতির নিদর্শন প্রচুর অনেক বড় বড় মন্দির আছে। এও একটি মন্দির-গেয়ে সমুদ্র-বনের কাছাকাছি পূর্ণ একটি চিত্র আছে। তার এতদিকে বো, অপর দিকে মানব। বাহ্যিক নাগকে বহু করে মন্দির পূর্ণ বাতা সমুদ্রবন করা হচ্ছে।

আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণ অগ্রগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহির্ভাষ্যে ভারতীয় বর্ষসংস্কৃতির প্রচার প্রকার একত্র বহু হয়ে যায়।

জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও কলপ্রবণতা যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা হাতিয়ে কেলি। আমাদের দুর্বলতার জুগোপ নিজে বিশ্বের নজির জাতিসমূহ আমাদের রাষ্ট্র-নির্দেশন অধিকার করে, আমাদের তলর প্রচুর বিজ্ঞান করে। ফলে আমাদের বর্ষসংস্কৃতির প্রচার প্রকার বহু হয়ে যায়।

প্রায় সাতশ বছর পূর্বে মূলমান জাতি আমাদের দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। তারা ভারতীয় হিন্দু-বর্ষসংস্কৃতির তলর নিদর্শন স্তূপগোষ্ঠা করে। হলে বলে কলে কোশলে তারা বহু হিন্দু জাতি ভ্রাতৃকে মূলমান বর্ষে নীতিত করে। উদ্বোধনের এক হাতে স্তূপ আর এক হাতে কোরান নিয়ে বর্ষপ্রচার করিয়েছিলেন।

উদ্বোধনের রাষ্ট্র গণের স্বাধীনতা হিন্দুজাতি ছিলেন। অপরকোশলে তাদের পানীর জলেই ইন্দোজাতি গোমানে নিকশন করে উক্ত ইন্দোজাতি মূল মানবীয় মূল্যকে মূলমান করা হয়েছিল। 'আপো অর্ন্তোদান' এই প্রবাদ-

যাকোর অধিদায় আধাধের দেশের বহু গণমাণ্ড হিন্দুকে মূলগতানধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। রাজসক্তি পেছনে থাকলে ধর্মের প্রচার এইভাবে প্রচার লাভ করে। আকবরের রাজত্বকালে মূলগতানধর্ম নানাভাবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে। সেসময় মধুসূদন সরস্বতী নামে একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী (পূর্বঃগের কবিবিশুই জেলার উত্তরাধিগ্রহীতা গ্রামনিবাসী) হিন্দুদের এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আকবরের নিকট হিন্দুদের রূপসার কথা জ্ঞাপন করেন। তদুত্তরে আকবর বলেছিলেন—‘আমার নিকট মূল্য বর্ধনশ্রম্যই সমান। আপনাতা স্বার্থপরতার সঙ্গে হোন।—এতে আমার কোন আপত্তি নাই।’ তখন মধুসূদন সরস্বতী নানাগল্পাঙ্গী সন্তোষ প্রদান করেন। তারা হিন্দুদের মানস্বর বন্ধার জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সেবা করতে হিন্দুদের বিধা করেনি।

মূলগতান রাজত্বের অবসানে ইংরেজজাতি আধাধের দেশের শাসনভার লাভ করেন। প্রথম প্রথম তারা আধাধের দেশের শাসিত সোৎসকে নানাপ্রকার প্রলোভন দ্বারা গৃহধর্ম দীক্ষিত করতে থাকে। হিন্দুধর্মকে এই ক্ষমকতিব হাত থেকে রক্ষা করার জন্য—বামা রাজমোহন রায়, বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবগণ দুঃসত্ব হন। তাঁদের প্রচেষ্টায় দ্বিপন্যাতীত্বের ধর্মাত্মকরণ অনেকটা শিথিলভাব ধারণ করে। তখন পাশ্চাত্য তাদের প্রচারের পথ পরিবর্তন করে। নানাপ্রকার সেবার কৌশল অঙ্গন করে তারা নিম্নোক্ত হিন্দুগণকে ধর্মাত্মক করতে থাকে। বর্তমানকালে তারা এসেদের শাসনকর্তা নেই সত্য, কিন্তু তাদের ধর্মাত্মকরণ চেষ্টা মোটেই চলছে।

এভাবে একাধিক শক্তিশালীভাষিত কলসর হয়ে আধাধা আধাধের নিম্ন ধর্মাত্মকভাবে বিসর্জন বিবেচি।

বাহীনতা আত্মল আত্মজ্ঞা বহুদিন পর্যন্ত আধাধের অন্তরে দুঃখিত বহুবিভিন্ন বিবাজনান ছিল। বহু দেশ-প্রেমিকের-আত্মদানের ফলে আজ আধাধা সেই বাহীনতা লাভ করেছে সত্য কিন্তু আধাধের অজ্ঞানতা লাভ হয়নি। বাহীনতার মূর্খনৈতিক আবেগে পড়ে আধাধা ভারতমাতাকে হুইথতে বিস্তৃত করে বাহীনতা লাভ করেছে। এই

বাহীনতা তার কৈশোর জীবন অতিক্রম করতে না করতে আধাধের বৃষ্টি নানাপ্রকার প্রেত-বৈবাহ, অর্ন্তক্য পার্থক্যের গঠিতে অবস্থ হয়ে পড়ে। ফলে বর্তমানে আধাধা ক্রিস্তঃখ্রীষ্টীয় হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি। এই পক্ষিল আধাধাওয়া হতে আধাধের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করতে চলে আধাধের শাস্ত্রের বাণীকে অহুসরণ করে চলতে হবে।

ডায়োনেস পূর্বঃখার্বের

গ্রামঃ খার্বের কুলঃ ডায়োনেস।

গ্রামঃ অনপথ্যখার্বের

আত্মজ্ঞা পূর্বঃখার্বের ডায়োনেস।

সংকীর্ণতা ও পার্থক্যভাষিত মহাপাণে আধাধা বিশেষভাবে ঘড়িত হয়ে পড়েছি। আধাধা নিম্ন নিম্ন ধর্ম রক্ষা করতে অক্ষ। দেশ, জাতি, সমাজ রক্ষার দিকে আধাধের কোন দৃষ্টি নেই।

আধাধা মহা মহা স্ববিপ্লবের বংশধর হয়েও আজ প্রাণন্যাতিক ডিবতবে বিসর্জন দিতে বসেছি। এর চেয়ে দুর্দিন আর কি হতে পারে ?

ঈশ্বরত্ব আগমনে সাহুধ থেকে আহত করে সবত জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ অস্বিকৃত অহুতব করে। তদুপ জ্ঞানিত দক্ষপত্তরের সাহুধের যথো বিস্তার লাভ করে।

যাফা সমরিতগতাবে সমাজজীবন ধাপন করে তাদের মাঝে কেউ সত্যভাবে জীবন ধাপন করতে চাইলে তাকে লবে পবে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। সাহুধ বোগগ্রস্ত হলে সেই বোগীকে রোগমুক্ত করা এবং অস্ত্রান্ত হুইলোক যাতে রোগাক্রান্ত না হয় তার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কাজ। এই আগর বিপদ থেকে আধাধের সমাজকে রক্ষা করতে গেলে, আধাধের দেশের বৈধক প্রচলকে অহুসরণ করতে হবে—‘আপনি আচরিত ধর্ম জীবনে শিখায়।’ এক্ষেত্রে আধাধের সকলকে নীতিপরাণে হতে হবে। শাস্ত্রগ্রন্থে অদ্ব্য উপদেশাবলী লেখা থাকলে তার দ্বারা জনগণের জীবনে কি উপকায সাধিত হয় ? নিজের হিত, নিজের মঙ্গল—কে না চায় ? এ হল সকলের আন্তরিক কামনার বস্তু। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে সাহুধ তা’ ঠিক ঠিক তাহে লাভ করতে পারে না। লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে

তবে শত বিপর্যয়ে পড়েও রাহুব তার বাতাসা বহা
রাখতে সক্ষম হয়।

পূরাকালে আমাদের দেশে একশ্রেণীর দাধু মহাত্মা
ছিলেন, তাঁরা অস্বাভাবিক বিস্তার থাকতেন। আর
একশ্রেণীর মহাসানবগণ আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে
সহাজ কলাপকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁরা নিজেদের
স্ববহুবিধার কথা চিন্তাই করতেন না। ভারতদেশবাসীর
সত্যের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীহং স্বামী প্রবচানমণ্ডলী
মহাশয় তাঁর এক বাণীতে বলেছেন—“রাহুব কাঠের
মালায় জপ করে, আমি চিরকাল জাতিগঠনের মালায়

জপ করে এসেছি।” বর্তমানে তাঁর অনুগামী নিম্ন ও
উচ্চগণ ধর্মকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অনন্যতর কার্যে
ব্যাপৃত আছেন। জনগণের সাহায্য ও সহায়ত্বের
ওপর এদের কর্মসিঁটকরণ নির্ভর করছে।

রাহুবের জীবনকে লুপ্তা মণ্ডিত করে তুলতে হলে
সংসদে বাস, সংগ্রহ পাঠ প্রকৃতি একান্ত প্রয়োজন।
অকস্মিক—কৃকাল না করে ‘সংস্কৃতি’, সবসময়ের সাহায্যে
জীবনকে পরিচালিত করলে ভারতের জাতীয় জীবনে
আবার লুপ্তা কিংবা আসবে।

বারাঙ্গণা—তবু

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্ত আবির্ভূত তার আকাশের শাখা হর পুঁজি
অনেক দুঃখে ঘর বহা শেষ যত্নান নিয়ে
ওখানে আতপ-মায়ী গহীরে ‘রাখিণ’ তার পুঁজি
অলে অলে চিত্তাকাল রামংগু ঝাঁকে যং বিয়ে।

ওরুও আশায়া শান্ত এলোচুলে শান্তির ইলাতা
বেদনার দুখ হালে চুপে চুপে অস্তরে অস্তরে

মনের কোণায় জ্যোতি জ্যোতিষ্কের নীল ছাতি ভরা
তাতেই চরম তৃপ্তি মোহ ঝাঁকে প্রতিটি অক্ষরে।

আরেকে তাতেই চাই হাফা মনে, লজ্জার দরীয়ে
লাগা অন্ধ ছেয়ে দেবে আবেশের বেত বস্ত্র বিয়ে
ছপের শৌরভ বধা টানে বস্ত্র ধূপে পাহায়ে
নির্ভ্রামের শান্তি আব রপে দেয় মনকে ভিজিয়ে।

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাত

হঠাৎ বিনামধ্যে বজ্রাঘাত : হাসতী হাড়ে বন দিনের নিউগোনিয়ার অতর্কী হ'য়ে পাড়ি দিল মরপারে। অসিত সে সময়ে পুরীতে। শব্দ পেয়েই ভীমকে তার কবল। ভীম উত্তরে শুধু লিখল—“তুই আসতে চেয়েছিল অসিত, কিন্তু এখন না চাই। আমি কিছুদিন একাই পুংব হিয়াসরে। পায়ের নীচে মাটি খুঁজে শাকি না।—ভীমবা”

বিন হশেক বামে ভীমের তার এল কথিকেশ থেকে, “বাচ্ছি বহরীনাভাৎ—চ'লে আয়।” অসিত লিখল : “তুমি তো জানো দাশা, আমি হুদী হাজুব—হাউটেনিয়ারিং—এ নামেও জ্ঞৎপ্প হয়। তাছাড়া মোজার বোড় মনসির পর্বত। হরিষারে বা কথিকেশে তুমি এখন নামবে, তার কোরো আমি দাব দেখানো। কিন্তু তার উপরে নয়—এখন কি কৃত্তগ্রাগণ বা ধেবগ্রাগণও নয়—কেবার বহরী কা কথা!”

ভীম একে পাঠী লিখল হৃৎকে : “জ্ঞৎপ্প! কাওহাৎ কোবাচার! কাছে পেলে এক চড়ে হাবাতে জ্ঞৎক ঠাঙা ক'রে বিতঃ। না, সত্যি, এক একটা কথা হ'ল? তাছাড়া মোজাশ কি হকা বহিরা দায় না থলতে চলে?”

অসিত লিখল কৃত্তগ্রাগণের পোড়াকিশের টিকানায় : “ভীমবা, রাগ করো না। সবাই কি সব পারে? তোমার বুঝেই সে ভুলেছি। বিখাপ কোরো তোমার মথ পেতে আমি কড়াবুদায়ী যেতেও হাদি বাচ্ছি। কিন্তু পাহাড়ে ঠাঙা—তাছাড়া হাকন চড়াই উংবাই স্তেঙে দুখুঁ অংমার গোয়ালঘরের মত চটিতে সাব সাব ভৌপীনবন্ধ-র সঙ্গে পিত-অদুর্গত কবলে জুবে অনিত্রায় হারতাপ—না ভাই, দায় বহরী আবার নাবার থাক—তবে যদি সত্যিকার

সাদুদত কাউকে পাকড়ে আনতে পারো কথিকেশ বা হরিষারে—হরিষারে হ'লেই সবচেয়ে ভাল হয়—তাহ'লে শপথ করছি :

যাতাসেরো আগে উড়ে আমি লব ঠাই তব ঠাঙা পাথ।
বিখাপ কোরো—সংশরীবাও সাদুদ প্রদায় চায়।

“কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা না ক'বে থাকতে পারছি না ভীমবা ভাই, অপমার নিশ না; তোমার ভিন মেয়ে জনছি তোমার কাকাবাবুর কাছে আছে। কিন্তু মামীনা? ওকে নিয়েই তাঁর করতে চুটেছ না কি?”

উত্তরে কৃত্তগ্রাগণ থেকে ভীম লিখল : “মাকে না নিয়ে আমি কেমন ক'বে বল? তিনি কী নাছোড়খান্দা তুই তো জানিল জুতুভাঙ্গী” (তাকে ধরে নিয়ে তিনি পদার দান তাঁর এক বিধিবা না ঠা'হুবহার শিতি দিতে?) তবু বৃদ্ধবয়সে তিনি পাহাড়ে ঈত লইতে পারবেন কি না শুধ'তে তিনি বললেন কৈঃ : “না পারি—আমাকে অদকানিমার নাহিরে দিয়ে আদিল বাবা, তাহ'লে গতি দেওমার বরঙও বাচবে—প্রাচুও করতে হবে না।”

“বৈধ তো ভাই, এমন অসুস্থে কথা বলে? কিন্তু থাকে বোকারে কে বল? তিনি একবার না বললে তাকে ঠা করে কার দায়ি? বললেন—তিনি লংদারে আর তে-বাতিঙও থাকবেন না, তাঁকে জাগলপুরে ফেলে এলে তিনি পদার জুবে যথবৈদী মরবেন। তাছাড়া আমার ভিন মেয়ের তার এখন কাকাবাবু নিতে গেলো, তখন এত সার মতোবা হুর্জাবনা কিশের? উপহত মাতৃদণ এখানে আমার ডবল হয়েছে। তুই জানিস ছেলেবেলা থেকে তিনি পতিত বেধে লাক্ত পড়েছেন—আমাকেও লাক্ত শিখিয়েছেন হা-ই। ছবপাঠ করা, শৈতে বেঙো,

হিস্কাফি চালে চলা সব কিছুব স্বীকার্য্যী তো তিনিই
...ইত্যাহি ইত্যাহি।

“কিছু বে তাপুত্ব! কী যে ভুল করি আমাদের
নকে না এসে—পরে পড়াবি। এখানে জাহাং বজা
হালে আছি এক বইয়ের অটালিকার। হুঁরি গেলে
তাকে মজিয়েছি, তিন তিন ঘরে যোজ মশাকিনীতে
মান, তাৎপর্ষই কেবল পান আর গান! তারপর এখানে
আমি এক কাণ্ড! ভূই তো জামিল আমি অস্ত্রঃ আজ
পৃথক ভজনকে তখন ভালবাসতে পারি নি। তবু এখানে
বিখ্যাত সাধু তুফায়ালের কাছে একটি ভজন শিখেছি।
শেখা মানে কি? ভজন তো শোনবারকৈ শেখা হয়ে
যায়। কিন্তু শিখলার কেন ভজন? ভজনটি সত্যিই
ভালো—মানে ভাল। বলতে কি, ভজনটির বন্দেধ এত
চমৎকার যে, তুফায়ালাকে ঠিক গায়ক নাম দেওয়া না
গেলেও তাঁর মুখে গানটি মল লাগে না। না—কবুল
করছি ভালোই লাগে। ভূই ভনলে বোহরর ‘আহা
আহা’ ক’রে উঠতিল —শেক্ষিকোলা কোথাকার!
কিন্তু গানটি আমি কিরে গিরে তাকে শেখাব না
কখনো। তবে অম্মাী গুটি চরণ তাকে পাঠাঙ্কি—
তাকে সাজা মিতে হার হার করতে চেষ্টে। তাই শেনি :

অম্বত তাগা তেরা শামল অম্বত তামাগা তেরা

তু হুনিয়াবে হুজিরা তুযবে উলটপালটকা তেরা

এ গানটির বাংলা করতে হ’ল মাকে শোনাতে—
তিনি কী হাকান প্রদিন্শিয়া জামিল তো—বিখি গান
আমো ভনতে জান না, বদেন—‘ও নৈয়ে’গেরে-তে আমি
নেই বাবা! তাই আমি গাই তাঁর কাছে :

অপত্ন লীলা তোমার শ্রীহরি, অপত্ন লীলা এ কী!

মগত জোয়াতে তুমিও ভগতে—ওলট পালট হেঁধি!

আটি

জীমের মাকে অসিত মাসীরা বলে ভাকত প্রথ
থেকেই। তিনি অসিতের মুখে মালা কীর্তন
ভনতে অজ্ঞাত ভালবাসতেন। ছেলেও বগতেন উঠতে
বসতে : “তোমার খোলা হুঁরি আমার মাথার ঝাক—
ননহিনী পান খেতে দুধ লাগ, নৈনা চকাই, নৈনা গুইয়ার
নান ক’রে, হাত সব বেগেলানি। গানে বহি ঠাকুরের
নাশ না থাকে তবে তাকে কি প্রাণ ছাড়ার?” ...ইত্যাহি

জীমরা উজ্জ্বল হামি হেনে বগত : “মা, গানের
দব চেয়ে বড় বৌলত হ’ল মন—ভক্তির ভজনও একটু
আবুঁ ভালো লাগে কেবল যখন সে মুখে তালে ভাবে
বলার হয়ে ওঠে। বেহুতো কীর্তনে প্রাণ ছাড়ার
কেবল তোমাদের—যেমন মরাগ্রভূর ছড়োতো ক নাম
ভনতে না ভনতে কেউকে শেখে।”

কিন্তু এ হেন “এম্বটিক” গনিকেরও মন বেজা
বলে পেল রাতারাতি প্রীতিযোগের মল মলে। অম্বত
আগেও তাঁর যেত দিখালর—কিন্তু ঠিক তাঁর কহতে
নয়। সাহেবের মল ভালো লাগত বৈ কি, কিন্তু বেশি
কম নয়। জুদিন বাবেই যত্নে হেলে যত্নে কিরে অঙ্গর
জমাত আগেকার মতনই। বাসন্তী ছিল ওর উত্তরচণ্ডী
বৃত্তির একমাত্র পিছুটান—তাকে ও ভালোবেসেছিল মনে
প্রাণেই। “আমাদের আবেদ অম্বত কেটে গিয়েছিল
বহুর না ঘুবেই”—বলত ও অসিতকে প্রাণেই—“কিন্তু
যত্না ভালোমান, সজ্ঞানকেত্র মলার, মানবাননা,
বাওহাওকরা, দেবাত্তব্রবা এমবেই মরাম্বি ছিল ঐ
মতীলক্ষী। কখনো একটি চোখ কথা কেউ শোনে নি
ওর মুখে। আবার ‘ক্যান-গাও মবাই বৌদি বলতে
অজ্ঞান। এইরকম কত কথাই বে ও বলত বাসন্তীর
মলকে! অসিত মাকে মাকে ছড়ার টিলনি কাটত :
‘পত্নশরের মরাম্বা শিখ তোমার ভাগ্যখান! কে না
যেবে তোমার মান।’” ইত্যাহি

সেই মাল্লব কি না আজ ভজন শিখছে—তা আবার
এমন বচসিয়ার কাছে যাকে ঠিক গায়ক বলা চলে না।
ঠাকুর কত ছালই যে চালেন—ওজ্জ্বলের মর শেবে হাতে,
বলে না? অসিত তাবে এই দব কথা। কত বৃত্তিই বে
কিরে কিরে আসে—বেসব বৃত্তি বাসন্তী বৌদির জীবদশার
উবে গিয়েছিল আজ উজান বেয়ে কিরে এসে নব হুই
নবরস বদিয়ে চলে। আহা! এমন লগাশ সবল মাল্লবে
ভাগ্যে এমন শোক! লক্ষীপ্রতিমাকে চিনে ও মেনে
শেখটার কি না বিসর্জন দিতে হ’ল অম্বতাল।

কিন্তু ঠাকুরকে নিহঁর বলেই বা কোন মুখে?
অতুলপ্রাণের একটি বাউল ওর মনে ভনভনিরে ওঠে
বিশেষ ক’বে জীমের মাকে নিয়ে মসীনারায়ণ বা
দবর পেয়ে :

তোমার ঠাকুর বলব নিতুং কোন ঘরে ?

ভবের গথে শূন্য খালি

বেতাই ঘরে বীন কাভালি,

বৈষ্ণব আমার পুত্রে হবে পাব বীনবন্ধুকে।

তিনিও গভীর হৃৎ পেয়েই এ বাউগটি লিখেছিলেন। মহাত্মন কবি বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট মন হারা ভক্তির দ্বিত মোড় নেয় দ্রাবিড়দেশে পথে। তার আগে সে ভক্তি তাঁর মন ছুঁয়ে যেতে যায়, প্রাণের মন্দিরে গারী আপন পেতে না।

কিন্তু ভীষ্মা কী করবে—কী নিয়ে থাকবে তাঁর থেকে তিরে ?—ভাবে অসিত। সবল মরলিপি বন্ধ-বংশল মালুটি লোক খাওয়াবে কেমন করে ? বাসতাই ছিল ওর সব উপসর্গের প্রধান বৃষ্টি। তাকে হারিয়ে ওর অস্তর কাকে হ'বে দাঁড়ায়ে ? মাদিনা আছেন এই ভরসা। কিন্তু তাঁর মন তো ষ্ট্রিক বাসতীর মতন সংসারী নয়। বহুদিন থেকেই খানিকটা ঘুরে ঘুরে আছেন তাঁর মনগড়া মনিরেনিয়ার পূজো-অর্চা নিয়ে। গুরু-বরণও করেছিলেন,—ঘটিও হুলগুজ। কিন্তু তাকে কী ? অদিতকে তিনি প্রাইই বলতেন চোপ বড় বড় করে : "হুলগুজ কি ক্যালনা বাবা ? বীক্ষাওকর পর কাটেন তো তিনিই।" অদিতকে বহুদিন আগে একবার ভীষ্ম বলেছিল তারাপা করে : "মা যন্ত্রে পেতেছেন মৈববানী যে তাঁর বীক্ষাওকর হিমালয়ে তাঁর পথ চেয়ে ঠায় ব'লে আছেন।" অদিত ভাবে "কিন্তু যন্ত্র নিয়ে ভীষ্মা হালাহালি করলেও যন্ত্র তো অনেক সময়ে মতিও হয়। বসো, যদি একত্রে যন্ত্র বলে—মাদিনা যদি স্তম্ভর কাছেই থেকে যান, তাহ'লে ? ভীষ্মার ভাগলপুত্রে সংসার চাপাবে কে ? ভীষ্মী চামেনীও নিয়ের বিন আসর হ'লেও শেকালির িবে যেনেই বা কি নিয়ে ? তার বেখাওনাই বা করবে কে ? ভীষ্মার কর্ম নয়। এইসব ভাবতে ভাবতে অদিতের মন উঠত বাধিয়ে।

এই সময়ে অদিতকে হেতে হ'ল বিলতে।

নয়

অদিত বিলতে থেকে ফিরে কলগে হ'লে ওভালটেচারে গানের সভায় গিয়ে অমল গান ক'রে ভ্রাতৃ হয়ে সুমিরে

যন্ত্র বেখল ভীষ্মাকে। পরদিন ভাগলপুত্রে লিখণ চিঠি ওর এক আত্মীয়কে ভীষ্মার খবর চেয়ে। উত্তরে আত্মীয়টি লিখলেন যে, সে বেংগলগে এক অস্ত্রের আছে মা-র মজ, মাঝে পেয়ে একই গুরুর কাছে মদ্যাসনীকা নিয়ে। বেংগের তিনটিকে যেনে বিয়েছিল কাকার বহির বাবুর তথ্যবকে তিনি বড় দুটর বিবাহ দিয়েছেন তাইশোব দুটি আউচলোই বলের ঘরে কিনে নিয়ে। ছোটটি—শেকালি—সম্ভবতঃ আছে তার বড়ি-র কাছে। তার কী বাবু হবে—কেউ জানে না। ভীষ্ম কিভাবে কি না তাও কেউ বলতে পারে না, কারণ সে কাউতেই চিঠিগত লেখে না। একবারে 'মোনী বাবা' থাকে বলে।

এ তো লোভা কথা নয়—চরকানো খবর। —ভাবে অদিত। বেংগদেশের মতন বন্ধুত্ব অমাত্যাদীর বেশে ভীষ্মা একটানা দুদিন বংশব আছে। এ কী ব্যাপার !! আর এক আশ্চর্য : মাদিনার মতন ষ্ট্রিকাতুরে বৃদ্ধা—বাট পেত্রিয়ে গেছে—হিমালয়ের পাঠাড়ে স্নিত হ'য়ে আছেন কেমন করে ? মেথানকার খণ্ড-স্তের বাবুহাই বা করবে কে ? ভীষ্মা তো আশা নিয়ে। ...এই সব আশা-পাখাল দিল্লার অসিতের মন ব্যাপান হ'লে যায়। সেই মহানন্দ বিন্দুবিদ্যা গল্পামোদী ভীষ্মা কি আশা মতিই তিনিবি—গল্পাদী ? ঘুর ঘুর কখনো ? এ বলে গুণব। মদ্যাদী বৈবিলির ছাঁচে ভীষ্মাকে বিধাতাপুত্র ভোলই করেই নি—অদিত প্রায়ই আওড়াও ভাগলপুত্রে :

ভীষ্মা থাকলেই আসর জমক

মহবর মহবর মহবর মহবর !

ভীষ্ম উত্তর দিত অসিতের কীধে টাটি মেয়ে :

বেবনিক ! জুড়েবে—ভীষ্মার অলপম

মুঁড়ির খোঁচে হয় মাঝরও জমক।

অদিতের কী যে ইচ্ছে হয় বেংগদেশে ছুটে যেতে ষ্ট্রিক খবরের জন্তে ! মহত ভীষ্মা কোনো পাকে পড়েছে—কে বলতে পারে ? পাকে পড়াই যার মতাব...কিন্তু—মাঝা নাড়ে অদিত লেখে—এ পার্বত্য স্নিতে বেংগদেশে যেতে ভরসা যায় না। তার উপর ষ্ট্রিক কি এই সময়েই তার নিঃস্বপ্ন এল বিবেচনায় এক লক্ষ্যত মদ্যাস শৌর্যোচিত্য করার ! একবার নিঃস্বপ্ন নিয়ে ফেলার পরে তো, আর না করা যায় না। এখন উপায় ? সত্যিই ভীষ্মার জন্তে

ওর মন কেমন ক'রে ওঠে। তাতে অনেককণ প্রার্থনা
করে একঘন। হঠাৎ মন হাকা হ'য়ে যায়। কে ধেন
বলে—ভীষ্মদ্বার খবর মিলবে স্বপ্নের বনোই। এ
রক্তর খবর হাতে থাকে শোনে। আর যা শোনে ঠিক
কি তাইই ঘটে। এবারও জুল শোনেনি ঠিক চাওনি
বারে ভীষ্মদ্বার চিঠি :
তাই অসিত,

হঠাৎ যন্ত্রে যেনলাহ তোকে। তুই যেন আমার
জন্তে প্রার্থনা করছিল। তাই মনের ভায়ে বেলে উঠল
কেবল বহু কঠোর ভীষ্মদ্বার। কদিন থেকেই মনে
হছিল তোকে অন্তত আমার একটু খবর দেওয়া উচিত
ছিল। কিন্তু জানিস তো তোর ভীষ্মদ্বার—গভীর
কহতে যার জুড়ি মলা ভার! ই।, শুকনো বললেন—
আমার বহু কারো বহন। তিনি মগাধোনি, তার কথা
তো আর জুল হ'তে পারে না। তাই লিখছি, তোকে—
তার অন্তর নিজে—যে আমারে আগামী শুক-
পুনিয়ার জুড়কদিন আগে স্বহস্তে মাস্তে হচ্ছে—শুক-
যেবেই কোনো কাজে। তুই যদি সেই মত নাগায় হরি-
বারে আসিস পে। দেখা হয়। চ'লে আর না ভাই, দুর্গা
ব'লে—লক্ষী! তোকে কত কথাই যে বলবার আছে—
অচেন, বোম্বের, ষ্টাণ্ডার্টিক—উঃ। বলবার জন্তে প্রা-
দুটকট চাচ্ছে। কিন্তু তোকে পাই কোথায়—ভালো-
ভায়া—“এই হল প্রশ্ন : “that is the question”!

এ-দমতায় একটিকার পরাধান আছে : সহস্র বহন
পর্বতের কাছে যেতে অক্ষয় তখন পর্বতের সহস্রের
কাছে আগমন। না, ঠাট্টা নয়—তুই তো এখনো ভাঙ-
হাত-পা, না আছে গৃহ, না গৃহীণী, না গুপ্ত, না শুকদ্বারী
সেবার হাতি—তাই তুই, কেন আসতে পারবি না
দোকা হরিবার—বিশেষ যখন হরিবার তুই এক ভালো-
বানিস। ভালো কথা : শুকনো আমারে বলেছেন
তিনি চান তোর মুখে খাস বাংলা কীতন মনতে—যা
আমি জানি না। কাজেই বলা চলে—তুই শুকনো-
কথা পেয়েছিল। না না, শুকনো নে—আমি শুক-
দ্বারের দ্বারাল নয়, তোকে “কনসার্ট” করতে চাই না।
তবে তোকে বলতে চাই শুকনো-কথা—আর এমন সব
আশ্চর্য কথা যে, শুনে তুই গালে হাত দিয়ে চাওবি

ভাবি : “তাই তো! মৃত্যু তাহলে আরও বেঁচে
ব'তে আছে এ ব-বুগে!”

ঠাট্টা না, তুই চ'লে আর দোকা হরিবারে—আমাকে
তার কদিন বোহিন্দবনের ঠিকানা। এ-মগাধার তুই
তো হুয়া উঠেছিল। তুই তার কারণে আমি টেনে
যাওতে বোহিন্দবনে এনে থাকতে।

যা আনছেই আছে। যেন আমারে যথাক
প্রায়ই : “বলি নি তোকে যে, মত হ'লেই শুক
যেখা যেন যেন যেন। যা দেখেছিলেন শুকনোকে
যন্ত্রে—কিন্তু সেখা বলব তুই এলে তবে।

একটা কথা : ভায়া এনে কলকাতার। তার খায়া
প্রিন্সিপাল কলেজের অধ্যাপক। সে আমারে লিখেছে
...জুটো তিনটা কল পাঠাতে চায়। তুই যদি নিয়ে
আসিস তো আমার তো খুশি হই, ভায়াও খুশি হবে
তারে মর্শন পুরে। তবে সে তোকে যথেষ্ট বয়ে
তার শুধানে একদিন কীতন গাইতে—বলে রাখছি।

ইতি। তোর ভীষ্ম।

৭৭

অসিত মুখিলে পড়ল। জিব্রনে মলীত মতায়
গৌরোহিত্য—অন্য ভীষ্মদ্বারে লিখেছে হুয়াসর বাবে...
...ভেবেচি প্রার্থনা করল লিখি বাবে হরিবারে
যাওয়া হয়। একে ভীষ্ম, তার গুপ্ত হরিবার—প্রার্থনা
না ক'রে পারে। প্রার্থনার অন্তরও মত হয়—যে
নি কি বাতবাই। মৃত্যু বাতুন বা না বাতুন, ঠাকুর
তো আরও ভেদিক করণায়ই আছে—“শত-অনু-
বন্ধ-পরাব” অর্থে “মলমত চিবমত”।

কেবল অচেন ঘটল। মতের কেবল উকি মারে : লিখি
কি প্রার্থনায় ঘটল—না কলকাতায়। তবে হু জুটো
অচেন ওক ভাবিয়ে দিল বৈ কি। এক : জিব্রনে
হুয়া কী এক মলমলে তবিল-অনু-পের মত মলীত-
মতায় অবিবেশন হুয়াস পেছিয়ে গেল। হু :
প্রাণ থেকে এল নিরন্তর—শুক পুনিয়ার ঠিক মত দিন
পরেই এক মলীত কলকাতায় : অসিত নিমন্ত্রিত হ'ল
শুকনো গাইতে।

অসিত আনন্দে ভীষ্মকে তার করে দিয়ে ওয়াল
থেকে রক্ত হ'ল কলকাতা। ভায়াও কাছে এ

সুনল। এর আগে তনেছিল গুরুবে। এবার সুনল ইতিহাস সবিত্তারে।

সেট সনাতন কাহিনী: নবলকে ঠিকিবে কৃষ্ণিলেব বোঝাবোলা—স্বী বিয়োগে মৃদুমান বৈবগৌকে ঠিকিবে চকুয় নগ্নাবীর শ্রীকৃষ্ণ: বচিনবানু কীষের অছি হ'য়ে ভ্রামলী চামেলীর বিবের অম্মহাতে এর দুট আটচালা কিনে নিলেম এক বছর নায়ে—ভাষ দাত হ'বার টাকার। অশিচ, মেবে দুটির বিবাহের পর শেকালিকে পাঠিবে দিলেন বিবিবের তথ্যবকে—সে থাকত কখনো ভ্রামলী কখনো চামেলীর কাছে। ভ্রামলী কীধে বলল: "ওদিকে ঠা কুমা গুরু শেয়ে গল্পগ, আর কিতো চাইলেন না—এদিকে আশাযেবও কিছুই হইল না—বাধা ও 'গুরুদাস' নাম নিয়ে বিবালী হওয়ার কলে। আশাযেব কালেভেড়ে লেখেন এক মাগটা চিঠি—ভা-ও পোঠগার্ড..." বলতে বলতে শেকালির সে কী ছুঁশিবে ছুঁশিবে কাহা! পলাতক পিতাকে ধরে ফিবিবে আনার চেষ্টা করবে কখনো নিয়ে অসিত কখন দুটি নিয়ে চলল হরিবার।

এগায়ে

হরিবার ঠেপনে অসিত অঙ্গল যোগীকে প্রণাম করতে হেঁট হেঁটে সৌর হৈ হৈ ক'রে তাকে বৃকে ছাড়িবে বসল।

"প্রণাম? সে আবার কী যে পদ্যলিহাস বুদ্ধিবাধী!"

বলল সৌর প্রঙ্গর পরিহায়ে। "দাতকঅও বাকে নবদ্বার পূর্ব কবিল নি।"

অসিত হেসে বলে: "কিন্তু তোমার যে নবদ্বার হয়েছে হাল। 'খোকা আশার সে খোকা তো নেই।' একবাহে বাকে বলে হাতেডগালেন্ডে ল'খ, তার উপরে গুরুদাস—ভাব উপরে এমন জন্মকালো হাড়ি! সস্তি সৌরবা, হাড়িতে তোমাকে কী যে রানিয়েছে!"

ভুক্তির সৌর বহাশ্রী হ'য়ে অসিতের পিঠে মোরালে চাপড় দিয়ে বুটের বাধা তার দুটকেন ও হোল্ডল চাপিয়ে পর চলতে চলতে ছড়া কাটে: "হা হা হা! ওরে অসিত,

"হাড়ি গৌক বিনা হয় না যোগীর গভীর যোগমাগে হুহতি কেন বিনা শুখ শিবপুত্রা ক'রে সতীর যেমন হেলে না পতি।"

অসিত হেসে বলে: সর্ব হুকে! তোমার প্রাণ খোলা হালি আর হুড়াকাটার মৌলতে নিজেবে আব অঙ্গলয় মনে হচ্ছে না। তোমার গুরুদ্বার বামীজি বৃষ্টি লেবে বৃক্কের মধ্যে থক ক'রে উঠেছিল। কিন্তু এখন দেখছি

সৌর কেব অট্টহানিতে সান্তার পথিকদের চমকে দিবে পাশপূর্ণে কবে

"—ছড়া কেটে ওলা অট্টগাতে বকতে কর্ণা বহার যে—

সঠিক: রে! গালপাট্টা হাড়িতে মজবে না ক-রে ধটার দে।"

অসিতই এবার সৌরের কাঁবে চাপড় মারে, বলে: "সস্তিই ভগ কেটে পেছে সৌরবা! বাইরে স্তোম বহায়েই বা—অন্তরে বধন পেই সৌরবাই আছ—"

সৌর বাধা দিয়ে বলে: "কীবে রতন, কীবে! অস্তা অস্তর দেওয়া চলবে না—বেদী বৃক্ষস্টে তাহ'লে কের বহবধন হবে। অনেক বট্রে 'গোয়ালে' বাওয়ার বহভাল কাঠিবে উঠেছি—নামও বহলে কেলছি: সৌরমেনের অন্তরেবী শির শুকলাল নাম নিয়ে শু'বে গুরুচরণে নত হয়েছি তাই নয়, তার চরণদুত সেবন ক'রে—কী বলব!—সহিষ্যিত হয়েছি তাই, সস্তি বলছি।"

অসিত টাকে "কিন্তু পাম জর্গা তো তেজ্জি চলেছে সমানে—"

সৌর কেব বাধা দিবে বলে—এবার হাতেরোড় ক'রে "নবাবী আমলে: শুখ ঐটুকুই আছে দাবা! বলব কী:—সিগারেট, স্তামাক, সিগার, পাইপ—সব ব্যতিল—ঠেঁচে আছে কেবল এই পানটুকু—ওও জর্গা হুতি বাধ। না, এ ঠাটা নয় ভাই! গুরুদেবের কৃপা পশুয়নি, মৈলে মহাহারী কি মাত কুবুবে মিভাহারী হ'য়ে মাত নমনা-নন্দ হ'তে পারত? না তার মূলদমান কিত জঠরও আচাৰী নিরা'বিশ্বাসী হিন্দু ম'বক বলতে পারত—হা হা হা!"

অসিত এবার সস্তিই আশ্রয় হয়: "বটে তুমি এমন নিরা'বিশ্বাসী!—ভাষের বলতে আগে 'দাম বাধ ওয়া—যেহুঁ'র মনে আছে।"

সৌর খোলা হেসে বলে: "তাই তো বলছি—গুরু-দেবেথ কৃপা আছ আনে, নরকে হর করতে পারো।"

“স্বাৰ ভোম্বাৰ ক্ৰমিক জিম্পেপ্‌শিয়া”

গেছে। আৰু আগলৈ তোকৈ চা-যোগে চালা কৰি—

“হা হা হা! নে তো অশীক দেহেৰ ব্যাধি—দেহে
ভাৰণে—উঃ! কত কৰাই যে বলদাৰ আৰে,
গেছে কবে! আঙো কত ভবব্যাধি কেটেছে যে—চল চল।”
বলদ তোকে থ ক’বে বিতে। এই যে ‘বোহিতবন’ এলে

[ক্ৰমঃ

— — —

ব্ৰহ্মসূত্ৰ কাব্যানুবাদ

শুন্দদেবী, সরস্বতী, শ্ৰীভক্তাৱতী

(পূৰ্বপ্রকাশিতের পর)

অম্বাদিবক্ত ভবহুশপত্তিঃ

(২১১২৪)

(২১১২৩)

শব্দৰ কন অশ্ব অৰ্থে প্ৰাণবে ভেনো কয়
পাণ্ডৱেৰ হাৰে পাণিব্য কটিনয় যে হয়
আবাব কেহবা বলিন যে হয়
কেহ উজ্জল উজ্জিয়া হয়
আবাব হাৰে চৈতন্তেৰ তেহনি প্ৰকাশ ভেনো
জীবেৰ অশ্ব জানি ব্ৰাহ্মৰ সৰ্ল জানতা ভেনো।
উপসংহাৰ্জৰ্ণনাং ইতি চেৎ ন কীৰ্ত্তব্যং হি
(২১১২৪)

কন শব্দৰ ব্ৰহ্ম জানিও জগৎ প্ৰটাই নয়
জগন্তেৰ উপকংণ জানিও ব্ৰহ্ম চতেই হয়
কীৰ হতে বধ্য হবি পুনঃ ভয়
তেহনি ব্ৰহ্ম জগৎ উদায়
শব্দৰ শক্তি আবাব দেহন অশ্বৰ্ণ পৰকাশ
জীৱি ইচ্ছাৰ পূৰ্ণ জগৎ সবে ভেনো জীৱ দাল।
মীন সে ব্ৰহ্মকাৰেৰ যেহন শাশ্বত ঘট ২৪
জগৎ ঘটি নয় জল ও চকু কত লয় পৰে পৰে
ব্ৰহ্ম জগৎ যে নিম ইচ্ছাৰ
এই পৃথিৱী প্ৰটাই হয়
জীৱাৰি তেহৰ সহ শক্তিৰ সহ উপাধান হয়
কিবা প্ৰয়োজন উপাধানে জীৱ যেহন ইচ্ছাৰয়।

শব্দৰ কন কেহ পুনঃ বলে হুৰ অচেতন হয়
উপকংণেৰ দ্বাৰা তাহা হতে হবি পৰিপত হয়
আবাব ভেদভেদে নান্য জগৎ হয়
ব্ৰহ্ম অতুল শক্তি যে ধৰে
যৈব ঘটনা প্ৰাণাৰ বা বৰ নিবেশে মূৰ্ত্ত হয়
মাকড়লা যথা নিম্ব বেহ হতে জাল যথা নিৰ্ভাৰ।
কৃৎষপ্ৰপত্তি নিৰবয়বয়ণয় কোণোবা

(২১১২৩)

শব্দৰ কন প্ৰতিপত্তিতে নান্য জগৎ কথ্য কয়
ব্ৰহ্মই হবি জগৎ যনতো ব্ৰহ্ম কোথাও হয়
জগৎ হইলে ব্ৰহ্ম কি নাই
ব্ৰহ্ম বলিতে প্ৰতিভেত বুঝাই
নিৰ্ভণং নিষ্ক্ৰিয়ং শাশ্বৎ নিৰবয়বং নিৰ্ভণং
ক্ৰিয়াহীন সেই জগতীন জন কি ভাবে এখানে কন
বাহু বধ্য বয় শাপ প্ৰাণেৰে বেহা কতু নাই বাৰ
গাছ নড়ে বেধি পাতা বৰে পড়ে বাহুও প্ৰকাশ পাও
ভেদনি মূৰ্ত্ত অমূৰ্ত্ত হাৰে
ব্ৰহ্ম জগতে প্ৰেভাবে বিৰাজে
ব্ৰহ্ম বাজীত কোন কিছু নয় ভেনো মনে নিতৰ
ব্ৰহ্মেৰ মাক বিদায়ে জগৎ নিজে সে ব্ৰহ্মবয়।

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বচর্চাশিতের পর)

চতুর্থ মন্ত্র (১।২।৪)

মন্ত্রঃ—দ্যুমতে বিপরীতে বিমুক্তী

অবিজ্ঞা যা চ বিভেতি জ্ঞাত্য।

বিজ্ঞাতীশিনং নচিকৈত্তমং যন্তে

নবা কামা বহুগেহসোপূষতঃ।

অর্থঃ—যাহা বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা বলিয়া খ্যাত, ইহায়া সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্নগতি। নচিকৈতা তোমাকে বিজ্ঞানী মনে করি। বহু কামাবস্তুও তোমাকে প্রস্তুত করে নাই।

ব্যাখ্যাঃ—অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞার প্রত্যেক বহুরাজ কেন উল্লেখ করিতেছেন? ইহা যাহা আমরা প্রের্ষ মার্গে যাইতেছি কি প্রের্ষ মার্গে অগ্রসর হইতেছি তাহা স্মৃতিগত লক্ষ্যে হয়। আসসা যাহা কিছু করি বা কিছু আশায়ের দ্বারা হয় তাহাদের গতি আশায়ের পরীক্ষাই দুই প্রকারে ব্যক্ত হয়। যে কাজ বা যে ঘটনায় আশায়ের পরীক্ষায় নিঃসৃত হয় তাহা প্রের্ষ বলিয়া জানিবে। যে কাজ বা যে ঘটনা আশায়ের বোঝে উদ্ভূত হইতে আকর্ষণ করে তাহা প্রের্ষ বলিয়া বিবেচ্য। মূল ও যুগ্ম পরীত ও বেধে একই লক্ষ্যে মানব জীবনে অববোধন বা আভ্যাস চলে তাহা জানিবে। একটার হইলে অপূর্ণতার যোগ করা যায় না। তাহায়া যেন মাহাত্ম্যের দুইটি পা এক পথেই চলিতে সক্ষম। যখন পরীক্ষার সকল রসের দ্বারা নিঃসৃত হয়, তখন প্রের্ষের দিকে ধাবমান হইতেছি। যখন আশায়ের পরপরই অস্তরে জলিতে থাকে, তখন সাধা সন্তা তাহারই উত্তাপে উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। রূপরাসা যেনও প্রোত কানায়। অগ্নির বহিঃস্থিতি নির্দেশ। হন নিচু দিকে টানিতে পাবে, কিন্তু বুদ্ধি উপরদিকে লইয়া যায়। হন অবিজ্ঞাকে বরণ করিতে চায়, বুদ্ধি বিজ্ঞাকে ধরিয়। থাকে। যে মাহাত্ম্য তাবৎ

যশ, উত্তেজিত হয়ে কাজ করে, সে মানব প্রচুর বীজ্য করিয়া অববোধন করে কাহন শাস্ত্রিক যনের অর্থ—বর্ষই চটন লক্ষ্যে মনোযোগী হয়, ইহাঃই জীবনে অববোধন প্রাধান্য জানিতে হয়। আর যে সাধক বুদ্ধিকে কাণ্ডারী করিয়া দেইমত সাধনপথে নিত্য তপস্কাপারায় হয় তাহার প্রের্ষ মার্গে উন্নতির গতি অসম্ভবিত্বভাবে চলিতে থাকে, সে আধ্যাত্মিক দিকে আবোধন করিতে থাকে এবং তাহাঃ জীবনে বিভাঃ মহিমাযিত হয়। তবে কি মনকে বুদ্ধির চোরে ছোট করা হইল? কঠোপনিষৎই পথে বুঝা যাইবে, মনকে বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করিয়া চালিত করিলে হন বাস প্রোত হইয়। আকাশ মার্গে মুক্তি পাইতে থাকে। তাহাঃই আশার আকাশের কল্যাণ নিমিত্ত বস্তু যা জীবনমুখের উপর পড়ে বর্ধিত হইলে তাহাতে বিশ্বের কল্যাণ হয়। কিন্তু এক্ষণে আধ্যাত্মিক অভিমানের গোড়ার কথা হইল, কি করিয়া প্রের্ষপথে অবিস্তারিত থাকিয়া অগ্রসর হইতে পারি। তাহারই ভিত্তি অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞার প্রত্যেক মিলন হইতে বৃষ্টিপাত করিয়া স্পষ্ট করিয়া জানিতে বলা হইল। অবিজ্ঞা যেন নচিকৈতাকে আশ্বর্ষ্য মানিয়া কামনাবিদ্ধ না হইয়া ধীরভাবে জীবন-যাপন করিতে প্রয়াসী হই। প্রের্ষমার্গ ক্রমশঃ নিঃসৃত পরিচয় নিজেই নিবে।

পঞ্চম মন্ত্র (১।২।৫)

মন্ত্রঃ—অবিজ্ঞায়ামন্তরে বর্ধমানাঃ

অনং বীজাঃ পতিতং যদ্বমানাঃ।

যদ্বমানানাঃ পরিবর্ত্ত মুচ্য

অনন্তৈব নীচানাঃ যদ্যন্তঃ।

অর্থঃ—অবিজ্ঞার মধ্যে বর্ধমান, নিঃসৃত বিচারে বীজ এবং নিঃসৃত বিচারের বস্তুতার পতিত, অতি সূচি

ମଧ୍ୟମୀ ସ୍ତୁତ୍ୟ, ଅକ୍ଷତ ସଂସା ପରିଚାଳିତ ଅକ୍ଷତ କ୍ରୀଡ଼ା,
ପରିଚ୍ଛେଦ କରେ ।

ব্যাখ্যা—বাহুবলী জীবনে সে কি করিছে একে বা
 তাহার ব্যক্তিগত জীবন হইয়া থাকে, তাহাই প্রতি-
 পত্তি তাহার নিজ জীবন ব্যতীত আরও অধিক প্রভাবশালী
 হয়।

যদি জীবনের সব কাজের মধ্যে কোন মহত্বের জীবন
আছে তাহা হইলে সে অবিত্য তত্বকে খিঁচিয়া
তাঁহার সন্ধান করিবে। কারণ অবিত্য তত্বকে
তাঁহার জীবনে কিছুই দেখা য়েবে। সে মানুষ নিজেকে
যতই প্রজ্ঞাশালী ও শাস্ত্রপণ বলিয়া গণ্য করুক বা
অভিমান করুক, তাঁহার বিচার কোনই নীতি প্রয়োগ না
হওয়ায় স্থান পাইতে থাকে ও পোপ পাইতে পারে।
প্রত্যেক অবস্থে পোষণ করিয়া জীবনে ব্যাপারে প্রেরণ
যদি পরিচালিত হইলে এইতদুই হয়। ইহাওই আধুনিক
তাবাখ ভাষায় বলা হয়। এইতদুই কল্যাণের জীবন
দুর্গতিপূর্ণ চর, বোগ, জরা, মরণ ও আত্মদিক প্রণ
তাঁহাকে স্বর্গ ও জর্গ করিয়া তাঁহার শেষ করিয়া থাকে,
তাঁহার মধ্যে জীবনের আর কিছু থাকে না, পু-র্নজন্ম ইত্যাদি
ইহা সে প্রবলোক বুঝিয়া আসে। আত্মর হাবাগ পাত,
যদি সাপোষন করি লয়। তাই এই বস্তু বলা হইতে
যে প্রেরণা লইতে হইলে চিন্তার, ব্যাক্য ও কর্মে দুর্গ
প্রকারে পড়িলে আত্ম কলপ্রব হয়। নতবে প্রাণের বাস্তব
জীবন যেমন অক্ষরায়ন হয়, তাঁহার অক্ষর জীবন
তত্ত্বদিক অক্ষর মত হইল। ব্যা ও কোন দিক হইত
কোন আলোর আশা করা যায় না।

सं. क्र. - (२/२१६)

ସହ - ନ ସଂସାରୀଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ୍ତି ବାଳଃ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାବତ୍ସଲ୍ୟ ବିକ୍ରୋହେନ ହୃଦୟଂ ।
 ଅଥଃ ଲୋକେଃ ନାତି ମହ ଇତି ସାନୀ
 ପୁନଃ ପୁନର୍ବିବାମହଜ୍ଞେ ଯେ ॥

অর্থ :- চকমহতি সাধন প্রাচীণ নিকট সম্প্রদায় সাধন
 প্রতিষ্ঠাতা হইয়া। সে প্রভাবগুরু ও বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু
 ইহা পক্ষে। "ইহলোকটি আছে, পরলোক নাই" এইরূপ
 মননকারী পুনঃ পুনঃ আবার (যেহে) ব্যস্ততা প্রাপ্ত হই।
 ব্যাখ্যা :- "মৃত্যু সম্প্রদায়" ব্যাক্যের দ্বিগত অর্থ এই

উপনিষদ ১৮৮২ সন্থে ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা
করিয়াছি। আবার সে কথাই উল্লেখ করিয়াছেন নাই।

লেখানে “সহজী দাম্পত্য” মানবজীবনে যেভাবে দেখা
 দেয় তাহা জানা গিয়াছে। এক্ষেপে সেই অধ্যয়ন মূল্যে
 যে দাম্পত্য পক্তি সাধনজীবনে সাহসের সহকারী বহন
 তাহার কথা বলা হইতেছে। পূর্বে তাহার পরিচয়
 গাইয়াছি। এক্ষেপে সাধনজীবনে তাহার ঐতিপক্তি জানিয়া
 তাহার কথা সকল বিদ্যমান করিতে বলা হইতেছে।
 প্রেমের পথে দাম্পত্য পক্তিও সত বহু আয় নাই।

এইবার পূর্ণ বয়সে মহিউদ্দীন মারা গেল। এই বয়সে যে সোজা অর্থ পাই তাহা হইতে আশঙ্ক করি। পূর্ণ বয়সে পণের মূল্য অল্প হইয়া, যিনি বীর তিনিও যে স্বর্গলীল্যের পর্যাণেই যেতে বসে দেখিবার ভয় দেখাইয়া রাখা যায় করেন তাহা যেহিলায়। এইজন্যে তিনি প্রায় সব চ্যুত হইয়া যান। বর্তমানে মনে আর এক প্রকার লোকের কথা বলা হইতেছে, যাহারা দুঃখিত মনে, তাহাদের চকল খালক খাওয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। হইতেছে, তাহাদের চকলতা বিভাবে প্রায়শই অসুস্থতার হয় তাহা বলা চাইতেছে।

ও হাৰ্বেৰ অৰ্থে সম্ভাৱ একাত্তই অভাৱ হয়। পিছলৈ দেখা দাত, সম্ভাৱ বিজ্ঞান কি প্ৰকাৰে দাবৰ জীৱনে বনে গ্ৰাণে ও বাহৰাৰে চলিত্তে থাকে। সম্ভাৱকই দেখানে "বোণ" আৰু দেওৱা হইতাত্তে (১৮৮৮)।

ভাষণের ব্যানবোশে আড়ম্বর হইলে “শব্দ” লাভ হয় (পীতা ৬.৩)। পী-১ অর্থস্বাক্ষর, সমতা হইতে সমতা পৌঙ্গবো। ঐক্যবোধের পথ। উপনিষদের সমতা হইতে সমতার নানিবা দেখানে দ্বি-বহুই বোঝে চিহ্ন। এই চিত্রের প্রকার সমতাকে মহাসমতা বলিলে উভয়ের প্রভাব বৃদ্ধা নহল হয়। সমতা বৃদ্ধ করে (process of addition) বলিয়া ইহা বোপ। সমাসমতা বিবৃদ্ধ করে (process of subtraction) বলিয়া ইহাকে মহাবোপ বলে।

সমতা ক্ষত্রিযের ধর্ম বাবা অর্জুনকে গীতার দ্বিতীয়
 স্কন্ধে হইল। মহাসমতা ব্রাহ্মণের জীবনে মোক্ষপথের
 সহায়, বাহা নষ্টিকের চিত্র পাথের। ধর্ম হিন্দু
 সমতা বাল্লভের জীবনে কার্য্যকরী হইয়া গেলে অমৃত

ক্রমশঃ যান পায়। বোকপথে মহামহতা অস্তর জীবন
হইতে বিভূত হইয়া সমগ্র জীবন গ্রাস করিয়া আত্মার
কিলৌহ বহ। বিজীৱিত সাম্প্রদায়িক নিকির নিরুপ কার্য।
সমস্তকে অতর্কিত করিয়া সুদৃঢ় জীবনে যখন পরাণজি
বলবতী হ'ল তখন তাঁহাকে বলা হয় "মহতী সাম্প্রদায়িক"
অর্থাৎ যে পরাণজি মহামহতা করান। ধর্মক্ষেত্রে
সাধককে সেহেই বলা, সাম্প্রদায়িক বৈদীর পাকস্থলী সমস্তকে
জিক অগ্রসব হইতে হয়। বোক কার্যে সাধক স্টোমী
(বুদ্ধিহীন বিচেষ্টে, কঠ-উপ, ১৩৩২) তাই হয় বৈদী
সাম্প্রদায়িকতাকে বুক জড়াইয়া বোকের পথে লইয়া যান।
তখন সাধকের পতাক্তর নাই। সেই পত উপনিবন সেট
বৈদীর পথে লন। তিনিই শ্রেয় বর্ণের অপেক্ষার থাকেন ;
সাধকের বকলবিগলনের ভক্ত।

চকলমহতীর বালকের ন্যেই মস্তকে প্রতিষ্ঠাত হই
না। ভিক্রেব আলো যে বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে
তাহা চকলচিহ্ন হইলে বুঝা যায় না। যদি কেবলই
অস্তরের বস্তা খুলিও বন্ধ করি তাহা হইলে সে আলোও
জীবনে স্থির হইতে পার না। সে আলো "ভিতরে "ভ্যতি"
তাহা আর সেইসকল বাহিরে "প্রতিভাত" হয় না। তাই
প্রথম পঞ্জিতে বলা হইল "ন সাম্প্রদায়িক প্রতিভাতি বালকঃ।"

বিজীর পঞ্জি হিমায়ে চকল মহতীর সাধকের পথে
পথে ভুল হয়। কবি সাহিত্যক্ষেত্রে, "দ্বন্দ্বনাথ মিলে, পথ
বোঝার বলে, পথে পথে পথ ভুলি কো" ১৭৭৭ নং ও পঞ্চ
ইঞ্জিরকে ধন অস্তরের শব্দ আকর্ষণ করিয়া বাড়িতেও
হির ঠাণ্ডে তখন আর ভুল হয় না। একথাও সীতার
১১৭৭ স্তোকে পাই। তাই সমস্তই যে ব্রাহ্মণমহতীর
প্রথম মূলধন তাহাও সীতার পাঠ করিয়া বলা হইয়াছে
(১৮৩৩)। কিন্তু এক্ষণে চকলমহতীর সাধন মার্গের
আলোচনা হইতেছে। এখানে সাম্প্রদায়িক সাধন পদ্ধতি-
রূপে দেখা বা পণ্ডা বাহ্যে; বাহিরের চাণ্ডা ও পাণ্ডা
বন্ধ হয়, তখন চিত্তে চেয়ে বিস্ত্র প্রাণন সুবিকা গ্রাণ
করে। মাহু নির্যাস জড়িত বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক
বন্ধ করিয়া দেখিতে থাকে। তখন অলঙ্কারে বন্ধ হইয়া
আর ঠিক ঠিক কিছু দেখে না। শ্রেয় এবং শ্রেয়
পার্থক্য আর বসিতে বাহ্যে লক্ষ্য হয় না। "বিযুক্তা নাহ-
ত, পত্জি জ্ঞানসমুৎপত্ত" (সীতা, ১১১০)। যে
চকল এই বস্তীর প্রথম চারটি মস্ত্রে আয়ত্ত করা

হইয়াছে আর ত তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মাহু বাহ্যিক।
কবিয়া অল্পবয়সে, "বাহির পানে চোখ বেলেচি,
ভবর পানে চোখ নাই।" কালেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতে
যুক্ত হইয়াছে; সাম্প্রদায়িক দূর বস্তুতে, দৃষ্টির অস্তরালে,
অধোবাহ মতো অল্প বয়সে বাঁচ। প্রথম বস্তীর শেষ
মাত্র (১ ১১২০) মানবজীবনের উচ্চতর অভিজ্ঞাতি যে মহতী
সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠার আশ্রয় হ'ল। বুদ্ধিবোধের
প্রথম উত্তানে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাকে বস্তীর মাঝে
পারিলায় না। কেন এমন হইল? নিজের চকল মহতীর,
আর একবার, হস্তে লেখ্যক, নিকটে বন্ধ করিয়া
মেখাইবার চেষ্টা করিল। এখনও যদি যমের শিখা
অল্পমাত্রী নিকটে চলিত করিতে না পারি, যদি নিকটে-
আগি নিশার কবিয়া, শ্রেয় জ্ঞানের আলোয়, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি
কিটাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলে ইহলোক ও
পালোকের মহাপ্রকার পটভূমিতে অনাগ, অনন্ত আত্মার
বিভূতি আর ত অল্পের অধোভিত্তি হয় না। ইহলোকে
লক্ষ্য বসিয়া মনিত্তে থাকি ও বাহ্যের এখানকার টানে
হয়ের বস্তু হইয়া পুনরাবর্তন করি।

অতএব চকলমহতীর বালক হইলে চলিবে না। মতি-
কেন্দ্রের মত বালক মহতীর হইতে হইবে। তাঁহার মস্ত
লভ্য হ'ল, তিনি সত্যকে ধারণ করিবার ক্ষমতা ইত্যদ্যতঃ
বুদ্ধি চাবল করেন না। তাঁহার বাহ্যের মধ্যে সত্য
নিজের বন্ধন খুলে, তাঁহার ধামের মধ্যে সত্য নিজের
মুক্তি পায়। তাঁহার মস্তকে সাম্প্রদায়িক ভাষা বৈজ্ঞানিক
স্থির থাকেন। তাঁহার ধর্ম বা ধ্যান ও সমস্তের সমস্ত
সম্বন্ধের ভিত্তর বিজ্ঞা তিনি হয়ের কাছে, যৌর গুচ্ছরূপে
সম্বন্ধের উৎসাহনে আত্মজিহ্বা করিয়া চিরকাল হইয়া
থাকেন। কালেই নিজের লক্ষ্যকে বিজ্ঞাছিল বলিয়া
তাঁহার ইহলোক, পল্লোক তাঁহার কর্তৃত্ব ও বজ্জল
হাফা হইয়া নিপাহাফা হইয়া যায়। সেইখানেই "সাম্প্রদায়িক"
তাঁহার সকল প্রকার ঐশ্বর্য লইয়া বীঃ হইয়া
"প্রতিভাতি" বা আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রেয়বর্ণের অল্প-
গমন চরমভায়ে পার্বক হয়। তখন তবু পথ দেখা পার্বক
হয় না; বাহ্য অস্তরের সত্যের স্তানে পণ্ডা বাহ্য তাহা
পথের মধ্যে শোনা যায়, ও তখন বাহ্যের মনে হইবে,
জবে কি সাম্প্রদায়িক বৈদী শ্রেয় অলঙ্কার আত্মার নিরুদ্দেশ
হইলেন।

[ক্রমশঃ]

জীবন জিজ্ঞাসা

প্রিয়শোককুমার মিত্র

নিম্নেই এখন দেখিতেছিলাম।

দেখিতেছিলাম, রক্ত জন্মে দেহগুলো কোলাহল
মাঝে কাগজের গুণ্ড কাল চোখের কানিতে লুপ্ত
হস্তাঙ্কুরে শব্দ আমার বসে পরিস্ফুট বিরাট বুদ্ধি নানা
ভালপালা নিঃশব্দা হইয়া আছে।

বুদ্ধির চোখ দেখিতেছিলাম।

আমি কে, কোথা হইতে, কেন কহিয়া, কবে এই
লুপ্ত পৃথিবীতে মানবের মাঝে আমি আসিয়া পাবি
হইলাম?

শিখা, শিখা, প্রশিতামহ... হইবে নামের কোলের
কাছে ছোট কহিয়া বস্তুতে তাঁহার স্রোতের নাম লেখা
হইয়াছে। এতদে মিলেই বংশ বুদ্ধের কোন পাখা
কলস কহিয়া উঠিয়াছে, আবার কোন পাখার ডেজ এবং
প্রকার হেমন উল্লসযোগ্য হয় নাই।

অবাক হইয়া দেখিতেছিলাম, আগেকার মেয়েদের
মাহুলে কোন বেন বেখান। লগ্নে আত্ম কাল। "রে
ভাবিলাম, হ'বেই তো—সেভালেও মেয়েদের "সেকেন্দা"
নাম—হিলেদী, বসুধা, গঙ্গাধি...।

গঙ্গাধি। শিবপ্রসাদেব্রী গঙ্গাধি।

মন কল্পনা প্রোতে ভাগিতে লাগিল।

মন হইল, শিবপ্রসাদ—গঙ্গাধি মিলন বেন রাহ-
বোঁক হইয়াছিল। না হইলে, ভালপালা নিঃশব্দিতার
বিরাট বস্তুকটি এমন আলো করিয়া থাকিত না।

কিন্তু এই মিলনের কাচিন্দী বড়ই কল্প।

শিবপ্রসাদেব্রী গঙ্গাধির বিবাহ—সে তো একটা
সৈব। বিবাহ নাও তো হইতে পড়িত—না হইবারই তো
কথা। কোজী মিলন হয় নাই। কিন্তু কোথা হইতে
কি হইয়া গেল। শিবপ্রসাদকে বালাধা গঙ্গাধির
গঙ্গাধি শেখ পূর্ণাধি বালা দিতে হইল। বিবাহকালে
তাহারা কৈশোর ছাড়িয়া বৌবনেও পূর্ণাধি করেন নাই।

এবিবাহিত শিবপ্রসাদ আদর করিয়া গঙ্গাধিকে

খেলার মাঝে "গঙ্গা" নামেই ডাকিতেন। এই ডাকা
অবস্থা ছিল নিঃশব্দ, নিঃশব্দ, নিঃশব্দ, অতি চুপেচুপে।
যেড়ন ছেদ আগেকার কথা কিনা।

(২)

আমার বাড়ীর নামনে যে বিরাট বোগেনজিলা। লতাটি
ছায়ে উঠিয়া গিয়া ফুলে ফুলে বাতীর নামনেটা আলো
কহিয়া আছে, গুটির একটু গুণ্ড ইতিহাস আছে। এট
বোগেনজিলা। লতাটিকে দেখি আর আদর হইয়া গিয়া,
এই জীবন জিজ্ঞাসার কথা। কাঁধের ইতিহাসে, কোথা
হইতে কি হইতেছে, কিছুই বুঝি উঠিতে পারি ন।
প্রাণ ডায়ালেট বংয়ের ফুল দেখিও এক বহুত বাতী
হইতে এট বোগেনজিলায় একটি মোটা ভাল কাটি।
মিলের বাগানে বড় গুণ্ড কহিয়া পুতিয়া দিয়াছিলাম।
বহুত জট হয় নাই, কিন্তু দিন দিন সব পাতাগুলি
তকাইয়া গেল। ডায়ালেট ডায়ালেট কহিয়া দিবার
কথা। কিন্তু কহিয়া দিব দিব কহিয়া শেষ পর্যন্ত
কহিয়া বেওয়া হয় নাই। একদিন বাগানে পরিষ্কার ক-
তেছিলাম। ডায়ালেট কহিয়া কহিতে গিয়া হঠাৎ নল্লবে
পড়িল—ডায়ালেটের গারে ছোট একটি পাতা বাহির
হইয়াছে। তারপর দিনেদিনে পাতাটি সত্যে হইতেলাগিল।
বর্তমানে সেট বোগেনজিলা লতা ফুলে ফুলে আমার বাড়ীর
বগানে আলো করিয়া আছে।

৩

চিত্তা করিতেছিলাম।

মন বহুত-বহুত-বহুত-বহুত গঙ্গাধির এই বংশবৃদ্ধ
যে তো অমূল্য ধান তা কি তিনি জানিতেন?

জানিতেন না। কেহই জানেন না। ঠিকমত জানিতে
পারিলে অল্পে 'বহুত' এক জিজ্ঞাসার উত্তর মিলিত।
শিবপ্রসাদ ও গঙ্গাধির এই পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্রই আমার
প্রতিভাধারের পিতামহ।

গভাষি অতি অল্প বয়সেই অতি অল্প সময়ের ব্যাধানেই এই দুই পুত্রের জন্ম দেন।

কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মকালে গঙ্গামণির জীবন আশঙ্ক্য হয়। তিনি এই কষ্টিন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। জীবন উৎসর্গ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের জীবন হান করেন। ঘাইঘাতা নাকি বলিয়াছিল—“একজনকে মরতেই হবে। ষয় হান নর সন্তান!”

ছেলে বাচাইতে গিয়া মায়েব মৃত্যু হয়।

শিবপ্রসাদ নাকি ঠাণ্ডা আরবের “গঙ্গা”র মৃত্যুর জন্ত দৃষ্টান্তকেই দ্বারা করেন এবং ছয় মাস ছেলেকে কোলে পৰ্য্যন্ত করেন নাই।

অরপ্রসাদের বিন ছেলেও প্রথম কোলে নিয়া আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং আনন্দ উৎসবে সকলের সামনে আবার করে কাঁদিয়াছিলেন! এই ছেলে নাকি বেশশিশুর মত হৃদয় দেখিতে হইয়াছিল। শিবপ্রসাদকে এমনভাবে কাঁদিতে দেখিয়া বোধ হয় বহু শিশুও কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং শিবপ্রসাদের গলা জড়াইতা বহিয়াছিল।

পরে শিবপ্রসাদ এই মা-দ্বারা পুত্রের জন্ত সব কিছু ব্যর্থতাপ করিয়া প্রাণ বিধা এই ছেলেকে বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সময় দবাই দ্বারা করিতেন, শিবপ্রসাদ তাহাও করেন নাই—ঘিঠীহবার দ্বার পরিগ্রহও করেন নাই অগ্রোধ উপবোধ নাহে!

শিবপ্রসাদ ও গঙ্গামণির এই ঘিঠীহপুত্র ষ্টেশনমাস্ট্রই পরে এই বংশবৃক্ষের বিরাট শাখাপ্রশাখা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মনে মনে প্রসন্ন করিতেছিলাম।

গঙ্গামণি যদি না জন্মাইত, তাঁর সঙ্গে শিবপ্রসাদের বিবাহ যদি না হইত, তাহাদের বিলনে পুত্রদম্পত্য যদি না জন্মাইত (না জন্মানাইত) তাহা কখনও বর্তমানে দম্পত্যের মাপকাঠিতে গঙ্গামণি যখন মাথা ঘন তখনও তাঁর বংশ বিবাহ উপযোগী হয় নাই। কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম দ্বিবার সময় গঙ্গামণি না মরিয়া দম্পত্যটি যদি মাথা ঘাইত, তাহা হইলে এই বিরাট বংশবৃক্ষ কখনই সম্ভব হইত না।

— — —



মহাকাব্য

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

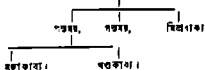
সামান্য ও মহাকাব্যত যে কবে বিভক্ত হইয়াছিল তাহার নিশ্চিৎ কোন দল ভাবিবে জানা যায় না। এই মহাকাব্য দুইটি আকারে বিশাল, উদ্ভেদে বিশাল, চরিত্রেও বিশাল। আর এই কাব্য দুখানিতে আশাযের কাহিনী, প্রকৃত্তি, লভ্য, দেব, ব্রাহ্মণিক, নীতি, ধর্মজ্ঞান, গার্হস্থ্য নীতি, রাষ্ট্রনীতি, চরিত্র, ধর্মস্বর্গ, ধর্মতত্ত্ব কবিবরের তুলিতে প্রসন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আশাযের জীবনের তিন দ্বয়ের প্রকাশও এই গ্রন্থের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত। পৈশমের বেধায় যন্ত্র, বৌরনে দেব উৎসাহ—আর বারংকো দেব শাস্তি।

সামান্য কেবল দুটো জাতির সংঘাতই নয়, আর্থ-অনার্থে বিরোধই নয়, বীর্যবলের কাব্যও নয়, সামাজ্যের পিতৃতত্ত্ব ও পত্নী প্রেম, প্রতীক ও বিচারের বহু প্রীতি, চরিত্রের প্রকৃত্তি, লক্ষ্য-ভাষ্যের সৌন্দর্য, ধর্মবোধে পুরোধ, দীর্ঘত্ব সাহিত্যতা এই সব ভারতীয় গার্হস্থ্য চিত্র বহু কথিত লেখান হইয়াছে, তাই গ্রন্থটি আশাযের এত আনন্দবীর।

অপর দিকে মহাকাব্যও কুপাণ্ডবের যুদ্ধ নয়, রাজ-দিত আফসান ও গৃহের ভয়ালাল বর্ণনাই এর মুখ্য উদ্ভেদ নয়—যুগিরের রাজ্য লাভের সমস্ত উৎসব-কৃত্তবরকে রূপে কথিত মহাপ্রাণের হুয়েই ইহার পরিসরাণ। তাই আশাযের এত প্রিয়।

লক্ষ্য পণ্ডিতের কাব্যকে ভাগ করিয়া তাহারে অলভ্যও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কথা হইল এখন এই গ্রন্থের কাব্য না মহাকাব্য? আলঙ্কারিকের মতে কাব্যকে ভাগ করিলে দাঁড়ায়—

কাব্য
(অভিনয়োপযোগী) পুত্র, স্ত্রী (অভিনয়োপযোগী নয়)।



তাহলে কাব্যের দুটি ভাগ পুত্র, স্ত্রী। আর স্ত্রীও দুটি ভাগ পত্ন্যম্ব, পত্ন্যম্ব ও মিল্লকাব্য। পরিশেষে পত্ন্যম্ব কাব্যের দুইটি ভাগ মহাকাব্য ও বণকাব্য। সামান্য ও মহাকাব্য এই মহাকাব্য স্রেষ্ঠ কৃত্ত। আলঙ্কারিকের মতে কতক এই গ্রন্থের মহাকাব্য নামে সার্থক তা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন—মহাকাব্যের নায়ক কৃষ্ণ ও উদার, দেবতা বিধা সম্বন্ধে ক্রিয় হইবে।

দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্যে হয় আশীর্বাদী বা দেবতার উদ্ভেদে উপস্থাপিত হোক কিংবা আরও হইবে।

তৃতীয়তঃ আলঙ্কারিকেরা কতকগুলি বিষয় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহারে মতে মহাকাব্য—নগর, পর্বত, সমুদ্র, গুহা, দ্বীপ, চরিত্র, চরিত্র, চরিত্র, অলঙ্কার, উৎসাহ, মঙ্গল, পুত্র, বিবাহবিচ্ছেদ, কুমারোৎপত্তি, মঙ্গল, পুত্রোৎপত্তি, যুদ্ধ, ব্যাঘ্র, বীজ, নারকের উন্নতি এবং আত্ম অনেক কিছু।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিষয় অল্পমাত্রে সামান্য ও মহাকাব্যকে মহাকাব্য না বলিলে উপায় নাই। গ্রন্থের বর্ণনাই মহাকাব্য।

সামান্য ও মহাকাব্যের দ্বারা আরও কতকগুলি কাব্য আছে যাহাদের বর্ণনা মতে ও সম্বন্ধে। বন মহাকাব্য বলা হইয়া থাকে কিন্তু ইহা কতক দ্বন্দ্বমূলক তাহাই বিচার সাপেক্ষ।

বৃদ্ধচিত্র, কুমার-কুমার, যুগ্ম, ক্রিয়াভাষ্য নীতিকে বই মহাকাব্য বলিতে হয় তাহা হইলে সামান্য, মহাকাব্যের ৌর্যহানি হয়, কিন্তু পরিতোষণের বিষয় এই গৌরব হানি করিয়াই এখনও উপযোগ্য গ্রন্থলিকে স্থানে স্থানে মহাকাব্য বলা হইয়া থাকে।

বৃদ্ধ চরিত্র অবশেষে হইতে। বৈরাগ্য লকারের বাধ্য সন্দেহের অপারম্ব প্রমাণই ইহার দল্য। ইহাতে সর্ব। কাব্যের আলঙ্কারিকেরা আলঙ্কারিকেরা

নিয়মাবলি মানিলেও ইহাওক মহাকাব্যের স্থলাভিষিক্ত করা চলে না। তাহাওন মহাভারত যে ভয়ের কাব্য ইহা সে ভয়ের নয়।

যাহা চিরকালের সত্য, শাস্ত, তাহাই কুমার সন্তান। অল্প রূপ লাভণ্য লইয়া নারী তাহার স্ত্রিহ জনের চিত্তকর করিতে পারে নাই অর্থাৎ স্ত্রিহ জনের মন একমাত্র ভগ্নতা ও ভাঙ্গনের দ্বারাই জর করা যায়। যৎ ঐতিহ্য, আবেশ-বাহী হইলেও, কাব্য বসেন জাতিক যৎ মিলিত হইলেও আন্তঃজাতিকের নির্দেশনন্ত হিমালয়, পর্বত, শব্দ বর্ণনা, বিহার থাকিলেও ইহাওক রামায়ণ মহাভারতের পার্শ্ব বসান হয় না।

যৎব্যপ কাব্যে যৎব্যপাভ্যেব শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য সম্পর্কে আলোচিত হইলেও, রামায়ণের স্তর প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা থাকিলেও অর্থব্যানের জন্ত অর্থ সংগ্রহ, কলগাভের জন্ত রামায়ণ, সন্তানভারের জন্ত বিহার, প্রকৃতি থাকিলেও ইহাওক মহাকাব্যের প্রকৃতিভূক্ত করা হয় না। এই কাব্য পার্শ্বভী-পক্ষেবস্ত্রের বসনা বিয়া আশ্রয়। যৎব্যপা, সন্তানভার ইহাওক পুত্র বহ।

‘কিরাভাভু’র কবি ভাণ্ডবি কর্তৃক রচিত। ইহা মহাভারতের বনপর্বে হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাই আলোচনা নিম্নোক্তমন।

নন্দনবীর জীবনের দ্বাদশ-অঙ্গ, প্রেম-কল্যাণ প্রকৃতি হস্তচিত্তের সনাতন চিত্তপ্রকৃতিগণিক আশ্রয় করিয়া ইহাওক বর্ণনা চলিয়াছে, আর তব তব লক্ষ্যণ হইয়া উদ্ভিগাছে যত্নতবে নারীতবে বিচিত্র বহিমা। মানব কল্পনায় বাহা কিছু মহান ও পবিত্র, তাহাই বেশি রামায়ণ ও মহাভারতে। একখানি ক্রমা, শান্তি, গেম, ভাগ ও সন্তের বহিয়ার পার্শ্বক; আর একখানি বীনচ, কর্ম ও বৈরাগ্যের প্রত্যয় লক্ষ্যণ।

সতী-সাবিত্রী-বমরভীর কাহিনী আমায়ের বহিলা-সমাজের লক্ষ্যণ গেম ও ভাণ্ডেব আদর্শ বহিগাছে। হস্তব্যানের প্রকৃতি, যুধিষ্ঠিরের স্ত্রায়সায়ণতা ও সত্য-

বাদিতা আমায়ের নীতি দিকা দান করে। শৈখ্যায় দ্বাবীর মান প্রকারে নিম্নকো প্রেম, হস্তিভ্রমের দান করিতে করিতে পুত্র বিক্রম, কর্ণের সত্যকায় জন্ত নিম্নকো পুত্রের নিম্নকোনে উপক্রম, জীবের পিতৃ হস্তের জন্ত চির-কোমর্ভবত গ্রহণ, রামভ্রমের পিতৃপত্য পাল্যার্থে দ্বাদশবে রামায়ণ ও বনে গমন, স্ত্রীভ্রাতার অল্পবহিভিতে জীবের পাত্তা সিংহাসনে দ্বাপন ও প্রতিবিধি বস্ত্র ভয়তের বাধ্য দানন আমায়ের বিকিত, অর্থনিকিত সমাজের গর্হণ জীবনের চিত্তিকার বহ।

অপর্যকি স্ত্রায়সায়ী স্ত্রীভ্রম আমায়ের, স্ত্রীভ্রম শৈখ ও পবিত্রতা, পাত্তার স্ত্রায়সায়ণতা, অল্পায় পাত্তার জীবনের স্ত্রায় পাত্তা আমায়ের লক্ষ্যকো উক্ত আদর্শে অল্পপ্রাণিত করে। ভ্রমের শাস্তিক বস, আমায়ের স্ত্রায় চর্চায় উৎসাহ বহ। বিহুয়ের বর্ষপ্রাণতা প্রাণিত ও শৌখ, দানে পাত্ত জীবনের পদ বহায়। এক-লগের শুভকর্ষ আমায়ের বিমিত ও বিহু করে। শব্দনি দ্বা পেরায় আমায়ের স্ত্রীভ্রম।

ষ্টিক তেমনি বিশীত বিকে ‘বিত্তিক’, ‘কৃত্তক’, ‘কৌচক’ প্রকৃতি আমায়ের জাতি পত্র, অর্থিক আহার, অর্থিক নিত্র, ও অর্থি স্ত্রী লোকের কথাই মনে করাইয়া দিয়া জীবনের লগায় পণে শ্রুতিদিত মান বজায় রাখিতে সতর্ক করিয়া বহ।

তাই রামায়ণ মহাভারতকে ভায়তের জাহ্নবী ও বননায় দ্বায়ার সহিত তুলনা করা হয়। যুগ যুগ বহিমা এই দুই দ্বায়ার বহিমা আদিতকে। যৎকো কোন্ অল্পভৌ বিয়া-লয় হইতে যেন নির্গত হইয়া অল্পকল আমায়ের ধ্যান-দ্বায়ণ ভগ্নভার মহাপ্রকৃতি এই দুই দ্বায়ার মিলন হইয়াছে। ইহাওক ভগ্নক ভগ্নক কত বৈচিত্র্য কত কর্ম উদ্বাপন, কত প্রাণিত ও ভাবের অপর বিলাস। তাই কাব্য ভগ্নভার প্রথম অল্পগায়ের এই দুই দ্বায়াকায় মহাভাসিনীর ভান বহিমা দ্বায়ের অল্পভগ্নভার, ভায়ভবের ভাগিত ও যুগ যুগ বহিমা আদিত হইতেছে ও হইবে।

ঝাড়ের রাতে

[নাটক]

স্বাক্ষর চক্রবর্তী

প্রথম দৃশ্য

[ছোট্ট একটি ঘর। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল। তার পাশে দু'খানা চেয়ার। টেবিলের উপর এলোমেলোভাবে কিছু বই পত্র ছড়ানো। কল্যাণ ঘরে একজন নাট্যকার, টেবিলপাশেই আলোর চেয়ারে বসে টেবিলে একমনে কাগজের উপর কি যেন লিখছে। রাত পড়ার]

কল্যাণ। কে? কে ডাকছে? (ভাবপূর্ণ অভি-
টিয়ায়ের মতো তাকিয়ে প্রোত্যাহের উদ্দেশ্য করে) ওঃ
আপনারা! আপনারা সব ই এখনে উপস্থিত হয়েছেন—
নাটক চন্দ্রেন বলে, বেথবেন বলে—কিন্তু আমার হাতে
তো ভাল নাটক নেই। নাট্যকারের নাটক, যে নাটক
যেখানে এবং চন্দ্রেনে আমার পদক্ষেপে চিন্তে পারবো,
চন্দ্রেনে পারবো। মানুষকে ভালবাসতে পারবো সে
নাটক আমার কাছে নেই। পৃথিবীর পথে স্রাস্ত—যত্নাক
মানুষের জ্বর আমার কলমের রেখার খুঁটিয়ে তুলতে
পারিনি, মানুষের বাঁচবার সংগ্রামের কথা, মানুষের অহাঙ্গ
এক কথার কথা, মানুষের অবমাননার কথা, পাণ,
স্নেহ, বৃণা পৃথিবীর উচ্চ অহংকারী মানুষের পাপবিক
বর্জিত কথা,—আমি লিখতে পারিনি।

মুচর বেখানে ত্রিংশদশ পৈশাচিক উন্নয়ন নিশীড়িত
অসুস্থ মানুষের রক্ত নিয়ে ছোলা খেলে সে ছবি আমি
সত্য/সত্যিই কখনও আপনারা দেখেন তুলে করতে
পারিনি। পারিনি হৃদয়, বুদ্ধির তিলে তিলে করে-
বাগ্য মানুষের সমস্ত বীজা কার্য, চক্ষু বন্ধ, আপনারা
সকলের চোখের কাছে তুলে বিতে। আমি কল্যাণ ঘর
আপনারা দেখে কথা বলছি।

যেখনি অনেকদিন ধরে তেবে আপছি—কিন্তু
লিখাবো। মানুষের দৃশ্য দু'বেলা কথা, হাসি কান্নার কথা,
অন্ধ কৈশোর চোটে মানুষের মনের ঘরে পৌঁছে যেতো;
কিন্তু পারিনি। কেন পারিনি?—সে প্রশ্ন আপনারা

মনেও যেমন রয়েছে আমার মনেও বহুদিন ধরে জমায়েত
হয়ে আছে। আমার অক্ষমতা রয়েছে, আমি স্বীকার
করছি। কিন্তু আমি তো নাট্যকারের নাটক লিখতে
চাই। নাট্যকারের নাটক আমার পুঁজে বেড়াচ্ছি।
আপনারা বুকের ভিতর ঘুরিয়ে রয়েছে যে নাটক, আপ-
নার আমার সকলের জীবনের রক্তে রক্ত লুকিয়ে রয়েছে
যে নাটক; সেই নাটকই আমি লিখতে চাই। আমি
জানি—আজ প্রত্যেকটি মানুষের বুকের ভিতর এক
একটি শক্তি পেল বিচ্ছ হয়ে আছে, তাই বিশল্যাকরণী
আমি খুঁজেই চলেছি, কিন্তু তা এখনও আমার হাতের
দু'ঠাং আমি পাইনি। আপনারাই বলুন—বলুন। আমার
হাতে বিশল্যাকরণী না থাকলে আমি কি করে সবার
কাছে যাই? কি করে সবার কাছে যাই? কি করে
নাটক লিখি? নাট্যকারের নাটক!

(এখন সময় টেবিলের বাইরে অভিনয়কারের এককোণে
একটি ভট্টপার সৃষ্টি হয়। অব্যবহৃত মস্তিষ্ক একটি লোক
এক আরেকটি মস্তিষ্কের মধ্যে তুলল কথা কাটাকাটি এবং
বলড়া শুরু হয়। একজন বলতে থাকে—না, আমার
কথাই পোনাবো। উনি আবার কথাই লিখবেন।
আরেকজন বলতে থাকে—না, না, আমার জীবনের কথাই
আজ কল্যাণবাবুকে পোনাবো। আপনি আরেকজন
পোনাবেন। প্রথমজন বলে—না—না, সে ঘর না আমার
জীবনের কথাটা পোনানো ভীষণ প্রয়োজন। দু'জনে বলড়া
করতে করতে ক্রমে ভাষাধের কাছে এগিয়ে আসে।
লিখুন, আমার কথা লিখুন—না, না, সে ঘর না। আমার
জীবনের কথাই লিখুন কল্যাণবাবু। একদমর হাতাহাতি
করতে করতে দু'জনেই টেবিলের উপর উঠে পড়ে।)

শব্দ (বহুশক্তি)। আমি আজ সাত বছর ধরে
একটা কাগজে বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সেই
কাগজ কেউ কোনদিন চন্দ্রেনে চারদিন আলোও ক'রে

শোনাতে পারিনি। আমার বুকের ভেতরটা জলে পুড়ে থাকে হয়ে গেছে। আজ আমাকে বলতে দিন—

কমলেশ। (কিছুটা বক্তৃত্ত বিস্তৃত) ক্যা! নেই, অক নেই,—No tears, Blood হ্যা, হ্যা, বক্ত। চোখে কেটে বক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আমি তুফার্ড। I mean thirsty, কিন্তু একফোটা, একফোটা, জল নেই কোথাও। মেঘ নেই। No—গুয়েলি, No, হ্যা: হ্যা: হ্যা:—It's a clean desert লাহারা,—বুকের ভেতরটা লাহারা। হ্যা: হ্যা: হ্যা:—

কল্যাণ। আপনাদের আমি তিনি না, জানিনা। আপনারা কি বলতে চাইছেন তা'ও বুঝতে পারছি না। আমার ঘরের ভিতর ঢুক এ আপনারা কি করছেন ?

শব্দর। কি করছি ? আঁ, হ্যা: হ্যা: হ্যা: হ্যা:। ওই যে আপনি বললেন লিখবেন—নাটক লিখবেন, সত্যিকারের নাটক। তাই আমার কথা লিখুন, কান্দনের কথা, আমার কান্দনের কথা। আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আমার বস্ত্র কেমন করে গড়িয়ে গেল ? কেমন করে আমার ঘর জেলে গেল। কেমন করে আমার কান্দন হারিয়ে গেল (কান্দন ভেঙে গড়ে) শেখা লিখুন—লিখুন।

কমলেশ। কান্দন! হ্যা-হ্যা, কান্দন—আমিও তো তার কথায় বলতাম। আমি তো আর কিছুই তার কাছে চাইনি। শুধু একটু ভালবাসা চেয়েছিলাম। ভালবাসা ? হ্যা: হ্যা: হ্যা:—Tears! No, Not a single drop. সমস্ত আকাশে এক ফোটা জল নেই। হ্যা: হ্যা: হ্যা: এক-দুই-তিন-চার ; চোখের কোণ থেকে বক্ত গড়িয়ে পড়ছে। টপ, টপ, টপ—

(শব্দ হঠাৎ রমকে উঠে কমলেশকে নিরীক্ষণ করে)

শব্দর। কমলেশকে আপনি চেনেন ?—জানেন ? কোথায় দেখেছেন ?—কবে ?

(শব্দ করে কমলেশের হাতটা ধরে কেলে কিছু কমলেশ এক কটকট ত্যা ছাড়িয়ে নেয়)

কমলেশ, তুমি !—শব্দর—Traitor. হ্যা: হ্যা: হ্যা: শব্দবক্ত,—শব্দবক্ত হয়ে আমি পথে পথে তোমার গুপ্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। পালাবার চেষ্টা করোনা। You Traitor—শব্দর।

(শব্দ হঠাৎ কোমর থেকে একটা ছোরা বাহ করে

জ্ঞত ছুটে গিয়ে কমলেশের পেটে বসিয়ে দেয়, কল্যাণ বাবা বিশেষ পদ্ধতিতে লাহারা পড়ে না। কমলেশ তৎক্ষণাৎ অবসর ছুটতে করতে থাকে—উঃ—আঃ—কল্যাণ কখনও স্তম্ভিত কখনও বা ঘর থেকে বেরিয়ে বাহ, আবার ফিরে আসে আবার কখনও হাই গেড়ে কমলেশকে লক্ষ্য করে।)

কল্যাণ। কি করলেন ? এখন আমি কি করি ? কোথায় বাই ? কি করি ? (ভীষণ ব্যস্ত)

শব্দর। প্রতিশোধ ! I mean revenge. হ্যা: হ্যা: হ্যা: (একদম বক্ত লাহা ছোরাটা কমলেশের পেটে থেকে তুলে নেয় শব্দর) বক্ত ! বক্ত—I mean Blood লাগে বক্তটা লাগে। এর থেকে অনেক বেশি তাল, অনেক বেশি লাগে ছিল কান্দনের বক্ত। হ্যা: হ্যা: হ্যা: হ্যা, হ্যা, পাখি। কোমল বস্ত্রের একটা পাখিই বগলে কাঁদলক।—একটা বক্ত উড়ে আসে পাখি কিছু কেমন করে—একমিনি তার বুকের লম্বন ডিগ্‌বিনের ভিত্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কেন পৃথিবীর আলো তার চোখে থেকে জ্বালা করে চিহ্নিত নেওয়া হলো ?

কে তাকে ডিগ্‌বিনের ভিত্তি এই পৃথিবীর হাসি, গান, আনন্দ থেকে বক্তিত করেছিল ? আপনারা তাকে চেনেন না। জানেন না। আমি না বললে কোনদিন জানতে পারতেন না (একদম বক্ত লাহা ছোরাটা ঘেঁষে ঘেঁষে শব্দর ছুড়ে ফেল দেয়)

কল্যাণ। What am I to do ?—আমি I to do ? কি করলেন ? কি করি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। (ভীষণ ব্যস্ততা)

শব্দর। বুঝতে আপনাকে কিছুই হবে না। হ্যা: হ্যা: হ্যা: লিখুন—লিখুন। সমস্ত বেশি নাই। আমাকে এত্নি খানার গিয়ে "সারেরগার" করতে হবে। আর একটু বাড়েই জোর হবে, পাখি জাকবে, পাখি।

ফিনের আলোর সম্বন্ধে ব্যাকরণে হয়ে যাবে। কমলেশ ব্যানার্জীর বুকের বক্ত এত্নি জমট বেঁধে ধরে। তাল লাগে, তাল খুঁ—কালো হয়ে যাবে। বাঁহ উড়ে এলে বলবে ; Don't delay. Don't waste your time.

আপনারা সবাই দেখছেন একটা লোক—অর্থাৎ আমি

শব্দ দুখারি—এই দুহুতে নিজে হাতে কমলেশ বানাজীকে খুন করলাম।

হ্যাঁ আমি খুনি। ভীষনে এইটাই আমার প্রথম এবং শেষ খুন। আর কতিকে খুন করার আমার প্রয়োজন নেই। সাত বছর ধরে একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম শুধু—শুধু একটি সাহসের ভণ্ট।

আমার সাজানো ঘর কেমন করে ভেঙে চূর্ণাবার হয়ে গিয়েছিলো আমার বুক থেকে কেমন করে তাগল হারিয়ে গিয়েছিলো! সে কথা আপনাদের শোনাবো—আপনার আহুন আমার সাথে, তার নেই। আপনাদের সব বোঝাবো।

আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, শব্দ দুখারি তখন কলকাতার কোন এক বগিচে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। আর University-তে M. A. পড়ি টিউনি করে সব খরচ চালাতে ছয়।

(কথা বলতে বলতে শিঁহু হাটতে থাকে শব্দ আর তলায় এসে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কাগজে খুঁ খুঁ করে লিখতে থাকে)

কমলেশ আমার সহপাঠী ছিল। পরিসর University-র ক্রাসেই। বন্ধুত্ব!—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধুত্ব, প্রগাঢ় ভালবাসা দুজনার মধ্যে ছিল। সেখানে কোন ঝঁক ছিল না, লগ্নে ছিল না, বিগা ছিল না। ভুলও কেন? But for what? আমার সাজানো ঘর ভেঙে শুড়িয়ে গেল। আমার কাজলতা; আমার কাজল; আমার বুক থেকে অকালে ডিরদিরে ভক্ত হারিয়ে গেল (কান্নার ভেঙে পড়ে) সেকথা আপনাদের শোনাবো; আহুন—ভয় নেই—বীয়ে—বীয়ে—পা ফেলে আমার পেছন পেছন আহুন,—

[টেবিলে অঙ্ককার নেমে আসে এবং বীয়ে বীয়ে পর্দা নামে]

—: দ্বিতীয় দৃশ্য :—

[বজীর জীর্ণ একখানি ঘর। ঘরের একপাশে একটি চৌকি লাগা, তার ওপর কমল দিয়ে একপাশে অপরিষ্কার তোবক এবং বালিশ জড়ানো রয়েছে। পেছনে একটি লোহার তার জোলায়। সেখানে কিছু বামা কাপড়, ছাতা ইত্যাদি। ঘরের এককোণে একটি হুঁজো, তার ওপর

একটি কীচের গ্রান। ঘরের আরেকপাশে একটি টেবিল। তার ওপর শুশুকৃত বইয়ের সন্ডার। হারিকেনের ঘড় আলোর শব্দ একটিচোরের বসে মনোযোগ সহকারে গ্রন্থে কিছু লিখছিল। তারপর জোব লগ্নায় পড়তে থাকে। রাত সতীর্থ]

শব্দ : (পড়তে থাকে) কবিতার সৃষ্টি অলৌকিক, হঠাৎ যন্ত্রের মত আপাত সৃষ্টিহীনতার। হুয়বিয়া-মিক্সা এইচএ অক্রমণ করেছিলেন ধর্মকে (বৃত্তধর্ম)—নিখিলের ঈশ্বরের মৃত্যুও ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন—কারণ ঈশ্বরের মৃত্যু মানতে হলে ঈশ্বরের অস্তিত্বও মানতে হয়, নচেৎ যা ছিল না তার মৃত্যু হয় কি করে, বৃত্তধর্মে অলৌকিক বা বহুস্তের স্থান নেই, যেমন অভিন "হোমের টু ক্রিসো" কবিতার লিখেছেন :

A Christian ought to write in prose for poetry is Magic.....

(যন্ত্রদলীতের সাহায্যে কড়ের আভাস সৃষ্টিতে চলেতে হবে এবং আলোর সাহায্যে বিদ্যুৎ চমক দেখাতে পাশে তাল ধর)

(যন্ত্রতালি) বড় উঠলো বেখছি, বরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি, কে? কে এখানে? এইভাবে এতখান্নে অঙ্ককারে এখানে বসে আছেন কে?

কাজল। আমি একটু আশ্রয় চাই। আজ রাতের মতো শুধু আমার একটু থাকতে দিন। আমার একটু আশ্রয় দিন।

শব্দ। আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? কিছুই তো আমি জানি না। কি করে আপনাকে থাকতে দিই। অ্যাঁ—বড় মশকিলে কেললেন বেখছি, কি করি? বড় উঠেছে, ভীষণ বড়। বান, বান ভেঙেছে বান। আর বাইরে ঝাঁকোনে না, ঘরের ভেতরে বান।

কাজল। উঃ কি ভীষণ বড় উঠেছে।

(শব্দ ঘরের মরবড়ে বরজাটা বন্ধ করে দেয়। কাজল, ভীত, অত, শঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে তার গাট্টায় হটকেনটা ঘরের এককোণে বেধে দিয়ে অডোলাডো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শব্দ নিজের পড়ার টেবিলে বাম/বইয়ের পাতার পুঁ-একটা লাইনে চোখ বুজিয়ে নি।

আবার উঠে পড়ে)

শব্দ। কি নাম আপনায়?

(কামল গ্রন্থে কোন উত্তর দেয় না। শুধু এক-দুট শব্দকে বেধেতে থাকে।)

মাঝি। কি বলুন? চুপ করে রইলেন কেন?

কামল। কামলদত্ত দাস।

শব্দ। হুঁ—তা বাবা হুঁ কোথায়? এখানে এই অবস্থায় এতদূরে বসেই বা ছিলেন কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বলা করে সব কিছু খুলে যদি একটু বলেন তবে এই হতভাগা বড় হয়।

কামল। সে অনেক কথা। আপনি শুনবেন? শুনেই বা কি লাভ? একটি সাধারণ, অতি সাধারণ—একটি মেয়েই হুঁষের কথা, তার সব বর্ণ হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনেই বা কি লাভ?

শব্দ। লাভ লোকমান কিছু বুঝি না। হুঁতেও আপনায় ভ্রত কিছু করতে পারবে কিনা তাও জানি না।

তবে এটা আশ্চর্য্য করতে পারছি—আপনি কোন একটা—ভীষণ বিশেষ পড়েছেন, তা না হ'লে এত-বড়ো অচেনা জায়গায় অপরিচিত একটা লোকের ঘরে কেউ আসার চায়?

(কড়ের শব্দ শব্দ শোনা যায়। হাতে হাতে বিদ্যুৎ চমকায়।)

কামল। হ্যাঁ, আস্তেই চেরেছিলাম একটু। কিন্তু এতদূর পৃথিবীতে আমার এতদূর থাকবার কারণ মিলেছে না। বাহুরের গড়া পৃথিবী এত রক্ত, এত ছত্র-ধীন তা আমার জানা ছিল না। আমার ওর কোথাও একটু ঘেঁষ, মায়া, ভালবাসা নেই। আমাকে বকল্য করছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ অনেক আমাকে বকল্য করতে চেষ্টাচ্ছে। কিন্তু বাহুরের বকল্য নিয়ে কুৎস্বপ্ন নিয়ে আমি বাচতে চাইনি। যখন ছোট ছিলাম পৃথিবীকে কত হৃদয় মনে হতো; আশ্চর্য্য মনে হতো। কিন্তু হালি গান আজো এক একে কেমন করে যেন আমার ভীষন থেকে নিঃশেষ গেল। কেমন যেন আমার গীতের গীতের কেবলই মনে হতে লাগলো আমার হৃৎপাশে শুধু অন্ধকার। যেন একটা রক্ত হৃদয় মরুভূমির ওপর দাঁড়িয়ে বয়েছি একেবারে একা। তবুও বাচতে হবে। সংগ্রাম করে

বাচতে হবে। সংগ্রাম আমি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু প্রবক্তা, শঠতা, মিথ্যা অসিনয়। শুধু একটি বাহুর, যাকে আমি প্রভা করতাম, বিশ্বাস করতাম, হ্যাঁ হৃৎকণ তার আমার ভীষনকে ভেঙে দিয়েছে, শুড়িয়ে বিচ্ছেদে।

কামল। আমার পায়ে তলার আর আর কোন মাটি নেই। মিথ্যা, মিথ্যা, সব মিথ্যা হবে গেছে,—

শব্দ। ধামধেন না বলুন,—কে এই হৃৎকণ যার মন্ত গোটা পৃথিবী আজ আপনায় কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে? কোথাও সত্যি বলে কিছু নেই, বিশ্বাস বলে কিছু নেই?

কামল। আমার বাড়ী ছিল কথামড়ার। সংসারে থাকবার যথো আমি আর বাধ্য। যাকে খুব ছোটবেলায় ঘেঁষেছি। তার মৃতা আরছাড়া হয়ে এলেছে ঠিক মনে পড়ে না। বাবার মুখেই শুনেছি আমি যখন খুব ছোট তখন গ্রামে একবার ভীষণ কল্যাণ লাগলো। যা কল্যাণ। যোগেই সেগার যারা শেকল। বাবা শতচেষ্টা করেও তাকে বাচাতে পারেননি; গ্রামে আমাঘের ছোট গরীবের মালার। সামান্য কিছু কনি ছিল। বাড়ীর সামনে একটা ছোট খুস্কিও ছিল। বাবা অসিতে লাগল বিধে নিষেই মদল ফসাতে। তাই অতিক্রমে দুটা পেট আর মাল্যের মস্তান্ত্র বরষা কোনমতে চলে যেত। বাবার আশাটা চিরদিনই খুব বড় ছিল। বলতেন, কামল আমি তোকে ইংলে শুড়ি করে দেবো, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। তোকে বড় হতে হবে। এত কষ্ট অম্মাঘের ভেতর দিয়ে আমি পড়াশুনা করেছি। হাইনর হুলের পড়াশুনা শেষ করেছিলাম। কিন্তু চঠাং কোথা থেকে বেঁচে গেছে! সব জগৎ পাগল হয়ে গেল।

আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা একবারে সবেরসে গেল, হারিয়ে গেল।

শব্দ। (বগতাজি আশা আকাঙ্ক্ষা সব ভেঙ্গে গেল, কেন? (প্রকৃত) কেমন করে ভেঙ্গে গেল? আপনায় বাধ্য—

কামল। না, বাবা আজ আর বেঁচে নেই। যেদিন সন্ধ্যার আগে আমি এক শুড় উঠেছিলাম। শুড়—আর তার সাথে ভীষন কুটি। চাষের মজল ছিল, বাবা কেতে কাজ করছিলেন।

পতর। তাবপর ?

কাজল। একটু স্বচলকে যেমন চান্না বা গ্রাঙ্ক করে না, বাবাও সেদিন আমাকে কয়েত পাহেরনি যে কতাদ-জাঙ্কর উপর দ্বিগে সেদিন এতবড় একটা স্বচ বয়ে গিয়ে। বাবা সেদিন বাড়ী কিংবে আসতে পাহেরনি। বস্তুভাবে চকের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছিলো। কেত থেকে ছুটে ছুটেতে একটা চক পেদিয়ে বাবা বাড়ীর দিকে আলছিলেন। কিন্তু স্বচ তাকে আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তাবপর একটা বিয়াট প্রাবনে যেন একটা মৃত্যুর মত ভেলে চলল।

মহা। আপনাকে বড় স্নান লাগছে। আপনি বসে এই চেয়ারটার বসুন। আর বাওয়া বাওয়া কিছু হয়েচে ? না বোধহয়। কিইবা আপনাকে খেতে দি। (বগতোক্তি) বাত প্রায় চুটে। বাও। স্বচ বাসলায় এতবড় কোন বোকাও তো খোলা নেই। বেথি টিনের কোটোটার সামান্য কিছু মূড়ি থাকে যদি—(পতর একটা টিনের কোটো খুলে খানিকটা বেথে নিয়ে কাপড়ের সামনে এগিয়ে যায়।)

এই নিম্নংকন। অল্প কিছু মূড়ি আছে। এটা খেয়ে জল খেয়ে নিব। আমার ঘরে তো আর কোন খাবার নেই। তাছাড়া আমি নিজেই হোটেলের খাওয়াদাওয়া করি। আর এতবড় কোন বোকাও তো পোলা নেই—

(পতর একটা মাসে ইঁজো থেকে জল ঢেলে কাজলের কাছে রাখে।) স্মৃতি/কাজল মূড়িগুলো খেয়ে চক চক করে খানিকটা জলপান করে। আর যাকে যাকে পতরকে লক্ষ্য করতে থাকে।)

কাজল। আমার এক কাকা ছিলেন, আপন কাকা। আমাদের সাথে তার সম্পর্কটা খুব ভাল ছিল না। নিজে বড়লোক বলে আমাদের তাক্সিলা করতেন। বাবার মৃত্যুর পর কাকা এসে আমার পেছনে দাঁড়ালেন। অনেক আশা ভরসা ছিলেন। তাই গায়ের লোকেরা অর্থাৎ বাবা আমাকে ভালবাসতো। তাহাও কিছুটা নিশ্চিত হলো। আমাদের দ্বিতীয় কাকার আগে ছিল সেটা জানতাম। কিন্তু তখন আমার বয়সই বা কত ? বেশ কিছুদিন ভালভাবেই কেটে গেল কাকার ছাড়াতে। তাবপর এক-

দিন কি সব কাকার পরে আমাকে সেই কবিরে নিলেন। তখন কিন্তু কাকা আমার সঙ্গে খুব ভাল বাহায়াই করতেন। হঠাৎ একদিন তখনকার কাকা আমাদের ভবি, বাড়ী, পুত্র, সব অর্থাৎ একটি লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি একবারও ভাবলেন না আমার মতো একটা অল্প বয়সের মেয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কি করে বেঁচে থাকবে। এই প্রথম একটা আঘাতে বাহুর ওপর বিশ্বাস আমার ভেঙে গেল।

পতর। আশ্চর্য! তাবপর আপনি কি কাকার আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছিলেন ?

কাজল। হ্যাঁ, কাকার পায়ে ধরে কেন্দ্রে বলেছিলাম—এ কি করলেন কাকা ? আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো ? কি করে বাঁচবো ? বাবা বেঁচে নেই আপনিই তো এখন আমার সবকিছু। সেদিন কাকার মনে এতটুকুও করণীর উল্লেখ হলো না। মনে হলো তিনি একটা নিষ্ঠুর পাখা। কাকা হেঁদে বললেন—আমি যা ঠিক বুঝি তাই করছি। পরী আরে যেমন করবে থাক। কিসিদি কর গিয়ে। হিরে তোমার হয়ে যাবে—তলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হালতে লাগলেন।

আর বললেন বাও বাও আর চক করে না। আর এবাড়ীর মুখে হলে ভাল হবে না বলে দিছি। বেঁকে চোখ ঝার—চলে বাও।

পতর। (বগতোক্তি) বাবে মলোয় ! চলে যাও, বেমিক বুনি চলে যাও ! অলহায় বাহুরকে বকনা ! বাঃ চমৎকার !

আপনাকে তো চলে যেতে বললো, পথ দেখতে বললো ; আপনি তখন কোথায় গেলেন ?

কাজল। কোথায় আর যাবো ? মাসখানেকের ভেতর বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে নতুন মালিকের কাছ থেকে পরোয়ানা এসেছে। মৃতকে অবলম্বন করে কোথায় যাবো ? কোথায় দাঁড়াবো ?

তখন আমার চারদিকে শুধু অন্ধকার আর হতাশা। এই মতো প্রাণের একমাদিবা বহন পথ কোলকাতা থেকে কালগড়ার এসেছেন। আমি তাকে ছোটবেলায় কিছুমাদি বলে ডাকতাম। তিনি হঠাৎ আমার খোঁজখবর নিলেন। খানিকটা চোখে

কাছে। কিন্তু সে আত্মবের আশাও গুডকাল হায়ে তাদের ঘরের মত ভেঙে গেছে। না, পৃথিবীতে আর কোন আত্মবের আশার এমন নেই। কিন্তু আমি আপনাকে কেমন করে বোঝাবো আমি নিজের মত আর কোন আত্মবের চাই না।

নিজের এই শুণিত জীবন, অভিশপ্ত জীবন আমি আর টিকিয়ে রাখতে চাই না। কিন্তু যে নতুন শিল্প পৃথিবীর আলোতে চোখ খেলতে চায়, বুকসহে নিঃশ্বাস নিতে চায়, বেলা করতে চায়, হালতে চায় পৃথিবীর মাটিতে; তার সে লাবী আমি নিজে হাতে কেমন করে ছিনিয়ে নেবো, অস্বীকার ক'বো। তাই কাল হায়ে আমার শেষ নিশ্বাস, শেষ বাশা শুকিয়ে বাবার পরও আমি আত্ম-হত্যা করতে পারিনি—পারিনি—

(কাছল কান্নার ভেঙে পড়ে)

শব্দ। আপনি ভুল করছেন; হু হু আঁতও কিছু আছে। এটাই শেষ নয়—শেষ হতে পারে না।

(বাইরে দরজার কড়ানাড়ার আওয়াজ পোনা যায়)

কমলেশ। (ঠোঙের বাইরে থেকে) শংকর, শংকর—বাকী আছিস? শংকর—

শংকর। আপনি তাকাতাড়ি ছাউকেস্টা ওই পাশে গেছে বিন। নিন্—মাথার খোমটা চাছন; তাকাতাড়ি—আবার বন্ধ এসেছে কমলেশ বুলেন। আপনি যেন আমার বিবাহিত; ত্রী এই পথিচাই শুধ ক'বে দেখো।

(কমলেশ প্রবেশ করতে করতে)

কমলেশ। ও এতকণ ঘরের মধ্যে বলে কাঁচ ব্যান করছিল বল:তা। না তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।

(ঘরে ঢুকেই কামলের দিকে তাকিয়েই যেন কমলেশ চমকে ওঠে) বা বাব্বা! শে কিরে? অ্যা—

শংকর। এই-এই-বের কমলেশ, মানে তোব মাঝে প্রায় লাটবিন হলো দেখা নেই। তা হঠাৎ বিয়েটা করে ফেলছি। মানে সবাইকে টিক খোঁজ খবর করে নেমজর করতে পারিনি; আর কাউকে জানাতেও পারিনি। হঠাৎ ঘটে গেল আর কি?

কমলেশ। ও যে তাম্বা ব্যাপার। আমার তুই—অবাক করলি শংকর। তোব মত ছেলেরও শেষ পর্যন্ত হা: হা:

শংকর। এতে হালধার কি আছে? আমি তো আর ভীষন নই যে শব্দ ভুল হবে না।

কমলেশ। না, তবে অনেকটা তাই ছিল। বুকে চোকা বেহে কথা ক'বাইতো বলেছো; এমন কি আমার মাঝে কাছের জোর গলায় বলে এ-চো-না মাসিমা, বিয়ে আমি ক'বো না, তার পরিণতি নাকি এই? আচ্ছা—শংকর, আমারও পর্বত তুই এর কিছু বিদগ্ধ জানালি না।

শংকর। ওইতো—বলছি না, এত তাকাতাড়ির মধ্যে জিনিসটা ঘটে গেল। তুই আমার কথা ক'ব কমলেশ,—আমি তোকে আর ধরব দিয়ে উঠতে পারিনি।

কমলেশ। ভালো, ভালো,—খুব ভালো। হাক এখন বেলাজে ঘরে বসেই আচ্ছা মন্যনো যাবে। আর বহু-ঠাফুনারী হাতের চা,—অর্থাৎ অন্তত সেবন করা যাবে।—হা: হা: হা:

শংকর। কি যে বলিস,—তুই একটু বোল কমলেশ। লোকান থেকে ঘুরে আসি।

কমলেশ। ভালো-খুব ভালো। জোর বটেরে মাঝে পরিচিটা পর্যন্ত করিয়ে দিলি না। ঘুরে কলাবট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলি-আমি কি এখন বলে বলে যাছি তাকাতাবো?

শংকর। আমি, একুনি আগছি। যাবো আর আসবো তুই নিজেই আলাপ করে নিতে পারিস, খুব আঁট বুকেছিস!

(শংকরের প্রস্থান)

কমলেশ। তা বুঝলাম, আমার কিছুটা বুঝলামও না। তুহি আমার অস্বাভাবিক বলে বন্ধ—অবাক করলে

(কাছল এতকণ ঘুরে খোমটা টেনে অন্তরীক তাকিয়েছিল। কমলেশ প্যাকেট থেকে লিগারেট বার করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে)।

কমলেশ। তাবুজি এখন আপনাকে কি বলে ডাকবো? বউমা—? না, বাব ধরে ডাকবো—

কামল। কেন? নাম ধরেই ডাকবেন—সেটা ইতো খুব আধুনিক।

কমলেশ। আধুনিক, আধুনিক খুব কথাতো! বলি—মাহাআতীর মূলখানা পর্যন্ত এখনও যেতে নেই। ব্যাপারটা কি? একেবারে যে কল্যাণে—

(হঠাৎ কামল ঘোষাটা ফেলে কমলেশের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ায়, কমলেশ খুব ভাল করে লক্ষ্য করে যেন চমকে ওঠে)

এ অর্থ বাক্য হয়ে থাকবে। কিন্তু আপনাকে যে বড় ভ্রমো—ভ্রমো মনে হচ্ছে। মনে হয় যেন কোথাও বেধেছি। আবার খুব কাছাকাছিও যেন একবার আপনি এসেছিলেন, I beg your pardon মানে আমি কোর খারাপ ইচ্ছিত করতে চাইছি না। তবে আমার বহুব্রু বিশ্বাস আপনাকে আমি দেখেছি কোথাও, কারণ এ অপসারণের চোখজুটা মতল না হলেও বড় নিরেট, হাঃ হাঃ হাঃ।

কামল। (প্রথম একটু হতচকিরে যায় এবং মুখে কোন কথা কোটে না)।

আমি আর কোথাও আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। কোলকাতা শহরে তো আর মেয়ের অভাব নেই। হয়তো আপনার কোন জানাপোনা মতের মুখের সাথে আমার মুখের আবলটা মিলে গেছে। এবং হয় ঘটনা তো সত্যিই ঘটে।

কমলেশ। তাই নাকি? না, না, তা নয় Madam তা নয়, আউটগোল জুয়েল তারের সাথে আপনাকে আমি দেখেছি।

কামল। না—না। মিথ্যা কথা, অনেক চাফে আমি জানি না, চিনি না, তার সাথে কোনদিন আমার পরিচয় ছিল না।

কমলেশ। এটাও কি মিথ্যা কথা, কোলকাতার কোন একটা নামজাদা হোটেলের লুকেশ যার একদিন আপনার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

খুব ভেবে বেশলে স্মৃতিও কি কি অকশনে আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো—সেটা হয়তো বলা যায়। কি বলুন? ওয়া হাঃ হাঃ—Madam sorry extremely sorry. আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি—

কামল। (ভীষণ ভীত; অস্ত, পড়িত) নাম— নাম নাম। ঐকান্তী কামলেশা বা—

(হঠাৎ দাঁত নিয়ে বিস্তৃত ভাবে ধরে)

কমলেশ। মুখোপাধ্যায়—হাঃ হাঃ হাঃ, খয়ের বউ

তো লক্ষী, তাকপালে সিঁদুর চেপে গাননি দেখছি, এটাও কি একটা অশ্লীলতা! I mean fashion, হাঃ হাঃ হাঃ!

(পংক্তির প্রবেশ, হাতে একটা থাণ্ডারের টোকা। তার ওপর তিনটে মাটির ভাঁড় এবং একটা বড় রাসে বেশ খানিকটা ঢা।)

পংক্তর। বাইরে থেকেই তোমাদের হাস্যহাসির শব্দ কিছুটা শুনেছে পাঙ্কজিলা, কমলেশ—এইই মধ্যে বেশ জনিরে নিয়েছে দেখছি। তা কি রসিকতা হচ্ছে?

(কথা বলতে বলতে পড়ার শালপাতার ওপর থাণ্ডার ভাগ করতে থাকে।)

তা কারণকে কি বকর লাগলো? নে থাণ্ডারটা খেয়ে নে। কামল আমারের চা খাও তো—

কমলেশ। তুই আমার এতলগা হাবার নিয়ে এলি কেন বলতো?

পংক্তর। কেন? তুই কি ভেবেছিলি তুই তোমার মজাই খাবার নিয়ে এলাম। তোমার কাছে আমার formality কিং? আমি, কামল সহাই তো যাচ্ছে।

কমলেশ। অ্যাঙ্ক—পংক্তর বিয়ে না হয় করেছিল আমারকে জানাপ নি, কাউকে জানাপনি; মানে জানাপতে মোটেই মমর পাগনি। কিন্তু একটা মগের তো দায়াবি? না, এখনও সেই চমকটোর মতো হোটেলার মমর করবি। বলি—চাইতু পূর্ণায় করার বমোবস্ত এই! আপনি বলুন হইমা—এই তো একটা মাক্তেল বাক্য উচিত—

কামল। তা ঠিক, তবে সব মমর ওই পড়াশুনা নিয়েই ডুবে আছে। শার একহাতে কবিতা সাহসানে বলুন?

পংক্তর। Correct, তা কি বকর মমরটা হলো!

কমলেশ। মমরটা ভাগলই হয়েছে। তবে—

(কমলেশ পংক্তরকে কিছু একটা ইচ্ছিত করতে চায়)

পংক্তর। তুই একটা হজ্জাড়া—

কমলেশ। যা হোক শেনি—পংক্তর; পুরীক্ষার তো খুব বেশী দেবী নেই। বেশ বহি আমার ঠেলেটলে পাশ করিয়ে দিতে পারিল।

পংক্তর। তার মানে?

কমলেশ। মং-টা খুব সোভা। তোমার University-র jewell পুরীক্ষার রেকর্ড মার্ক পাবি।

শেনি মজার উত্তর বৈজ্ঞানিক তোমার পথছে খুব

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন, তাক্কাড়া ভট্টর বাস, ভট্টর
রহমান প্রত্যেকেই তোর ওপর Expectation ভাগে।

শংকর। তোরা বহুটা ভাবছিল, কার্যকরে ততটা
হবে কিনা ভাজে যথেষ্ট সংকল্প আছে, তবে ইয়া—M. A.
degree হয়েছে একটা পেয়ে যাযো।

কমলেশ। সে দেখা যাবে। কমলেশ পৃথিবীরতে—
তা বাংলাপাঠিতোর ক্রমবিকাশের ওপর তোর যে নেটটা
আছে ওটা আমার একই বে, আর বলাকা মানসীর
কতকগুলো জায়গার আমি বড় confused হয়ে যাছি।
মানে বহীশ্রনাথকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না। তা তুই
হরি গাথা গিটিয়ে একই ঘোড়া কবে গিলে তোর কাছে
চিরতাল স্থায়ী হয়ে থাকবে।

শংকর। যেখ কমলেশ, formality আমি ভালবাসি
না। আর ওপর অস্বস্তিগার maintain করিস।
আমার কাছে আসিল, বহুটুকু বৃত্তি থেকে বোকাবার চেষ্টা
করবে। কিন্তু তুই না Prof. Bhattacharya-র কোচিং
নিছকি।

কমলেশ। গাথা গাথা টাকা খরচ করে কোচিং তো
আমেকের কাছেই নিয়েছি, আমলও নিছকি। কিন্তু তারও
এসে ছিল লেকচার দিয়ে হার; আর আমিও ভুলে যাই।
ব্যাপার কি জানি, আমার ভই Deficiency-টা ঠিক
তাহের শুদ্ধি হয়ে বলতে পারি না; মানে সংকোচ রয়েছে
কিছুটা; অবশ্য বোঝটা আমায়ই—

শংকর। ঠিক আছে ভাই, হাশ্টে হয়েছে। আমার
কাছে তোর নতুন করে কোন দুখবন্দের স্বকীয় নেই।
তুই মাঝে মাঝে বেশ সময় হাতে নিয়ে আমার কাছে আর
না? আর University-তে আমারের বিশেষ কোন
জ্ঞান হবে বলে তো মনে হয় না। তুই যং পং
চুপুতর দিকে এখানে চলে আর। পরীক্ষাতে এসে
পড়লো, কি যে হবে কে জানে।

কমলেশ। হাসালে Brother, হাসালে।—হাতোক
চলি—চলি বড়বা, আর কোন কথা বললেন না তো।

কামল। কেন? জমা হইলো, আমার তো
আসছেই।

কমলেশ। তা'তো আগবোই। একটিকে আপনায়
আমর, অপরটিকে নিষেধও একটা—

শংকর। তুই একটা ইভিট—

কমলেশ। আমি তা'লে চলি—Be happy—
wish you best luck. Good bye।

(কমলেশের প্রস্থান)

(শংকর এবং কামল কারকই মুখে কথা নেই
কণিক নিম্নতর হয়ে কেটে যায়।)

কামল। এ আপনি কি করলেন? এ যিথো অতি-
নয়ের কি স্বকীয় ছিল?

শংকর। অভিনয়? যিথো অভিনয়? না, জীবনে
অভিনয় কোনদিন আমি করিনি। শাহ বতবিন এই
পৃথিবীতে টিকে থাকবে। মানুষের সাথে যিথো অভিনয়
কোনদিন করবে না। মানুষের কাছে বিখ্যাসের ছবি
তুলে ধরতে না পারলে মানুষের মন থেকে কোন বিখ্যাসকে
ভেবে দেবার, গুড়িয়ে দেবার অসম্ভব কাকর নেই।
মানুষের জীবনে যত্নে যত্নে আমলও আবির্ভাবিত, শঠতা,
জুয়াতা হানা বেঁধে রয়েছে, বাসা বেঁধে রয়েছে। প্রেম-
ঈর্ষি ভাষাবাদা দেহমহতাকে আমলও মানুষ গলা টিপে
মেরে কেন্দ্রে চায়, তাকে নিয়ে জুয়া খেলে, তারপর
যিথো অভিনয়ের রত ছড়িয়ে দিয়ে মনের স্বার্থপর স্বর
মানুষ—মুখর।

কমলেশ। জীবনে শাহ হার আখ্যাত পেয়ে আমল
হত্যা। অম্বকার চরম অবিসায়েশ মধ্যে আমি ডুবে গেছি।
তাই চোখের সামনে আমার সবকিছু যিথো মনে হয়,
সব যিথো। আমার কথা কখন, আমি না যুক্ত
আপনাকে আখ্যাত দিয়েছি।

শংকর। স্বার্থপর মানুষেরা একটা অলম্বার নিষ্ঠুর
মানুষের জীবনে বার বার তাহের লোদূপ যিথো
ছোবল বেয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে তার গোটা জীবনটায়
গুণ্ডা বিব। সেই বিব,—তার মনের গভীর অবিসায়েশকে,
কন্যাসংগ্রহ যিথো শোভন করে হিতে পারতাম, তা'লে মনে
হ'তো হ'ল। সত্যিই বেঁচে আছি—

(কণিক বিরাগিত হয়ে)

আপনি—আপনি আমার কথা দিন আমাকে ছেড়ে
কোনদিন কোথাও চলে যাবেন না।

কামল। না,—না, তা হয় না, স্থপিত
আমার জীবন। আমার অভিশপ্ত জীবনের বিব আ

হৃদয় জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই না, চাই না।

শংকর। কে বলে আপনার জীবন অভিশপ্ত? কে বলে আপনি দূষিত? স্বার্থপর গোষ্ঠী হিংস্র মাছের বেগে। যুগ আপনার জীবনকে বিধিবে তুলেছে, আপনাকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। আপনি অভিশপ্ত নন, হতে পারেন না। কোথ করে একদল হিংস্রমাছ আপনার জীবনের ওপর অভিশাপ চাশিয়ে দিয়েছে!

কাজল। আপনার হৃদয়, সহজ, ছন্দোবহ জীবনে কত আহুত, লবাত আহুত, সে আমি চাই না। আপনি যহৎ। তাই হৃদয় লবকিছু পুষ্টি কেথেন, িখে অমৃতের লভান করেন। কিন্তু আমি কেনন করে যোঝাবো আমি কত মৃদাঙ্গীন, কত নগণ্য, কত ছোট—কত দুগা—

(কাজল চেপ্তারে বলে কানুন তেঁকে পড়ে। শংকর বীরে বীরে কাজলের কাছে এগিয়ে যায় এবং তার মাথা ওপর হাত রাখে। কাজল অবাক বিজ্ঞান দৃষ্টি নিয়ে শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

শংকর। ছিঃ কীদে না কাজল। পৃথিবীতে চোখের জল কেলেলে তা বাঁশ হয়ে ডিরডির ধোঁহাফার করে বেড়াবে, মহত্ব দিয়ে বড় করে আত্মকে দূরে ঠেলে দিও না কাজল। বড় আত্মা বাঁচতে চাই। যদি পান আনন্দ নিয়ে হৃদয় পৃথিবীতে আত্মা বাঁচবে, বিপাক নিয়ে বাঁচবে, সত্য নিয়ে, সংগ্রাম করে বাঁচবে।

কাজল। আপনি মানুষ নন। আপনি—

(কাজল আবার কানুন তেঁকে পড়ে, শংকর তার মাথা হাত রাখে।)

[বীরে বীরে পর্দা নেমে আসে।]

তৃতীয় দৃষ্ট

[শংকরের বাড়ীর দেই ঘর। কাজল ঘর গোছাতে ব্যস্ত। সময় ৬পূঃ।]

কমলেশ। (বাইরে থেকে।) শংকর! শংকর বাড়ী আছি!

(কাজল ঘরের দরজা খুলে দেয়)

কাজল। আহন, কমলেশবাবু! ডেডার আহন—

কমলেশ। শংকর কোথায়? ঘরে নেই?

কাজল। না, সেই সকালে বেদিয়েছে, এখনও ফেরে-

নি। অবৎ আমার তো বলে গেছে 'টিউবনি' ছুটো দেবে বেলা দুপটার মধ্যে কিবে আসবে। কিন্তু কই এখনও তো এলোনা?

কমলেশ। কাজল বলে ও কোথায় যায়, কি করে, কিছুই জানি না। দুখ হুটে কিছু বলবেও না। চাকরী-বাকরী সব দূরে বেড়াচ্ছে নাকি? কিছুই বুঝতে পারছি না। মহাবাহকের দেখা পাওয়াটা পর্গাৎ মুশকিল হয়ে উঠেছে। পরীক্ষা কাঙ্ছে এসে পড়েছে—ওষ হত একটা Brilliant student অবৎ; সকলেই একটা বিদ্রাট আশা হয়েছে ওষ ওপরে।

কাজল। আপনি বহন, চা ঠৈরী করে নিয়ে আছি।

কমলেশ। না, এতবেলায় আবার চা। থাক,—দরকার নেই।

কাজল। তাতে আর কি হয়েছে? আমার কোন অহুবিবে হবে না, আপনিই না একদিন বলেছিলেন চা লগ্নময়ে পান করা যায়। আমি উত্থন জলটা চাশিয়ে দিয়ে এলুপি আছি—

কমলেশ। (অধঃগতাক্রি) টাকা-টাকা করে শংকরটা কোথায় গুবে বেড়াচ্ছে। না, ওকে নিয়ে আর পাবা গেল না। আমার দেওয়া টাকা না হয় নিতে ওষ আত্ম-মদ্যনে বাধে। কিন্তু কত করে ওকে বলগার আয়োজের কার্য-এ একটা পাট টাইম সব নিয়ে নে, তাতে তোর পড়াভেনোও কোন অহুবিধা হবে না; আর লগ্নমরীটা কোনরূতে চলে যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

(কাজলের প্রবেশ)

কাজল। কিন্তু টোট নেড়ে নেড়ে কার মাথে কথা বলছেন। আপনি তারি মরার লোক তো? হাঃ হাঃ হাঃ কমলেশ। মহার লোক ভাটিক, তবে হাসলে তো আপনাকে তারি হৃদয় বেধার কাজল বেরী। আর দাতি তেহনি দিষ্ট আপনার হাদি!

কাজল। কবিতা লেখেন না কেন? বেশ কবিতা করে কথা বলেন তো?

কমলেশ। এককালে নিখেন্ডি, হ্যা, হ্যা লিখেছি। শংকর জানে, প্রেমের কবিতা, বিরহের কবিতা, জুগের, আনন্দের কবিতা, হাঃ হাঃ হাঃ। না, আপনার সাথে

পরিচয় হওয়ার পর থেকে কবিতা লেখা আমি ছেড়েই দিয়েছি। অর্থাৎ আর কবিতা লিখি না। হাতে লেখারও আর প্রয়োজন নেই। আপনাকে দু'চোখ তবু বেশি প্রাণ-খুলে কথা বলি, কারণ আপনি নিজেই একটা জ্যান্ত কবিতা—

কাজল। হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ—

(কাজলের প্রণাম)

কমলেশ। শুধু—শুধু—

কাজল। চাটাইটা করে নিয়ে এখনি আসছি—

[কমলেশ টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে তার পাতা ওলটায়]

[একটুক্ষণ পর ভিসের ওপরে একতাপ চা নিয়ে কাজলের প্রবেশ]

কাজল। নিম্ন—ধকম, চা-টা খেয়ে নিম্ন।

[কমলেশ ভিসের ওপরে কাজলের হাতের ঠিক তলায় হাত রাখে। আর একমুঠে কাজলের বিক ভাকিয়ে থাকে। কাজল কাজলের মূখ নত হয়।]

কমলেশ। কাজল! (একসময় কাজলের হাত থেকে চায়ের কাপটা কমলেশ তুলে নেয়।)

কাজল। এরকম করলে কিন্তু ভাগ হবে না বলে দিছি। কেবল ক্ষুধি! আপনায় বন্ধুকে বলে বেগো।

কমলেশ। না, কাজল, আমার চোখেই দিকে তুমি একটিনার ভাকিয়ে দেখো, তাহলেই সব বুঝতে পারবে। এ নৃকের ভেতর কত জালা, কত যন্ত্রণা জমাট বেঁধে আছে। আমি একটা আল্লাহ চাই, বাস্তব আল্লাহ। আমি, তোমার কাছে একটা ভালবাসা ভিক্ষে চাইছি কাজল! ভিক্ষে আমি তো তোমার হৃদয় তরে আমার দ্বয়ের সব কিছু দিতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি কেন বোঝনা আমার নৃকের ভেতরটা কি জীবন তোলাগড় চলেছে। আমি পাগল হয়ে যাবো কাজল, পাগল হয়ে যাবো। আমি কেন তোমাকে বোঝাতে পারছি না যে আমি তোমার কত ভালবাসি।

কাজল। না, কমলেশবাবু, এত ছেলেশ'হাষি করবেন না। আপনাদের টাকা আছে, বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, আপনাদের সব কিছুই বানিয়ে যায়। ইচ্ছে করলেই আপনারা লম্বা প্রার্থ্যা, ভোগবিলাস, সুখের পথ

চোখেই সাধের তুলে ধরে অনেক অনেক নারী, হাষী, তপসী, মেয়েদের ভালবাসা কিনে নিতে পারেন।

কমলেশ। কাজল! এ তুমি কি বলছো? আমারই এই মহর বেলানেশের কথা বিবেচ্য কি তুমি এটা বুঝতে পারিনি যে আমি তোমার কাছে ভালবাসা কিনতে আসিনি, ভালবাসার অভিনয় করে তোমাকে ভোলাতে আসিনি আমি, আমি—আমি হাতাহাতাহার খেতাব পাওয়া ব্যপের ছেলে, যাহের অনেক অনেক টাকা লম্বা-ঐত্যা প্রতিপত্তি, আমি কমলেশ ব্যানার্জি, যাঁর তপ আছে, যৌবন আছে সে হাত বাড়ালে মেয়ে পাবে না সেটা ঠিক নয়। কিন্তু অভিনয়, রত, পাশিল, চর., তাকানি বেবে বেবে আমার চোখ পরে গেছে কাজল! কমলেশ ব্যানার্জি জীবনে কালের কাছে কোনদিন কিছু ভিক্ষে কল্পিনি এই প্রথম, হুতো এই শেষ। তুমি আমাকে ঘাই ভাবনা কেন আমি তোমার ভালবাসি কাজল, —নানী ভালবাসি।

কাজল। না-না। আপনি যাব যাব ওই একই কথা উচ্চারণ করবেন না। নিতকে আর অপমান করবেন না কমলেশবাবু। ঘাঁ হতে পারে না, বা হবে না, সে কথা কেন বাঃ বাঃ বলছেন? (পল্লার ঘর কাছার তেজা, কবিক বিবর্তি দিয়ে) এই আপনায় বন্ধুস্বীতি, এরমতই কি আপনি শব্দ ঘূষাজীকে বিপদে আগলে আগলে রাখতে চান? কেন আপনি তার ঘর ভেঙ্গে তার কাজলকে নিয়ে যেতে চাইছেন? একবারও কি ভেবে যেয়েছেন তার কথা যে মল্লবীটা কাজলকে মৃত্যুর মূখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এয়েছে। নিজের উদ্বাস্ততার তার নির্ধিতে নির্ভর পথিয়ে দিচ্ছে; প্রতি মুহূর্ত সংগ্রাম করে, কলঙ্কের বিপ গান করে, কাজলকে ভালবাসা দিয়ে, বৃকে জড়িয়ে বেঁধেছে, — ভেবেছেন তার কথা?

কমলেশ। শব্দের কথা নতুন করে আমার ভাবতে বলো না কাজল, তুমি,—শব্দ আর কমলেশের দ্বয়ের-গভীর ভালবাসা উপলব্ধি করতে পারিনি, সেটা অবশ্য তোমার দোষ নয়। কিন্তু এটা তুমি কি করে ভাবলে আমি শব্দের ঘর ভেঙ্গে তার কাজলকে ছুঁতে নিয়ে যাবো? আমি ভাবিয়ে বেগো, তাকে সত্যবিকৃত করে? তুমি এটা বোঝ না কাজল, শব্দের ঘর তাক। আর আমি নিম্নের ঘর তাক। একই কথা।

কাজল। বাৎ চমৎকার! হৃদয়, বানিয়ে, শুধিয়ে
সাজিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন তো?

কমলেশ। না—না। সাজিয়ে, বানিয়ে আমি কথা
বলি না, তাহ'লে আপনি আমাকে চেনেন না,
জানেন না।

কাজল। আমি,—নিশ্চয়ই আমি। আপনার মনের
চেতন একটা খাণ্ডা উন্মুক্ত লুকিয়ে রয়েছে!

কমলেশ। stop! stop! অল্প কোন যেরে চলে
আমি আপনার মিতটা উপড়ে ফেলে দিতাম। But
here I can't—

কাজল। তা হলেও পারেন কিন্তু আপনি কি
অবীকার করতে পারেন—আমার প্রতি আপনার কোন
লোভ নেই?

কমলেশ। No—No. আপনি আমার ভুল বুঝেছেন।
আপনি আমার মিছেমিছি অপমান করেছেন কাজল
দেবী। আপনি আমার আর অপমান করবেন না, তাহ'লে
সব অঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। শব্দ
—আমি—আপনি কেউ যেহাই পাবো না, কেউ না,—

কাজল। কেউ না—?

কমলেশ। ও: Stop! Stop! Please stop—
(এমন সময় শব্দের প্রবেশ এবং কমলেশ জ্ঞত বর
থেকে বেহিয়ে যায়।)

শব্দ। কি হয়েছে? কমলেশ একায়ে বর থেকে
খেরিয়ে গেল কেন? (বহুদূর বাইরে গিরে শব্দ ভাঙতে
থাকে কমলেশ, কমলেশ,—কিন্তু তার সাজা না পেতে
নিরাশ হয়ে বর ফিরে আসে।) তা ব্যাপার কি? এক-
কপ চা পড়ে হয়েছে টেলিফোন গুপ! কমলেশ কি চা
না খেয়েই চলে গেল?

কাজল। হ্যাঁ, চা টার গুপের একটা বাড়ি উড়ে এল
পড়েছিল। তাই ওনার খাওয়া হয়নি। আমি বললাম
আরেকবার চা করে দিচ্ছি। বললেন—একটা জীষ
হরতার আছে এমন বাড়ি, গবে এল চা খাওয়া যাবে।

শব্দ। কিন্তু কমলেশ আমার পাশ ঘিরে এমনভাবে
বেহিয়ে গেল তাতে আমি ভাবলাম কিনা আমি হয়েছে।

কাজল। হাত পা বুয়ে নাও ভাতাভাতি, বেলা হয়েছে
বুকে। খেতে ফেওয়ার বশেষ করি—

শব্দ। হ্যাঁ—তুমি গিরে সব রেডি কর আমি
আমি—

(গাভের প্রবেশ। শব্দ খুব তুচ্ছগ্রস্ত। কতক-
গুলি চিঠিপত্র পড়তে থাকে। কয়েক দুহুঁপব শব্দও
বীরে বীরে টেকের বাইরে চলে যায়।)

(আবার সমাপনান্তে একখানি পামছায়া খুব দুহুঁপে
দুহুঁপে শব্দ এবং কাভের একত্রে টেক প্রবেশ এবং
শব্দ খাটের গুপের গা এলিয়ে যেন।)

শব্দ। আরও নতুন দুটা চিঠিখানি পেয়ে পেলাম,
বুকে কাজল। চাকুরীর জন্তে তো চেষ্টা করে বাড়ি।
শরীফাটা হ্যাঁ গেলে যেন বাঁচা যায়। তখন উঠে পড়ে
লাগবে। মাঝার গুপের মাঝা নেই। ওরিকে না দেখে,
—যানে নিবেশের গ্রায়ে, আমার ছোট্ট দুটা ভাইবোনকে
নিরে মসোর চালাতে হিম্মিৎ বেয়ে যাচ্ছেন। তাৎক্ষণ
যা দিনকাল পড়েছে! দায়িত্ব কিছু মরিজমা আছে।
মাঝা যেখানেও করছেন তাই কোনমতে সন্দারটা
বড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তা না হ'লে কবে এখন থেকে
পাততাকি কটিয়ে গ্রায়ে গিয়ে লাফল যতন্ত হ'তো—

কাজল। মায়ের চিঠি পেয়েছ?

শব্দ। হ্যাঁ—অজই চিঠি পেয়েছি—

কাজল। বাজীর সবাই ভাল আছে তো?

শব্দ। টেলিফোন গুপের চিঠিটা হয়েছে পড়ে দেখ।
মায়ের শরীফা ভাল আছে না। তারগুপের মাঝার সন্দারের
একপা চিঠা। এখানে আরও কিছু টাকা
পাঠাতে লিখেছেন। কি যে করি, কোথায় এত টাকা
পাই?

কাজল। তাৎক্ষণ আমার আবার নতুন কবে তোমার
কামেলা বাড়িয়েছি।

শব্দ। আমার ওসব কথা শুক করলে? তুমি
বোঝনা কাজল—আমার তুমি কতটা দঃগ্রামী করে তুলেছ।
আমার উপলব্ধির ভেতর, যোবের ভেতর যে অস্পষ্টতা
ছিল; তোমার ভালবাসার হৃদয়স্পর্শ দে হৃদয় সব
গেছে। তোমার জন্তই আজ জীবনকে আমি কঠিন দুঃখ
গুপের ঘাটাই করে নিতে পেরেছি। নিবেশকে চিনতে
পেরেছি কাজল—

কাজল। কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে। আমার

কেবলই হলে হৃদয়ে আবার বুকি বড় আসবে।

শব্দ। তবু! তাকে আদর্শ কে কোথা ছিটকে
পূর্ববর্তী কে জানে? হৃদয়ে আদর্শের সবকিছু ভেঙ্গে
ভঙিয়ে চুরচুর হয়ে যাবে, সবকিছু হারিয়ে যাবে।

কাজল। আদর্শ বুঝি কেন আদর্শ ছিলে? কেন
আদর্শের নিচে থর থর করে? আদর্শ বড় ভয় করছে,
তীব্র ভয় করছে—

(কাজল কাজল ভেঙে পড়ে)

(শব্দ বীরে বীরে কাজলের কাছে এসিয়ে যায়)

শব্দ। বড় আসবে, হৃদয়ে সব তেঁতলাপড় হবে; সে
আমি জানি কাজল। কিন্তু নিচেও ওপর আদর্শ বেঁধে
গভীর খোঁজের ওপর ভর করেই আদর্শের এগিয়ে যেতে
হবে। নতুনদিনের স্বপ্ন বেঁধেও হবে, আদর্শের থর থর করে
হবে। সংগ্রাম করতে হবে। নতুন স্বপ্ন যে কোন
কটিনুয়া আদর্শের নিচে হবে কাজল। তবু,—তবু—
কুঁচি আদর্শ ওপর বিবাল থেবে।

[বীরে বীরে পর্দা নেমে আসে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[শব্দের বস্তির সেই ঘর। কাজল আপন গৃহকর্মে
বাস। বেলা বিপ্রহর]

অরুণ। (বস্তির মালিকের ছেলে, অশিক্ষিত লম্পট,
ঠেঁজের বাহির থেকে) শব্দবাবু! ও শব্দবাবু!
যা ব্যক্তি কোন আওতা নেই দেখছি। হুপুং বেলাই
দ্বিগুণ হওয়া পেটে হুপুং দেখছি—শব্দবাবু ও শব্দবাবু—

কাজল। (একটু বিচ্যুতভাবে বীরে বীরে ঘরবার
কাছে এগিয়ে যায়) আপনি কে? কোথা থেকে
আসছেন?

অরুণ। আরে! দরজাটা খুলেই কথা বলুন একেবারে
লজ্জাবতী যে—(অরুণ ঘরে ঢুকে পড়ে) অরুণোনা ঘর
তাড়া দিয়ে আমার বেলায়ত বিইতি কিন্তু তাই বলে কি
ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে না কি? হিঃ
হিঃ

(অরুণ ঘরের ভেতর পাঠান করে 'সে পড়ে)

কাজল। ওনার কিরতে তো বৌতী হবে। তাই যদি
দরজাটা খুলে বলেন তো—ভাল হয়। উনি এলে
সব বলবো।

অরুণ। সে তে বলবেনই। বহন না? বহন,
বলে একটু গল্প করা যাক। দরজাটা তো আর তিন
—হাল হলো বাকী পড়ে আছে। উনিতো একটা পরদাও
ঠেকাননি। বলে একটু গল্প লজ্জা করবে তো—হিঃ হিঃ
কাজল। যেহেতু, আদর্শের হাতে প্রচুর কাজ রয়েছে।
গম্বাওয়া এখনও শেষ হয়নি। তাই যদি কিছু হলে না
করেন—

অরুণ। না,—না, এতে মনে করাত কি আছে।
আমি বসতি,—আপনি রাজ্যবরের কাজ পেতে আছেন।
আদর্শ এত তাড়া নেই। মনে আপন'র সাথে একটু
গল্পলজ্জা করবে আর কি? ঘান, ঘান—দুখে আছেন।

(কাজলের প্রবাহ)

(বগতোক্তি) খালি চিৎ শব্দবাবু জোড়াজে করেছে।
তালো। আপনো কানামুখ্য লোকের মুখে শুনেছিলাম
কিছুটা,—যেহেতু পূর্ন জুড়িয়ে যাবে।—হিঃ হিঃ হিঃ—

(কাজলের প্রবাহ)

কাজল। আপনি আর কতখান ওনার তত একা
একা—

অরুণ। না হয় একটু বলেই বইসাম। সত্যি আপনি
নম্রত।

কাজল। ওর মনে?

অরুণ। আপন'র সবচে, শব্দবাবুর সবচে বস্তির
আপনো পানের লোকের মুখ থেকে কিছুটা শুনেছি। সত্যি
আপন'র আদর্শ নেই। হিঃ হিঃ হিঃ

কাজল। আপনি কি বলতে চাইছেন? কিছু তো
বুঝতে পারছি না। বস্তির লোকের মুখ থেকেই বা
আপনি কি শুনেছেন?

অরুণ। না, মনে শব্দবাবু সবচে এখনকার কিছু
লোক একটা "কোমল-লেন" করছিলো আর কি? আমি
অব্রত ওদের কবীর বসন্ত, মিহিনী।—তা ছাড়া এখন
আপনাকে নিয়ে চোখে দেখে গেলাম।

সত্যি জারি ডালপায়ে আপনাকে। তা মাঝে মাঝে
আমি হুঃহুঃ করে আপন'র কাছে আসবো, কি বলুন?

কাজল। (হাত কোড় করে) আপনি এখন ঘরা
করে আছেন। আর আপন'র নামটা জানতে পারি কি?
ওনার সাথে আপন'র দরজাটা খোলাখুলি আছে বলে

তো ভাল হয়। আমার হাতে একজন সময় নেই।

অরুণ। ও বাবা! আমার তাঁক ও হবেই যেখতি,
—বাই হোক শংকরবাবুকে বলবেন খেঁচের মালিক এসে-
ছিলো। ঘর ভাড়া অনেকগুলো টাকা বাকি পড়ে
আছে তাই। মানে তাগালা দিতে এসেছিলো। অবশ্য
—আপনি একটু হালিখুশি হলেন—একটু মজা মিলে,
শংকরবাবু অনেকগুলো টাকা বেঁচে যায় আর কি? হি:
হি: হি: আর ভাবতি সাধনে বঁধা আপনার আগেই অপে-
নায় ঘরটা পুঁথো বিশেষায় করে দেবো। বস্তির আর
লবার মতো তো আপনারকে রাখা যায় না কি বলুন? অ্যা
হি: হি: হি: তা হলে এখন আসি দেবী। আমার আসবো
নিশ্চয় আসবো। তা হলে—আজ উঠি—অ্যা হি:
হি: হি:

(অরুণ প্রস্থানোত্তর এবং শংকরের প্রবেশ)

শংকর। আরে! অরুণ গরু যে—মানে রেখুন দিন-
কাল যা পড়েছে, তাতে শুধু টিউজানি করে চারখিক ঠিক
সামলে উঠতে পারছি না।

অরুণ। তা ঠিক, শংকরবাবু তা ঠিক। তবে এক-
সাথে অনেকগুলো টাকা বাকি পড়ে গেছে তাই—

শংকর। তারপর পরীক্ষার কামেলা। আমার
একটু সময় দিন। আমি সব শোধ করে দেবো।

অরুণ। সময় না হয় বিলাস, অ্যা কি বলুন? হি:
হি: হি: তা ভাবতি—বসটা একটু বিশেষায় করে দেবো,
তা না হ'লে আপনারের এই—বুখিমিল জমবে কি করে?
—কি বলুন? অ্যা হি: হি: হি:—

পেটভরে নেমকরটা খেয়ে গাথো—হি: হি: হি:

চলি,—চলি, আমার আসবো।

(অরুণের প্রস্থান)

শংকর। এক গ্রাম জল ঘাট তো—

(শংকর চিন্তাধর, কামল এক গ্রাম জল নিয়ে শংকরের
কাছে এগিয়ে আসে)

কামল। কি হলো? পরীর খাওয়া হতনি তো?
কোন কথা বলছো না যে—

শংকর। না, পরীর ঠিক আছে। একটা টিউজানি
'র হাউজা হয়ে গেল। আভাস ইন্ডিতে জ্যাক্সির
ardian কি যেন একটা বোকাতে চেয়েছিলেন।

আমার তখন মনে মনে খুব হাসি পাচ্ছিল।

মাছের সামান্যো দুনিয়টা জীবন হুঁকো কাশল।
নির্ভর সত্যের সামান্য একটু ধাতাত্তে তা শুভা হয়ে কবে
পড়ে। আজ আর সাধারণ মাছের মনে কোন পরীক্ষা
নেই। অবশ্য সেটা পৃথিবীতে সাধারণ মাছের তেঁড়ই
বেশী। তাই কোন ঘটনাকেই তদিয়ে যেতে চায় না।
কোন জিনিসকে নিয়ে পরীর ভাবে ভাবতে চায় না।
মাছের প্রতি মাছের যদি বিশেষ দায়িত্ব কেলে তবে তব-
ব্রতে মাছ কি নিয়ে বাঁচবে? কি করে প্রতিকূল
অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করবে? কি করে সে সত্যের তত্ত
মাথা তুলে দাঁড়াবে?

কামল। সেই কখন ঘর থেকে খেঁচিয়েছ এমনও
পেটে কিছু পড়েনি। আর বেলাও গড়িয়ে গেল। চল,
তোমাকে খেতে দি। এখন আর বইখর নিয়ে বসো
না। আগে যা হোক দুটো মুখ দিয়ে নাও—

শংকর। চল,—বাছি—(কামলের স্তন্যন)

(শংকর পকেট থেকে কতগুলো কাগজপত্র বার করে
মনোযোগ সহকারে প্রথম কিছুক্ষণ ভাব ওপর চোখ
খোলায় ভাবপর ধীরে ধীরে গায়েব কামা খুলে হাতে একটা
গামছা নিয়ে ট্রেম থেকে বেরিয়ে বার)

(কয়েক মুহূর্ত পর শংকর এবং কামল উভয়েই কথা
বলতে বলতে হকে প্রবেশ করে)

শংকর। তারপর?

কামল। পার্কার্কার্কারের কোন একটা ক্রাটে বিহু-দার
সাথে এসে উঠলাম। সামান্যো-গোছানো বস, দৌখিন
সব আলবাব। আমি তো প্রথম সব কিছুটা বেখেতনে
হুঁককিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর সব পাড়াগাঁ থেকে
এসেছি, শংকর হাগচাল কিছু জানি না। আমারে সদ-
বন্দী বিহুদার আরও দুটো ঘেঁরে ছিল। তারাতো
বেখেতাব সব সময়ই পরীর মত পেলেওকে আছে। স্থলে
পড়াগান্য করে সেটা অবশ্য নামখাত্র, কড়ি-এব মতো
কেবলই তিরি: বিরি: করে বুয়ে বেড়ায়। কোথায় বার,
কি করে? কিছুই খোঁজা যায় না।

(শংকর হুঁক হুঁক হাঁসে)

কামল। হাসছো যে—

শংকর। হাসছি মানে তোমার বলার ভঙ্গি দেখে।

কুমি বেশ শুষ্ক হয়ে হৃদয় করে বলতে পারবে।

কাজল। ও বকম করলে কিন্তু আমি আর কিছুই বলবো না।

শংকর। আরে না, না, তুমি বলো। আমি Seriously শুনি—

কাজল। কোথা থেকে টাকা আসে, বিদ্যুৎসিরা এক হত সংসার চলে। কিছুই বুঝতে পারি না। বাড়ীর ভেতর হৈ,,হমোড়, নানা ধরনের লোক ব্যস্তব্যস্ত করে কিছুই যেন ঠাহর করে উঠতে পারছিলেন না।

আমাকে তো বিদ্যুৎসিরা হৃৎকবিরের ভেতর হৈসেলে চালান করে যিলেন। হাতধিন জুু কাশ আর কাশ। আর জ্বলো বাংলাবের হাড়ি টেঙ্গো। মনে মনে ভাবতাম ভালো চাকুরী পেয়েছি! চাকরিকের সাং ব্যাশায় বেখে আমার যেন বর বহু হয়ে আসতে চাইলো।

আমি এই পর্য্যন্তই থাক কি বলো? তুমি তোর একটু বিজ্ঞান কর—

শংকর। Its a fine story. বল—বলো কাজল আমি সবটা শোনা যাক—

কাজল। একদিন কোথা থেকে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝলাম না। বেড়াপের ভাগ্যে দিকে দিকিণো, কি না কে জানে? বিদ্যুৎসিরা এসে আমাকে আহার করে ডেকে বললেন—কাজল! তাকে আর হাম্বাওয়া করতে হবে না বুঝছিস। তাকে খুশে ভক্তি করে বেবে, সাহসের সাগ থেকে। পড়াশুনোই করবি। আর দেখ ইংরেজিটা ভালো করে বুঝে কব। আমি তাইলাস সেকিহে বাবা! বিদ্যুৎসিরা হঠাৎ আমার ওপর এত প্রদর হলেন?

শংকর। Interesting সম্মার তো? বলো—তাবপার?

কাজল। বাহোক, পড়াশুনোর ওপর সবদমরই একটা আমার ভাব্য বোঁক ছিল। তাই স্মরণে পেয়ে বিভিন্ন পড়াশুনো করতে লাগলাম। ইংলিশ আর বইপত্র নিয়েই বেশদিন কাটছিল।

একদিন বেধলাস বিদ্যুৎসিরা এক এংলোইণ্ডিয়ান Lady Teacher আমার ওপর নিহৃত করলেন। আর বললেন—দেখ কাজল English language-টা ভালো করে আহার করা বরকার। বুঝিতো তা নাহ'লে Society-তে

টিক যোলামেগা করা যায় না। ভাল করে মন দিয়ে কোজি-টা নিসু। লম্বত ব্যাপারটা আমার কাছে কি বকম খেন গোলামেলে ঠেকছিল।

শংকর। আচ্ছা! তারপর?—

(বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল)

রবীন্দ্র। শব্দ—শব্দ।

শব্দর। কে! কে ডাকছে? (দরজা খুলে দেখে।)

আরে! রবীন্দ্র, আপনি? আহ্নন, আহ্নন, তেতবে আহ্নন। তাইপার এখন কোথায় আছেন?

(রবীন্দ্রের প্রবেশ)

রবীন্দ্র। আমি এখন আসনসোলেই আছি। এই কোলাকাতায় এনেছিলো, আমাংবের Organisation-এর একটা Meeting ছিল। তা তাইলাস তোমার সাথে অনেকদিন দেখা হয় না। দেখাটা করে দাও।

শব্দর। খুব ভাল করেছেন। আপনি যে এসেছেন তাতে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। কতদিন পরে আপনাকে সামনাগামি দেখলাম। কাগজপত্রে আপনার কটো দেখি, বিভূতি পড়ি, আর আপনার সংগ্রামকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাই। ইয়া—পরির করিয়ে দিই, কাজল, রবীন্দ্রকে প্রণাম কর। উনি একদিকে আমার জীবনেই গোড়ার শিকাওক। আর হীকা! ওনায় কাছ থেকে নিতে পারলাম কোথায়? তাগ করতে শিখলাম কোথায়? বা হোক রবীন্দ্র, ও আমার জী কাজল।

রবীন্দ্র। কুমি বিয়ে করেছে—বেশ, বেশ,—ভালো—হুবা হও বউমা, তোমরা হুবা হও।

(কাজলের প্রস্থান)

রবীন্দ্র। তারপর শংকর তোমার পরীক্ষা তো এসে গেল, বাড়ীর খবর সব ক'লো? বা ভাল আছেন? আমাংবের গ্রাম কৈলাসপুর ছেড়েছি—সে যেন এক বৃগ হয়ে গেল। তা তুমি মাঠে মাঠে গ্রামে যাচ্ছ তো? গ্রামের অস্ত্রস্ত্র খবর সব ভাল?

শব্দর। না, ভাল আর কোথায় রবীন্দ্র! চাষবাগের উন্নতি নেই। অস্ত্রস্ত্রিক তিনিশপত্রের দান হ'ব করে বেড়ে চলেছে, Irrigation system ভালো না হলে গ্রামের চেহারা পান্ডাটাবে বলে আমার তো মনে হয়না। তাই ওপ'রে রয়েছে জোতদারদের ফাড়াবল, গোরাকারাবা—অদহা!

বক্তিত মাহুবেয়া পথশ্রবের সাথে হাত বেলাতে না পাবলে ;
সত্যের জন্য কোন সংগ্রাম চেক না—ইতিহাস দেই
কথাই বলে বহীনতা—

বহীন। আমি তো বাতফিন আকাশ পাতাল সেই-
কথাই ভাবছি। কেন মাহুবকে একসাথে বেলাতো যাচ্ছে
না? কোথায় যেন একটা ঠাক আছে। আর কি যেন
একটা হাতো বুঁকে পাওয়া যাচ্ছে না, যা দিয়ে সমস্ত
মাহুবের হৃদয়কে একত্রে ধরা যায়।

সত্য। কিন্তু ঠাকটা কোথায়? where is the
flaw? সে কি শুধু অপ্রাণের ভেত্রে, টাকার ভেত্রে,
জুবার ভেত্রে, না আর কিছু?

বিমল। (বাইরে থেকে) সত্য, সত্য—বাড়ী আছি।

সত্য। কে? বিমল? হেভরে আর। দরজা খোলা
আছে।

বিমলের প্রবেশ

বিমল। আমি তোমার কাছে একটা খুব বড়করে
এসেছি। আমাদের Student Federation-এর secre-
tary ডেকে একবার সফরী ওলম করবে। তুই কাল
একবার হাত নটার মধ্যে আমাদের অফিসে বাস
করেছিল।

সত্য। তা তো বুঝলাম, বোম। তবে মিলি থেকে
কিরেছিস! Teachers এবং Student-দের হাবি নিয়ে
তোমার ডেপুটেশন কেন হওয়া?

বিমল। সে অনেক কথা। বলে সব কিছু গুছিয়ে
বলবার হাতো এখন সময় নেই তাই। তাছাড়া কাসেমের
মারফৎ খবর তো একটা পেরেছিস। আমি আচ্ছ চলি।

(কাসেমের প্রবেশ, হাতে দু'কাগজ)

সত্য। আরে বোল, বোল, অন্ততঃ চা'টা খেয়ে যা—
(কাসেম, বহীন এবং বিমলের হাতে দু'কাগজ চা'ডলে
যেয়।)

তা পরীক্ষার বসবি তো। না—

বিমল। Course-এর পরীক্ষা তো কিছুই হয়নি।
যেখা যাক কি কবি—

সত্য। (বিমলকে উদ্ভত করে) পরীক্ষাটা কহিয়ে
এই হচ্ছে কাসেম, আমার বী। আর উনি হচ্ছেন
শিক্ষাপ্রদ ঐক্যব্রতের আচার্য। বর্তমানে কোল-

কাতার বাইরে আছেন। একজন Trade union Le-
ader, আর বহীনতা, এ হচ্ছে আমার মধ্যশ্রী univer-
sity union-এর একজন পাঠ।

বিমল। থাক—থাক; খুব হয়েছে—

(তাড়াতাড়ি চা'টা শেষ করে বিমল উঠে পড়ে)

তাছলে এখন চলি—নমস্কার। নমস্কার।

(বিমলের প্রস্থান)

সত্য। সেরা, আন্তরিকতা এখনও আছে। দস্যের
জন্ত লড়াই আদমও চলছে—

খালি কাগজ দুটা নিয়ে কাসেমের প্রস্থান।

বহীন। জানো শংকর, গুপ্ত একমাস হয়ে একটা
কাহিন্যের আমি strike চালাচ্ছিলাম। প্রথমে আমার
প্রমিকদের ভেতর কত উদ্বোধনা ছিল, দুরতা ছিল,
তারের গভীর বিশ্বাস ছিল, সেদিন এক অন্তত সাতা
পেরেছিলাম, যে এক অপর আলোড়ন। কিন্তু—

সত্য। কিন্তু কি? বহীনতা—

বহীন। আচ্ছ—আচ্ছ ওরা বলছে strike তেবেদবে।
অথচ ওরাই আমার হাতের একমাস মবল, একমাস
হাতিয়ার, আচ্ছ ওরা বলছে আমরা আর strike করতে চাই
না। আমরা মানিকের কথাই মনবো, তার কথাই ঠিক।
আমরা কাজে যোগ দেবো। তুমি leader ধাপাঝাল।
তুমি মিথ্যে করে দাবি করে সব বল—সব মিথ্যে। আমি
ওদের বোঝাতে চাইলাম আমার সংগ্রাম কতের জন্ত?
তোমাদের হাবির মতই তো? কথাটা কেউ কান পেতে
মনলো না পর্যন্ত, অনেক অন্ততভাবে হেসে উড়িয়ে দিল।
এমনকি কতকজন আমার এক'ত্র জানা, একান্ত আপন
সেহতাঙ্গন কনি বিশ্বাসী! আমার গায়ে হাত পর্যন্ত
তুলেছিল।

সত্য। আন্তরিকতা রয়েছে, ত্যাগ রয়েছে, কালহাসা
হয়েছে। তবুও কোথায় যেন একটা ফাঁক খেতে
যাচ্ছে!

বহীন। আচ্ছ তাহ'লে উঠি সত্য। আমাদের আচ্ছ
আগুনসোল বহন হতে হবে। ট্রেনের টাইমও তো হয়ে
এলো। আচ্ছ তাহ'লে চলি—

সত্য। আগুন এত কষ্ট স্বীকার করে যে আমার
বাসার এসেছেন, এতে দাঁড়াই আমি খুব মানসিক

য়েছি; কিন্তু আপনি আমার ঠিকানা ভোগাড় করলেন কোথা থেকে ?

বইদা। ঠিকানা Universityতে আমার একটি চেনা ছেলের কাছ থেকে ভোগাড় করে নিয়েছি। তাছাড়া কুমি হচ্ছে University-র Jewell, ওখানে একটি খোঁজখবর নিলে ভোগাড়ের ঠিকানা পাওয়া কি খুব কঠিন ? আজ্ঞা চলে—

(বইদার প্রশ্ন)

(শব্দ বহুটা পর্যাঙ্ক বইদালকে এদিয়ে ফিরে পুনরাবরণ করে প্রবেশ করে। কাজলও আসে।)

শব্দ। আমার তো চা ছিল না কাজল ?

কাজল। আর কোন খালি কাপ ছিলনা তাই। চাটা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হেঁথ দামাস্ত একটু দরদর করে নিয়ে আসি—

[শব্দ বইদার একটা পাংড়া গলটেতে থাকে এবং কাজল কয়েক মুহূর্ত পরে দুকাপ চা নিয়ে ঠেলে প্রবেশ করে। দুজনে চা শান করতে করতে কথা বলে।]

শব্দ। তাবপর কি হলো কাজল ? ভোগাড় কখাটা তো শোনা হলো না।

কাজল। সে আরেকদিন হবে—আজ সব কথা বলা যাবে না। তাছাড়া এখন কুঠি টিউশনীতে বেরোবে না ?

শব্দ। না, তাবছি—আজকেও সম্বোটা ছুট যেরে দি, কি হলো ? তার থেকে বহু জোয়ার কখাটাই আজ শোনা থাক।

কাজল। আমার কথা কি শুনবে। ওই বহন শুনে চাইছো, তাৎসে বলি—

তারপর পড়াশুনোটা আমার চুলায় গেল।

বিদ্যুদাসি আমাকে মেয়ে হবে পুরোবস্ত্র Society girl করে তুলতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন function-এ, পার্টিতে, বড় বড় লোকের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে বিদ্যুদাসি ভীতমত বাতায়াত গুলু করলেন। পেরে-দিকে অবন্ত বিদ্যুদাসির উদ্বেগটা আমি কিছুটা আশ্বাস করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়েই বা আসবো কি করে ? কাকে অবলম্বন করবো ? কিশের গুণের গুণনা করবো ? এমন এক

দুদিনে কোন একটা অকস্মেৎ সুকেশ ঘায়ে সাথে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়ে গেল। হাছবটাকে আমি একদম চিনতে পারিনি। লোকটা যে একটা পালা অভিনেতা সেটা বুঝলাম একবারে শেষের দিকে। কিন্তু তখনও নিজেকে ভাব কাছ থেকে দূরিয়ে নিলেও আর কোন লাভ ছিলনা। তাবের টাকা ছিল অনেক, অনেক বাড়ী, পাড়ী, প্রতিপত্তি সব ছিল। আমার চোখের সামনে সে সুখের স্বপ্ন, স্বব-বীধার স্বপ্ন তুলে ধরেছিল। আমি ভেলে গিয়েছিলাম শব্দর। ভোগবিলানের বোডে, আকাজ্জার মোহে আমি সেদিন ভেলে গিয়েছিলাম। আমি হাছবটাকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু—কিন্তু সেই বিশ্বাসের বর্গালা সে দিতে পারেনি। একটা অলদায় হাছবের সাথে অভিনয় করে, তাকে অনেক অনেক স্বপ্ন বেবিয়ে তাকে অবীকার করেছে। পায়ে ঠেলে দূর সরিয়ে দিয়েছে।

(হঠাৎ বাইরে থেকে তিনচারটি কষ্ট শোনা যায়)

শংকরবাবু। ও শংকরবাবু। বাড়ী আছে ন ?

শংকর। কে ? কারা ডাকছে ?

(শংকর ঘরের বরজা বলে বাইরে যায়)

কি ব্যাপার ? আপনাদেরতো চিনতে পারছি না ?

কোথা থেকে আসছেন ?

শেখর। সে কি রশাই। আমাদের চিনতে পারছেন না ? অহরহাতো এই বক্তিতেই থাকি। ওই পানের চায়ের বোতালটাতেই তো আমাদের আজ্ঞা। সকাল সন্ধ্যায় হায়েশাইতো ওখান দিয়ে হাতায়াত কচ্ছেন রশাই। সে বাই হোক, আপনাবা আমার শিক্ষিতলোক রশাই। তা একটা ভীষণ বরকারে আপনার কাছে এসেছি—

শংকর। তা আহুন না ? ঘরের ভেতরে আহুন,— আপনাদের কি বরকার সেটা শোনা থাক।

(অল্প ছুঁন বলতে থাকে বান। শেখর ভেতরে যা। সব শুদিয়ে বলি। স্বগতা বেহাত কদিল নি বে)

[শেখরের প্রবেশ, কাজলের প্রশ্ন।]

শংকর। বহন ওই চেয়ারটায়—তারপরে বসুন ?

শেখর। মানে হেঁদুন, বক্তিসিগির ঘরের ওপাশে— একটা ছোটপার্ক আছে না ? সেখানে আমরা

হিলে একটা function করছি। মানে মনসা করবো
আর কি ?

শেকর। তা আবার কি করতে হবে ?

শেখর। না, আপনাকে কিছু করতে হবে না।
মানে টিকিট পেদট। পুরোপুরি করে উঠতে পারিনি।
তাছাড়া, জায়গেল Artist-দের বারনা করতে হচ্ছে তো
—মানে Advance বুক করছি। তাই হাতে কিছু টাকা
স্ট পড়ে থাকে। যদি কিছু আদায়ের এই অসময়ে help
করেনতো Group-টার একটা হিলে হয়ে যায়। গোটা
তিরিশেক টাকা যদি—

শেকর। টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার সত্যিই নেই।
তাছাড়া আমার নিজেব মনসাই অতি কষ্টে চলে। বস্ত্র
আর পাটমেনের দস্তই আমারও একট অসহ্য। আমার
মাণ কখন, এখন আমি টাকা বিতে পারবো না।

শেখর। দেকি মশাই! আমরা যে অনেক আশা
ভরসা নিয়ে আপনার কাছে এগেছি। হান না খণালে
চলবে কি করে ? হে হে হে বহুতে থেকে কেজা
করছেন—ভালো, আমরাই তো মাথলারো কি মলুন
মশাই ! হে, হে, হে। ভালো হুং ভালো—বড়লোকের
বাড়ার জুহলা ঘরে এসে হালা দিচ্ছে। অমোছে, বেশ
মনোছে মশাই।—খ্যা হে হে—

শেকর। দেখুন কথামাত্রা একটু ভক্তভাবে মাথলে
বলুন। আপনি এখন বরা করে আসতে পারেন।

শেখর। দেতো আসবোই। আপনারা শিক্ত, হে
হে ভক্তরা আর শিখলার কোথায় ? তবে বলে দিছি
এসব লটপট, বেশিদিন এখানে চলবে না হে হে—একটু
মাথলে চলুন। চাববিকে সব বি বি কয়েছে যে—চলি হে
হে চলি—

[শেখরের গ্রন্থান এবং কবলেপের গ্রন্থানের সঙ্গে সঙ্গে
শেখর এবং তার লড়োয় হাসাহাসি আরম্ভ পোন
যায়।]

কমলেশ। কি বাণীর শব্দ ? বাইরে এত লোক
কেন ?

শব্দ। ও কিছু নয়। Function করবে তাব

কমলেশ। ও—

(কামলের প্রবেশ)

কামল। আরে ! কমলেশগারু যে ? আপনি কতক্ষণ ?
কমলেশ। এই তো এগার।

কামল। তা—টা খাবেন তো ?

কমলেশ। আরে না, বিকেল থেকে পাচ কান
already হয়ে গেছে। এখন আর গুব কামেলা করবেন
না, বরকার নেই—

কামল। সে কি ? আপনি হাসলেন দেখছি।
একোবারে ভুজের মুখে রাম নাম ?

কমলেশ। হাসছেন যে ? ঘাহোক, শব্দ তোর দায়ে
কামের কপাটা সেবে নি।

শব্দ। ভোমার, আমার সাথে আর কোন কামের
কথা নেই। তা এতদিন আসিনি কেন ? বলি—ভুবা
হেরেছিলি কোথায় ? এই কত কথা—হোমার কাছে এগে
কোটিং নেবো। পণীক এগে গেছে। কতকগুলো জিনিষ
আমার মুক্তিবে মিল -কর—

কমলেশ। মানে বেশ হঠাৎ একটু অকস্মাতে Engag-
ed হুং পড়েছিলাম। পড়াগুলো অবস্ত করছি—

শব্দ। পড়াগুলো অবস্ত করছি। তোর বট সব
হাতিতামি।

কমলেশ। (কামলকে উদ্বেগ করে।) আপনি
আমাদের দিকে ভ্যাকিয়ে কি দেখছেন ?

কামল। না,—কিছু না।)

(এমন সময় ঘরের দরজাঃ কাছে "টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম
জীপতব সুখামি, বাড়িতে কে আছে?" বলে শিওন
বাইরের থেকে চীৎকার করে।)

(শব্দ তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে যায় এবং
টেলিগ্রামটা পড়তে পড়তে ঘরে ফিরে আসে। কেনে কথা
না বলে কমলেশের হাতে টেলিগ্রামটা তুলে দিয়ে একটা
খোলসো ব্যাগের মধ্যে একটা বাসা আর একটা কাগড়
আর সামান্য টুকটাকি জিনিষ ভরতে থাকে।)

কামল। কি হয়েছে ? কার টেলিগ্রাম ?

কমলেশ। শব্দকে এতুনি বেশে রওনা হতে হবে।
ওর মা জীপ অসুস্থ—

(শব্দের মুখে একটা বিবাহের ছায়া নেমে আসে।)

শব্দ। (Money bag খুলে কামলের হাতে কিছু

টাকা দেয়।) আমার হয় তো বেশ থেকে কিয়তে গোটা পনের দিন লাগতে পারে। কেহানে থাকে দিবে দেখাবের মতো দেখতে পারো কিনা? কোন জায় নেই কাল; সাধ-ধানে থেকে। তাছাড়া কমলেশ রইলো। ও এসে দেখাতেনো করবে। আমি বসে বসে গল্প চলে আগবো।

কমলেশ। তোকে ওদর ভাবতে হবে না। আমার গাফী রয়েছে। চল, তোকে টেনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিবে আমি।

কামল। তাড়াতাড়ি করো না। সাবধানে যেও। (তারপর কামল লম্বের কাছে এসিয়ে যায়।) আমার যে বড় ভয় রয়েছে। (কামল কঁপে কেলে)

কমলেশ। কি হেসেমাছনি করছেন? চল, চল—আর বেটী কথিনি লম্বা—আরে আমি তো বয়েছি!

লম্বা। কমলেশ। (কমলেশের হাত ধরে।) নরন অস্ত্রপূর্ব। কমলেশ লম্বাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি টেম থেকে বেরিয়ে যায়।)

[ঘরে ঘরে পূর্ণা নেবে আসে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[শব্দের বড়ির শব্দ। লম্বা দুপুঃ। বাইরে দরজা কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা যায়। কামল খাটের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করছিল। শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখে।]

কামল। কে কমলেশবাবু; আহন, আহন; ভেতরে আহন। তা হঠাৎ এই ভয় হুগুং?

কমলেশ। আপনার কাছে আসবো, লম্বার ঘরে আসবো তার আবার লম্বা অমর কি? বা হোক আপনার কোন অসুস্থি হচ্ছে না তো?

কামল। অসুস্থি আর হতে যিচ্ছেন কোথায়? রোজ দুঃবেলা এসে যেভাবে তবির তরকারি করছেন তাতে আপনাকে অল্প বস্ত্রব্য জাপন করলেও স্বপ্ন শোধ হবে বলে আমার মনে হয় না।

কমলেশ। কলী হয়ে থাকবার মতো বড় ধরনের কোন কাজ; অথবা লম্বা কোন জাপন দীকার আর পর্যন্ত পুখিরিতে কাকর মত করতে পেয়েছি বলে তো মনে হয়না, অথবা বস্ত্রব্য জাপনের মধ্যে ক্ষতি থাকতে পারে কিন্তু

তাতে ভালবাসার স্পর্শ থাকে না কামল দেখী, কটিকে দুই লম্বিরে বেওয়ার মতো উদারতা নেই। আপনকরে কাছে টেনে নেওয়ার মধ্যেই হয় তো আসলে জীবনের ময় দৃষ্টি হয়।

কামল। তা ঠিক। তবে আপন করে নেওয়ার মধ্যে একদিকে প্রজ্ঞাভাবে লুকিয়ে রয়েছে অধিকার, অস্ত্রিকের দাবী।

কমলেশ। এই দাবী আর অধিকার নিয়ে মাহুয়ের মনের ভেতর জটিলতা; কি বলেন? আমার মনের ভেতর বেব্রীতি, প্রেম ভালবাসার মূল্যবোধ মৃদুত্ব আরও একটা অন্তত গোড়ামি লুকিয়ে রয়েছে।

কামল। ব্যাপারটাতো ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। মানে ঠিক আমি বুঝতে পারছি না।

কমলেশ। খুলে সবটা না বললে না গোকাই বাস্তবিক কামল দেখী। কারণ মনের ভেতর বাস করে মাহু যেমন বুঝতে পারে না মনের চাপ আছে; তেমনি একটা সংস্কারের ভেতর জুবে থাকলে তার বাইরে এসে নিজে কোন বোধকে বাচাই করা লজাই কঠিন।

কামল। মাহুয়ের জীবনে সীমিত গভীর ভেতর, তার বোধের ভেতর সংস্কারকিছুটা থাকবেই তাতে আর আশ্চর্য্য হওয়া কি আছে?

কমলেশ। মাহু বহি উপলব্ধি করতে পারে যে তার বোধের ভেতর কোন সংস্কার রয়েছে তবে সে তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা নিস্তর করবে; একদিন বেরিয়ে আসবেও। তাহ'লে আপন নিজেই বলুন কামল দেখী আপনি সংস্কারটা বোঝেন কিছটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন না।

কামল। হরতো তাই। উপলব্ধির গভীরতায় বোধের বহুতায় হরতো আমি ভেতরা সংস্কারী, ভেতরা বাহ্যিক। হয়ে উঠতে পারিনি। তাছাড়া হরতো আমার মনের আর, বিধা আছে, মনের ভেতর বস্তু আছে।

কমলেশ। অথও লজা, অথও বিশ্বাসের বৃগু শেষ হয়েছে। পথবিখণ্ডিত লজা, বিশ্বাস গোটা পুখিরিতে ছড়িয়ে আছে। মাহুয়ের জীবনে অপূর্ণতা বেধন আছে, তেমনি অসম্পূর্ণতা রয়েছে তার চিন্তার জিহা উপলব্ধির ভেতর। অসংখ্য বিভিন্ন বস্তুতাকে কী

করার ভেতর হাল্ধের কোন গোড়ামি থাকা উচিত নয় এবং তা বীকার করলে হাল্ধ অক্ষতি হয়ে যায় না, ছোট হয়ে যায় না।

কাম্বল। কিন্তু হাল্ধের মাদনা, লালসা, ঐশ্বর্য হাল্ধকে বীরে বীরে আটোপনের মতো গ্রাস করবে না, লেখা আপনি বোর দিয়ে বলতে পারেন ?

কমলেশ। হাবীর অনেক রূপ আছে যা আছে কাম্বল দেখী। আমার হাবীকে আপনি বুণা দিয়ে অপমান করেছেন কিন্তু মন দিয়ে শোমন করে পরিচয় করে দেখতে পারেন নি।

কাম্বল। অকৃত তুলতে গেলে বিষ উঠবেই কিন্তু সে বিষ দেখান করবে কে ? শব্দ !

কমলেশ। কাম্বলজাত দেবী! শব্দকে মাগতে যাবেন না।

কাম্বল। না মাগতে আমি তাকে চাইনি। শব্দের উচ্চারণ, রহস্য, এবং পারল্যকে মাগা আমার পক্ষে কোন-দিনই সম্ভব নয়।

কমলেশ। আর এটাও কোন দিন মাগতে পারেন নি কমলেশ ব্যানাজির কুকর ভেতর কত ভাল, কত যুগা, কত কামা, হাছাকার করে বেড়াচ্ছে, কত কথা মাথা ফুটে মিনহাত তার মনের বহুবার আছড়ে রয়েছে। সে কত ভূফার্ড—কত স্নায়ু সে।

কাম্বল। যৌন, বেহ, ভোগসাধনা আটোপনের মতো জীনেকে দিয়ে ব্যবহা। না—না সে হয় না কমলেশ বাবু, এত বিষ পান করতে পারবেন না আমি। শব্দ, আপনি, আমি, তার জটিল আবর্তে সব ভেসে যাচ্ছে, কেউ রকে পাঠো না, কেউ না।

কমলেশ। বেহ, যৌন, ভোগের লালসা, আপনি এগুলোর গুণব পূর বেশী মূল্য আধোণ করে কেনছেন। একটা পরিচয় লভ্যকে না দিয়ে বলে দিতে চাইছেন, পিখে দিতে চাইছেন—অথচ বেহের পরিচয় বলে আপনি বোটা বোঝাতে চাইছেন, সেটা আপনার নই।

কাম্বল। কমলেশ বাবু, শব্দের উচ্চারণ, ভাল-মাসার অর্থগা করবেন না।

কমলেশ। তার ভালমাসার মর্যাদাটা আপনি ঠিক দিতে পারবেনই হবী যতো কাম্বলজাত দেবী, তবে

শব্দকে শ্রদ্ধা করুন, ভক্তি করুন আমি সেটাই চাই। কিন্তু আমাকে অপমান করার অধিকার বোধহয় আপনার নই। যদিও আমার ভালমাসাকে কৃষ্ণের যুগা দিয়ে ব্যবহার করেছেন কিন্তু সে ভালমাসাকে অপবিত্র করার চেষ্টা করবেন না।

কাম্বল। পরিচয়কে চেষ্টা করলেই অপবিত্র করা যায় না। আমার বেহ এবং যৌন আপনার মোহ স্রষ্টা করেছে। ভালমাসার কথাটা বাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কমলেশ। আপনার কাছে হুতো সেটাকে বাশ মনে হওয়া খুব অসম্ভব নয়। কিন্তু বেহের বড়াই, যৌনের বড়াই, পরিচয় বোঝাই কমলেশ ব্যানাজির চোখের মাঝে তুলে রাখেন না। তার কুক আঁচড় কাটলে, বক্ত বেবলে,—হুতো—হুতো তার হিংস বাবা বেহিয়ে আসবে। By request কাম্বলজাত দেবী আপনি তা করবেন না—করবেন না। আপনি আমাকে কৃষ্ণতে পারেন নি, আপনি আমাকে চেনেন না,—জানেন না।

(ক্ষত বর থেকে প্রস্থান)

[কাম্বল পঙ্কিত, বিহ্বল, চিন্তামগ্ন, একদমই আবার বিছানায় গা এলিয়ে বের। দুপুর গড়িয়ে শায়া হয়।]

একটি লোক। (টেকর বাইরে থেকে) চিঠি আছে, চিঠি,—বাড়ীতে কে আছে ? (কাম্বল দরজার কাছে এগিয়ে যায় এবং একটা খাম হাতে করে কিংব আপন)

কাম্বল। (বসন্তোক্তি) চিঠি তো বেশীভাষি বেগমের কথা সেই দুপুরে। অথচ এত সময় বাসে কে বেন চিঠিটা দিয়ে গেল, আশ্চর্য। পিমনহাও বেহাছ দরকার অবরকার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। তবে, বস্তির লোকতো ? যেখানে সেখানে একজনের চিঠি অগ্ন্যোকেণ হাতে দিয়ে চলে যায়।

[প্রথমে কাম্বল ঠিকানটা পড়ে, তারপর দাবদানে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে থাকে)

কাম্বল,

আমি কবি ভূমি ভাল আছো। তোমার পূর্বের চিঠি পেয়ে দুগুণ আনন্দিত এবং নিশ্চিত হয়েছি। ওখানে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না বেনে আমার দৃষ্টিভাও কিছুটা লাঘব হয়েছে। আমি জানতাম আমার আপদে

বিপদে কলপেণ ছাড়া আমার পেছনে এনে দাঁড়াবার মতো আর কেউ নাই। ও এত ঘর নিয়ে যে তোমার দেখা-ওনা করছে তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।

মা ইহলে ক'টাগ করেছেন। আমার মাথার ওপর আজ এক বিরাট গুজরাতি ঘুড়। নিজের মনের ওপর বিশ্বাস রেখে। আরও তীব্রতর সংগ্রামের জন্য আমারে প্ররোচিত হতে হবে। যাহোক মায়ের পারলৌকিক কাজ গুণ বুৎবুৎ মিন মন্দার হয়েছে। এদিকে ঘাবতীর বন্দোবস্ত করে আমি আগামী শনিবার কৈলাশপুর থেকে কোল-কাতার এসে পৌঁছাবো। ওইদিন রাত বৃষ্টির মধ্যে যদি না গিয়ে উপস্থিত হতে পারি তাহলে কিন্তু কোন চিন্তা করো না পক্ষীটি, ভেবে নিও আমি অল্প কোন দরকারী কাজে আটকে গেছি। আজ এখানেই শেব করছি কামল—

ইতি

তোমার শকর।

কামল। (সমতাজি) তাহলে আজই আগছে, আজই তো শনিবার।

[সময় রাত্রি। বরষা-সীতের সাধাযো কড়ের আস্তান ফুটিয়ে তুলতে হবে। মাকে মাকে বিদ্রোহ চমকাবে।]

কামল। (সমতাজি) ভীষণ কড় উঠলো যে! উঃ কি ভীষণ কড়!

(তারপরে ঘরের নরবড়ে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দেয় এবং চিত্তাময়)

[এমন সময় দরজার কড়ানাজির আওয়াজ শোনা যায়। কামল খুব ব্যস্তভাবে দরজা খুলে দেয়।]

কামল। কে?

[কমলেশের প্রবেশ, তাকে দেখে ভীষণ ভরে কামল যেন ঝাঁকে গুঠে এবং ছুটে ঘরের অপর কোণে চলে যায়।]

আ।—

[কমলেশের আগোছালো বেশ, মস্তান করেছে বোকা বাজে, নীচের ভাবনায়া তাই দরজার বাথতে পারছে না। পা কিছুটা উলছে—বুড়ির সঙ্গে পোশাক ভেজা।]

কমলেশ। আমার ঠিক ঠিক চিনতে পারছেন না কামলগজা বেবী। (তারপর একদম উলটে উলটে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়) বড় উঠেছে, বাইরে ভীষণ কড়—

আ।—কি বসুন কামলগজা বেবী। আঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমার বুকের ভেতরটাও ভীষণ জোলাপাড় চলছে। Storm—No No Cyclone, ভিহুটিয়াস, I mean volcanic eruption হাঃ হাঃ হাঃ—

কামল। কমলেশবাবু! আপনি এইদর ছাইপাশ গিলে কেন এখানে এসেছেন? আপনি কি চান?

কমলেশ। কি চাই? হাঃ হাঃ হাঃ, কিছু নয়। Nothing—আমায় জো আপনি বসতে বললেন না, আদর করে চাও যাওয়ার কথা বললেন না। এতকম একটা বড়ের রাত বিপল হয়ে যাও কামলগজা বেবী!—না—না। তা হয় না। কি বসুন? আঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

কামল। আপনার কোন অসুস্থতা বোধ নেই, লক্ষ্য নেই? বহুত অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে—

কমলেশ। No—No—No. I beg your pardon. খাওয়া কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসিনি—শকরের সাথে দেখা করণে বলে এসেছি। কারণ সে আমার—আমার চিঠি দিয়েছে সে আসবে। তারসাথে একই ভরকী দরকার আছে—

কামল। “শকরের সাথে দেখা করতে এসেছি। তারসাথে আমার দরকার আছে”—যত নয় মিথ্যা কথা।

কমলেশ। সেই—এক কথা—হাঃ হাঃ হাঃ—ছোবল মেয়ে লাভ হবে না

কামল। বুঝি—আপনি এখন এই অসুস্থতা কেন এসেছেন। You are too mean, আপনি অতি নীচ।—আমি এতদিন যা চেয়ে এসেছিগাশ সেইটাই তবে ঠিক—আপনি দুগারও অযোগ্য। সব থেকে বেশিই যান বলে দিচ্ছি। বেহিয়ে যান।

কমলেশ। বাইরে ভীষণ কড়, ভীষণ কড়—I mean cyclone বুকের ভেতরটা—আঃ—কোথার যাবো? আপনার কাছে এসেছি কামলগজা বেবী। শকরের সাথে দেখা করার করে যেতেই হবে। না—না আপনি আমার যা ভাবছেন সেজন্য আমি এখানে আসিনি। অন্ততঃ কমলেশ বাঃনাচ্ছি, শকরের বন্ধু, সেজন্য এখানে আসবো না।

কামল। ইয়া, আপনি সেইদরই এসেছেন। শকরকে নিরীহ পেতে, আমার মতো একটা অসুস্থতা বোঝে আপনি

মহাশি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপৰ্ব

বঙ্গানুবাদ : স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(ପୂର୍ବଶ୍ରବଣାଧିତେଜ ମୟ)

ଅତ୍ୟନ୍ତାଶ୍ରୟାନ୍ତ ହୃଦୋଦ୍ଧ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତଃ ।

अकारणोद्भवेति वदन्त्युक्तं बहुविधतया ॥३॥

প্রাকৃত ও গোশালীয় এই দুই প্রকারের হংগের (সেনার) কথা বর্ণন করা হয়েছে সেই শাস্ত্রে। এরমধ্যে প্রাকট সেনা আট প্রকারের, আর গুপ্ত সেনা বহু প্রকারের বর্ণিত হয়েছে।

इथा नाथ। हवाटेन्डव पावाएटेन्डव नाथव ।

ବିଶ୍ୱନାଥଚରଣ ଟଙ୍କା ମେଳିକା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା

अनादितानि कौरवा इकानानि वन्द्य त ।

ଶ୍ରୀରାମାୟଣାବତାରକାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚୋପ ବିବାହ: ୧ । ୧୨
 ଓ କୁଶାଙ୍ଗୀ ମାତୁଳମନ, ବଧ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ମହାତିକ,
 ବୃଦ୍ଧିଦେହୀ ଘୋଡ଼ା, ଭୋକତୋହାଣୀ, ଶୁଣ୍ଠର ଅବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟୋ-
 ମନେଷକାରୀ ଶୁକ—ଏ ସବଳ ମେନନୀର ଆଟି ଶ୍ରବଣ କାମ ।
 ମେନର ଶୁଣ୍ଠ ଅବ ହେଉ—ଶ୍ରୀରାମ, ଅର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀରାମି - ଓ ଅଶ୍ରୁରାମ,
 ଅର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମି ସବଳ ।

ଅର୍ଥେ ଡାକ୍ତାବହାର୍ଥେ ଡାକ୍ତାମାନଙ୍କବିବିଧ: ସ୍ବତ: ।

अविषिद्ध देवाजीन ईलाखः नाशुसिद्धाः । १७७

এই গোপনীয় বসুগাথন বিব আদি শতাব্দের লোকের
বসু প্রকৃতির সঙ্গে স্পর্শ করিতে লব্ধ। তাৎপৰ্য্য ভোজ্য
অবোধ সঙ্গে মিশিবে যোবার গন্ধ ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন
বসুগণের প্রয়োগের কথাও নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে।
এ ছাড়া এ প্রাচীন শব্দ নিম্নে উদাহরণে কথ্য বায় বায়
বর্ণিত করা হয়েছে।

ବୃନ୍ଦା ସାର୍ଗସ୍ୟାଟେକ୍ୟ ଉପା ଚୁରିତ୍ରବାନଠ ହ ।

আবু হাফস মাদানী: সূর্ণাণাং চাহবেকবন ১৪৪

পথের সন্ধান, ভূমির সন্ধান, আত্মরক্ষার উপায়,
আত্মপন ও রথ আদির নির্মাণ, আর নিষ্ঠাকর আদির
বর্ণনা রয়েছে।

कथनं विविधानि नृणां वैशालिनाम् ।

বাহ্যন্ত বিবিধাভিহা বিচিহ্নং দুহকোপলন্ ১৪ :

উৎপাত্তাক্ত নিপাত্তাক্তহৃৎঃ স্পন্দিতম ।

पञ्चाननं भगवन्तं ज्ञानं परमं तत्त्वम् । १५०

সেনাবাহিনীকে খুঁট করণার্থে অনেক প্রকারের যোগ, হাতী, ঘোড়া, বখ, আয় বহুদা সেনা দিয়ে কত বকসের ব্যাং রচনা, অন্যপ্রকারের যুদ্ধ কৌশল, উর্দুগনন, নিয়গনন, কুশলতাপূর্বক যুদ্ধের থেকে পলায়ন, এই সকল উপায়ের বর্ণি এই গ্রন্থে আছে। যে ভরতর্ষক, পর সকল বক্রায়ও প্রয়োগের উপায়ও উল্লিখিত হয়েছে।

बलवान्नमस्तु ८ उद्वेग बलवर्धनम् ।

শীତ। চাপকালন্ত পতিজ্ঞান ৫ পাত্র ১৪৭

পাণ্ডুনন্দন, বিপদ বেঁকে দেবারে উদ্যম করা,
দৈনিকবেশে হাও উৎসাহ বাড়ানো, পীড়া ও আপদের
সময়ে পরাভিক দৈনিকবেশে প্রভুত্ব পৰীক্ষা করা,—এই
সকলের কথাই এই শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে ।

তথা খাত্তবিধানং চ যোগঃ সংসারি এব চ ।

চোটব্রাটব্রিটকল্‌:ট্রা: লব্‌ব্রিট গীডনম ১৪৮

अष्टिदेवर्गशेतेनैव अतिवृणक्तान्तेकः ।

শ্রেনিদ্রখোপজ্ঞাপেন বীজধনেন ৫ ১৪২

प्रत्येकेन ८ नागानां शतं दत्तवानेन ८ ।

আশাধনের তরুণ প্রত্যাশাধনের চ ৫৫০

দুর্গের চারিধারে বাতশবন, দুহের অন্তে সেনাকে
 সজ্জিত করা, যুদ্ধাভিষেক, চৌর বা সন্মানক মঙ্গল বহু
 দ্বারা অক্ষরাষ্ট্রকে পীড়া দেওয়া, আশুন লাগিয়ে, বি-
 প্রায়োগ করে, অস্ত্রবেশধারী লোকের দ্বারা পক্ষের ক্ষতি
 করা, তাবশব, পক্ষবলের প্রধান প্রধান কর্তৃপক্ষের মধ্যে
 তেজ সৃষ্টি করা, মঙ্গল ও পান্ন কেটে নেওয়া, দ্বন্দ্বী মঙ্গলকে
 ভড়কে দেওয়া, লোকবলের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা,
 পক্ষবৈর মধ্যে অস্থিরক পুঙ্খক অস্থির-অস্থি দ্বারা ভাঙিয়ে
 নেওয়া, পক্ষপক্ষীয় লোকবলের মধ্যে নিঃশেষ প্রতি বিশ্বাস
 সৃষ্টি করা, ইত্যাদি উপায়ে পক্ষের রাষ্ট্রকে পীড়া দেওয়া
 ফলাও ত্রাণ উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

দগ্ধাক্ত চ রাভাক্ত হ্রাদদ্বিমহরসম্ ।

দৃত্ সার্বথা সংযোগো বাতুস্ত চ বিবৰ্দ্ধন ৥৭১

অবিবৰ্দ্ধ্যত বিপ্রাণাং লম্বাক্ষ্যং চোক্তং প্রপঞ্চনম্ ।

অবসৰ্গঃ প্রভীষাত্তত্বেণ চ বপৌবদান্ ৥৭২

সাত অকম্পিত বাতোর হ্রাদ বৃদ্ধি, সাম্যভাবে স্থিতি, হ্রদের সার্বথা হাতা নিত্যের ও নিত্যের প্রাচ্যের বৃদ্ধি, সত্য, স্মিত ও মধ্যস্থতের বিস্তারপূর্বক লম্বাক্ষ্য বিবেচন, বদনবান শত্রুকে ধ্বন ও বাবা বেওয়া প্রকৃতিঃ বিবিধ এই প্রবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে ।

বাসহাঃ স্বদেহস্ত তথা কষ্টকশোভনম্ ।

অথো বাবাম যোগস্ত ত্যাগঃ ভ্রবস্ত সংগ্রহঃ ৥ ৭৩

বিচারকণ্ডের ব্যাঃ স্বদেহ ভিচার, ক্লেশ শত্রু নিবদন, অম, বাহ্যিক, বনের সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধে জ্ঞাতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ।

অভূতানাক ভরণ্যং তৃষ্ঠান্যং চাশ্ববেক্ষণম্

অৰ্ঘ্যাকালে দানক বাসনে চাপ্রগ্রহিতা ৥ ৭৪

হস্তিতের ভরণ্যোষণ, বাসনে ভরণ্যোষণ চলে ভরণ্যে সংরক্ষণ, ঠিক সময়ে অর্ঘ্যদান, বাসনে অঙ্গাঙ্গিত্য করাও বলা হয়েছে ।

তথা রাগপ্রপাত্তব সেনাপতিঃ স্তম্ভাক্ত হ ।

কায়ণক স্মিৰ্ণস্ত গুণবোধোত্তমৈব চ ৥ ৭৫

নবপতিঃ স্তম্ভ, সেনাপতিঃ স্তম্ভ, বর্ষ, অর্থ ও কায়ের হেতু স্তম্ভ এবং বোধ সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে ।

হুস্তেষ্টিতক বিবিধঃ বৃত্তিষ্টৈবাহুযজ্ঞিনাম্ ।

শব্দিভ্যস্ত সর্বস্ত প্রসাদস্ত চ বৰ্দ্ধনম্ ৥ ৭৬

দুর্জনেব নানাবিধ হুস্তেষ্টি, অমৃদভী গোকেব ব্যবহার, সঞ্চয়ের উপর ব্যাক্য সম্বন্ধ ও অসামান্যতা পরিহার করা —এ-বিষয়েও সেই শাস্ত্রে উপদেশ রয়েছে ।

অমৃদলাভো লব্ধস্ত তবৈব চ বিবৰ্দ্ধনম্ ।

প্রদানক বিবৃদ্ধস্ত পারোভ্যো বিবিধস্ত ৥ ৭৭

অমৃদ অর্থেব লাভ, লব্ধ অর্থেব বৃদ্ধিসাধন ও ধবাবধ ভাবে সংপারো সেই বর্দ্ধিত অর্থেব প্রদান, সে বিষয়েও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ।

বিসর্গোহর্ষস্ত ধর্মার্থঃ কাষ্যেহুত্কৃদ্যতে ।

চতুর্থঃ বাসনাঘাতে তথৈবাহু পিতম্ ৥ ৭৮

প্রথমতঃ ধর্মের মন্ত, দ্বিতীয়তঃ কাষ্যের মন্ত, তৃতীয়তঃ যোগনিবাহরণার্থে ব্যয়, তাৎপর্য চতুর্থতঃ বিপৎপ্রতীকারে ব্যয়ের নির্দেশও সেই শাস্ত্রে আছে ।

কৌষেহানি ভবোগ্রাণি কামজানি তথৈব চ ।

ধনোক্তানি কৃকশেষ্ঠ ! বাসনাস্তস্ত তৈব হ ৥ ৭৯

হে কৃকশেষ্ঠ ! সেই শাস্ত্রে কৌষেহ ছয় প্রকার উগ্র বাসন ও কামজ চারি প্রকার কৌশল বাসন বর্ণিত হয়েছে ।

মুগ্ধাকাশত্বাঃ পানঃ স্ত্রিচ্যস্ত ভাৰতবর্ষত ।

কামজাঃ হরাচার্য্যঃ প্রোক্তানৌহ স্বাহুবা ৮০

হে ভারতবর্ষ ! মুগ্ধা, অক্ষত্রীড়া, হুয়াপান ও স্ত্রী-বিলাপ এই চারি প্রকার বাসনকে আচার্য্যগণ কৌশল বাসন বলেন । এ সকলও অধ্যয়নিত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ।

(ক্রমশঃ



বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাংলা ভাষা ও তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের চকুতঃ প্রথমটি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে বাংলা ভাষার বাঙ্গ-
ভূমির চতুঃসীমা একবার মাথা দবকাব। উত্তরে হিমালয়
পর্বতমালা, নেপাল, সিন্ধি ও বুটান রাষ্ট্র, পূর্বে পাটকোই
পর্বতশ্রেণী, আশামের সমতলভূমি, গাখো-খাসিয়া-জয়ন্তীরা-
মিকির-মুণাই পাটকড়, যদিপুর নামা ও ব্রহ্মদেশের অঞ্চল,
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ওড়িশা বা উৎকল, ছোট-
নাগপুরের অঞ্চল, সীওতাল পরগণা ও রানঘরগ পাহাড়—
এই হল বর্তমান বাংলাভাষী এলাকার চৌহদ্দি বা বাংলা
বেশ।

বাংলা বেশের পাহাড়-পর্বত-অঞ্চল-নাগরবেশ প্রাপ্ত
সমস্ত ভূপটের ভৌগোলিক ঐক্য ও অখণ্ডতা নিয়ে তর্ক
বা সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক
ঐক্য জাতিগরিষ্ঠের সংস্রাভীত কালব্যঞ্চে স্বীকৃত ও স্বীকৃত্য।
অতিথ। নিত্য সাংস্কৃতিক কালের কথা বাদ দিলে এই
অঞ্চলেবর্মীর কারণে একরাষ্ট্র গঠনে আগে কোন বাধা ছিল
না। বর্তমানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় বাংলা বেশ নামক এক-
ভাষী একজাতি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক এককটির
রাষ্ট্রীয় গঠন কেমন হতে পারে, তাই আলোচ্য।

সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা একত্র করে একটি
স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার প্রথম ঐতিহাসিক কালে প্রথম আশ্রয়
হয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রবানত পাল বংশের দ্বারা। তার
আগেও বাংলা বেশের বা গোড়-গাড়-সুহ-বরেন্দ্র-পুণ্ড্রবর্ন-
ব-সমস্তট এলাকার অস্তিত্ব ছিল। সত্য অসংগীতরূপেই
ঐ সুহ সুহ অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব ইতিহাসে ও পুরাণে
স্বীকৃত ছিল অষ্টম শতাব্দীর অনেক আগে থেকে। কিন্তু
এখন বাংলার ইতিহাসের বঙ্গল বাংলাটির ইতিহাস
আমাদের আলোচ্য হওয়ার এখন থেকে ভৌগোলিক

বাংলাদেশে বাংলাভাষী জাতির উদ্ভব হল, যাত্রা তখন থেকে
বাঙালির রাষ্ট্রীয় বিঘটনের দায়িত্বই আমাদের বিবেচ্য।

কেবল বাংলাভাষী সমস্ত এলাকাটা একত্র করে কোন
অত্রভাবানিরূপেক মাত্র একভাষী ভাষাভিত্তিক বাংলা
জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা ঐতিহাসিক কালে কখনও হয়
নি। মাত্র বর্তমানে কয়েকটি ছোট স্বাধীনভিত্তিক বঙ্গল
ইউরোপীয় আদর্শে এ-বাংলায় উৎসাহী দেখা যাচ্ছে।
ভবিষ্যতে অবশ্য এই স্বকম কোন বঙ্গল বাংলা দেশে রাজ-
নৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করবে। কোন ভাষাবিক সর্ব-
ভাষায়ী হল বর্তমান বঙ্গলের ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের
আন্দোলনের সঙ্গে সমতালে চলতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হতে
পারে না। কিন্তু বর্তমান দিন একটি সজ্জালা বাংলা
জাতীয় গণ গড়ে না তেঁ, তত দিন একথা যেমন নেওয়া
উচিত যে, আধুনিক অর্থে সংহত স্বাধীন জাতি বলতে যা
বোঝায়, বাংলায় ত. কখনও ছিল না এবং আরও নয়।

পৃথিবীতে এখন রাষ্ট্রীয় সংগঠিত স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত অল্প
ছিল এবং আছে। আরবিন ও ইতালির রাষ্ট্রীয় সংগঠিত
ও স্বাধীনতা মাত্র এক শতাব্দী কালের; এখনও তারা পূর্ণ
সংগঠিত লাভ করে নি, সুতরাং বাংলায় স্থাপন বা নিরুচ্চর
হওয়ার কোন কারণ নেই।

বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে গোঁববদর দুগ পাল রাজবংশে
রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। বাংলা ভাষা বাঙালির রাষ্ট্রভাষা
কোন কালেই হয় নি। পাল রাজবংশের আমলে আর
হোদেন নাহের সময়ে বাংলা ভাষা কতকটা উৎসাহ পেয়ে-
ছিল, এই মাত্র। যোগল বঙ্গে যে বাংলা দ্বারা গঠিত
হয়েছিল, তাও শুধু সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা নিয়ে নয়,
তাতে বাংলাভাষী এলাকার সঙ্গে অত্র অনেকভাষী অঞ্চল
সংযুক্ত ছিল। পাল রাজারা সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলাভাষী এলাকার সঙ্গে তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবভাষী অকল একত্র শাসন করতেন। সেন রাজস্বের সম্বন্ধেও ঐ-কথা প্রযোজ্য। তুর্কি আমলে, খারীন মূলতানবের আমলে, মোগল যুগে বা তার শেষ বিকে খারীন নবাবের আমলে কোন সময়ে এমন অবস্থা আসেনি যখন শুধু মধ্য বাংলা-ভাষী এলাকাটা নিয়ে একটি অঞ্চল বর রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিধিতির আত্মকুলো বাংলাটা এই রকম একটি রাষ্ট্র গড়বার সুযোগ পেয়েছে। পাল বা সেন রাজারা সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা কোন সময়ে একত্র শাসন করার সুযোগ পেয়েছিল কিনা সন্দেহ, যদিও তাঁরা আরো অনেক ভিন্নভাবে এলাকা তাঁদের সাম্রাজ্যে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। মোগল অধিকার হস্তান্তরিত হলে মর্বপ্রথম বাংলা সুবাহর তেবের সম্ভবত সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা একত্র হত, যদিও তাছাড়াও প্রায় সমগ্র আশাঘক তখন বাংলাভাষী এলাকা ব'লে ধরলে এমন কি মোগল রাজস্বেরও সব বাংলাভাষী একত্র হবার সুযোগ পায় নি। কিন্তু তখনও কেবল বাংলাভাষী কোন সুবা বা প্রবেশ বা অকথ্যায় গঠিত হয় নি, খারীন বাংলায় যত দেখা তো সুবাহর কথা। মাত্র ইংরেজ রাজত্বে সমস্ত বাংলাটা এক পার্বত্যের শাসনাধীনে একত্র হবার সুযোগ পেয়েছিল, তার আগে বা পরে আর কখনও নয়। ইংরেজ গঠিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতেও বাঙালীকে ভিন্ন-ভাষী এলাকার সঙ্গে থাকতে হতো, শুধু বাঙালীকে নিয়ে একটি প্রদেশ ইংরেজরাও কখনও গঠন করে নি। মোট কথা, সুইডেন বা পোন্ডু যালের বতো একটি একভাষী সংহত অঞ্চল রাষ্ট্র বা প্রদেশরূপে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কখনও কোন রাজত্বে এখানে সম্ভব হয় নি।

বাঙালির উত্তর ঘবেই ঘরে থাক, অগ্রোশন শতাব্দীর আগে রাষ্ট্রের প্রদে বর্ধে ভূমিকা গুরুতর কিছু ছিল না। কিন্তু অগ্রোশন শতাব্দী থেকে মুসলিম শক্তির হিসেব নিকল ক'রে বাঙালির রাষ্ট্র বা জাতীয় পরিবর্তন ও অগ্রগতির বিচার করতে হবে। এ-কাল করতে যিনি পারবেন না, তিনি বর্তমানে বাংলাদেশে বাঙালির মুগলস্টে তার পথ-নির্দেশ করতে পারবেন না। বাঙালির মুগলস্রা সম্ভাব্যের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে, চিত্তবর্তন, অবস্থি, বিনয়, মোহিতপাল, হস্তাভ্যন্ত প্রভৃতি নেতা ও সন্যাসীরা

প্রাথমিক চিত্তবর্তন অস্থায়ী করেছেন। চিত্তবর্তন সমস্তার বস্ত্র বুলেও সমাধান নির্ভর ভুল করেছিলেন; আর অবস্থি পথে শ্রীমদ্বিধ হয়ে ভুল সাপোদন করলেও প্রথমে বাঙালির জাতীয় আত্মালানের অকলমোদন ক'রে বাঙালির গুরুতর অনিষ্টে কারণ হয়েছিলেন। ব'ঙালি বনাম মুসলিম শক্তি—এই চটপট জাতীয় প্রদে বর্তনরূপে, বিনয়সুবার ও হস্তাভ্যন্তের সমাধান উৎকর্ষ হলেও মনে হয়, সমস্তাতির মর্বোত্তর উপলব্ধি বিবৃত হয়েছিল কথাসাহিত্যিক মধ্যমরূপে অগ্রগম বদনায়।

অতীত যুগের বিবরণ এই যে, মন চার-পাঁচ বাঙালি সন্যাসী ও নেতা ছাড়া প্রায় সমস্ত বাঙালি রাজনৈতিক এ-ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি বা বুঝতে চান নি যে, বর্ত দিন মস্ত্রাধিনিবিশেষে বাঙালি নিজেকে আগে ব'ঙালি পরে হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয় বা পাকিস্তানি ভাবেতে না নিখছে, তত দিন বাঙালির তথাকথিত অবশি আবেদন একটা সাম্রাজ্যিক আত্মবাত্তি উচ্চাঙ্গের ব্যাপারমাত্র হয়ে থাকছে। বাঙালি যদি নিজেকে আগে ভারতীয় বা পাকিস্তানি পরে বাঙালি, কিংবা আগে হিন্দু বা মুসলমান পরে বাঙালি, কিংবা আগে বাঙালি মুসলমান বা বাঙালি হিন্দু পরে বাঙালি ভাবেতে থাকে—বা এখনও পর্যন্ত প্রায় সব বাঙালির চিন্তার বিষয়—তা হলে বাঙালি কখনও জার্মান, জাপানি, কহানি বা ইতালীয় মাপের তো দূরের কথা, নেপালি, পার্স বা ক'বোম মাপের বাট্টও গড়তে পারবে না।

শ্রীমদ্বিধ, ব্রহ্মাভ্যন্ত, পানবেঙ্গলমণ, সূর্য সেন প্রভৃতি সম্ভাব্যী বিপ্লবীদের বীরত্বের সুখ্যাতি ক'রেও বরতে হবে যে, তাঁরা খারীনতা-সংগ্রামের সময়ে নিজেকে মর্বোত্তর বাঙালি ব'লে ভাবেতে দেখেন নি। পরে শ্রীমদ্বিধ ও মানবেঙ্গলমণের জীবন-বর্ধন একেবারে বসলে গেলেও ১৯০৫ সালের আন্দোলনের যুগে বিপ্লবীরা প্রায় সবাই ছিলেন আত্মবস্ত্রের উপাসক। ভারতমাতা কি জগ, জা বা কানী ইত্যাদি ধ্রুনিতে খারীনভাতির হয়ে উঠলেও বাঙালি মুসলমানদের তিন্ত কেন লাড়া দেবে, সে-প্রদে উত্তর তাঁরা ভিত্তাও করেন নি। এ-মধ্য রবীন্দ্রনাথের মতব্য প্রাধান্যযোগ্য :—

“ভাষা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার করে

হাত পেতে ব'লে বয়েছে। মূলদান-শাসনে বর্ণি বল, শিখ বল, নিভের হাতে অস্ত্র নিয়ে চল চেয়েছিল, বাঙালি তার ধর্মোদ্ভূতি হাতে অস্ত্র নিয়ে মর পড়ে চল তখন। কতই ছিল। কিন্তু বেশ ধর্মী নয়। তাই বলের মধ্যে কেবল ছাপ-মহিষের মুগপাত হল।" (ধর্ম-বাইবে, ১৭৮-১৭ পৃষ্ঠা।)

অস্ত্র হস্তের ছাতিরে আঘাতের বীকার করতেই হবে যে, তব নী, দুর্গা ও গগনাত্মী মাতাধর্ম উপাসকদের হাতে কিছু কিছু সাহেব মেয়েও মুগপাত হয়েছিল। কিন্তু অশ্লিষি আশ্রয়ালয়ের ধর্মী প্রতিক্রিয়ায় মূলদান ওষধিতা যেখানে উঠতে ঘেরি হল না। বাঙালি হিন্দু নেতাদের মতোই তখনকার বাঙালি মূলদান নেতারাও নিভের ধর্মের কথা আগে, তাবা ও ছাতির কথা পরে না ভাবলে ভাগ-বাটোয়ারার মামলা সহজে জমে উঠত না। কলে এক দিকে পাওয়া গেল মূলদান দানের প্রামাণ্যকৃত ধর্মের বেশী কিছু। অস্ত্রবিক্রে আরবে মক্কুরি মতী-ডিকার হয়ে মূলদান গায়কের বর্ষ পোনা গেল। বাঙালির ঘরোয়া গঙ্গা-পদ্ম-মেঘনার পাশাপাশি শাস্তি আরবে মলমল। কেবল ধর্মের দানকেই বলে পাওয়া সম্ভবপর।

ধর্মের মতল ছুঁতে কেলে দিয়ে ধর্মের চেয়ে বেশ, ছাতি ও তাবকে বড় বান। মক্কুরি প্রপাত। বাঙালি হিন্দু মূলদান মাতৃমৈত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে ধর্মিকাল দেখা যায় নি। এখনও বাঙালি হিন্দুর ধর্মবানী পুত্র ছাতির তিনবাটা পতাকার মতো যে-ভাবে কোলাহল বা টাঙানো হয়, তা কেন মক্কুরি থেকে নিষিদ্ধ করা হয় না, ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়। ছাতির পতাকা কোন বিশেষ ধর্মের অস্ত্রটানে ব্যবহৃত হলে ছাতির পতাকা তার ধর্মনিরপেক্ষ ছাতির মহিমা থেকে বিভ্রান্ত হয় ব'লে মনে করা সম্ভব।

এর মধ্যস্থতির পর বাংলায় বাঙালি হিন্দুর মধ্যে ধর্মোদ্ভাবনার ভাবটা ক্রমশ কমে গেলো মূলদানদের মধ্যে তখনও ধর্মোদ্ভাবনার চেয়ে ছাতির বোধের প্রাবল্য দেখা যায় নি। চিত্তবজ্র ব্যাপারটা মূলদান ভাগ-বাটোয়ারার মূলদানকে কিছু বেশি দিয়ে আশোষিত করে। এ-প্রকারের বর্ষ পরিণাম এখন মক্কুরি ঘানা। কিন্তু তখন মতান্তরিত ভারতে হিন্দু ছাতির চেতনার

প্রাবল্যের মূলে চিত্তবজ্রের ঐ প্রকারে কোন কোন নেতা এক কুটনৈতিক দাক্ষ্যের ইচ্ছিত খুঁজে পেলেন। এ-কৌশল আরও বেশি প্রয়োগ ক'রে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত হয়েছে। বাংলায় বাঙালি রাজনীতিবিদদের এ-প্রকারের বর্ষতা উপলব্ধি ক'রে শেষ পর্যন্ত দুটি মতের সত্যের উদ্ভাবের গোড়াপত্তন করলেন : বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মূলদান। অর্থাৎ ভারত-বিভাগের মাঝে এ-সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আর তখনও হিন্দু-মূলদান মিলিতভাবে একটিনাতি ছাতি গঠন করতে পারবে না; আগে যে তারা তা চেয়েছিল, তা নয়; কিন্তু তখন দে-আশা ছিল। বৃষ্টি ভারত-বিভাগের পরে দে-আশা চিত্তের লুপ্ত হয়েছে। এ-মত বাঙালিকে দোষ দেওয়া এই মতের ঠিক হবে না যে, ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মূলদান ছাতি গঠনের পরিকল্পনা বাঙালির মধ্য প্রথম আসে নি। মহারাষ্ট্র থেকে এক হিন্দু ছাতির মত বন্ধন লাভ। তাৎপ-বর্ষকে বাধ্য পরিকল্পনা ধর্মিকাল থেকে—অস্ত্র সপ্তম পতাকী থেকে—প্রতিষ্ঠা ছিল। তার প্রত্যুত্তরে অস্ত্র ধর্ম-মতের মূলদান মূলদানের পক্ষ থেকে লাভ। ভারতের মূলদানদের মধ্যে একটি মূলদান বাগুড়ি বা বাট্ট গঠনের পরিকল্পনাও প্রচলিত হয়। এটিও পশ্চিম ভারত থেকে আবার মূলদানের উদ্ভব হতে। ভারত-বিভাগের পরিকল্পনার মধ্যে বাঙালি হিন্দু-মূলদানদের খুব বেশি ছাতি কথা যায় না। কিন্তু ভারত-বিভাগ যখন কার্যকর হল, তখন আর সংবাদপত্রভারী এক ছাতি হবার উপায় হইল না। দুটি নতুন ছাতির গোড়াপত্তন হল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে : বাঙালি হিন্দু ছাতি আর বাট্ট হল পশ্চিমবঙ্গ, আর বাঙালি-মূলদান ছাতি আর বাট্ট হল পূর্ব বঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান বা মধ্য বাঙালিখান।

অঞ্চল বাহীন বাংলা বাট্ট গঠনের মত প্রথম দেখেন বন্ধিত। তার মত ও মাদনার মত কিছুই না বুঝতে না পেরে একদিকে হিন্দু মাতৃমৈত্রিক নেতারা তখনই মত, শুণ্ডবিদ্যেই মতপ্রসূতি স্থাপন ক'রে হিন্দুধর্মগামুত বৈষম্যিক সাধনার বনোবিশেষ করলেন, অস্ত্রবিক্রে প্রচার হতে লাগল যে বন্ধিত মত সাস্থ্যবাহিক হিন্দু এবং "বন্ধি মত" দুর্গামত পুণ্ড্রপুণ্ড্রার মত ছাতি আর কিছু নয়। মত ছাতি অস্ত্র প্রতিমা যে উপাত্ত নয়, বন্ধিতদের

বিষয়কর বৈশ্বিক প্রগতিশীল যত্নবোধ এই অশব্দাণ্য।
কথা হল যে, বহিঃস্থ হুগা, লম্বী, সহযতী বন্দনার
বচনা করেছেন! এই ব্যাখ্যা দেওয়া আধুনিক বাঙালি
হিন্দু কাছের একটা মহা উদারতা ও প্রগতির পরিচয়।
বহিঃস্থকে “শাস্ত্রবাহিক” বন্দনা দিতে পারলে এই
শ্রেণীর সাধারণ বাঙালি পাঠক একটা চিন্তাপ্রবর্তন
পৌরব অস্বত্ব করে। “পড়িলে তেড়ার শূন্য ভাঙে
হীতার খার।”

বিবেকানন্দ অনলম্বত এক কথার পুনর্নির্দেশ দিয়েছিলেন :
আগামী পঞ্চাশ বছর দেশই ভোমবেহ একমাত্র উপায়
দেবতা হোক। বিনয়বোধের বিনয়বোধে লক্ষ্য ও আদর্শ
মহাবোধে চোখাড়ে ভাষার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।
কিন্তু যা হবার নয়, তা হল না। দেশ, জাতি ও ভাষার
মতো ভৌগোলিক ঠাট্টাবিজ্ঞানের বিষয়কে আধ্যাত্মিকতা ও
ধর্মগতনা দিলে এমন অপরূপ রাজনৈতিক বিচুড়িতাঙ্গ
পরিবেশিত হল যে, বাঙালি তার শ্রেষ্ঠ মনোবোধের কথা
কান না দিয়ে আত্মোক্তি বিন্যাসিত বিন্যাসিত ইচ্ছা
পরিচালিত হতে লাগল। এর পরিণামে বাঙালি জন-
শোণী অর্থাৎ বাংলাভাষীরা দুটি জাতিতে পরিণত হল।
একটা কথা মনে রাখতে হবে : ভ্রমোৎপন্ন শত্রু বৈশ্ব
পূর্ববর্তী কোন দম্বে বাঙালীরা এক জাতি ছিল না। কিন্তু
অজ্ঞত এই আশা ছিল যে, একদিন বিবেক কুলে সব
বাংলাভাষী এক জাতি হয়ে উঠবে। সেই আশার অতি
জ্ঞানক বাধা এনে দিয়েছে ১৯৭১ সালের ১৫ আগষ্ট।
যে-জনশোণী প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিল, সে-জনশোণী
হুগা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে অজ্ঞত করতে
লাগল যে, তারা দুটি জাতিতে পরিণত।

১৯৭১ সালে বহিঃস্থ খাটী বাংলায় বসন্ত রক্ত
করলেন :—

“গোখার কমলাকান্তপ্রতি বসন্তু। দূরপ্রান্তে
বেশিয়ার—চিনিলাও, এই আদ্যর জননী ভয়ভূমি। এই
কুমারী—দুঃখিকান্তপীলী—অনন্তরত ভূমিতা—একবে কাল-
গর্ভে নিহিত। এ-মুতি এখন বেশি ন।—আজি বেশি
ন, কাল বেশি ন।—কালযোতে পার না হইলে বেশি
ন—কিন্তু এক দিন বেশি। আদি সেই কালযোতো-
বেশিলাও, এই হৃৎকণ্ঠী বসন্তু। এসো বা,

গৃহ এবে। গাহার ছব কোটি মনান—গাহার ভাবনা
কি? উঠ মা হিংস্র বসন্তু! এবার হুগান হইব।
এসো তাই লকল! আমরা এই অজ্ঞতার কালযোতে
ক’ল মিই। এসো, আমরা বাধন কোটি দুই ঐ প্রতিমা
কুমিরা ছব কোটি মাধব বহিয়া ঘরে আনি। অত
পূর্ববৃত্তকার ঢাকী ঢাক কাড়ে করিয়া বসন্ত বাননা
বানাইয়া আকান ফাটাইবে, কত বেশি নিবেশিত ভ্রমোৎপন্ন
আমিরা মাঠের চরণে প্রণামি দিবে।”

মাঠের দৃশ্যসংখ্যা এখন ছব কোটির পরিণতে
বাতো কোটিতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রায় এক লক্ষ বর্গ-
মাইল জংগল মাঠে কোটি লোকের এক রাষ্ট্র যে
স্বাধীনতার হতে পারে, সে-কথা ভাবতে হুগার জন ছাড়া
আর সব বাঙালি এখনও ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এ-ভয়
বেশি দূর থাকবে না। বর্তমানে বলেছিলেন : “এসো,
অজ্ঞতার জয় কি? না হুগ ভূমি। হাটুহীনের জীবনে
কাজ কি?”

যেহিহালাবে যতো বহিঃস্থক ভীকৃদী সমালোচক
দীকার করেছেন, যে, বাঙালির ভ্রমোৎপন্ন রাজনৈতিক
জীবনে বহিঃস্থ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে গেল। তাঁর সম্পর্ক
শাস্ত্রবাহিকতার খিলা নিম্ন লক্ষ্য ক’বে বিনয়বোধের
অর্থবাহীন ভাষার পথের খিলা হলেন এই তাই :—

“অত্রান্ত হিন্দু আর অগ্নি মূলদান এবং হিন্দু মূল-
দানের বহিঃস্থ ঐক্যবোধের দানও বহু-নিজের ভেতর
বেশতে পাই। গোটা কয়েক লাখ বাঙালী বাঙালি
হিন্দু মালা যেনটাকে বর্তমান ভগবতের উপযোগী ক’বে
জুলবার জর উঠে-পড়ে গেলছে। এই ভগবতের বহিঃস্থ
স্বাধীনতার লোকের নাহ বাঙালি আশ। আমার পরিভাষায়
আশ—বর্তমাননিষ্ঠ হিন্দু বাঙালি। লোকটার আগে
বাঙালি হওয়া চাই। তার পর হিন্দু হওয়া চাই। তার
পর বর্তমাননিষ্ঠ হওয়া চাই। তা হলেই সে হয়ে গেল আশ।
আশা সত্যতী হিন্দুর পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বছর আগে
আগে গেলছে। কামাল পাশ ভুক্তিতে কি ক’বে গেলেন
জানিল? নিউটন-বিশ্বকর্ষক জীবন ইলদারহীন হয়ে
পড়েছে। তা ব’লে ব্যক্তি গন্ত জীবনের খোঁজ খোঁজ
খটুখু খর্বের হবার ভয় ভয় হুগা ইলদার আশও
ভুক্তিতে বজা আছে।

পাতায় যতো নিম্নতম নহ। পূর্ব বঙ্গের গ্রামবাসী হিন্দুদের মধ্যে রুকমারি প্রতীমাপূজার প্রবলতা লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে কলিকাতাবাসী হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে হাইক-ক্রীতি বীথ ক্রীটকে চেঁকন বান ক'রে তোলায় পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য কমিউনিস্টদের কল্যাণে হিন্দুগণ জ্ঞাত যেটাপুটি ধর্ম-বিধানমুক্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু মূলমতানবের মধ্যে ঘর্ষা-মারি এখনও বেশ কিছু দিন থাকতে পারে। কালী বা কৃষ্ণকে কটুক্তি করলে শিক্তি হিন্দু পাথে যাবে না। কিন্তু একটি বিশদ মন্তব্য করলে মূলমত অন্তত ভেঙে ওঠে। হুতরাং অকাবণ ধর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত না হয়ে ধর্মবিধানের সুপ্রভাব মূল্য না হওয়া পর্যন্ত হলাণ্ড, হেলজি-ম ও লুকসেনবুর্গের দৃষ্টান্ত গ্রহণ ক'রে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরা-কাছাড়ের আত্মা বক্ষা ক'রে চলা সকল সম্ভাব্যের মঙ্গলের কারণ হবে।

প্রসঙ্গত ব'লে রাখা ভালো যে, ত্রিপুরায় পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তিতে যিনি সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিলেন, তিনি কোন বাঙালি মূলমতান নন—তিনি একজন বাঙালি হিন্দু। আর যে একরা বাংলা-সরকারি-ভাষা-শাসক-রাষ্ট্রা ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত এলাকাত্তরে হিন্দি সরকারি ভাষা গ্রহণে বাধা হয়েছে তার ক্ষত্র তাঁর পশ্চিমবঙ্গ বিরোধিতা দ্বারা। বঙ্গ-বিভাগের সময়ে পশ্চিম বঙ্গের ভাগে যাতে কম এলাকা পড়ে, তার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন আর এক বাঙালি হিন্দু যিনি স্বাধীননির্ধারণ সমিতির সমস্ত হাইকোর্টের বিচারকদের কাছে কংগ্রেসের বক্তব্য উপস্থাপিত ক'রে মওজাল করার সময়ে সদর্পে বলেছিলেন—বিজিন্ন স্বতন্ত্ররতন পশ্চিমবঙ্গ অনির্ভর্য হতে না গেলে যাতে ঈশ্বরই পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হয়, তার জন্যে কংগ্রেসের প্রতিনিবিরণে বেশি এলাকা তিনি দাবী করেছেন না। বিচারপতিরা ঐ দুর্ভাগ্যবস্ত্র জ্ঞাতভাবে অজবোবনে দুঃপ্রকাশ করেছিলেন। সিবিলা চ্যান্সেলর ঐ দুর্ভাগ্যবস্ত্র হযোগ পূর্বমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন। তা দ্বারাও বিজিন্ন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশ বা অঙ্গমাত্রাঙ্গণে নিজের অস্তিত্ব বক্ষার বাস্তবে পেরেছে। পূর্বাসল প্রবেশ প্রতিষ্ঠা হলে তারও অনির্ভর্য হওয়া সম্ভবপর। কংগ্রেসের ভারতপ্রবেশিক দ্ব্যতিদগ্ধিধারণ রাজনীতিকদের অপপ্রয়াস

বার্ষ ক'রে বাংলাভাষী সমস্ত এলাকার একীকরণের চক্র কোন্‌ শব্দ গ্রহণীর সেটা বিচার্য। পূর্ববঙ্গ শাক্তিক্রম থেকে বিজিন্ন হলে ভারতের অধীন বাংলাভাষী এলাকার কর্তব্য-নির্ধারণ সহজসাধ্য হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধেয়ী বাঙালি হিন্দুরা কোন মানসিকতার বশবর্তী হয়ে ভারতের অধীন এলাকার বঙ্গভাষী এলাকাকে বৃহত্তর ও অক্ষত হতে বাধা দিয়েছিলেন, সেটাও নিজেদের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দু নিবিশেষে সব বাঙালির উপলব্ধি করা কর্তব্য। বাংলা-দেশের একীকরণের পথে হিন্দুমূলমতানসমস্তা প্রদণ বিষয় বটে; কিন্তু অসুস্থ অর একটি বিষয় ন্যূনতম অর্থনৈতিক কারণে সত্তে "বটিকাগাল" সমস্তা, যাও ভজ্ঞে পূর্ববঙ্গের অতি প্রাদেশিক বাঙালি হিন্দু নেতারা বেশ একটি দ্বারা। পরে এই সমস্তার বহুদণ নিয়ে আগে কাপোচনা করা যাবে।

ভাষা ও জাতির সমস্ত উদ্ভাটন করা যার জন্যে গোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় পরিপত্তি সম্বন্ধে বৃক্ষিমস্ত নিদান্ত নেওয়া সহজ। হুতরাং প্রথমে ব্যাপকভাবে বঙ্গভাষাপরিক্রমা প্রয়োজন। তা করলে হিন্দু-বৌদ্ধ উভা হিন্দু-মূলমতান ধর্মবিরোধ, পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক মতবৈধতা বা "বটিকাগাল" বিরোধ, বঙ্গাল-দেশা আন্দোলন বা "অব-ভাঙ্গি ভারতীয়ের বাঙালি বিধেয়ের বিচার রূপ প্রকৃতি বিতর্ক-সমূহ বিবরণটির পর্যালোচনা সহজসাধ্য হয়ে আসবে।

ঐতিহাসিক, নব্যঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ব-বিদগণের মতে, বাংলা দেশে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন বিন্দুপ-সংগোষ্ঠীর আদমন, বদলন ও মৌলিক-মিশ্রণ দাবিত। বাঙালি জাতির উদ্ভব ও প্রাথম উপলব্ধির জন্যে এইসব মতের সাধারণসমূহ আবারের প্রয়োজন। বাঙালি নিঃসন্দেহে একটি ভারতীয় এবং ভারতীয়-আর্ষ-ভাষী জাতি; সেই সঙ্গে অস্ত্রাত ভারতীয়দের থেকে সে নিশ্চিতভাবে পৃথক একটি জাতিও বটে। এই মতাত্ত্বীকার না ক'রে অগ্রদণ হলে যে কোন বঙ্গের রাজনীতিবিদের পরিণামে অহুতাপ করতে হবে। এই জাতির উপলব্ধি-রাস্তা বা জানা যায়, তা অতি লক্ষ্যে আলোচ্য।

(ক্রমশঃ)

বন্দরের বন্ধন

অরুণকুমার দত্ত

সক ইংলিশ চ্যানেলটা পেতেই নব্বয় লাগলো মাম পকাশ মিনিট। কডটাই বা বাস্তব। ক্যালেন থেকে ডোভার। ক্রাস আর ইংল্যান্ডের মুখোমুখি দুটো বন্দব। মাকখানের ইংলিশ চ্যানেল দুটো থেকে আগাধা করে বেঁচেছে।

ডোভারে নেমে পাশপোষ্ট ঢেঁকি হল। তারপর ট্রেনে করে লণ্ডন। আরও মিনিট চল্লিশের বাস্তব।

শব্দ ছিন্নর মনে অনেক দিন থেকেই উত্থাপা ছিল উচ্চশব্দ্যর মতে ছিলেত বাবাব। এম, বি, বি, এম, পাশ করার বেড় বছরের মধ্যে গাউন কমিশিয়ানসিপ শেষ করে সে হাই বিলেভের পথে পা বাড়িয়েছে, তার বয়স মাত্র পচিশ বছর।

ভিক্টোরিয়া ট্রেনে এসে ট্রেনটা থেকে পেল। টার্মিনাল লণ্ডন শহর।

আগেকার বাবাবের মত শব্দর ইতিহাস টুডেন হোটেলে বাবার উত্তাপ করল।

ভিক্টোরিয়া ট্রেনে তখন অগনিত তারতীরের ভীড়। বেশ থেকে ভাগে পরিচিত আতীর বন্ধুবান্ধব এগেছে। তারে স্বাগত্বনা করে নিয়ে বাবার মতে ছোট লনটা।

শব্দর পরিচিত কেউই ছিলনা। কামেই সে তারতীরের ভিক্টো ক্যাটের মতন ট্রেনের বাইরে পা বাড়াল তখন চারিধিকের চোখ বাঁধানো গানবান আর হুন্ডল নয়নারী। কিত বেধে তার মনে হল অকূল মন্থর।

ম্যাট্রিক পাশ করে বদন সে বামোদনের মকঃমলে একটা ছোট গ্রাম থেকে কলকাতার প্রথম শব্দে এসেছিল তখনও তার একম একটা অহুত্ব এসেছিল।

ক্যান আই হেলপ ইউ সিক।

চরক উঠে পেছনে তাকাতাই শব্দর বেধে একজন ট্যান্ডি জাইতার পড়ীর ভেতর থেকে দুখ বার করে তাকে

প্রশ্ন করছে।

ট্যান্ডি জাইতার যে একম মিলি করে কথা বলতে পারে শব্দর আগে তা জানা ছিল না।

ট্যান্ডিতে উঠে আরেক বিপত্তি। শব্দর বলল ইতিহাস টুডেন পোষ্টেল উননকই নং গিল্ডফোর্ড ট্রাটে বাবে। কিন্তু লণ্ডন কত ?—আর শব্দর বক্তর পারে না।

শেষকালে ইতিহাস হাউসের লেখা টিটিটা দেখতে ড্রাইভার বলে উঠল—ওই বাবুল জোয়ারে, আচ্ছা একুনি নিরে বাচ্ছি।

শব্দর অবাক হয়ে দেখতে লাগল কেমন ভাবে ড্রাইভার যেতার ট্যান্ডির মতন লকে বলতে বলতে তাকে ইতিহাস টুডেন হোটেলে নিয়ে এল।

গিল্ডফোর্ড ট্রাটের ইতিহাস টুডেন হোটেলে এসে শব্দর একটা বড় বকরের মাক খেল। চারিধিক অপরিস্রব। ঘরের খেতে কার্পট শতহির। টরলেটের অবস্থা শোচনীয়। যে বিলেভের ছবি তার মনে গাঁথা রয়েছে, তার লকে এ মনে বাশ খায় না।

তখন দেবরের শেষ। ঘড়িতে লাগে ছটা বাজেলেও বাস্তব বেশ ভালো আছে। শব্দর ভাবলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসে।

এক ঘটা ঘরে একলা একলা রাভার এলোবলো খুলো দে। ছটার সময় সব বোকান বন্ধ হয়ে গেছে। লোকেরের ভেতর মনিহারী কিনিব সামান্যে। তার চারপাশে আলো। বার বার গুলিকে আকর্ষণ করে।

শব্দর ভিনিষের পায়ে বাস লেখা আছে। কোন বর মতব নেই। কেউ ঠকাতে চায় না। ঠকতেও চায় না।

খুতে খুতে শব্দর একমম আবিভার করল সে মাকার হারিতোপেগেছে। কি করে!

অব্রের একজন পুলিশ কনষ্টেবল বেধে শব্দর

জিহ্মে কখন গিলকোর্ড ট্রাট্টা কোনদিকে পড়বে বলতে পারেন ? আমি রাজ্য গায়ে কেনেছি।

ছ'ফি লম্বা পুঁশি কনট্রোল মুখি হেলে বললে—
আগনি গিলকোর্ড ট্রাট্টার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন।

তার মানে ?

—মানে খুব পড়িবার। এই রাজ্যটার নাম গিলকোর্ড ট্রাট্টা।

পরে শব্দ ব্রুছিল সে যুগে যুগে গিলকোর্ড ট্রাট্টার আর একপ্রান্তে দেখি পৌছেছিল। তাই এ প্রান্তের ইতিহাস ইন্ডেন্ট হোটেলে সে দেখিন হবিস করতে পাবেনি।

গিলকোর্ড ট্রাট্টা ধরে হাটতে হাটতে সে হাসেন সোয়ারি টিউব টেনেব নামে এসে পৌছল।

তখন শব্দ অজ্ঞত কখন তার খুব কাছে পেয়েছে। সেই কিস্টেই রাজ্য টেনে ছাড়ার পর থেকে সে আর কিছু খামনি।

মামে ভাষনবল রেযোঁর সাইনবোর্ড দেখতে গেলে সে তার ভিতর ঢুকল।

সব কঠিনোয়ের বস একটা লম্বা ঘর। দুপাশে টেবিল। টেবিলের দুবিকে চোরা। স্বাক্ষর দিয়ে রাজ্যের কথা একফালি রাজ্য।

একটা চোরা টেনে শব্দ টেবিলের একপাশে বসল।

ঘরটার একদিকে ঢোকার দরজা। আর একদিকে ওজারকোট রাখার জুকার। তার আর এক পাশে সেলস কাউটার। কাউটারে বসে টাক-মাথা এক ভুল্ললোক মিলেটটানে বাংলায় বললেন,—ইউহু, বেশ খয়ের এলছে।

কাউটারের পা বেয়ে লক একটা রাজ্য চলে গেছে কিসেনের দিকে। কিসেনের ভেতরটা আর চোখে পড়ে না : দেখিক দিয়ে হুচুচে কাল ইউহুকে যেখানে এসে কতককে সাদা হাত গের করে ইংরেজীতে বলল—ইয়েল তার। হোয়াট ওয়ার্ড তার ? বলে মেছুটা এগিয়ে দিল।

শব্দ দেখল মেছুটা ইতিহাস খাত ডালিকার ভর্তি।
স বুটে পুরোটা আর বোগান ছুপের স্বর্জার দিল।
গাগান ছুপের সঙ্গে সে কলকাতার পাকারী হোটেলে

গুণের খেয়ে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। সে জানত ওটা মটর কাছিরই নামাধর। গো মাংস অন্ততঃ নয়।

কীটা চাষ ছিয়ে পুরোটা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে শব্দ লবে মুখে ঘিয়েছে, এমন সময় পোশাকি শ্রম-বর্গে, নাতিবর্গ চোরাবার এক ভুল্ললোক এসে টিক তার সামনে চোরায়ে ধূপ করে বসে পড়লেন।

হারপর একগাল হেলে বললেন—কি দাড়, নতুন আইচেন নাকি ?

শব্দ ললচ্ছ হেলে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু নতুন এসেছি কি করে ব্রুলেন।

—আরে ভ্রামের গাটের কাট ভাঙেই বোঝছি। ওকি আর জানান দিতে হয় নাকি ?—তা, কোই ওইচেন ? নম্বা দেখেব বাড়ীতে ? না বেনারসীর বাড়ীতে।

একটু ইতস্ততঃ করে শব্দ বলে, আজ্ঞে না আমি ইতিহাস ইন্ডেন্ট হোটেলে উঠেছি।

—আরে বামচন্দ্র ! ওখানে উঠেছেন ! ত : নম্বা দেখেব, বেনারসীর বাড়ীতেও তাই। লগেন এসে ছেলেটা প্রথমে ওসব মাথপাতেই ওঠে। হাত দিয়ে এক এক টাকার মত এক এক পাউণ্ডের নোটগুলো খরচ করে। তারপর সব আবে আবে ঢালাক হয়।

মনে মনে নিজের পকেট লুণ্ড হবার সম্ভাবনা একটু শঙ্কিত হল শব্দ।

মুখে বলল, আজ্ঞে না—বিন কয়েতের ভেত্রে লগেন থাকব। তারপরে এডিনবার্গ চলে যাব।

হে, হে, করে হাসতে হাসতে ভুল্ললোক বললেন—
শিখতে হবে, শিখতে হবে। নোতন বিলাইতে আইচেন। আপনার কীটা-চাষে খববার ক্যাডরা ভাঙেই ধবুছি।
ঠেকে শিখতে হবে আপনাকে। চোজর বাইতে বাইতে ভাঙবেন। তখন বোঝবেন বিলাইত কি কিনিয়।

আমার নাম গণেশ গায়ের। অনেকদিন আগে আমি লগেনে আইছিলাম। আর বাশে কিচি নাই। এখনেই দিয়ে কইয়া বেশ মুখে আছি। খালি এখন আপনাকে যেখি তখন মনে হয় বিলাইতি চালচলন এখন আপনাকে অনেক রপ করতে হইবে।—হে, ওলি তাহলে—বলে সে কিছু না পেয়েই চলে গেল।

লগ্নন থেকে অভিন্নবহা নাড়ে তিনশ মাইল। টেনে বেশ কয়েক ঘণ্টার জামি।

করিডোর ট্রেন। কামরার বাইরে ক'রোজার। টেনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। যাকখানে জাইনিং কোচ। সব গলী দেওয়া দাঁট। 'কাট' আর শেকড় জালের মধ্যে ভাড়ার তফাৎ ছাড়া আর কোনও তফাৎ নেই। কামরার ভেতর হীটার চালিয়ে দিলে ভেতরটা বেশ গরমই হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডার ঝট হয় না।

হাট পা ছড়িয়ে বলল শব্দ। যাত্রীর সংখ্যাও কম। কামরার আর দুজন ইংরেজ কল্লোও বসেছিলেন গোকড়া মুখে। ঠিক যেন আবেগের জলকরা মেঘ। দুজনের হাতেই খবরের কাগজ। শাং টেনে কোন কথা হল না। ততোও কিছু জিজ্ঞাস্য করলে না। শব্দও কিছু বলল না।

ইংক রেশনটা পেগেরে যেতেই থেতেথোর বর প্রজেক্ট কামরার এঙ্গে জানিয়ে দিতে লাগল, ভিনাথের টাইম হয়ে গেছে। কেউ যেতে রাজী আছে কিনা? সম্মতি জানাতে সে শব্দের হাতে এক টুকরো কাগজ স্তরে দিল।

সকলকে উঠতে দেখে শব্দও উঠল। জাইনিং হলে এসে দেখে চারপাশে সব দ্যাংব আর হেম সাহেব।

তখনও শব্দ বেহসামিথে অত্যন্ত হয়ে ওঠেনি। একটা অস্বস্তিকর কাউন্টটা তার সর্কাক ছড়িয়ে আছে। কোথার কি জুল হল। 'হ্যানান' আর 'কার্টিন'র গোলযোগ।

তাই সে কালোমুখ খুঁজতে লাগল। বেশী দেরী হলনা। বিরাট পাগড়ী মাথার এক শিখ তরলোকের শর্মন শিগ্মির পেল। তাইই সঙ্গে এক টেবিলে বসল শব্দ।

নাম হুর্শন সিং। ব্যাডী চক্কোড়ে। ব্রিটেনে বহুত কয়েক হল আছেন। গ্রামগোতে ফরেটারি পড়ছেন।

চাং কোর্সের থাকার। হুপটা শেষ করে যখন হাড়-হীন মগপাহীন সেছ বাটনের টুকরোটা কাবড় বসিয়েছে তখন হঠাৎ জলভেটা পেয়ে গেল শব্দের।

বরকে ভেঁকে বলল, এক গ্রাম জল দিতে।

জল চাওয়াতে সে ভীষণ হুতকিরে গেল। তারপর

শব্দকে আরও বাহড়ে দিয়ে বলল, জল কি করবেন?

কেন খার! ভেটা পেয়েছে যে। শুকনো গঙ্গার শব্দ বললো।

গহো! আজ্ঞা টাটান! আনছি। বলে সে চলে গেল।

হুর্শন সিং শুধু শুধু মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। যেন ব্যাপারটা সে বেশ উপভোগ করছে।

কি ব্যাপার। জল চাওয়াতে বরটা অত আশ্চর্য হয়ে গেল কেন? শব্দর রিজেকশন করে।

একই ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে হুর্শন সিং বললে খাবার সময় জল এটা বায়ই না প্রায়।

কি করে গঙ্গা ভেজার ওহালে? শুকনোতর গঙ্গার শব্দ বলল।

চারপাশে চেয়ে দেখুন।

এতকণে শব্দের নজরে আসে, চারপাশের টেবিলের ওপর পান পাড়গুলো লাল লাল তরল পানীয়তে ভরা।

—হ্যাঁ ঠিক তাই। হুর্শন সিং পুরোনো ভঙ্গীতেই বাড় নাড়ে।

—জলের বসলে এরা ঘষ খার। বেশীর ভাগই বিরাট ভাতীর পানীয়। আপনাব জল চাওয়াতে বরটা তাই ভড়কে গিয়েছিল।

বরটা এতকণে জল আনে। একচুমুকেই সে-গ্রাসটা শেষ করে শব্দ। গলাটা তখন আরও শুকিয়ে গেছে। কিছুটা ভেটার আর কিছুটা উত্তেজনার। তারপরই চার আর এক গ্রাস ভল।

এবারে বরটা জলভর্তি কাঁচের আন্টাই নিয়ে আসে। পুরো আগটাই শেষ করে শব্দ আপনপানের বিশ্বয় বিস্তারিত মুষ্টিগুলোকে উপেক্ষা করেই।

হুর্শন সিংয়ের পুরোনো ভঙ্গিতে হালাটা কিছু এত-টুকুও বলায় না।

দুই

এভিন্নবার ওয়েজারসি টেনে এসে ইনটা থামল তোংলোয়। চারদিক তখনও অন্ধকার।

কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলের শারদত অভিন্নবার এক ল্যাঙলেন্ডির বাগান পেরিয়েগেট হয়ে থাকার ক্যাম্বা-কবেছিল শব্দ।

এবার সে একটু চানাক হয়ে গেছে। তাই ট্যান্ডি ছাইভাষাক বলে ছিল পঞ্চাঙ্গিণি নখর পোলওয়ার্ড গার্ডেনে যেতে হবে।

গ্রিলেগন স্ট্রীট ঘরে ট্যান্ডি ছুটল পোলওয়ার্ড গার্ডেনের দিকে। চারদিক কুখ্যার অভ্যাস। পথবাট গছপাশা গ্রাণাঘের মতন বাড়ীগুলো নিম্নরেটে ছবিব রত মনে হচ্ছে। গ্রিক ঠাঁহর করা হয়েছনা।

স'হনের দিকে আল্ল বোঝিয়ে ট্যান্ডি হিভার বললে ঐ বেছুন—এডিমবরা ক্যানল।

ভাল করে বুঝতে পারলনা শংকর। গ্রিলেগন স্ট্রীটর সবডল ছবি থেকে একটা রাস্তা উপরে চড়াইয়ে উঠে গেছে। বোঝা যায় সেটা একটা ছোট পাহাড়। তার ওপর ক্যানল। বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিবিদ্যুত এডিমবরা ক্যানল।

পোলওয়ার্ড গার্ডেনে পৌঁছে দিয়ে ট্যান্ডি চলে গেল।

পাঁচতলা বাড়ী, হাটে ভাগ করা। দু'ঘর দু'শাপে নেমেই ও কলিবেল। কিন্তু অনেক খুঁজেও খাওসেডি মিল ভেতলিনের নাম বার করতে পারল না শংকর।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাগতে লাগল শংকর কি করা যায়। চাংপাশের কনকনে বঁওড়া যেতের জানুকের হত মুখে, পিঠে, পাঁখে আঘাত হানছে। কনগ্রাট্রি চিহ্নযাত্র নেই। সব ঘূষাচ্ছে। ভোরেব আসলে আপপাল দিয়ে ছুটে উঠছে।

ঝড়িতে দেখল লাউটা বেধে পনেরো মিনিট।

শংকর লগনে বতদিন ছিল ততদিন তার মনে হত যেন তারতবারেই এক কোণার রয়েছে। চারদিকে বৈশ্বীয় লোকের ভীড় ও ভাষা শুনে সে বিশেষে আছে বুঝতেই পারতনা। রাস্তা চন্দ্রবার লম্বা মনে হত যেন সে কল-কাতর পার্ক স্ট্রীট বা চৌরঙ্গী দিয়ে চলছে। দেইওকম কাল সাধা মুখের ভীড়। সোকানশাটের সরঞ্জাম, আলোর বাহার—একই রকম প্রায়। অবস্থা বিশেষে একই ভেবফর, এই বা তত্বাৎ। শিতও মনে হত কলকাতার না হলেও বাংলাদেশের মতঃবলেই চাড়াবাড়ি। কিন্তু এডিমবরার এসে হটগ্যাণ্ডের দুর্ভয় শীতে হি হি করে ঈপণ্ডে ঈপণ্ডে মনে হল—না এখাও সত্যিই এক অচেনা দেশে সে এল পৌঁছেছে। নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল

শংকরের।

এখন সময় লাকাত্তে লাকাত্তে সেখানে ভেব চোখ বন্ধুর বলসে এক কিশোরী এসে গতির হল। তার বললে একতড়া খবরের কাগর।

শংকর বুকল সে হকায়। কাগর বিলি করে।

মেয়েটাও অবাক হয়ে শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে হুগুচাত জানাল। তারপর একটু ইতস্তঃ করে বলল—আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি ?

শংকর বলল, এই বাড়ীতে মিল ভেতলিন থাকেন। কোন মেমব্রেট না থাকায় বুঝতে পারছি না। তার শংকরই আমার বন্ধক।

সম্প্রতি তাহে মেয়েটি বলে আমিও তাকে চিনি। তারপর শংকরের মুখের বিশরভার দেখে বলল, আজো ম্যাডান বলেই ছুটে বাড়ীর ভিতর ছুকে গেল।

একটুখায়ে মনে করে এক বুড়ীকে নিয়ে এসে বলল, এই হাঙ্কে মিসেল হিডিল। বোতলায় থাকেন। এক কই মুন আপনায় যা বককায়।

সব শুনে মিলেল হিডিল মল্লেন—আবে আহুন, মিল ভেতলিন একেবারে উপস্থানে থাকেন।

অঙ্কতায় দিডি ভেঙ্গে ভারী ভারী হুটকেসগুলো বহে তুলতে তুলতে শংকরের মনে হল ব'হুখের হাণ্ড তারতবারে কত সত্তা। এখানে রাস্তার বোড়ে বোড়ে কুলি পাওয়া যায়না যে চাব আনা মিলে মাল বইবে। বিনিমিত ভাবনের স্বায় হল শূন্য !

মিল ভেতলিন উত্তর গ্রিলগন এক প্রোজা। চারতলায় আর পাঁচতলায় ছাটা ছাটা ভাড়া নিয়ে তিনি পেয়েগেয়েই বাবলা করছেন। সর্ধলমখে গোটা পাঁচেক কম তাঁর বোকায়েত।

শংকরের স্থান হল একেবারে ওপরের ভল্লার ঘরে। ঘরে ঢুকে শংকর অবাক। হানী কার্পেট মেঝের বিছানো। কোণে এক বড় আলমারি। মাঝখানে একটা দামিগাটা জানিয়া। তার পাশে ভল্লার বেদিন। ঘরের মাঝখানে পালকের ওপর মুদ্রিত বিছানা। খালি বাবলা। লগনের ইংগুনান ট্রেডটন হটল মেঝে তার মনে হচ্ছিল এবেশের সব চাংপাই বুকি এরকম।

হঠাৎ খাটের দিক ওপরকার ছাংবের দিকে শংকরের দৃষ্টি

আটকে গেল—আরে একি। একটা হাইলাইট জানালা, মিলিয়ে। জানালায় আটকে একটা হাড়ি রাখা রয়েছে। সেটা ধরে টানতেই জানালাটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একতাল স্তম্ভকমানে ঠাণ্ডা হাওয়া তাড় দেতর দিয়ে ধরে চুকে গেল। পক্ষ তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিল।

মিল ডেকলিনের ভিগলে ৯ গেটের সংখ্যা পক্ষকে নিয়ে হল মোট ত্তন। হাঁক থাকবার বাবু লাভবনে।

প্রাতঃপাল টেবলে অপর গেট ডাঃ স্কেন্ডারবারের সঙ্গে আলাপ চল তাঁর বড়ী উত্কাহবে। বেশ ছাপিখুশি ছেলেট। প্রাইম'রী এক, আব, সি, এল কোর্স পড়তে এসেছে। বঙ্গ ভিবিএর নীচেই।

সে পক্ষের অস্তিত্বের কথা শুনে মুখ টিপে হেসে বলল—আরে বটল লাওলেডিং হচ্ছে মহা কিপটে। পক্ষা বহুত হবার ভয়ে মিল ডেকলিন নেমপ্রেট, কনিংহাম কিছুই বাইরে লাগাননি। অগতঃ হুগার হুগার ঘন চাব পাউণ্ড করে বেশ তখন মুখটা কেন্দ্র মিল আনন্দে ভরে যায় দেখবেন।

খেতে খেতে বটলবারে রূপণতা পক্ষে একটা গর বললে ডাঃ বেলভাভা। একটা একসিডেন্টের গল্প। কিছু একসিডেন্ট হল তার কাহিনী।

চার বাহার মোটে একটা বটল ট্রাফিক পুলিশ কনট্রোল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বান চলাচল নিয়ন্ত্রন করছে। একটা প্রাইভেট মোটরকার তার নির্দেশ উপেক্ষা করে চলে যাত্রিল। ট্রাফিক কনট্রোল ড্রাইভারকে পাকড়ান করল। কি করে বেচারী ড্রাইভার।

সে চিৎকন পক্ষি অলসন করল। মানে কনট্রোল-কে এক পাউণ্ড ঘুর দিল। বাহাতে দুখ মিল কনট্রোল। কারন তার তান হাতটা গাড়ী নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেবার জন্য বাত দিল।

এ পর্যায় ব্যাপারটা মন্থপ্রাবেই চলছিল। কিন্তু তারপরই বাবল গজগোল।

গাড়ীর ড্রাইভার ছিল মহাকপণ ২৫। গাড়ী ঠাঁট দিতেই সে কনট্রোলের কাছে ঘূরের টাকাটা ফেঁচ গাইল।

৯ ঘোমানে বেড, ব্রেকফাস্ট ভিনারের বহুত দিয়ে থাক।

বোধহয় অস্ত্রগুলো টাকা কোকটে বেরিয়ে যাওয়াতে তার হুকের তেতুতটা করকর করছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে হল একসিডেন্ট। কনট্রোলটা বেলভাভা হয়ে গিয়ে জুল হত নির্দেশ দেওয়াতে।

দুপুতাবলা পক্ষ লাক খেতে বেরোল। পক্ষের মহা-মুখে ইউনিভার্সিটির চব্বরের কাছে রহাল ইনকমহারি। এভিনবহার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। দেশবিদেশ থেকে বিভাবীরা এখানে আসেন চিকিৎসালাভ শিখতে।

বহাল ইনকমহারির বিশরীত কোণে একটা অর্ধবৃত্তাকার ইটালীয়ান রেস্তোরাঁ। পক্ষের দুটি আকর্ষণ কল। ওখানে টিউব লাইট লেখা—'বাবলিকিউ'। দেওয়ালের পাশে সামান্য ক্ষিত্র টেবিল ও বসবার আসন। আক-খানের চুচীতে রান্না হচ্ছে। চুচীর চারপাশে ঘিরে অর্ধ-বৃত্তাকার ডেক কাউন্টার। তার নীচে বসবার চেয়ার।

হরমার মুখোমুখি সেলস কাউন্টার। সেখানে হানি-মুখে বলে রয়েছেন স্ত্রী এক ততকী।

রেস্তোরাঁটা পক্ষের ভালই লাগল। বেশ ছিন্নছিন্ন, পরিষ্কার। বাবের তাড়াতাড়ি আছে তাহা ডেক কাউন্টারে বসছে। বারা দেবী করে রয়ে লয়ে থাকে তার নীচের কীচেয় দেওয়ালের ধারের টেবিলে বসেছে।

ওপার বসলে বন্ধ দেওয়ালের ডেকের দিয়ে চারিখিকের রান্না, লুচটারী বেশ ভালভাবেই পর্যবেক্ষণ করা চলে।

পক্ষ বলে বনে দেখতে লাগল হোকানের খন্ডেরবের বেস্বর ভাগই ছাত্র। আক্সো-এশিয়ান মুখ অনেক চোখে পড়ল। বাবার চোতগুলা ইপি গাগিয়ে চেক হাঁবছে। গৌকগুলা, বিরাট চেহারাও বললে এক ইটালীয়ান ম্যানেজার সব তথ্যকর করছেন আর অকারণে হাঁকডাক করছেন।

'কিন এও পটাটো চিপস'—পক্ষের বাবারের অর্ডার নিয়ে বিচনী স্টিলের একটা মেরে ওয়েট্রেন চেক এর উদ্দেশ্যে বলল। চেক অর্ডার পেয়ে তার লাকেরবের বলল।

কাঁচা আলু আগে খেতেই কাটা ছিল। সেগুলো লার্ভের ভেলে ফেলে ছাঁকনিতো তামা হতে লাগল। হালকা নীলবর্ণের পাউনপা অল্পবহনী হুন্দরী দেখেবা পক্ষিত্ত ভাবে খন্ডেরবের টেবিলে টেবিলে পরিবেশন করে চলছে।

সার্জনস হল একটা ঐতিহ্যবাহিত সড়ক। পৃথিবীর চিকিৎসার ইতিহাসের বহু অধ্যায়ের অধীনে এই বাড়িতে তৈরী হয়েছে।

শব্দ এম, আর, সি, পি দেবার আগে মেডিসিনের স্তম্ভ ক্লিনিকাল এন্ডোমেট্রি-স্টা কবেছিল। সার্জনস হলের অফিসে গিয়ে খোঁজ পেলে তাকে ইষ্টার্ন মেমোরিয়াল হাসপাতালে ডাঃ বার্নসের ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে। শব্দর খবরটা নিয়ে বাড়ীর দিকে বসে।

রাস্তার বেলা হলো বিনয় বানান্ধীর সঙ্গে। তারের থেকে কয়েক বছরের সিনিয়র ছিলেন। বছর দুই এখানে রয়েছেন। লিভিংস্টন থেকে ডি, টি, এম অ্যাণ্ড এড করে এম, আর, সি, পি চাকরির পুরুষ।

শব্দকে বেঁচে একগাল হেসে বললেন দেবার খবর হল। নতুন এঙ্গে বেশ থেকে। আমিও পেছ মাংস আর স্থল খেতে হাশিখে উঠেছি।

পরে একদিন সব কথা বলব বিনয়। আর ডাঃ-ডাঃ আছে, চনি। আপনায় কাছ থেকে এম, আর, সি, পি, কোলের পড়াশোনা করার ল্যাম্বেনডলো সব নেব একদিন।

পোলওয়ার্ড গার্ডেনে এম বখন শব্দর পৌঁছাল তখন ছটা বেয়ে গেছে। চারদিক অন্ধকার।

ভিনায়ের টাইম হয়ে গেছে। পস্তায় মুখে মিস ডেভলিন বললেন—আপা করি ভাল থেকে মি: মিটার পাচুগালি ছটার আলবের ভিনায় থেকে।

রাশিরে খেঁচ বেয়ে শব্দর বখন তার ঘরে ঢুকল তখন সে চীৎকারে একা একা, হুজু অসহায় বোধ করতে লাগল।

চারপাশে কেউ নেই। ঘরে সজ্জাবোলা অ-খোঁদ-বজনের বাড়ী যেত। হুলে পড়ার সময় খোলা রাঠে বলে লজ্জাবোলা অজ্ঞাত মারত। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে হল বৈধে কলকাতার রাস্তার রাস্তার কি পার্কে বেড়াতে যেতো।

এখানে একা। বাইরে কোথায় বেগোবে; সাতটা বাজে শুড়িতে। জানলার পর্দা সঠিরে সাদির ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল।

'বিদিশার নিশা' লক্ষ্যে লবের লম্বাক কোন ধাবনা ছিলই না কিন্তু কল্ললীনিমিত্ত এভিবহার কাল রাশি-

ওলা শব্দরের মনে রাগ কেটে রাখল। জানলার কাছে কান পেতে শুনে লাগল সে। সে। করে বাইরে বয়ে চলেছে অশান্ত হাওয়ায় অস্বাভাবিক জলদান।

সিপিং হাট গারে চাপির বিদ্যানার গুয়ে একটা পিগারেট ধরিয়ে ছায়েব দিকে তাকালেই চোখে পড়ল সিপিংয়ের জানলটা খোলা। এই বকর ঘরকে 'এটিক' বলে। আর ভিনায় খাবার সময় ডাঃ শেলডারাম বসছিলেন।

এমন সময় বরদার ঠকটক টৌক পড়তেই শব্দর চমকে উঠল। তাই তাকে তার বরদার এমন সময় নক করছে।

...বিদ্যা, ডাঃ বিদ্যা বরদা বুলুন। চাপা করে শেল-ভায়া ডাকছে।

সংকিত হয়ে বরদা হুলে বের শব্দর।

—কি ব্যাপার!

—বিদ্যা, এই হচ্ছে আমার গাংগেও ভরোবী হ্যাকলারমন, স্টেপ্যাও থেকে এসেছে। দেখানকার হল-পিটালের নার্গ। এখান থেকে পনের মাইল দূরে স্টেপ্যাও, রাসগোর পথে। একদমর আমি সেই হাসপাতালে কাজ করতাম। সেই থেকে বন্ধু।

এখন দৃষ্টিগ হয়েকে মিস ডেভলিন ঘরতে পার্গাংগেও আনা একবারে শব্দর করেননা। আর তিনি লক্ষ্যে করতেন যে আমি কোন বেয়েছেলেকে নিয়ে এসেছি। ঐ শুধু সিঙিতে পায়েব লম্ব। এছনি আমার ঘর মার্ত করবেন।

আপনি নতুন এসেছেন ভাংমাংস। আপনাকে একঘর লক্ষ্যে করবেন না, আপনি কাইওগি একটু কোঠার করুন। জরোখীকে আপনি আপনার হয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। ঘরক্ষণ না মিস ডেভলিন এ হোট রেডে নীচে বান। বলে একঘরম জোর করেই সে ভরোখীকে শব্দরের ঘরে ঢুকিয়ে বরদা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেল।

শব্দর ঐতিহ্যত ভাবাব্যাক্য খেয়ে গেল। বিস্ময় লক্ষ্যে সে অনেক গর শুনেছে। তা বলে আপনকে না আসতেই এক্তি!

আগন্তকার মুখে দিকে ভাগ করে তাকায় পারল না। তবে তার শব্দর পায়েব দিকে তা-

সে দুজনে পাঠল বসন্ত কুড়ি এলুপের বেশী নয়।

—হাসিন—সী ইচ্ছা কামি। ডয়েখী কিমকিমিরে বলে।

হিস ভেতগিনের ভারী পায়েব শব্দগুলো ক্রমশঃ নিকট-তর হতে থাকে। ভারপূর্ণ উপক্ৰোবে এসে থাকে। কন্ড-নিখাসে ভারী অপেক্ষা করতে থাকে।

শেলভাগ্যের দরজার দিকে হিস ভেতগিন প্রথমে গিয়ে নক করেন।

—কাম ইন স্লিট, বসে গভীর পড়াকনোয় বস শেল-ভাগ্য উত্তর দেয়। দরজার পাশটা ঠাক করে মাথা গুলিয়ে হিস ভেতগিন বরের চারদিকটার চোপ বুলিয়ে নেন। বাণি বই, খাতা, টেবোৎসেপ, ছাবার চাবদিকে ছড়ান। আর তার মধ্যে পড়ার জুবে আছে ডাঃ শেল-ভাগ্য।

—আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি হিস ভেতগিন?

নো ডক্, থাক ইউ। আমি জানতে এসেছিলাম তোমার ঠাণ্ডার কোন অস্থিবিদ্য হচ্ছে কিনা? নীচে থেকে এককোণ গরম চা পাঠিয়ে দেব নাকি? আমতা আমতা করে কণ্ঠ হাসি হেসে হিস ভেতগিন বলেন।

মেনি থাকস। কিছু রপটার লম্বা সাপার। ভখনই না হয় চা খাব হিস ভেতগিন।

ভখনাইট...ভখনাইট। রিপ ওয়েল।

পথপথে পায়েব ভারী শব্দটা এবার শব্বরের দরজার দিকে এসিয়ে আসে।

—রিম, হুইট অব দি লাইট। জবোবী মুহু অবড তীক্স হয়ে বলে ওঠে। বলেই হুইটে। অব কংডে যায়।

শব্বর বাধা দিতে চেষ্টা করে।—কেভেনল্। বাধা দিক না। লগাই তাৎলে এড়িয়ে পড়ব। বলে জবোবী হুইট অব কংডে হুঁকে পড়ে; শব্বরকে পেড়িয়ে। বিছানার ওপাশে হুইট, বাধা দিতে বাধার মলে দুজনেই গড়িয়ে বিছানার পড়ে যায়। আলোটা কিছু নিতে যায়।

নিশ্চিন্ন অন্ধকার বরের ভেতর। অন্ধকারে বরের নিখুঁততা যেন আরও বেড়ে গেল।

হিস ভেতগিনের পায়েব শব্দ শব্বরের দরজার সামনে এসে থেমে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন জাবেন হিস ভেতগিন। নক্ করতে গিবেও হাতটা নাড়িয়ে নেন।

দরজার চাবি দর্প দিয়ে ভেতরে উঁকি মাথেন। অন্ধ-কার ঘরে কোন সাড়াশব্দ নেই।

—পুতোর বহ! হি ইজ স্টিল কিং হোমসিক। আরাধেব লম্বারের সঙ্গে এখনও হানাতে পাগেনি। বিড-বিড করে বলতে বলতে ভারী পায়েব আগুয়াক ভুলে হিস ভেতগিন নেমে যান।

একটু পরেই ডাঃ শেলভাগ্য শব্বরের ঘরে এসে ঢুকে বস্ত্র-বস্ত্র কানিয়ে জবোবীকে নিয়ে ঢলে যায়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে শব্বরের শেওল নেই। হঠাৎ তার খুব ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। প্রথমে তার মনে হল যে যুক্তি বরষের চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে গেছে। তুম্বার খোঁজটা কেটে গেলে সে তাড়াতাড়ি উঠে আলো জেলে দিল।

—আবে একি! ছাবের জানালাটা দিয়ে নরম, লগা ভুলো আঁশের মত কিসব যেন ভেলে আসছে। ঠাণ্ডা।

—এ যে বরফ।

এতক্ষণে শব্বর বুজতে পারল বরফ পড়তে আসত করেছে।

তাড়াতাড়ি ছাবের খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিল।

পরের দিন শেলভাগ্যকে বলতে সে তো বো করে বেলে বলল আবে এসেছে ছাবের জানালা বুনে কেউ শোয় না। বরফ এখানে যে কোন সময়ই পড়তে পারে। 'ব্রিটিশ গভোব' এন্ড ব্রিটিশ উইমেন আর অলগয়েজ 'আন-সার্ভেট'। এটা সব সময় মনে রেখ।

শব্বর তার পরদিনই গে বাসা ছেড়ে চাকাক্তি মধ্যাহ্নে ঘরে আর্ডেন হোটেল গেল।

[ক্রমশঃ]

তালগাছের কথা

শ্রীমধীর গুপ্ত

ওই তাল গাছ মাথা তুলে নসে
 নীরবে ঝাড়িয়ে নলযোগ্যাস্ত
 পাতার বঁশীতে কি কথা কহিছে
 প্রান্তঃচাঁদী লুহ পায়ে ।
 “সম্পদ—পদ সন্তোষময়
 ক্ষমতা-দত্ত থাকে না কিছু ;
 নবীন পায়, হ’লো না ক্রান্ত
 হুটিয়া কখনো এদের শিছু ;
 শত প্রলোভনে যানে-বনে-বনে
 দ্বিগুণা বহিবে তোমায়ে লবে,
 চলার লবল সতিয়ে কহিবে
 হুটিল ভেসকি-ওয়ারো ভবে ;
 ভটিগতা-জাল কমেই ভয়াল
 হবে যিনে যিনে লাভের লোভে ;
 তার পরে ছাচ, হেবিবে হেখায়
 জীবন-তপন যখন ভোবে
 হোলনে-কন্ত অনাধি জীবনে
 কালি মাথা পদ ধার না বোঝা ;
 হাহাকার-করা বিলাপী বাতালে
 বার্ষ-বিক্ষল পদ্য খোঁজা ।”

তুলে-ভরা ভবে দরদ-সাকী
 নন্দ-নৌলিয়ার নিয় একা
 ঝাড়য়ে ঝাড়য়ে কত কি আশার
 নিত্য হেখায় হু হু বেধে ;
 কত ভাঙা-পড়া—কত যেটা-করা
 ওঠা-পড়া হায় শেষ তো নাই ;

পর্বা-পটের মিনেমা-ছবিয়
 মতই গে সব ধেখিতে পাই ;
 কত অনিবার ছায়া-মায়া তা’র
 পটেতে পড়িয়া বিলাস ঘুরে ;
 বর্তমানের সবই অপেক্ষ
 বিশাখ আধার অতীত-পুরে ।
 শত বহুত্ব—অহঙ্কারে
 এই পরিণাম জালি যা’রা,
 পদ—সম্পদ সন্তোষময়
 চাহিতে কখনো পাবে কি তা’রা ।

নীচব সাকী সরল শাখাটী
 কহিছে, “পায়, কেবলই চলো ;
 সরল ভবল জলের ধাবায়
 মতই পূর্ব-কিরণে তুলো ।
 দু’ধার ভরিয়া শব্দ-শ্রীতির
 প্রলেপ ব্লাঙ সোহাগ-ভবে ;
 মিত্ততা বাঙ ঢালিরা-ঢালিয়া
 সমীচনর পথেব ‘পবে ;
 তা’র যেনী আর নাই কামনার ;
 চির-সামান্য পদ-প্রাণে
 চলাই শান্তি—কায়—কান্তি
 লায়ন্তায়র পথেব টানে ।
 সমতা-সামনে মোহন মধু
 স্নেহ বাহুরে চলিতে বলে,
 স্নাত্ত খামর পুষ্কিত-ভাষ
 সজিত কথা তা’র কি চলে ।”

প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর পরিকল্পনা

অধ্যাপক প্রীতবনীকুমার দে

নগর পরিকল্পনা একটি কলাবিজ্ঞান যাহার উদ্দেশ্য হই-
তেছে মানুষের পরিবেশকে সুইচ্ছাবে সাজানো ও মানুষের
স্থান সুবিধা, নিরাপত্তা ও আনন্দদানের ব্যবস্থা করা।
প্রাচীন বিজ্ঞানগুণিত মধ্যে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান যাহা
প্রাচীন ভারতে ব্যবহার করা হইত এবং অত্যন্ত উন্নত
ছিল।

নগর পরিকল্পনার ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা
যায় যে আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালেই নগরপরি-
কল্পনাবিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম-বন্দী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন
মহাভারতযোধ্যা ও হযরত খলিফারশেখ হইতে আমরা
যেখিনে পাই যে এই মানচিত্রে স্থপতিকল্পিত রাজ্যঘাট ও
অতীব সুন্দর পঃ-প্রধানীর ব্যবস্থা ছিল এবং পৌর ব্যবস্থার
নিয়মাবলীও প্রচলন ছিল।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ যামহাজের প্রসিদ্ধ পুস্তক "হিন্দু-
দের স্থাপত্যবিজ্ঞান" হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টাব্দ সপ্তদশ সহ
পূর্বে ভারতের আধাংশ মধ্যে গ্রাম ও নগর পরিকল্পনা
পুর্বে সুইচ্ছাবে করা হইত।

কৌটিল্য তাহার অর্থশাস্ত্রে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে
মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় প্রচলিত নগর পরিকল্পনার সামাজিক
ও প্রাচীনগিক বিবরণ লব্ধে বিবরণ নিম্নলিখিত বর্ণনা
দিয়াছেন।

১১১-১২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত "প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের নগর
পরিকল্পনা" পুস্তকে শ্রী সি. পি. ডি. আচার্য হুই চাচার
কর্তৃক আগেরকার তৈয়ারী রাজ্য ও অজ্ঞাত নগর পরিকল্পনার
নিম্নলিখিত লব্ধে লিখিয়াছেন : এই নগরগুলি দ্বার-বন্দিতঃ
বন্ধিতঃ কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। বন্ধিতঃ
কেন্দ্রের চারিদিক নগরে খোলা জায়গা, উদ্যান, পরিষ্কার
সড়ক, বাজার, মন্দির, গুরু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও চাষিক

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা থাকিত। লোকেরা
তাৎক্ষণিক নিম্ন নিম্ন জীবিকা অগ্রহাণী বিভিন্ন অংশে বাস
করিত। বাজার, দোকান, বিজ্ঞান, লোকসমীক্ষা, শ্রম,
পুস্তকী, পানীয় জলাগার ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত
হইত।

আগেই বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের
অর্থশাস্ত্রে "নগর পরিকল্পনা, বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান ও কলা-
রূপে পুর্বেই প্রসিদ্ধ ছিল। এই বিজ্ঞানকে 'স্থাপত্য' বলা
হইত এবং ইহাকে অর্থশাস্ত্রে একটি 'উপদেশ' হিসাবে
গণ্য করা হইত। কথিত আছে যে হইকর্তা যখন এই বিজ্ঞান
প্রবর্তন করেন ও কয়েকজন স্বতন্ত্র উদ্যোগ দেন।
তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক শিখার এই বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। এই
শিখারই তাৎক্ষণিক লক্ষ্য জান উত্তরকালের লোকদের
স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ করেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়কালে প্রচুর
স্থাপত্য ও গ্রাম তৈয়ারী করা হইয়াছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের
সময়ের সময়কালে "মানসার" হিন্দু স্থাপত্য বিজ্ঞান লব্ধে
বিবরণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'মানসার পিঠিকা'
মানসারের সময়কালিক।

মানসার, মানসারতম্, বিবর্তন্য মানসারতম্, বাজার, শিল্প-
বিজ্ঞান-মানসারতম্, বিবর্তন্য বিজ্ঞান-প্রকাশ ইত্যাদি কয়েকটি
প্রধান প্রধান গ্রন্থ হইতে প্রাচীন নগর পরিকল্পনার
লব্ধি লব্ধে আনয় জানিতে পারি। উপরোক্ত
গ্রন্থগুলি ছাড়াও অর্থশাস্ত্র, ব্রহ্মসংহিতা, পুরাণ, কৌটিল্যের
অর্থশাস্ত্র, মেঘদূত, গুরুদূত, মহাভারত, রামায়ণ,
মহাভারত, বায়ুপুরাণ, ভোজের বৃত্তি-লব্ধি ইত্যাদি
গ্রন্থগুলিতেও নগরপরিকল্পনা বিজ্ঞানের লব্ধি লব্ধি
বিবরণ উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিখ্যাত রামায়ণ ও মহାভারত গ্রন্থ হইতে আদ্য
ঐশ্বর্য্যশ্ৰেয় রাজধানী আদ্যো, রাজ্য জনকব রাজধানী
নিবিশা, রাবণের রাজধানী লক্ষ্য, ঐক্যের ব্যৱস্থা, ভৌব-
বের হাতিবাহু, পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ ইত্যাদি নগরের বিব-
রণ পাই। এই নগরগুলি পাত্ৰমতে পৰিকল্পনা করা
হইয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরগুলি যথা পাটলী-
পুত্র, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, কংকী, মহাবলীপুত্র, ভাণ্ডার
মহাবলী, বিজয়নগর ইত্যাদিও পাত্ৰাহ্বারী পৰিকল্পনা করা
হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে প্রযোক্ত রাজ্যের বারম্বারীতে তাঁহার
নিষেধ দ্বারা 'স্বপতি' ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীরা
থাকিতেন। স্বপতির কাজ ছিল নিখুঁতভাবে নগর পরি-
কল্পনা করা ও নগর রথোত্তরাধারী, বিভিন্ন অংশের
চতুষ্পাশ্ব নির্দেশ, স্বপতি বোণেশের পরিকল্পনা এবং
পুত্রদ্বারা, উত্তর ও প্রধান প্রধান ইয়ারতগুলির স্থান নির্দেশ
করা ইত্যাদি। স্বপতির পথেই স্থান ছিল 'হরগ্রহী'।
তিনি ছিলেন জমি জরীপ ও মঙ্গল তৈয়ারীর সঙ্গে
বিশেষজ্ঞ। অস্ত্রাঙ্গ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে থাকিতেন অগ্নি,
উত্তর ও ক্রমিক বন পরিকল্পনা, দুর্গ পরিকল্পনা ও মার্গ বা
রাস্ত্রাধারী তৈয়ারীর বিশেষজ্ঞরা।

ହାତୀମାନ ଓ ହାତୀମତେବ ସତେ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାରୀ ନଗର-
ଭଳିକେ ବିକ୍ରିର ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରା ହେଉଅଛି । ସଦ୍ୟ—

(১) নগর-ইহা আত্মস্থতীন বাবলা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। বাবলায় ও কাবিলেরেবা এখানে বাস করিতেন।

(২) পশুজল—নদী বা লব্ধস্থের দ্বারা অবস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্ত বন্দর। এখানে প্রাধান্যতঃ ঘণি-মুক্তা, বৈশাখ, লুগন্ধি এবং ইত্যাদি বাবদ্যের বৈশেষ্য বাস ছিল।

(৩) দুর্গ—ইহা এক একটা দেশের নাথকত্বের শাসন-কার্য পরিচালনা ও নৈতিকত্বের জন্য ব্যবহৃত হইত। বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত এই দলবল নগর আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইত।

(১) **কাজধানী**—একটি রাজ্যের কাজধানী। এখানে রাজ্যের রাজস্বসংগ্রহ ও তাহার চাহিদার্থে দৈনিকসেবাবণ্টিত।

(১) **শেট**—নদীর তীরে অথবা বনের মধ্যে ছোট

পাহাড়ের দ্বাৰে অবস্থিত ছোট নগৰ। এখানে ক্ৰান্তান্তঃ
মুহূৰ্বেৰ বাস ছিল।



২২ নং বিএ

খেট নগদেব মজা।

(৬) **খৰ্চট**—একশতটি গ্রামেই কেন্দ্রে অবস্থিত নগর। এই গ্রামগুলি হইতে আশীত দৈনিক খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি চাষিপার্শ্বে নগরগুলিতে এইস্থান হইতে প্রেরণ করা হইত।



੨੨.੧੨.੧੯੯੯

ବର୍ଷାଟି ଉପହେବ ନାହିଁ।

(୧) **ଅବିଭକ୍ତ**—ଯାହା ଯଦନ ଗ୍ରାହ୍ୟ ତଥା ବାହ୍ୟ ହୁଏତେନ
ତଦନ ଉହା ଶାହାବ ମୈକ୍ରମେନ ସମସ୍ତ ବାବଦୁତ ଦୈତ ।

নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা কইয়াছে। যথা—

(५) **सम्पत्तिकाय—**अभिहितः आचार्यः राजपुत्रः

(২) **এক্সর গ্রাম**—গ্রামণ ও বৈষ্ণবের (বাবুদা
 শ্রী) মল গ্রামের বৈষ্ণব গ্রাম ।

(৩) বহুলিঙ্গ প্রাণ—একই প্রাণের ক্ষেত্রে।

শ্রেরীর লোকদের মত এবং বিশেষতঃ কৃষিকারীদের মত—
এই গ্রাম ব্যবহৃত হইত।

(৭) পরাগ গ্রাম—প্রধানতঃ কৃষিকারীদের মত।
তবে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেরীর লোকেরাও বাস করিতে
পারিতেন।

(৮) চতুর্ভূজ গ্রাম—আগতনে আরও বড়, চতুর্দিকে
প্রাচীর বেষ্টিত এবং সর্বশ্রেরীর লোকদের বাসের মত
গ্রাম। ইহার চারিদিকে চারিটি দ্বার থাকিত।
গ্রামের প্রধান গ্রামের মধ্যে একটি পুণ্ড্র অংশে বাস
করিতেন।

(৯) পূর্বভূজ গ্রাম—প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও কৃষিকারীদের
বাসের মত বড় গ্রাম। চারিদিকেরাও এখানে বাস করি-
তেন। পরিদর্শনকালে রাজার বাসের মত একটি স্থানও
থাকিত।

(১০) মজল গ্রাম—মগল শ্রেরীর লোকদের বাসের
মত প্রাচীর বেষ্টিত বড় গ্রাম। বহুজন বিশিষ্ট অষ্টাদিক,
বাহ্য, মণ্ড, পুষ্করিণী ইত্যাদিও এখানে থাকিত।

(১১) বিশ্বকর্মা গ্রাম—সাধারণতঃ নদীরদ্বারে অবস্থিত,
গ্রাম ৪০০০ লোকের বাসোপযোগী নগরেরদ্বারে বড় প্রাচীর
বেষ্টিত গ্রাম। প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা এখানে
বাস করিতেন। রাজার রাজপ্রাসাদ ও বিচারপুণ্ড্র এখানে
থাকিত।

(১২) সেবেশ গ্রাম—প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও চাষি-
গণের বাসের মত বড় গ্রাম।

(১৩) বিশেষ গ্রাম—প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও চাষি-
গণের বাসের মত প্রাচীর বেষ্টিত গ্রাম। এখানে অনেক
লম্বিতকলা প্রদর্শনী গৃহ থাকিত।

(১৪) কৈলাস গ্রাম—প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের
বাসের মত সন্মুখের দ্বারে বা পাহাড়ের দ্বারে অবস্থিত
মুগ্ধিত গ্রাম। পূর্বদিক হইতে গ্রামের প্রধান প্রবেশদ্বার
থাকিত।

(১৫) নিত্যমজল গ্রাম—গ্রাম ৪০০০ লোকের বাসোপ-
যোগী অত্যন্ত সুশীতল গ্রাম। ইহা প্রশাসনিক ও ধর্মীয়
দুইরকম কেন্দ্র ছিল। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী ও
কৃষকরা এখানে বাস করিতেন। গ্রামে ব্রহ্মা-গৃহ,
বিচারপুণ্ড্র ও অনেক মন্দির থাকিত।

(১৬) খেট গ্রাম—বন্যে অবস্থিত দ্বার ও অন্যান্য
আমিষভোজীদের বাসের মত গ্রাম।

(১৭) ধর্মী গ্রাম—নদীর তীরে অবস্থিত বীরদের
বাসের মত গ্রাম।

(১৮) পল্লী—বনের দ্বারে বা পাহাড়ের দ্বারে অবস্থিত
খোট্টা গ্রাম। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ গবাদি
ও অবাদি পশুর প্রজনন স্ত্রীস্বাক্ষর কার্যে নিযুক্ত থাকিত।
অন্যান্য শ্রেরীর লোকেরাও এখানে বাস করিত।

(১৯) ঘোষ গ্রাম—বন বা পাহাড় স্তম্ভের বিস্তারিত
পশুচারণ ভূমির মধ্যে অবস্থিত গোপালকদের বাসের মত
গ্রাম। প্রচুর গবাদি পশুও এখানে থাকিত।

(২০) অস্ত্র গ্রাম—ঘোষ গ্রামের ন্যায় কিন্তু
আগতনে আরও বড়।

উপরোক্ত গ্রামগুলি ব্যতীত বিবর্ণ্য বাস্তবায়ন
নিয়মিত প্রকারের নগরগুলির পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ
লিপিবদ্ধ আছে :—

(১) পুণ্ড্র, (২) বৈষ্ণবগর, (৩) মাজলগর,
(৪) বৈষ্ণবগর, (৫) পুণ্ড্রগর, (৬) অষ্ট-
ভূজগর, (৭) বাহ্যগর।

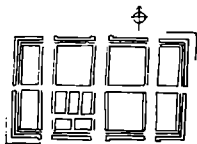
বিভিন্ন শ্রেরীর লোকদের কার্ণার ও বন্যদের
হস্তশিল্পী গ্রাম, পুণ্ড্র, পশুচারণ এবং পুণ্ড্র নামে অভিহিত
করা হইত। উদাহরণ নকশা পরিদর্শন করা হইতে করেক
প্রকার বিশেষ বিশেষ জাতিগত আকার অনুযায়ী বাহা
মত ও স্থিতিগতক বস্তু বিবেচিত হইত। গ্রাম ও
নগরের নকশা পরিকল্পনা দ্বারা অনুযায়ী মানদণ্ড ও
মাত্রার উদ্দেশ্যে ১৮টি শ্রেরীতে বিভক্ত করিয়াছেন।
যথা :—

(১) মণ্ড (২) সর্বভোজ (৩) মঙ্গলগর
(৪) পশু (৫) ধর্মী (৬) প্রস্তর (৭) কামুক
(৮) চতুর্ভূজ (৯) পরাকর্ষক (১০) পরাগ (১১)
মঙ্গলগর (১২) ত্রিপ্রতিবিম্বিত (১৩) কৃতক (১৪)
ক্রীত ও (১৫) বৈষ্ণব।

(১৬) মণ্ড—গ্রাম ৪০ হইতে ৬০০ জন ব্রাহ্মণের
মত ইহা কৃতক গ্রাম। গ্রামের আকার আনুমানিক।
গ্রামের চারিদিকের প্রাচীরের চারিদিকে পরিখা থাকিত।
সংসারভাগী ব্রাহ্মণের স্থিতি ৩৩ ইহা পাহাড়ের উপর

অবস্থা এবং উপাত্ত। ভূমিতে অবস্থিত হইত।

পুংনি থাকিত। গ্রামের প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি প্রধান প্রবেশ দ্বার থাকিত।



২ নং চিত্র

দণ্ডক গ্রামের নক্সা

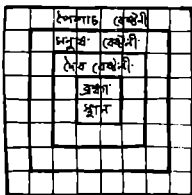
(২) সর্বসত্তাক্ষত্র—বর্গাকার গ্রাম। ব্রহ্ম, বৈশ্ব, বৃহ ও বিভিন্ন জৈনীয় পুণ্যস্থানের বাসের মন্ড। গ্রামের মহাফলে উৎস, শিব বা বিষ্ণুর মন্দির অবস্থিত।



৩ নং চিত্র

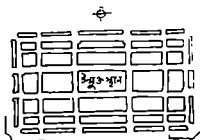
সর্বসত্তাক্ষত্র গ্রামের নক্সা

প্রধান প্রধান রাস্তার সহিত পঞ্চাঙ্গীনের মন্ড নির্দিষ্ট পথ থাকিত। থবারীতি গ্রামের বিভিন্ন অংশগুলিকে বৈশ্ব, ব্রহ্ম ও পৈশাচ দেবীর নামে অভিহিত করা হইত। পৈশাচ দ্বানের চারিটি কোণায় চারিটি অতিথি-নিবাস থাকিত। গ্রামের বাহিরে চাণ্ডীর মন্দির ও চণ্ডালদের



৪ নং চিত্র

(৩) নন্দ্যাবর্ধ—বর্গাকার বা আয়তাকার গ্রাম। এখানে ১০০ বা ততোধিক লোকের বাস ছিল। গ্রামে চার জৈনীয় রাস্তা ছিল। 'মহার্গ' ও 'বীদি' ৪৫ ফুট হইতে ৬০ ফুট প্রশস্ত হইত। 'বীদি'র সহিত পঞ্চাঙ্গীনের পথ থাকিত এবং মহার্গের সহিত উৎস থাকিত না। 'মার্গ'



৫ নং চিত্র

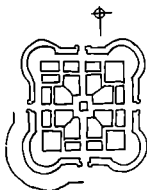
নন্দ্যাবর্ধ গ্রামের নক্সা

৫০ ফুট প্রশস্ত হইত এবং 'মুহূর্তমার্গ' আরও কম প্রশস্ত হইত। রাজপ্রাসাদের নিকট কনিষ্ঠদের ও উৎসের ভ্রাম্যমাণের স্থান নির্দিষ্ট হইত। গ্রামের চতুঃপাশে নিয়ন্ত্রিত দেবদেবীর মন্দির থাকিত। চারিদিকে চারিটি

গ্রামের দ্বার বাহ্যিক প্রাচীরে চারি কোণার আয়ত চারিটি দ্বার থাকিত। গ্রামের প্রাচীরের বাহিতে উত্তরদিকে

শ্রোণীর বাহ্যিকের দিক এই গ্রাম ব্যবস্জত হইত। সর্গ প্রকার শ্রোণীর লোক এখানে বাস করিত এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবদেবীর থাকিত।

(৬) প্রান্তর—বর্গাকার বা আয়তাকার গ্রাম। প্রাচীর বেষ্টিত এবং ৬, ৮ বা ৮টি গ্রামের দ্বার থাকিতে পারে।



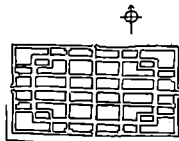
৬ নং চিত্র

পঞ্চক গ্রামের নক্সা

কালীঘর দ্বারের থাকিত এবং ইহা হইতে আরও দুই চতুঃলম্বের পূর্বাধি থাকিত।

(৬) পঞ্চক—বর্গাকার গ্রাম। চারিদিকের প্রাচীর দ্বারাকার বা অষ্টভুজাকৃতি এবং পাথুরে দ্বার আকৃতির হইত। গ্রামের মধ্যস্থানে মন্দির, মণ্ডপ থাকিত।

(৭) দ্বিতিক—বর্গাকার আকৃতির গ্রাম। হিন্দুদের মন্ডপ অষ্টভুজাকৃতির মন্ডপ প্রাচীর 'দ্বিতিকার' আকারে গাটব্যাটের

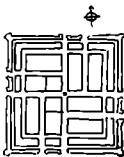


৭ নং চিত্র

প্রান্তর গ্রামের নক্সা

দৈব অথবা মন্ডপ স্থানে রাজার প্রাসাদ থাকিতে পারে। পৈশাচ বেষ্টিত বাহিরের দিকে প্রধান রাজার দ্বার বৈশ্বদেব বাসস্থান নির্দিষ্ট হইত। নিকটে প্রধান রাজার পাশে মোকান, রাজার ইত্যাদি থাকিত। পৈশাচ স্থানে কারিগর, দীঘর, দক্ষিণ ও অস্ত্রাকার বাসগৃহের লোকেরা বাস করিত।

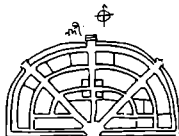
(৮) কাম্বুক—গ্রামনক্সা বৈশ্ব বা বাসগৃহের দ্বার নদীতীরে বা সমুদ্রতীরে অবস্থিত গ্রাম। অস্ত্রাকার শ্রোণীর লোকেরা বাস স্থান ও কাম্বুকগ্রাম এখানে বাস করিতে



৮ নং চিত্র

দ্বিতিক গ্রামের নক্সা

পুত্রিকল্পনা করা হইত। গ্রামটি প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের চারিকোণার চারিটি বর্গাকার দ্বার থাকিত। বিভিন্ন

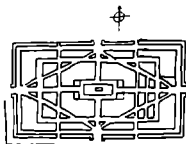


৮ নং চিত্র

কাম্বুক গ্রামের নক্সা

পারে। ঐকন কেন্দ্রে গ্রামের নাম হইবে যথাক্রমে খেটক ও খস্ট। গ্রামের বহিঃসীমার আকার মনুকের প্রায় এবং মনোর বা মনুকের প্রায়ের রাস্তা মনুকের প্রায় বাঁকা। প্রাচীর ব্যতীত আনুভূমিক নহে। এই গ্রামে নিব ও বিষ্ণু মন্দির থাকিতে পারে।

(৮) চতুর্ভুজ—গ্রামের আকার আয়তাকার।



৮ নং চিত্র

চতুর্ভুজ গ্রামের নকশা

গ্রামের নকশার বিষয়ে কয়েকটা বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে সম্প্রদায়ের জন্য গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে স্থান ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। গ্রামের মধ্যে কয়েকটা স্থিতিস্থাপক স্থানে খোলা জায়গা ছাড়িয়া রাখিতে হইবে যেখানে পূর্বে গৃহাধি নির্মিত হইতে পারে। গ্রামের বাহিরে, যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে তাহার বিপরীত দিকে ভবিষ্যতে সম্প্রদায়ের জন্য স্থান ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি উহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে সম্প্রদায় অন্য দিকেও হইতে পারে। প্রাচীর ইমারত, মন্দির ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইহা হইতে আশা হইতে পাই যে বর্তমান কালেও নগর-পরিকল্পনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা এই নির্দেশ মানিয়া চলেন। তাহারা নকশা তৈয়ারী করিবার সময় ঐতিহাসিক ইমারত, মন্দির ইত্যাদি সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।

প্রায় সকল শিল্প শাখাই দুর্গ পরিকল্পনা ও তৈয়ারীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যাহাযত্ন নিরূপিত প্রকারের দুর্গের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

(১) গিরি দুর্গ বা শর্কত দুর্গ (২) নরী দুর্গ (৩) নিচক

দুর্গ বা মক্কুদিত্তে নির্মিত দুর্গ (৪) বন দুর্গ (৫) স্থান দুর্গ বা মাতার নির্মিত দুর্গ (৬) নর দুর্গ, পৈনা দুর্গ (৭) বিশ্র



১০ নং চিত্র

দুর্গের নকশা

(গিরি দুর্গ ও বন দুর্গের বিশ্র) দুর্গ (৮) বৈব দুর্গ বা কোতাধের দুর্গ ও (৯) কুত্রি দুর্গ।

মন্দির—মন্দিরের জন্য সংরক্ষিত স্থানগুলি আয়তাকার হইবে কিন্তু ইহা নগরের কেন্দ্রস্থলে হইলে বর্গাকার হইবে। গর্তগুহ, পূর্ণ মণ্ডপ, ভদ্রমণ্ডপ, ধর্মমণ্ডপ, বলিদীপ, এবং প্রাকার নদী মন্দির গঠিত হইত। শিল্পশিল্পগণিতে মন্দিরের বিভিন্ন অংশের পরিকল্পনা, তৈয়ারীর রীতি, স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থগুলি হইতে আমরা নিম্নলিখিত প্রকারের গুণগুলিরও বিশদ বিবরণ জানিতে পারি:—

(১) দুর্গ—প্রাচীর, প্রবেশদ্বার, ভদ্রমণ্ডপ ইত্যাদির বিবরণ।

(২) মন্দির—গোপবন, মণ্ডপ, বিহান ইত্যাদির বিবরণ।

(৩) ব্রাহ্মসাম্রাজ্য—নগরের স্থান, বিচার স্থান, লিখোদান রাখিবার স্থান, ভোজাখানা, অন্নপ্রসাদ, গ্রন্থাগার, কোক-ঘর, শয়ন কক্ষ, প্রাথমিকানী আবাস স্থান, প্রমোদ কানন, অশ্বশুর ইত্যাদির বিবরণ।

(৪) সৌধ—সমস্ত ব্যক্তি, রাজপুত্র, রাজপুত্র, মন্ত্রী, দেনাপতি ইত্যাদির জন্য সৌধগুলির বিবরণ।

(৫) গুপ্তদুর্গ—স্বাক্ষরগণিত প্রবেশ দ্বার, বিহান ভোদন, রাজধানী ও নগরের প্রবেশ দ্বার ইত্যাদির বিবরণ।

(৬) বাণী ও ভদ্রমণ্ডপ—নগরের মধ্যে ও বাহিরে ছোট ও বড় পুকুর, অনেক মণ্ডপ, পাতঙ্গা ইত্যাদির বিবরণ।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়—২ কুতা ও পরীক্ষার নিমিত্ত হলঘর, গবেষণাগার ইত্যাদির বিবরণ।

(৮) নাটকশালা, নাট্যশালা ও সঙ্গীতাদর্শনগৃহ ইত্যাদির বিবরণ।

(৯) গৃহস্থ নিরাপত্তার নিমিত্ত, সিঁড়ি, বেলিকা, ছাত, বাস ইত্যাদির বিবরণ।

(১০) গৃহস্থের আঙ্গণাব্যপন্ন বথ বেড়ি, চেয়ার, বাতিঘান ইত্যাদির বিবরণ।

(১১) গোয়ালখর, অশ্বশালা ইত্যাদির বিবরণ।

(১২) ধর্মশালা, কয়েদখানা, কোকান, স্তম্ভাশ্রম ইত্যাদির বিবরণ।

নগর পরিকল্পনার নিম্নলিখিত

অধিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন অনুযায়ী যে প্রত্যয়ের গ্রাম, নগর বা নগর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতা যশস্বিত্তি নিম্নলিখিত প্রকারে কার্য করিতেন :—

(১) ভূ পরীক্ষা—ভূমির ভরণকার্য, মাটি পরীক্ষা, ও ভূমণ্ডল মলের উপস্থিতি নির্ণয়।

(২) ভূমি-সংগ্রহ—ভূমির আকার, রাস, জল নিষ্কাশনের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে অনুশন্ধান করিয়া স্থানী নির্মাণ করা।

(৩) দিক পরীক্ষা—যনেটা পাহাড়, নদী, মন্থ, পুষ্করিণী অবধা বাগের নিকটে কিনা, স্থানীয়া পারিশ্রমিক অবধা কিতাপ, বিভিন্ন দিক হইতে স্থানীতে যাতায়াতের সুবিধা কিতাপ ইত্যাদি বিষয়ে অনুশন্ধান করা।

(৪) পথ বিস্তার—প্রয়োজন এবং ব্যবহার অনুযায়ী স্থানীকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা।

(৫) ভূমি-বিধান ভূমির উন্নতিসাধন ও সংরক্ষণ।

(৬) আলয়-বিধান—বসির ও আশ্রয়ক গৃহাদির স্থান নির্ণয়।

(৭) গ্রাম বিন্যাস, পুরবিদ্যা, পঠন বিন্যাস, নগর ও পুরী বিন্যাস ইত্যাদি—গ্রাম, নগর ও নগর পরিকল্পনা।

(৮) গৃহ-বিন্যাস—গৃহ ও মৌলগুলির পরিকল্পনা ইত্যাদি করা।

(৯) মণ্ডপ-বিধান—মনসাধারণের নিমিত্ত হলঘর,

বিচারগৃহ, চক ইত্যাদির উত্তরার কার্য।

(১০) গোপূত্র-বিধান—প্রবেশ দ্বার, চোরাণ দ্বার ইত্যাদির উত্তরার কার্য।

(১১) ক্রান্তবিন্দু-বিধান—প্রশাসনিক দৌর, রাজ-প্রাসাদ ইত্যাদির উত্তরার কার্য।

পরিমাপের একক

ভূমি ভরণের কার্য নম্রা উত্তরার, নম্রা অনুযায়ী ভূমির মাপিমা দণ্ড বেওরা এবং বিভিন্ন অংশের গুণিতকতা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গুণাদির উচ্চতা ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য পরিমাপের একক দ্বির করা একাধ প্রয়োজন। যশস্বিত্তি ও শিল্পীদের নিজস্ব মাপের দ্বারা ছিল। যশস্বিত্তি পরিমাপ করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কেকগুলি ব্যবহার করিতেন :—

১ ক্রীহীতে (শানী ধানোব).....১ অঙ্গুল (ইংরাজী ১ ইঞ্চি)

২ অঙ্গুলে.....১ বিস্তৃতি বা বিঘত (১ ইঞ্চি)

৩ বিস্তৃতিতে.....১ হস্ত (১ কুট ৬ ইঞ্চি)

৪ হস্তে.....১ ধনুর্দ্বী অথবা ১ গজ (৩ কুট)

৫ ধনুর্দ্বীতে.....১ হস্ত (৬ কুট)

৬ হস্তে.....১ বাজহস্ত (১২ কুট)

৭ বাজহস্তে.....১ ব্রহ্মহস্ত (২৪ কুট)

মাপিবার হস্ত কাঠ, বেগমী কাশড়, বাহু অবধা পাছের ছাল দ্বারা নির্মিত হইত। প্রাচীন পরিমাপ হস্তে এবং নগরের পরিমাপ বাজহস্তে করা হইত। স্মৃতির স্মরণে পথিয়ার পরিমাপে ব্রহ্মহস্ত ব্যবহার করা হইত।

প্রধান রাস্তাঘাট

প্রাচীন নগর পরিকল্পনার স্তম্ভাধিকারিক তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইত :—

(১) দেশমার্গ ও গ্রামমার্গ—বেশ ও জিলাব প্রধান দড়ক।

(২) রাজমার্গ—নগর ও নগরের মধ্যে যান-বাহন চলাচলের প্রধান রাস্তা।

(৩) মার্গ—গৃহস্থদের ভূমিগুলিতে বাইবার রাস্তা রাস্তা। কোটিগোর অবধাভ্রমতে বিভিন্ন প্রকারের রাস্তাঘাটে প্রমত্ততা নিয়ন্ত্রণের হইবে।

(৪) দেশমার্গ—১৮০ কুট প্রমত্ত হইবে।

(৫) গ্রামমার্গ—১২০ কুট প্রমত্ত হইবে।

(১) সীমার্মাণ—(প্রধান প্রধান নগরের সংযোগ-কারী রাস্তা)—৬০ ফুট প্রশস্ত হইবে ।

(২) পুরমার্গ—(দুইটি গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা) ৪০ ফুট প্রশস্ত হইবে ।

(৩) মার্গ—(গ্রামের পক্ষ গাড়ী চলিবার পথ) ২৪ ফুট প্রশস্ত হইবে ।

নগরের ও সহরের মধ্যে রাস্তাঘাটগুলি নিম্নলিখিত প্রকার প্রশস্ত হইবে :—

(১) প্রধান রাস্তামার্গ—৬০ ফুট প্রশস্ত ।

(২) গোঁধা রাস্তামার্গ—প্রধান অংশের ৪০ ফুট হইতে ২৪ ফুট প্রশস্ত হইবে ।

(৩) সাধারণ মার্গ—২৪ ফুট প্রশস্ত ।

বাস্তব মধ্যে গাড়ী (২৪) ঘাইবার জন্য ১৪ ফুট প্রশস্ত হইবে, গৃহস্থিহ সড়কের উদ্ভুক্ত স্থান ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত হইবে, পথচারীদের জন্য সংযুক্ত পথ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত হইবে এবং গলি পথেরের জন্য সংযুক্ত পথ ৬ ফুট প্রশস্ত হইবে ।

মানসারের মতে নিম্নলিখিত প্রকারের বড় গ্রাম ও নগরের রাস্তাঘাটগুলির বিবরণ পাওয়া যায় :

(১) অঙ্গলবীথি—গ্রাম ও নগরের চতুর্দিক বড়িয়া (Outer ring road) রাস্তা । কমপক্ষে ৩০ ফুট প্রশস্ত হইবে ।

(২) পূর্ণ-শক্তিরে প্রসারিত রাস্তাকে বলা হইত বাসপথ ।

(৩) রাস্তাবীথি—যে রাস্তার দুই প্রান্তে প্রবেশ দ্বার থাকিত ।

(৪) সজীববীথি—যে রাস্তার দ্বি বা junctions থাকিত ।

(৫) উত্তম-বন্ধিপথার রাস্তাকে বলা হইত অক্ষাকাল বা বাসপথবীথি ।

(৬) কেল্লারের ব্রহ্মাধারের দ্বারা দিয়া যে রাস্তা হাইও ডাওয়ার নাম ছিল ত্র্যক্ষবীথি ।

সাধারণতঃ বন্ধপথবীথি ও বাসপথবীথি প্রত্যয় বাহা বাহান থাকিত ।

ভর্তুকি শাস্ত্রে রাস্তাঘাট পঠিকল্পনার বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী লিখিত আছে :

(১) রাস্তাপ্রাণ ও মন্দিরের সম্মুখে প্রাপ্ত উদ্ভুক্ত স্থান থাকিবে ।

(২) অধিবাসীদের মর্যাদাক্রমারে রাস্তার দুই পাশে গৃহগুলি বিস্তৃত থাকিবে ।

(৩) রাস্তা সংলগ্ন গৃহগুলির উচ্চতা সম্মুখের রাস্তার প্রশস্ততা অপেক্ষা উচ্চ হইবে না ।

(৪) রাস্তাগুলি সূর্যপুর্বেই স্তার হইবে অর্থাৎ যথোচ্চ হইবে ও দুই দিকে ঢাল থাকিবে । এবং প্রাথমিকস্থানে সীকো বা পুল থাকিবে ।

(৫) চল নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তার দুই ধারে দালা থাকিবে ।

(৬) গৃহগুলির সম্মুখদিক রাস্তামার্গ অথবা অস্ত্রান্ত রাস্তার উপর হইবে এবং উহারের পক্ষাধিকের চত্বরে স্থানধর ও পাখোনা থাকিবে ।

(৭) প্রতি বৎসর রাস্তা রাস্তাঘাটগুলির যেরাতি করাইবেন এবং এইরকম এই সকল রাস্তা বাহায়া ব.বহার করেন বা বাহায়া এই সকল রাস্তা দ্বারা উপকৃত হন তাহাদের নিকট হইতে রাস্তা কর আদায় করিতে পারিবেন ।

(৮) গ্রামে ও নগরে যতদূরকরে তৃণলতাধি রোপণ করিতে হইবে । বসন্ত যানের নিকটে ভাল ভাল ফুলের গাছ বসাইতে হইবে । ভাল ভাল গাছ ৩০ ফুট অস্তর, অধাম জেবীর গাছ ২২½ ফুট অস্তর, লাধারণ জেবীর গাছ ১৪ ফুট অস্তর ও ছোট ছোট গাছগুলি ৭½ ফুট অস্তর রোপণ করিতে হইবে ।

(২) কুয়া, পুষ্করিনী ও খালের ধারে ও চারিদিকে রাস্তা বা পথচারীদের নিমিত্ত পথ থাকিবে এবং সুবিধাজনক স্থানে নি দি থাকিবে । নদীর উপর পুল নির্মাণ করিতে হইবে এবং পারাপার ও যাতায়াতের জন্য নৌকা এবং অস্ত্রান্ত চলমান থাকিবে ।

(৩) কুয়া, পুষ্করিনী ও খালের ধারে ও চারিদিকে রাস্তা বা পথচারীদের নিমিত্ত পথ থাকিবে এবং সুবিধাজনক স্থানে নি দি থাকিবে ।

(১০) কেবল রাস্তার অববোধ সৃষ্টি করিবে না । এমন কি রাস্তাও হাতে ও বাহায়ে কোনপ্রকার স্থানবাহুল্য চড়িয়া যাইবেন না ।

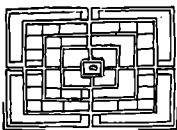
(১১) রাস্তার ঘণ্টাবান ব্যক্তি, অগ্রস্থ ব্যক্তি, রক্তা, মৃতদেহ বহনকারী, প্রাচ্যে ব্যক্তি, মৃৎ ও শকটবাহারীদের পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। অথ অথবা গরুদি পথ হইতে ৪ হস্ত ও শকটবিহীন হইবে ১০ হস্ত দূরে চলা বাঞ্ছনীয়।

(১২) পথচারী ও ভ্রমণকারীদের ভক্ত রাস্তাঘাটগুলি লক্ষ্যমতে ভালভাবে সংরক্ষিত করাইতে হইবে।

গ্রাম ও নগরস্থিত স্থান নির্মাচন, জমি অত্রাপ ও ভূ পরীক্ষা

কৌটিল্যের মতে রাজ্যের ভেতরস্থ উৎসাহ বাঞ্ছনীয় স্থাপিত করিতে হইবে। স্থানীয় ভূর্ণ-নগর চারপাশী গ্রামের কেন্দ্রে এবং 'ধর্ম' নগর দুইপাশী গ্রামের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করিতে হইবে। নদীতীরে, সমুদ্র, হ্রদ বা পুষ্কিনীর ধারে গ্রাম, নগর বা সত্বেয় স্থান নির্মাচন করিতে হইবে।

জরাজীর্ণপাশ্রবতে গ্রামের নগরের বা সত্বেয় একজন স্থান নির্মাচন করিতে হইবে যেখানে নানা প্রকারের বৃক্ষ-লতাযুক্ত থাকিবে, গরুদি পথ, পশু ও মানব প্রকারের পথ থাকিবে, বন্যায় বন থাকিবে, প্রচুর বাস্তবশ্রমী পাওয়া যাইবে ও উত্তম পানীয় জলের উৎস থাকিবে। স্থানটি পাহাড়ের নিকটবর্তী হওয়া সমস্তলক্ষ্য হইবে এবং সেইস্থান হইতে জলপথে নৌকা করিয়া সমস্তপূর্ণাঙ্গ যাত্রাযাত্রা করা যাইবে। রাজধানী পাহাড়ের ধারে বা নিম্নস্থে স্থাপিত হইবে। পাহাড়ের উপরে নিম্নে রাজধানীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুর্গ স্থাপিত হইবে।



১০৮ চিত্র

স্থানসংস্থের মতে চক্রবর্তী প্রণালী রাজ্যের
অন্ত রাজধানীর নগরের নক্সা

স্থানসংস্থের মতে গ্রাম, নগর বা সত্বেয় স্থান সমস্তলক্ষ্যের হইবে, উৎসাহ বাঞ্ছনীয়, নাম দিক হটতে ভ্রমণমিকে চোটে নদী প্রবাহিত থাকিবে, সত্বেয় ভূমণ্ডল জল পাওয়া যাইবে এবং সেইস্থানের উত্তম নাতিশীতোষ্ণ হইবে। সেইস্থানে প্রচুর পরিমাণে তরুণ, শিখ, লক্ষপূর্ণ ইত্যাদি ফুল ও ফলের বৃক্ষ থাকিবে।

গ্রাম, নগর বা সত্বেয় স্থানটি মধ্যস্থানে উত্ত হইবে এবং উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্বদিকে ঢালু হইবে। নগরের মধ্যস্থান নীচু হইবে না। প্রস্তাতকালীন যুগের স্থানো ও উত্তাপ পাইবার সুবিধার নিমিত্ত নগরের ঢাল পূর্বদিকে থাকিবে প্রয়োজনীয়। এই কারণে পাহাড়ের পশ্চিমদিকে নগরের স্থান নির্মাচন বিধি আছে। ভাষ্যবর্ণের মতে গ্রামপ্রধান যেনে নগরের ঢাল দক্ষিণদিকে থাকিলে জমি ও পুষ্টি অত্যধিক পরিমাণে যুগের উত্তাপ পাইবে এবং ফলে রাষ্ট্র মতিগর চক্র হইয়া যাইবে ও পুষ্টি অত্যধিক উৎপন্ন হইবে। এইমতে বাতাস ও বৃষ্টি স্বাভাবিকত: দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। অতএব এইদিকগুলিতে জমির ঢাল থাকিলে পুষ্টিগুলি লক্ষ্যমতেই বৃষ্টি পাইবে। দক্ষিণ দিকে ঢাল থাকিলে নগরের সমস্ত মনুষ্য, জল ও ময়লা বৃষ্টি জলে দক্ষিণদিকের নালার আনীত হইবে। ঐক্যালে যে কোনও ক্রিমি দীরে দীরে পতিতে থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালের উত্তাপ উঃ দ্রষ্টই পতিতে শুরু করে। দক্ষিণদিকের ময়লা জল নিষ্কাশনের এই নাল হইতে গ্রীষ্মকালে দুর্গন্ধ দক্ষিণদিক হইতে প্রবাহিত বাতাস-বাগা নগরের দিকে আনীত হইবে এবং নগরে অস্থ ও মহামারী সৃষ্টি করিবে। কিন্তু জমির ঢাল উত্তর দিকে থাকিলে এই দুর্গন্ধ নগরের দিকে আসিবে না।

গ্রাম, নগর বা সত্বেয় অস্ত নির্মাচিত স্থানের রাষ্ট্র কত শক্ত এবং উৎসাহ উৎসাহিতা কিন্তু তাহা নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত ভূ-পরীক্ষা করিতে হইবে। এক হস্ত দীর্ঘপ্রস্থ ও পত্রীয় একটা পর্শ ঘূর্ণিত হইবে। বায়ামহৎ মতে স্থপতি এই গুণটি মধ্যাকালে জলে পরিপূর্ণ করিবেন ও পরদিন প্রত্যুষে উহা পরীক্ষা করিবেন। গর্তে কিছু জল থাকিলে রাষ্ট্র লক্ষ্যপ্রকারে উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রান্ত ও পশ্চিম রাষ্ট্র মনুষ্য বন্যায়ের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রথমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই চারটি দিক
তমিতে নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার পর স্থপতি গ্রাম,
নগর বা নগরের স্থানী ও উহার নিকটবর্তী চারিশানের
স্থানের প্রাকৃতিক অংশগুলির জরীপ কার্যে নিযুক্ত হইবেন।
একটী নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহাতে বর্তমান
রাস্তাঘাট, নদী, মালা, পথ, পাহাড়, বৃক্ষাদি, শতভূমি
ইত্যাদি প্রাকৃতিক অংশ গুলি প্রদর্শন করিতে হইবে।
ইহার পর স্থপতি 'পরিমাপন' করিলে অর্থাৎ স্থানটিকে
প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিবেন।

গ্রাম ও নগর বিভাজন

কুস্তম্ভ গ্রামের আয়তন প্রায় $\frac{1}{2}$ বর্গ মাইল ও নগর-
কুস্তম্ভ নগরের (জাঙ্গলানী) আয়তন প্রায় ১০০ বর্গ মাইল
হইবে। গ্রাম বা নগরের বৈধি প্রস্থের ১, ১৫, ১৫, ১৫,
১৫, ১৫ বা ২৪০ পর্য্যন্ত হইবে। উহাদের আকার বর্গাকার
আয়তাকার, অর্ধ-বৃত্তাকার, বৃত্তাকার অথবা অষ্টভুজাকৃতি
হইবে।

প্রথমে নগরের চতুঃসীমা নির্ধারণ করিতে হইবে।
রাজ্যের অন্তর্গত নগরের এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায় ও
ভূমিপ্রধান কেন্দ্রগুলির সহিত, যে সকল পাহাড় হইতে
খনিজ সম্পদ আনীত হইবে উহারের সহিত, অথবা ভূগর্ভ বা
বন (যে সকল প্রধান প্রধান স্থানের সহিত নিঃস্নিহিতভাবে
সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে) প্রভৃতি স্থানের সহিত
সংযোগকারী বর্তমান রাস্তাঘাটগুলির সাহায্যে বাণিজ্য গ্রাম
বা নগরের পরিকল্পনা করিতে হইবে। ইহার পর চারি-
দিকের প্রাচীর নির্মাণ করিতে হইবে, পরিধা বনন করিতে
হইবে এবং নদীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নগরের
ভোরণপথগুলির সংখ্যা ও স্থান নির্ণয় করিতে হইবে।
ইহার পরেই কার্য হইবে প্রাচীর যেটি স্থানটিকে কয়েকটী
অংশে বিভক্ত করা। বর্গাকার অথবা আয়তাকার নগরের
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে ৮ অথবা ৯টী স্থান অংশে বিভক্ত করিতে
হইবে। এইরূপে নগরটী ৬৪ অথবা ৮১টী অংশে বা
এককে বিভক্ত হইবে। শিল্পাশ্রমভে এই অংশগুলিকে
৪৪ জন দেবতারের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। বিদ্যুৎ
বাল্পাশ্রমভে দেবতারের সংখ্যা ২৪। প্রত্যেক দেবতার
জন্ত কতগুলি অংশ সংযুক্ত করিতে হইবে সেই বিষয়ে
কোন দ্বিধতা নাই। সকল দেবতারের মধ্যে ব্রহ্মই প্রধান

এবং এই কারণে নগরকেই নগরের কেন্দ্রস্থলের কয়েকটী
অংশ ব্রহ্মার নামে সংযুক্ত হইত। বৈষ্ণবে নগরটিকে ৬৪টী
অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে সেখানে ব্রহ্মার স্থানে ৪টী
অংশ থাকিবে এবং অপর ক্ষেত্রে অর্থাৎ বেঙ্গে নগরটিকে
৮১টী অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে সেখানে ব্রহ্মার স্থানে
৯টী অংশ থাকিবে। সকলকেই ব্রহ্মার জন্ত সংযুক্ত
স্থানে কেন্দ্রীয় উদ্ভূত স্থান থাকিত অথবা রক্ষিত থাকিত।
বিভিন্ন অংশগুলির 'বিভক্তকারী' দেবতাগুলি রাস্তাঘাট ও
গলি প্রভৃতির মধ্যবর্তী নির্ধারণ করিয়া উহারের নক্সা
নির্ণয় করা হইত। এই দেবতাগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর অধি-
বাসীদের জন্ত নির্ধারিত বিভিন্ন বাসস্থান, বিভিন্ন প্রকারের
জিনিষপত্র নিষ্কাশের স্থান, এবং বাহলা বাণিজ্য, খেলা-
ধূলা, আনন্দ-প্রমোদ, ধর্মীয় অজ্ঞান, প্রশাসন এবং অন্যান্য
সাধারণ স্বপ্নাঙ্কন্য ও হবিষাদির জন্ত সংযুক্ত স্থানগুলির
পরিমাপ নির্ধারণ কার্যেও ব্যবহৃত হইত।

ব্রহ্মাস্থান ও নগরের প্রত্যেক দিকের মধ্যবর্তী স্থানকে
তিনটী স্থান অংশে ভাগ করা হইত। প্রত্যেক অংশকে
একটী বিশেষ অংশে পূর্ণিত করা হইত এবং ইহাদের
নাথকরণ করা হইত অথাক্রমে বৈষ্ণব, বহুস্থান ও শৈশাচ
স্থান। ব্রহ্মাস্থানের পরেই থাকিত বৈষ্ণবস্থান। এইখানে
অন্যদিকের ও প্রশাসনিক দৌরভুক্তি, প্রাচীরের বাস-
গৃহ, বাসপ্রাসাদ ও অন্যান্য দেবতারের মন্দির থাকিত।
বৈষ্ণবস্থানের পরবর্তী অংশকে বলা হইত বহুস্থান। এই-
খানে বৈষ্ণব ও অজিহেরা বাস করিত। নগরের সীমানার
নিকটবর্তী ও বহুস্থানের পরবর্তী অংশকে বলা হইত
শৈশাচ স্থান। এইখানে সূর্যোদয় ও কার্তিকরগণ বাসকরিতেন
এবং গুহাধারের কার্যস্থান ও গুহাধার ও এইখানেই
থাকিত। কোলমায় শৈশাচস্থানেই ধর্মশাস্ত্রা বাসিত
হইত। এইরূপে নগরটিকে দৈব, বহু ও শৈশাচ স্থানে
বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন অংশ চারিটি ধর্মের অধিবাসীদের
বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারে জন্ত নির্ধারিত হইত।

অধিবাসীদের বর্গ, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও জীবিকা-
স্বার্থী প্রতিষ্ঠা অনুসারে নিম্ন নিম্ন পূর্বের আকার, আয়তন,
পরিকল্পনা প্রণালী ও বিভিন্ন প্রকারের গৃহ-বিভাগের বিশদ
নিয়মাবলী প্রস্তুত ছিল। গুরুত্বাধী বর্ণগণের
নগরে বাসকৃত ভাবে কেহই অধি ও সম্পত্তির

হইতে পারিবে না। নগরে নাগরিকদের কেবলমাত্র জীবনতত্ত্ব হিন্দুরে জমি দেওয়া হইত যেখানে তাঁগায়া গৃহ নির্মাণ ও উত্তরন তৈয়ারী করিবেন। জমি ও সম্পত্তির চিরদত্ত মালিকানাধার বন্দোবস্ত ছিল না। আধুনিক পৌর নগরো ও উন্নয়ন সংস্থানির ভাৱ তখন নগরপত্রিকল্পনা ও গৃহনির্মাণের লক্ষ্য বিষয় নিঃস্রব করিতে ন।

বাসস্থিতির পত্রিকল্পনা ও গৃহ নির্মাণের নিয়মাবলী

গ্রাম, নগর ও মহলের সম্পূর্ণ নগর ও বিস্তারের দিক্ত লক্ষ্যত্ব বক্ষা করিয়া বিভিন্ন দৌর ও গৃহগুলি নির্মাণ করিতে হইবে।

লক্ষ্য শিল্পশাস্ত্রগণিতেই উল্লিখিত বিষয়গুলির বিশদ নিয়মাবলী আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের নগরপত্রিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন বাসস্থিতির পত্রিকল্পনা ও বাসগৃহ নির্মাণের বিভিন্ন নিয়মাবলীর মধ্যে কয়েকটা নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) বিশ্বকর্মা প্রাচীনকালে লিখিত আছে যে প্রথমে গ্রাম, নগর বা মহর পত্রিকল্পনা ও পত্তন করিয়া পরে গৃহস্থিতি নগর তৈয়ারী করিতে হইবে। এই নিয়ম লক্ষ্য করিলে অবলম্বন হইবে।

(২) মানসারের মতে নগরপত্রিকা কৃত বাসগৃহের জমির পরিমাণ হইবে ২৪০০ বর্গ ফুট অর্থাৎ ৫৬ কাঠা। নাগরিকের মধ্যমা অস্থায়ী ঐ জমির পরিমাণ ঐ কৃত্তম জমির ২, ৩ বা ৪ গুণ হইবে অর্থাৎ ৬৬, ১০ বা ১০৬ কাঠা হইবে।

(৩) শুক্রনীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজা নির-লিখিত ভাবে জমি নির্দিষ্ট করিবেন।—

গ্রাম, নগর ও মহলের বিভিন্ন, মধ্যবিত্ত ও ধনী লক্ষ্য জ্ঞেয়র লোকদের মত জমি নির্দিষ্ট করিতে হইবে। কৃত্তম জমির পরিমাণ হইবে ২৪×৪০ ফুট অর্থাৎ ৯৬০ কাঠা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মত জমির পরিমাণ হইবে কৃত্তম জমির মাপের ১২ গুণ অর্থাৎ ১০৬×১২ ফুট বা ১২৭২ কাঠা এবং ধনীদের মত জমির পরিমাণ হইবে কৃত্তম জমির মাপের ২ গুণ অর্থাৎ ৪৮×২৪ ফুট বা ১১৫২ কাঠা।

গ্রামের ক্ষেত্রেই জমির পরিমাণ হইবে পরিবার-বিশেষের প্রয়োজনের মত যেটুকু প্রয়োজন ততটুকু।

কর বা বসনী নয়।

(৪) মানসারের মতে জমির মাপের অর্ধেকের বেশী পরিমাণ স্থানে গৃহ নির্মাণ করা যাইবে না। অর্ধেক জমি উদ্বৃত্ত রাখিতে হইবে।

(৫) বিশ্বকর্মা প্রাচীনকালে মতে প্রথমে বৃক্ষ রোপণ ও পরে গৃহনির্মাণ করিতে হইবে। অগ্নিবার গৃহ দেখিতে উদ্ভূত হইবে ন।

প্রাচীন ও মহলের উদ্ভবের ব্যক্তিকের গৃহ চতুঃপালা অর্থাৎ চারিটি অংশ বিশিষ্ট হইবে, অগ্নিবারের গৃহ ত্রিংশালা, বৈষ্ণবের শিখালা ও শূত্রকের গৃহ একশালা হইবে।

একই ভাষায় শার্বতী গৃহস্থতির উক্ত মত মতানুসার এক হইবে।

(৬) মাতঙ্গল অস্থায়ী রাজপ্রাসাদ এলাতোলা পর্যায়, ব্রহ্মণের গৃহ মহতলা পর্যায়, মাধ্যম রাজাদের গৃহ মধ্যতলা পর্যায়, লাক্ষ্যদের গৃহ পাত্ততলা পর্যায়, বৈষ্ণব অগ্নিবারের গৃহ চারিটিলা পর্যায় এবং শূত্রদের গৃহ এক হইতে তিনতলা পর্যায় হইতে পারে। ১৫০ ফুটের অধিক কোন দৌরবে উচ্চতা হইবে না এবং কোন গৃহই নগরের বাহির অপেক্ষা উচ্চতার অধিক হইবে না।

(৭) বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে যে বিভিন্ন প্রকারের গৃহের দীর্ঘা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এখনই অবলম্বন করিবে না।

(৮) শুক্রনীতি শাস্ত্রে মতে গৃহে ৩, ৫ বা ৭টি ঘর থাকিবে। বহুগুলি ঘরোয় বা অগ্নিবারের প্রাচীর বা বিভাগ দ্বারা পৃথক করা থাকিবে। গৃহের ঘোট ৮টি ঘরমা থাকিবে। গৃহের প্রত্যেক দিকেরই দিক দ্বারা বিভাগ থাকিবে। নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে ঘরমা রাখিতে হইবে, অগ্নি কোন স্থান নহে। ঐচ্ছ প্রত্যেক ঘরের জানালাগুলি নিজ নিজ পদম অস্থায়ী বসান যাইতে পারে।

প্রত্যেক গৃহের সমুদ্রতাপ প্রধান রাজ্যের দিক রাখিতে হইবে। গৃহের দুই পাশে বা পশ্চাদ্ভিক গৃহের মরলা, অম্বাল বা পায়খানা পত্রিকার করিয়া লইয়া যাইবার মত গৃহের পিছনের উঠানে ঘাটের মত পথ রাখিতে হইবে।

(৯) মানসার ও বৃহৎসংহিতা মতে প্রত্যেক গৃহের সমুদ্র গৃহের প্রস্থের এক তৃতীয়াংশ চওড়া খোলা ঘাটমা থাকিবে।

(১০) মানসাত্মক মতে প্রত্যেক গৃহের সমুদ্রে বাণীয়া ও গৃহ সমুদ্রস্থ চত্বর হইতে উচ্চ বাহালায় বাইবার মত প্রশস্ত গোপান থাকিবে। গৃহের অত্যন্ত ভিন্ন দিকেও বাহালা থাকিলে ভাল হয়।

গৃহের সমুদ্র দিকের দরজা টিক দরজা হইলে বদান হইবে না, এক দিকে অগ্নি পাশে থাকিতে হইবে।

(১১) গৃহের দরজা বা জানালা অগ্নি গৃহের দরজা বা জানালায় সামান্য সামান্য হইবে না।

(১২) কুঠীর মত সবচেয়ে গভীর হইবার মত টানির দ্বারা বিশিষ্ট গৃহের ছাদ মধ্যে উচ্চ হইবে (উচ্চতা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হইবে)।

(১৩) একতলা বিশিষ্ট গৃহের ঘরের দেওয়ালের উচ্চতা উহার প্রস্থ অপেক্ষা কমপক্ষে ১/২ অংশ বেশী হইবে। এবং দেওয়াল ঘরের প্রস্থের ১/২ অংশ চওড়া হইবে। দুইতলা বিশিষ্ট ও অত্যন্ত উচ্চ গৃহের ক্ষেত্রে উন্নীত মানগুলি প্রয়োজনজন্য বেশী হইবে।

নগরপরিষ্কারের বিষয়ে রোমক স্থপতি Vitruvius (ভিট্রুভিয়াস) বাংলা লিখিয়াছেন তাঁহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

Vitruvius এই স্থাপত্যবিষয়ক নিবন্ধ প্রায় দুইহাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। উহার পাণ্ডুলিপি ইটালি পঞ্চদশ শতাব্দীতে St. Gall-এর Convent-এ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা হইতে দেখা যায় যে মানসাত্মক ও Vitruvius-এর মূলনীতিগুলির মধ্যে বর্ণিত সাদৃশ্য আছে।

Vitruvius-এর মতে প্রথমে নগরের স্থান নির্ধারণিত হইবে। স্থানটি উত্তর ও পূর্বদিকে হইলে ভাল হয়। সেইস্থলে কৃষ্টি বা কৃষ্যাসার প্রাচুর্য থাকিবে না। স্থানটিতে অত্যন্ত স্থান হইতে যলপথে, নদীপথে বা সমুদ্রপথে সহজেই যাওয়া যাইবে। নদগাটী চতুঃসীমায় আকার বর্গাকার হইবে না, বহুভুজবিশিষ্ট হইবে। এইরূপ হইলে নগর হইতে শত্রুগণকে ভাঙভাবে পরাভেদন করা যাইবে। পক্ষপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত নগরের চারিদিকে প্রাচীর, পাঠাখা ও গ্রহসীমার পরাভেদন করিবার নিমিত্ত বৃক্ষ ইত্যাদি থাকিবে। প্রাচীর যথেষ্ট দৃঢ় ও প্রশস্ত হইবে যাতে উহার উপর দিয়া দুইজন

সমস্ত প্রাচীর পাশাপাশি হইতে পারে। একটা বৃক্ষ হইতে নিকটবর্তী বৃক্ষটীও দূরত্ব এতদূর হইবে যাতে পক্ষ যারা আক্রমণ হইলে উহার নিকটবর্তী বাধ বা ভাঙ দিকের বৃক্ষ হইতে ঐ আক্রমণ প্রতিহত করা যাইবে। এই নিমিত্ত উহারে পরস্পরের দূরত্ব এতদূর হইবে যাতে ভীষন নিক্ষেপ করিলে ভীষন উহাতে পৌছিতে পারে। বৃক্ষগুলি গোলাকার বা বহুবৃক্ষবিশিষ্ট হইবে।

ঠাণ্ডা বাতাস অস্বীকৃত্য। উষ্ণ ও দারুণ বাতাস ক্ষতিকর। বাতাসটি ও গৃহগুলিকে দক্ষপ্রকারে অস্বীকৃত্য কর বাতাস হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। এইরূপ সহরেব কেন্দ্রবল হইতে বাতাসগুলি ব্যাসার্ধের দ্বারা বিস্তৃত হইবে।

বিভিন্ন দেহবৈদ্য স্থান সহরেব বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট হইবে। যুদ্ধবৈদ্য Mars সহরেব বাহিরে স্থান পাইবেন। তিনি সহরেব বহিঃপাক্ষ হইতে রক্ষা করিবেন। Venus সহরেব চৌর্যপন্যাসের নিকট থাকিবেন। সহরেব সর্বোচ্চ স্থানে Jupiter, Juno ও Minerva স্থানলাভ করিবেন। সহরেব Forum-এ Mercury স্থান পাইবেন। Isis ও Serapis ব্যবসাব্যবসায়ের স্থানে, Apollo ও Father Bacchus নাট্যশালায় কাছে এবং Hercules, Amphitheatre, Gymnasium ও Circus এবং নিকটে স্থান পাইবেন।

আধুনিক নগরপরিষ্কার পদ্ধতি :

আধুনিক নগরপরিষ্কারের তিনটা মূলনীতি হইতেছে—
নগরবাসিনের মত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তাহারেব স্বচ্ছতা ও স্বাস্থ্যকর মত বন্দোবস্ত করা।

আধুনিক নগর পরিষ্কার পদ্ধতিতে এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে নগরবাসিনের অঞ্চলগুলিকে ‘প্রতিবেশিক মতে’ (Neighbourhood Planning) পরিষ্কার করিতে হইবে। এই অঞ্চলগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্ভার রূপে পরিচালিত হইবে এবং উহারেব নিজস্ব প্রাকৃতিক ও সামাজিক অস্তিত্ব থাকিবে। উহারেব নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে এবং সম্ভারগুলির জন্য বিজ্ঞান, যোগ্যতা, বাণিজ্য, বৈজ্ঞানিক বাই ইত্যাদি অংশ প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির সংস্থান করিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর পরিষ্কারের স্বীকৃতি এই প্রবন্ধে পূর্বোক্ত বিষয় হইতে আনুমান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যে আধুনিক নগর পরিকল্পনার নিয়মান্বয়ী পদ্ধতি প্রাচীন ভারতেও এই রীতিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।
 কথা:—নগর পরিকল্পনার স্থপতির স্থান ছিল সর্গাগ্রে। ব্যবহার অনুসারে নগরগুলিকে বিভিন্ন স্ট্রেটে ভাগ করা হইত। পূর্ববর্তীকালে নগর সুলভ্যারূপে রক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া উদ্ভূত স্থান ছাড়িয়া রাখা হইত। যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার অপর দিকে বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হইত। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ইমারতগুলি সংরক্ষণ করা হইত। নগর নির্মাণের ক্ষুদ্র নির্মাণিত স্থানটিতে নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থান হইতে যাতায়াতের সুযোগসুবিধা থাকিত। স্থানটিতে ভাল নিকাশনের সুবিধা থাকা প্রয়োজনীয় ছিল। সম্মিহ উন্নতিসাধন ও সংরক্ষণ করা হইত। প্রথমে ঘনি ঘরী ও মাটির ঘোগাতা পরীক্ষা করা হইত। বর্তমান প্রাকৃতিক তথ্যাদি প্রদর্শন করিয়া স্থানটির বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহারের নক্সা (Existing Land use Survey Map) তৈরি করা হইত। প্রথমে নগর পরিকল্পনা নক্সা ও পরে পূর্বাধিক নক্সা তৈরি করা হইত। নগরে স্থপতিগণিত রাস্তাঘাট, যাতায়াত পদ্ধতি পথচারীদের ক্ষত্র নির্দিষ্ট পথ, পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা, শয়:প্রবালীয়া ব্যবস্থা, খোলা জায়গা, বোকা, বাজার, বিদ্যালয়, সরকারী ভবন, সম্মিহ, স্কুপি যোগ ইত্যাদি বন্দোবস্ত থাকিত। গৃহের চারিদিকে উদ্ভূত স্থান ছাড়িয়া রাখা হইত। পৌর ব্যবহার নিয়মান্বয়ীও প্রচলিত ছিল। জীবন শব্দ হিসাবে বাসস্থানের সম্মিহ বটন করা হইত যাহা যাহা নগর পরিকল্পনা ও গৃহ নির্মাণের সকল নিয়মান্বয়ী নিয়ন্ত্রণ করা হইত।

উপসংহার—ইচ্ছা বলা হইতে পারে যে এই বেশের দোহেরা কেবলমাত্র আধুনিক রূপান্তর ছিলেন না। তাহার মননের দৃষ্টাও বুঝিয়ে। শিল্পায়, যাতায়াত ও বিবিধ পূর্ববর্তী বর্ণিত উপবিভক্ত বিষয়বস্তু হইতে প্রমাণিত হয় যে তাহারা কি প্রকারে জীবনকে ভোগ করা যায় ও উপযুক্তভাবে বাঁচিয়া থাকা যায় তাহার ক্ষত্র নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নিয়মান্বয়ী প্রচলন করিয়াছিলেন। তাহারা আধুনিক অংশের পাখি বিধে কোন অংশে কম উন্নত ছিলেন না। প্রাচীনকালে গ্রামের একক (Village Unit) হিসাবে ও উদ্ভান-গ্রাম (Garden Village) যন্তে নগর ও নগর পরিকল্পনার রীতি অত্যন্ত সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিল। পরিশেষে ইচ্ছা বলা যায় যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ উপবিভক্ত আধুনিকভাবে চরম উন্নতি লাভ করাইয়া নগর পরিকল্পনা বিচার সত্বন বেশের পূর্বোক্তাংশে ছিল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি :

- (1) Town Planning In Ancient India—
Sri B. B. Dutt.
- (2) Town Planning In Ancient India—
Sri G. Venkatarandmd Reddy.
- (3) Early Chapters In Indian Town
Planning—Sri S. C. Mukherjee



অসংসারী [উপদ্রাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূৰ্বপ্ৰকাশিতের পর)

হুঁচি

প্ৰথম দিন আঁচাঁর করেছিলেন যে যেহেতুই মেহেতব সবচেয়ে বড় শত্রু তিনি ক'ছি কিনা জানি না, কিন্তু এটা যে শাস্ত সত্য সেজন্য স্ত্রীচরিত্র সংক্ষেপে অভিজ্ঞ সমস্ত লোকই স্বীকার করতে বাধ্য। না হলে নীরোগবাবু পুত্রপুত্র রাখে ব'লীকে নিবিবিলি পেয়েই সবপ্ৰথম গৌরীর প্ৰদীপ উত্থাপন করতো না। গৌরীর সঙ্গে ঐ বউটির খুব একটা বন্ধুত্ব না থাকলেও ঘনিষ্ঠতার কম ছিল না সে কথা বলইবঃলা, কারণ একেবারেপাশাপাশি বাড়ীতেওরা দুজনে বাস করছে আজ শ্রাবণ পূর্ণিমা, এবং বাড়ীর ভেতর এবং বাহ্যিক দিকেরেই ওদের মধ্যে ঘাতাতাতের পথ রয়েছে এবং প্ৰাণেশ না হলেও মধ্যে মধ্যে ওরা একজো ওরাজী আনাগোনা করতে অভ্যস্ত। সেই বউ বহুমান্তির নিম্না প্ৰকাশ করাঃ এই চমৎকার দুহোপটা পাণ্ডামাজাই সমস্ত ব্যাপাচটা সবিস্তারে ও সাগলভাবে সেই হাতের স্বামীর তর্পণোত্তর করলে। সেই সঙ্গে আর একবার করে কথা উঠলো সখীও ও রেগুর এবং সাগনের কোয়ার্টারনে ঐ দুটি স্থানিত প্ৰায় বাদ্য বেঁধে যে কি বেলোপনা করছে, সে কথা আর একবার করে স্বামীর কানে সে দিবে ছিল।

যেহেতু সখীরেও কথাঃ নীরোগবাবু ছেলে প্ৰবোধ বিশেষ আশ্বাস দেয় না, তাই কেবলই মনে হয় পুত্রের কথাঃ তার কি বহুত্বঃ আজও সে এবিষয়ে তেমন আশ্বাস দিল না কিন্তু গৌরীর পাচক খট্টিত ব্যাপারে তার সীমিত চমক লাগলো। মনে মনে এমনও হোল যে তার বাড়ীতেও সে এবং তার বাবা দুপুত্রে বাড়ীতে থাকে না এবং এখনই না হয় তার

ভালক পাড়ী এবং ভালিকা দিন করেকের ভদ্র দিল্লীতে এসে তার বাড়ীতে রয়েছে অন্তর্ভাষ তার বউও ত দুপুত্রে একাই থাকে এবং তার বাড়ীতেও ত একটা ছোড়া চাকর রয়েছে, অতএব, তাকেও ত সীমিত সাবধান হতে হবে। তাহলে তাহলে সে বেচারা গভীর হয়ে গেল।

বউটি দুঃকথার স্বামীকে হেলা গের কোন উত্তর না পেয়ে ভাবলে স্বামী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ছে, অনন্তা হতাপ ও বিরক্ত হয়ে পাশ দিয়ে ঘুরবার চেষ্টা করতে লাগলো, ঘুমের ভান করে স্বামী কিছু সাধারণত হয়ে কেবলই ভাবতে লাগলো, এগবের প্ৰতিকার কি কথা যায়! শেষে সেই তরুণ স্বামীর কেবলই মনে হতে লাগলো, পাড়ায় মধ্যে এই সব অনাচার বন্ধ করতে না পারলে সংক্রামক ব্যাধির মত এই দূষিত জীব্যতা ভাবেই হুশী পরিবারকেও ধ্বংস করে একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে। অতএব স্বামী বধন সকালে পথ্যাভাগ করলে তখন তার চোখদুটি লাল হয়ে আছে। দুষ্টিভাষ রাতি আগুনের যে সমস্ত ছাপ চোখে মুখে থাকে, সেগুলো সবই তার মুখে লগ্নি হয়ে রয়েছে। সানানির পরে কিছুটা গুচ্ছিত্ব হলেও, কোন হতেই সে সুস্থ হতে পারলে না। গানের বাড়ীতে আগুন লাগলে এ বাড়ীর পুষ্ণের যে আতঙ্ক হয়, হতভাগা স্বামী সেই আতঙ্ক জোপ করতে লাগলো অহোহায়, এখন এত প্ৰব্ব প্ৰতিকার যে চাকরটাকে ছাড়িয়ে কেওয়া, সে প্ৰত্যহ সে নীরোগবাবু কাছে কয়েই বা কখন কবে। কারণ লোক ত একটা চাই আর এ লোকটা ভালোই, অতঃ হত- দিন সে কাক করছে, তার মধ্যে তার কোন দোষ পাওয়া যায় নি। এ দিকে আগল কথাটাই বা বাবার কাছে কি

করে বলা যায়! অনেক হিন্দুর পূর্ব শেষে ঠিক করলে,
 থাক, বতরিন শান্তদীয়া এ বাড়ীতে থাকেন, শুভ দিন ত
 চলুক তারপর দেখা হবে।

কিন্তু অকস্মে গিরেও কিছুতেই মনে শান্তি আসে না। বেলো একটার সময় সেই অভ্যন্তরীণ হস্তপ্রাণা দ্বারা তার মস্তকসীকে বসে দাঁড়াবারকের ভয় চুবি করে ছুটি নিজে নিজের বাড়ীর দিকে বওনা ছিলে, কিন্তু পাড়ার এনে নিজের বাড়ীতে না চুকে দোকা এনে উঠলো লবণিষের বাড়ীর বাগিচায়। বাগ্গার বা বাগের কাছে কোন দোকান নেই, তবুও বুকের ভেতর কেমন যেন হুক হুক করে। তার ভয়ে সে শান্তিষের শোবার ঘরের জানলায় কাছে এসে বসে জানলার কঁক দিয়ে ভেতরের কোন দিক বা কোন দিকের অংশমাত্র দেখাও মনা বোধ হয় দু'একমিনিটেও বন্দোবান প্রাণে পেয়েছে এমন সময় হঠাৎ তার মস্তক পড়লো। দামনে কোঠাটোপের সন্ধ্যার বাসার দিকে। সন্ধ্যা এই সময় বসার করে। অতঃপে এই মাত্র কিংবদন্তি মাইকল থেকে নেমে নিজের বাড়ীর লম্বার কোন রকম আদাত না করে পূর্ণদৃষ্টিতে এ বাড়ীর চুই-করে-দেখার চোখের রক্ত নীরোবাবু'র ছেলের দিকে অগাধ বিশ্বাসে চেয়েছিল।

এতেই বসেছে গিবে নীরাধারবুঝ হেলে প্রবেশ
 যোব এক লাখে রোয়াক থেকে শাখিরে গড়ে নিভাত
 অপরধার হত নিখের বাড়ীর উঠো। যিকে লখা লখা পা
 চলিয়ে বগুনা দিলে। কিন্তু তাতেই কি নিশব কব!
 লখীরের কোয়াটাসের পাশের ছুট। কেয়াটাসের সাবা-
 শাখি একটা। গাছ ঢাকা দক শপিখের হত জায়গার একটা
 ছোট বেকি গেতে তার গণোর বসে দু'নিতে বাড়ীর
 চাকর বসাহেব নিরিগিলিতে একসঙ্গে একটা জটলা করে
 বিড়ি খাচ্ছিল, ওদের মধ্যে প্রবেশের চাকরাট গিলে।
 সে তার বাবুকে এই বকর লখতিলে শিবগাঝ বাড়ীর
 রোয়াক থেকে শাখিরে গড়ে প্রায় ছুটে শগিলে যেতে
 মেখে নিভাত কোঁড়লী হয়ে বিড়ি হাং। কাটিয়ে
 বেরিয়ে এগে এবং বাবুকে অনেক দুবে এগিয়ে যেতে
 মেখে কেহন একটা। গোয়ালিক গন্ধ আবিষ্কার করে নি.জ
 সীতে এসে সোফাভূজি প্রবেশের হ্রীবে জিজ্ঞাসা কলে,
 তুপুরে এসেছিলেন কেন? এথিকে পৌরীও কান

১) দু'পাশে এসেছিলেন কেন? এদিকে গৌণও কান

খাড়া করে রিপ তীর ঘরের দিকে কেউ আঁচ
 পাতে কি না, তাই হোখার জন্য। একটা লোকের
 রোগাক পকে থাকিয়ে পড়াই শব্দ শুনে পৌী নিজেই
 এককের ঘরে এগে পূব দপ্পণের বহা পূলে দুখ বাড়িয়ে
 এবিক ভিকি দেখে কটাইয়ে দেখতে না পেয়ে আবার
 বখন নিবোধবাবুহর বাড়ীর দিকে দৃষ্টপাত করলে,
 তখন মেঘলে প্রবোধের স্ত্রী বা তাই চাকর দুজনই
 এদিকে চেয়ে আছে। এং আরও মনে হোল যে,
 প্রবোধে স্ত্রীর চোখে খের কাপ বাপোখীর কড়। চাকরের
 কথা শুনে প্রবোধের বট নিশ্চিত বুঝেছে যে, তার খাচী
 দুপরের নির্জনতার পৌীর বর থেকে বেরিয়ে আসার
 আদিলের দিকে রওনা হয়েছে। এং পৌীর বহা পূলে
 প্রবোধকে বিয়ার দিয়ে শুভকর হয়ে তাইই দৃষ্টপথের
 দিকে দৃষ্ট বোধে এখার তাই বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে
 বোর হয় যেন লগলি এই কথাই চিন্তা করেছে যে তোমার
 খানেকের আমি মর করে নিজেছি, এখন আর তুমি আমার
 কয়বোটা কি ?

বেচাৰী বউ বড় হ'লান হয়ে নিজের ঘৰে গিয়ে একেবারে
হেঁকে পড়লো। তার ভাই, বোন ও ছা ওয়া এই কতজন
আগে হেঁবে এক নূৰ সম্পৰ্কীঃ আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়েছিল
যেথা কবাব শুদ্ধাংতে এবং সেই সঙ্গে সেই আত্মীয়ের
স্ত্রীৰ বাবকং তার স্বামীকে দিয়ে ছেলের একটা চাকরীৰ
তদ্বিষ্য করাণোর উদ্দেশ্যে, কালেই নীতাম্বাবুৰেৰ বাড়ীতে
অন্ত এখন কেউই ছিল না যে কি না ঐ বউটিকে তার
সদেহজনক চিহ্ন। থেকে অধাহুতি কেওতে পাবে। বউটি
আপন হনেই বিছানায় পড়ে পড়ে অনেকজন ঘরে ছুঁপিয়ে
ছুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। চাকরী একটু ইন্তন্তঃ করে
কাবাব তার পূৰ্ণের আভ্যন্ত বিত্রে এলো, এবং দ্বিত্রে এলো
নিজেকেৰ হলে বাহুগার বাহুগের কেলেকাণীর কখাই
আলোচনা করতে লাগলো। সেই আলোচনাৰ বেণু ও
গৌতী থেকে হুক করে যী বীৰে অন্ত অনেক বাবুৰ বখাই
চলতে লাগলো, এবং শেষ পৰ্য্যন্ত এইটাই স্থিৰ হয়ে গেল
যে, প্রমোদ প্রায়ই গৌতীর ঘরে ভূপুৰে যায় এবং ইত্যাদি।

এক ঘোড়ায় অফিসের ব্যবসায় পৌঁছে প্রবোধ হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘরে এলে হাফির হোল এবং এক গলাল ঘল এক নিম্নানে গলাধঃকরণ করে প্রাণ অধঃশ্বসে।

মাথা টিপে চুপ করে বলে থেকে শেষে কতকটা প্রকৃতি
 চরে আবার কাঁদল নিঃশব্দে বসলো। তার চক্কেট
 করেবার একে লক্ষ্য করলে, কি দুর্ভাগ্য ঘটছে সে লক্ষ্য
 প্রসঙ্গ করলে, শেষে সমীচরণে ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে
 নিজের কাজে মনোনিবেশ করলে। বেলা তিনটে নাগাদ
 স্থপতিবৃত্তান্তের চাপরাসী এসে প্রবেশকে সেলাই
 জানালে, অর্থাৎ সেক্ষণের স্থপতিবৃত্তান্ত মানে নীরোগ-
 বাবু স্বয়ং প্রবেশকে ডাক দিয়েছেন। শান্তিলি বালকের
 তার প্রবেশ পাশের ঘরে এসে পিতার টেবিলের পাশে
 দাঁড়ালো।

নীরোগবাবু নিত্যকাল সমস্তভাবেই প্রশংসা করলেন, প্রবেশ,
 তুমি দুপুরে কোথায় গিয়েছিলে?

প্রবেশ ঘাড়ের গেল, হঠাৎ সে বলে ফেলল না ত,
 কোথাও তাইনি।

নীরোগবাবু বলেন, যে কি, আমার চাপরাসীকে আমি
 ছুঁবার পাঠাইছি, সে ছুঁবাই তোমাকে পেলো না
 ব্যাপার কি? বলেই তিনি ঘটা বাঁধিয়ে চাপরাসীকে
 ডাকলেন।

চাপরাসী এসে হাজির হোল, প্রবেশ একবারে
 প্রশংসা করলেন।

নীরোগবাবু চাপরাসীকে ধমক দিয়ে বলেন, চাপরাসী,
 বাবু ত কোথাও যায় নি, অথচ তুমি ছুঁ ছুঁবার করে বলে
 যে—

চাপরাসী বললে, নেহি সাব। আমি বাবাবাবুকে
 চেয়ারে না ঘেঁষে সেক্ষণের চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করে
 তখনুম বাবু বাহ্যর চলা গিয়া। একবার এক বাজে, কিন্
 বেড় বাজে আমি খবর নিয়েছি মা, আপনি ঐ সেক্ষণের
 চাপরাসীকে ডেকে—

আজ্ঞা যাও। নীরোগবাবু তাঁর চাপরাসীকে কাজে
 অবহেলা করায় ভয়ে ভয়ে ধমক দিয়ে গিয়ে হঠাৎ
 অপ্রসন্ন হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পথ পেলেন না। এতিকে
 প্রবেশের চেয়ারা একেবারে পাত্তর হয়ে গেছে।

একটু পরে প্রবেশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমার
 ডেকেছিলেন কেন?

নীরোগবাবু হঠাৎ কলমটা নাড়তে নাড়তে বললেন,
 তখন সবকিছু ছিল, এখন কোন বস্তু নেই, তবে খবর

নিষ্কলম, তুমি কিবেহ কি না।

প্রবেশ ফিরে যাওয়ার উপক্রম করতেই নীরোগবাবু
 বললেন সেদিন দুপুরেও তোমাকে খোঁজ করে পাই নি।
 দুপুরে তুমি যাও কোথায়?

প্রবেশের মনে হোল, সত্যিই ত। আরও একদিন
 দুপুরে সে বেরিয়েছিল আশুতোর ওর তার এক বন্ধুর সঙ্গে
 সামান্য একটা ব্যক্তিগত কাজে। কথাটা সে সবলেই
 বোঝার করে নিয়ে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিয়ে ঘর থেকে
 বেরিয়ে এসে, কিন্তু আসরের এই অশুভবৃত্তির অপরিহার্য
 নীরোগবাবু মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হলেন।

যায়ে খীর সঙ্গে প্রবেশের বেশ এক হাত হয়ে গেল।
 সীট প্রবেশই প্রশংসা করলে তুমি আর দুপুরে এ পাড়া
 এসেছিলে?

প্রবেশ বললে, কই না ত, কে বললে? অস্বাভাবিক
 জোর দিয়ে সে কথাটা অস্বীকার করলে।

আমি বলছি, আমি জানি, সীট জোর দিয়ে উত্তর
 দিলে।

হুতই পারে না, এলে আর তুমি যেথতে পেতে না?
 যেথতে পেলে, তুমি শিববাবুদের বাড়ীতে দুপুরে
 শিববাবুর বউয়ের কাছে এসেছিলে?

তুমি যে-বৎ? মজোখে প্রবেশ প্রশংসা করলে। একই
 তার মনটা কাপ থেকে খুব বিচলিত। তার গুণের এই
 নতি বিখ্যাত মিশ্রিত কে হৃদয়িত মনেদের নয় অভিযোগ।

দেখেছি এবং আরও অনেক দেখেছি।

নিধেয়েই প্রবেশ এতটুকু হয়ে গেল, একবারে ঝাঁকো।
 ভবে কি বাবুও দেখেছেন? সত্যিই ত পনের বাড়ীর
 বউয়ের জানালায় সে দুপুরে উকি মেয়ে দেখেছিল। তবে কি
 মনোবের সঙ্গে, না—না যেহেঁতু সঙ্গে তাঁর খীর কোন কথা
 হয়েছে? তবে ভবে প্রবেশ প্রশংসা করলে, আর কে
 দেখেছে তুমি।

কেন? আমারে লক্ষ্য? সেই ত আমারে
 দেখালে।

প্রবেশ একেবারে আগমনের মত আসে উঠলো। জীত
 করে বলে লক্ষ্যের সঙ্গে তোমার ঐ সব বিষয় নিয়ে কথা
 হয় কেন? বাড়ীর বউয়ের সঙ্গে চাকরের ভাব দ্বন্দ্ব
 সহ্য কি করে? হাঁ, তুমি আমার পাশের বাবা

ঘটকের ঘোষ দিতে এসেছিল? আগে নিজে লাম্বল থাকো, তারপর অপরের কথা নিয়ে চর্চ্চা কোবো।

বউ এবং রীতিমত হটে উঠলো, বরো, দেখা স্বামী বলে ভয়কম যা তা বিশ্রী কথা আমার ককুনও বলবে না বলে কিঙ্কি। পুরুষ ছাড়াটা দেখছি এই বকমই হয়!

কোন বকম ডিঙ্গা না করেই প্রবোধ বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব জানি। পাশের বাড়ীর উঠের দর খুঁজনাও করে বটানো হচ্ছে, আর তুমি যে চাকরের সঙ্গে একসঙ্গে চলে বিনদুপুরে পথের জানলার আড়ি পেতে দেখছো, কে আসে কে যায়, তাতে কোন ঘোষ হয় না, কেমন? খবরদার, এবার থেকে তুমি এ চাকরের সঙ্গে কোনো বকম কথা পর্যন্ত কইতে পারবে না?

জ্ঞ, তাই নাকি? নিজের ঘোষ চাকরে গিয়ে এগার আমার ওপায় উল্টো চাপ! বেশ, আমি আর জোমার বাড়ীতে ব'কুতেই চাই না। তুমি যখন ঐ পরভানীর পাঞ্জায় পড়েছ, তখন পড়, আমি আমার মা জাইয়ের সঙ্গে চলে যাবো, বলেই নিজের উপর অক্ষর যখন করতে না না পেরে উঠে ছাপস যখন কেঁদে উঠলো।

প্রবোধ ঘোষ ব্যত হয়ে পড়লো। বাগান্ধর বাড়ির পেতে বাবা এবং ভ্রাতৃক নিষিদ্ধ, পাশে বারার ঘরে গিয়েছে শান্তিভী এবং ভ্রাতৃকা। নিষিদ্ধ রাত, যদি কান্নার শব্দ বাইরে পর্যন্ত যায়, তাহলে এক বঙ্গ কেলেকারী হ'ব। নিরুপায় হয়ে প্রবোধ হঠাৎ দ্রৌ পায়টো অন্ধকারেই আত্মক কং ধরে বেশে, বরো বঙ্গ করে চূপ কর, আর কেলেকারী বাড়িও না।

কিন্তু দ্রৌ চরিত্র চিরদিনই অসুস্থ। স্বামীও চরিত্রবোধ "প্রবোধ করণ সুযোগ পেলে কোন দ্রৌ সে সুযোগ লহতে ছাড়তে পারে না। এই নিরীদ ঘটিকা সাধারণ নারী-চরিত্রের ব্যতিক্রম নয়। ঘোষ হয় এমন সেই কাহিনীই সে কান্নার মতো অংগে বাড়িয়ে দিলে, এবং খবরও বিপর হোল" এই যে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে সে তার চুপের কাহিনী বেশ ইনিরে যিনিরে বর্ণনা করতে শুরু করলে।

এই বিপজ্জনক অবস্থায় অসহন্য প্রবোধকে বাড়িতে দিলে তার আটমাসের ছেলে। ছোট বাচ্চাটা হঠাৎ এমন চিৎরে উঠলো যে প্রবোধের দ্রৌ আর উপায্যব না দেখে ছেলেকে নিয়ে আসতে বাধ্য হোল, এবং প্রবোধ কোন

মতে এ বাচ্চা বঙ্গা পেয়ে যেন এইমাত্র তার খুব ভেদেছে এইভাবে অজিনয় হয়ে ছেলের কান্নার বিব'কটা বেশ চীৎকার করে বগডোজির খায়া প্রকাশ করে বিদ্বান। ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে এসে বাইরের পরি-দ্বিটিটা ভাল করে দেখে নিয়ে বিনা প্রয়োজনে হস্ত বা বাইরে আসার কৈফিয়ৎ বেগুনার ওই বাবকদের হিকে চলে গেল। মেঘান থেকে ফিরে একটু দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলতে লাগলো, উঃ, ছেলেটার কি হোল, মাথা যাত ধরেই কান্নাকাতি, আর ভালো লগে না। এর পর ইতস্ততঃ করে ছেলেটার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অলুহাতে সে তার নিজের খাতিরাটা টেনে ঘর থেকে বার করে বারাত্তর শ্যালকের খাতিরা পাশে রেখে যখন শয়ন করার উদ্ভোগ করেছে, তখন নীতোরবাহু ডিং হয়ে শুয়ে বগলেন, প্রবোধ না কি?

হ্যাঁ বাবা, ছেলেটার কি হয়েছে, কান্না ক'বুছে, তাই বাইরে এসে।

কেন, খোঁজার কি অলুহ বিলুপ কিছু করল? প্রবোধ বললে, না তা কিছু নয়, এখনই যেন দেখে গেছে। উক্তরে নীতোরবাহু আর কিছুই বগলেন না।

প্রবোধ হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠলো। বাবা কিছু বলেন না কেন? ছেলেটার ত আর ক'বুছে না। তবে কি বাবা লব শুনেছেন?

প্রবোধ শুয়ে কাঠ হয়ে বসে। বাবা তাকে কখনও কোন ধমক দিয়েছেন বলে প্রবোধের মনেই পড়ে না, কিন্তু তবুও সে বাবাকে ভীষণ লম্বা করে চলে। তার কিন্তু খিটো ব্যাক্যার না করে গুপণে ফিরে হস্ত বা ঘূষিয়ে পড়লেন। প্রবোধ দ্বির হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ল'গল।

কিন্তু প্রবোধের উদ্ভক্ত ঘর্য হয়ে বগের মধ্যে উল্টা বুঝিদি তান হয়ে দাঁড়ালো, যেমন দাঁড়ায় প্রত্যেক দ্রৌর সঙ্গে তৎপর স্বামীদের কলধবিবাহের সময়। প্রবোধের খাতিরে শুতে আসার কাণ এই যে, ভেতরে শুলেই হস্ত আবার নতুন নতুন কথা উঠবে এক এই অহেতুক কেলেকারী কবে খেড়েই চলবে, ক'বে না; কিন্তু একথা প্রবোধের মোটেই মনে হোল না যে তার বাইরে শোনার লগে তার দ্রৌ এ কথাই মনে করতে পারে যে, প্রবোধ আর তাকে

ভায় না। সে যোগ্য, সে কাশ্য। অস্ত্র পক্ষে বয়স বেশী হলে কি হয়, ভয় হলে কি হয়, ঐ পাশের বাড়ীর গৌরী যে তার চেয়ে এখনও বড় স্তম্ভ অধিক হুমকী দেয়। একসঙ্গে এক ব্যাকো শীকার করবে; কালেই গৌরীকে লাভ করে প্রবোধ আর তাকে চায় না বলেই সে তার ঘর ছেড়ে বাইরে খাটিয়া টেনে নিয়ে বেড়িয়ে গেল একথা ঐ খুঁটির মন থেকে কে নিবাকরণ করবে? মেয়েদের মনে একবার এই জাতীয় চিন্তা ঢুকলে আর বন্ধা নেই। কোমাকুতি বীণাপু যেমন একবারের মধ্যেই রোগীর শরীরের সমস্ত রক্ত জল করে তাকে মৃত্যুর সুখার্থে ঠাঁড় করিয়ে দেয়, নারী মনের এই সর্জনশীল স্নেহের ঠিক সেইভাবেই এক হাতের মধ্যেই স্বামীত্বের সমস্ত প্রাজ্ঞান প্রণয়কে গলিগে জল করে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে। কালেই শরদিন সকালে যিনের আলোর বহন স্বামীত্বী আবার সুখার্থে ঠাঁড়ালো। তখন স্বামীর মনে হোল, ওঃ স্ত্রীমাকুতি কি লাঘাতিক, অথবা চীৎকার করে নির্দীর্ঘ পুরুষকে কি নিবাকরণ ভাবেই না হতভান করতে চেষ্টা করে, আর স্বীর মনে হোল, স্বামীত্ব কি বিশ্বাসঘাতক! দুপুরে অফিস পালিয়ে পথতী ভোগ করে রাত্রে নিঃশব্দ স্রোকে বর্জনকরে স্বাক্ষর ভাল ছেলে সেজে বাবার পাশে শুয়ে রাত কাটায়। ওরা দুজনই স্মৃতি অমৃত্যব করলে যে পাশের বাড়ীর ঐ হুমকী পরভনীট। গুণের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পাঁচিল পেরে জুলাচ্ছে।

লক্ষ্যে গুণের মধ্যে আর কোন কথাই হয় নি। প্রাতঃকৃত্য শেষে নিয়ে প্রবোধ স্বামীত্বী লক্ষ্যকে লক্ষ নিয়ে গেল বাজারে বাজার করতে গেল, কেবল যাওয়ার সময় বোধ হয় যেন বিনা কারণেই একবার শিববাবুয়ের বাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখেছিল, কিন্তু সেই সময় সে জানতেও পারে নি যে, তারই উপেক্ষিতা সহধর্মিণী নিঃশব্দ ঘর থেকে তার পশ্চিটকে লক্ষ্য করছিল; শুধু তাই নয়, সহধর্মিণী মনে এ কথাও স্মৃতি হয়ে উঠেছিল যে, তার স্বামীসেবতা পাশের বাড়ীর খোলা কানাল দিয়ে বৃষ্টি নিষ্কাশন করে হয়ত বা ইদিকে তার মধ্যস্থ আগমনের পরহটা জাপন করেছিল ঐ কালামুখীকে এবং এইভাবেই বোধ হয় কয়েক দ্বিগুণ অভিশাপ বহনিন থেকেই বীরে বীরে থেকে উঠেছে।

বেলা নটার সময় পিতাপুত্রের অগোরে বসেছে। প্রবোধের ভালমত দিল্লীতে এলেছে বেড়াতে, সেই সঙ্গে চাকরীর সন্ধানেও বটে, তাই তার কোন ভাড়া নেই এবং দুটো তরকারী বাকী আছে বলে সে এদের সঙ্গে খেতে বসে নি। প্রবোধের শক্তনী বেয়াই-এর কাছে একবার মাত্র বলে কোথায় যেন উঠে গেলেন। পরিবেশন করছে প্রবোধের স্ত্রীলিঙ্গ, এবং প্রবোধের বউ পাশের বাসায়। একথা শেকতর মধ্যে প্রবোধের বউ স্মৃতি স্তন্যে গেল নীরোগবানু ছেলেকে গভীরভাবে বলছেন: যেখা প্রবোধ, দুপুরে জুনি গরম করবে অফিস থেকে দু'এক ঘটীর ঘস্ত খেয়ত না, বিশেষ করে আমার ছেলে হয়ে জুনি যদি এইভাবে ডুব মারো, ভাললে আমার শুদ্ধ বন্দনাম হয়ে যাবে, বুজলে।

প্রবোধ নতমুখে স্বীকার করলে যে সে আর দুপুরে বেরবে না।

প্রবোধের স্বীকৃতি চোখ দিয়ে জল বেড়িয়ে এল। সে স্মৃতি বুজলে যে তার স্বামী বরদিন হয়েই এটা খেলা খেলে আসছে। ছোট বোন এমিক এমিক করে দি'র মুখের দিকে চেয়ে বললে, দিদি তুই কীচ্ছিন্ন কেন, কি হয়েছে দিদি?

দিদি নির্ভীক। ছোট বোন বিস্মিত হয়ে পুনর্বার সেই একই প্রশ্ন করেছিল।

দিদি বললে, কই না ভ, বলেই ঠাঁড় দিয়ে কপালের ঘাম মুছবার ভকীতে চোখ মুখ মুছে নিলে।

অফিসে বেরোবার সময় লক্ষ্যবিনের স্ত্রী প্রবোধের পানিনিয় স্বীকৃতি আর তার ক'ছে এল না পরিবারে এল তার স্ত্রীলিঙ্গ। বাবারের কৌটোটা কাপড়ে জড়িয়ে স্ত্রীলিনের মত প্রবোধের হাতে এসে পৌঁছাল বটে কিন্তু পেটা স্ত্রীলিকার হারকং। এমিক এমিক চেয়ে প্রবোধ তার স্রোকে ধারে কাছে কোথাও দেখতে পেল না। লামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে প্রবোধ তার বাবার ঘরে এসে দেখে বাবাও তৈরী হয়েছেন। স্ত্রীলিনের হতো আককেও পিতাপুত্রের একই সঙ্গে দুর্গা ত্রিহরি শ্রবণ করে বেরলেন বটে, কিন্তু প্রবোধের মনের মধ্যে এক স্তম্ভতার যেন কে চাশিয়ে দিয়েছে। তার মনে আক বিশদ্বাস্ত শক্তি নেই। বিকাল বাড়ী কোথার পর থেকে রাত্রে খাওয়ার সময় পা প্রবোধ তার স্বীকৃতি দেখা পেল না, সেও প্রায় অতি

কয়েই বাইরে ভালক ও পিতার পাশেই তার খাটিয়া পেতে
শয়ন করলে এবং এমনভাবে নির্ভীক হয়ে পূর পূর ঘুমিন
এক দুর্ভাগ্য কেটে গেল। শালা, শালী, খাতিয়া এবং
হুগত বা পিতাও মনে মনে দুঃখলেন যে খাম্বী-স্রী
স্বাধীন্যে বোধ হয় যেন কি একটা মান অস্তিত্বের
ব্যাখ্যা চলছে। প্রবোধ একবার শৌখের বোকাবো
চোঁকা করেছিল যে, যাকে কুটুম্বা বাইরে থাকবে, আর সে
কেমন হবে ঘরে শোর, কিন্তু খুঁজি। কেউ বিখাস করলেন
না, বুঝা গেল না। অন্ততঃ এটা ঠিক যে, শালিকা তার এই
মহতী আত্মত্যাগ আঁধো বিশ্বাস করে নি, এবং সে এর
মর্মেণ্ডাটনের চোঁকাও কিছু করেছিল, কিন্তু কিছুই বুঝে
উঠতে পারে নি। অন্তরে মকলেই নির্ভীক ছিল, কারণ
বিবাহিত ব্যক্তিরাজেই মনে যে পৃথিবীতে একমাত্র
ঘোণীরাই মৌন হয়ে থাকে না, মন্দভিত্তিও মধ্যে মধ্যে
মৌন হয়ে পারে এবং হুগত।

ঘুমিন চুপচাপ থাকার কলে প্রবোধ বড়ই ব্যস্ত হয়ে
পরগো, তার কেবলই মনেহতে লাগলো যেন কতকাল, কত
দীর্ঘ বৃণ ধরে সে একাকী মকবৃষির ভণোর বিধে কেবলই
বৈদম্বিন শুক কর্তব্য পালন করে চলেছে। এ মৌনতা যে
কবে ভাঙবে, কে ভাববে, কি ঘটন করে নিগের মানদম্বনে
বজার বেধে স্রী মকে আবার পূর্ণের স্রার মেরামেশা হক
হবে, তার কোন দৃষ্ণ পছাই সে আবিষ্কার করতে পারছিল
না। এর পূর্বে এই পাঁচ বৎসর বিবাহিত স্রীনের মধ্যে
যে এমন দুর্ঘটনা ঘটে নি, ত না, কিন্তু এবাংকার
মৌনতার শুকর যেন মর্দবীক; অজ্ঞাতব্যাবের মত একবার
ভাকলেই মমন্ত জোলের অবলান হবে বলে মনে হয় না।
অপর পক্ষে স্রী কেবলই মনে দতে লাগলো যে, এ
ঘটন মৌনতা ত এর আগুও হয়েছে, কিন্তু তখন খাম্বী
একদিন পূর্বে আদ্য করে তাকে নিয়েছে কিন্তু এবার
যে অন্ত ব্যাপার। আরও ভালো এবং উপদ্রুত মনেব হাশুয
মিলে গেছে, তাই পূর্বা হুটি মিন, দীর্ঘ আটচ'ল্লিটি খটী
এক এক পার হয়ে গেছে, কিন্তু খাম্বীমেনতা তাকে
ভাকার কোন প্রাণেই আর বোধ করেন নি। বাক্তে
স্রীকে বুকের গুণের চলে হয়ে হাপুল মনে মৌরবে
ই বউ, মনে মনে বলে তুইই আমার লব, তাকে

বড় করণো, মাল্লব করণো তোকে দিয়েই আমার নকুন
করে গড়ে উঠবে আমার বুড়ো বরদের মঙ্গার কারণ
ঘোঁরনের মঙ্গার আমার শেষ হয়ে গেছে। খাম্বী আমার
পয় হয়ে গেছে, চোঁখের মাম্বের খাম্বীর এই বক্য আমার
আর দগ্য করতে পারি না। এক একবার বলে 'তগগান,
আর আমার কিছুই চাই না এবার আমার কুলে নাও,
তোমার চরুণে ঠাই হাত। বাংলা দেশের নিভাত রমণ-
শীল হিন্দু পৃথিবীরে বেঁচে, এর চেয়ে বড় চিন্তা বা অন্ত
মহাধান আর কোথায় পাবে?

প্রবোধের শালা তার মা ও বোনকে নিয়ে হরিবারে
মানে তাঁর করত। প্রবোধের স্রী তার দালা এবং
মকরকে করে মঙ্গো দেও যেতে চায়। নীরোবাবু
মন্তে মেন যেতে পারো, আমার কোন আশক্তি নেই, তবে
প্রবোধের মত নিজে?

বউমা মৌরব। নীরোবাবু মন্তে, পেরার আপত্তি
না থাকলে যেতে পারো, মাত্রা খাওয়ার ঘম্বা বা হয় কথা
মাবে' মন।

প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করলে তার শালী। বয়ে
ভাম্বীরা, হিদি আবারের মলে হরিবার যেতে চায়, আপনি
মিহিকে হুটি বেয়েন কি?

প্রবোধের অন্তরম্বা একবারে হাই লাউ করে মলে
উঠলো। তবে কি প্রবোধ এখনই মুনিত, এখনই অকথা
যে খাওয়ার চুচীটা মর্দন্ত সামগ্রিক ভাবে নিতে হবে, তাই
কোন রকমে অন্তের হাবকৎ নেওতা হুজ। আশা, এর
প্রতিকূল সে হবে। এ অপমানের শক্তি ঐ শুভভাগা
বউকে নিভাই পেতে হবে।

তাকে নিরন্তর বেধে ভালিকা আর একবার মন্তবোধ
মানাই প্রবোধ বলে, মকলে, আমার কোনই
আশক্তি নেইন

খাড়াগ থেকে প্রবোধের উভারিত মন্তগো মকর্বে
মনে তার স্রী চোঁখ কেটে মল এল। মনে হোল, বউটি ত,
আমাকে আর কি মকরা?

শালী বয়ে, মাত্রা মাক্তর অন্ত—

কথা শেষ করতে না নিয়েই প্রবোধ মলে, সে বাসম্ব।
মবে' মন। আপনপাশের অনেক মাক্তরই তাঁরুী আছে,
হুটার মনের অন্ত কিছু মঙ্গা মিলে টের পাওয়া মাবে।

কথাটা যেন প্রবোধ দ্বারা জোর দিয়েই বর্ণন, কাউকে আশাত বেষ্টার উদ্দেশ্যে। উদ্ভূত দ্বন্দ্ব হোল। অন্তর্গলে ষট্টিয় বুক ফেটে কাছা বেবিবে এস, সে এ বাড়ীর বিনা মাইনেই চাঁদুদী। পরক্ষণেই মনে যোগ, হঠাৎ এই উপলক্ষ্যে প্রবোধ দ্বিতীয় শিববাবু বাড়ীর ঠান্ডারকে, সেই হস্তান্তর ছোঁচকাটাকে বোধদ্বন্দ্ব নিছক করে ওষেধ লকে বেনী করে মেলায়েবার জুগেণ করে নেবে; বা যে, তবে ত প্রবোধের সুবিধেই হবে।

চুপে প্রবোধের স্রী বৈকে বসলো। না, আমি আর হরিধার-টরিধার কোথাও যাবো না, আমি এইখানেই থাকবো।

ওই মা কদিন বেরই মূর্ততে খেয়েছিল বে কোথাও যেন বেশ বড় বকসের বেনুয়া বাজছে। তিনি যেহেতু অনেক করে সুস্থিরে শেষে বসলেন, অনেকদিন এক আত্মগার আঁদিল, কদিনের ভ্রম একটু ঘুরে আসবি চল, শবীর মন দুইই ভালো হবে। যোন বসলে, হিহি তিন কতক সংলাপ ছেড়ে বেবিবে পড়, জাখাইলা কুহু, কত ধানে কত চাল, তখন আবার ভোর নতুন করে আরও বাড়বে। ছোট যেহেতু ধমক দিয়ে মা বসলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বোমাই মনাই যখন মত দিয়ে দিয়েছেন—

জুঃ ও ক্ষোভে দ্বিধাধার ষট্টি চুপুচুপু ত'লো করে না বৈধে জু'খানা আদমরঙ্গা কাপড় এবং ছেলের দুটো ঝাঁপ নিয়ে দাঁড়া বা শু ছোট বোনের সঙ্গে হরিধার চলে গেল সেদিন সাঁদ্যার টেনে। কথা হোল যে জু'খিন পরে অর্থাৎ রবিবার সকালে কিবে আসবে।

একি প্রবোধের কালংক্রি আর কাটতে চর না। প্রবোধ ছোট্টো নিত্যক নিত্যই গোছেব লোক। জীবনে তাকে কোনদিন কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় নি, অর্থাৎ দাঁড়াবার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে নি। যা বাপের এক ছেলে, চার বছর পূর্ণ পর্যন্ত তার মা জীবিত ছিলেন, এখনও বা কিছু মতামতের ব্যাপার সমস্তই বাবার কাছে। কোনদিন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মাথা দেওয়ার দরকার সে পোষ করে নি, কোন বকস খাত প্রতিক্ষাতের সম্মুখী সে হয় নি, এমন কি চাকরী পর্যন্ত তাকে খুঁজে বাত করতে হয় নি। নিত্যক গোয়েন্দারিত্যবেই সেবি-এ

পাল করে বিনা ইটামতিউতে সে আর থেকে পাচ বছর পূর্বে এই সরকারী চাকুরীতে বহাল হয়েছিল এবং অফিসের বাবার ছায়ায় নীয়ে নিজে কাকটু চালিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত একলা সে ট্রেজারিও করে নি। তার তর বেড়েছে বটে কিন্তু মনে প্রাণে সে এখনও শক্ত। তার এই মনু বিপদে তার এখন একটা বন্ধুও নেই যাকে কি না এই সব ব্যাপার সে গ্রাণ খুলে বলতে পারে। বেচারী দিনরাত ডেবে ডেবে একবারে ভ্রান্ত হয়ে পড়লো।

শনিবার সকালে যখন তার বিভিন্ন রক্তরীর অবদান হোল, তখন তার সমস্ত রাগ গিরে পড়লো ঐ পাশের বাড়ীর বউয়ের ওপরে। সে মনে মনে ঠিক করলে, সে সমস্ত কথাই শিববাবুকে বলবে। কিন্তু মুখিল এই যে, যাকে যে সময় কথা সে শুঁছিরে ভেবে ঠিক করে, সকালে দিনের আলোর সেই কাল কংতে সে কিছুতেই পারে না। কাকটু লগে কোন কথা বলতে গেলে সে যেমন করে ভেবে নিয়ে প্রস্তত হয়, সে-সব কোথাও কেমন যেন ভুলিয়ে গিরে এখন কিছুই কিস্বাকার হয়ে যায় যে কিছুই বলা হয় না এবং নিজে নিত্যক খেলো হয়ে পড়ে। কাকটু লগে কোন কথা শেষ করে বলে আসার পর তার কেবলই মনে হয় যে, এই সব কথাতলো আন্তে বলা যেত, এইভাবে ব্যাপারটাকে আরও স্পষ্ট করে সুটরে তোলা যে এবং এইভাবে চিন্তা করতে করতে সে প্রত্যাংবেই ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করে যে অস্ততঃ একশো একটা জিনিষ তার বলা হয় নি, এবং সে যা বলেছে সেটা বলায় গেরে কোন কিছু না বলাই ছিল ভালো, এমন কি সেই ব্যাপারে তার মাথা কেটে এই উচিত হয় নি। তার নিজের এই দুর্বলতা সবচেয়ে বহুবার বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার এই জানই হয়েচে যে, সে শুঁছিরে কথা বলতে পারে না; কামেই সে ঠিক করলে যে, সমস্ত কথা সে শিববাবুকে চিঠি গিখে জানাবে। সেই ভালো, শিববাবু তার নিজের ঘর সামলান, না হাত এখন থেকে উঠে অত্র কোথাও চলে যান।

ভোরবেলা অত্র সমস্ত কাজ বাধ দিয়ে নিজের ঘরে গলে প্রবোধ শিববাবুর নামে চিঠি লিখতে লুফ করলো। কলমে, যে কলমে দৌরী কান্দী টিকানা লিখেছিল, কলম হাতে নিয়ে প্রবোধ ঠিক করলে, সমস্ত

কাহিনী, বেগু কণা, সবীবেহ কণা, চাহরণের কণা
সমস্ত কণাই সে লিখে শেষ পর্যন্ত শিববাবুকে ভয় দেখায়ে
যে, যদি তিনি তাঁর ক্রীকে শোধনহতে না পারেন, বা এ
পাতা থেকে উঠে পড়ত চলে না যান, তাহলে তার গুণের
অভ্যাচার ভরা হবে। এই সব লিখে সে ভগ্নার নাম ছিল
'আপনার বন্ধু' বলে। চিঠিখানা আগাগোড়া ইংরাজীতে
লেখা হোক, কারণ ইংরাজী ছাড়া বাংলায় এ-ভাবে লেখার
মত আত্মবিশ্বাস প্রবোধের ছিল না। লিখতে লিখতে
বেগু লাড়ো লাঙটা থেকে গেল। নীরোবাবু ছেলের
সংযোগ নিলেন হুবার, দ্বিতীয় বায়ে বললেন, কি লিখছিল যে
এত ?

প্রবোধ তাহ চিঠিখানা অন্ন আড়াল করে বললে,
একটা চিঠি একজনকে লিখছি।

নীরোবাবু যখন :কৌতুহল হলেও আত্ম কোন প্রশ্ন
করলেন না।

এর পর প্রবোধের মনে হোল 'হাতের লেখা থেকে যদি
শিববাবু টের পান যে এসব প্রবোধের কান, তা'হলে ?

প্রবোধ ভাবলে, ঠিক আছে, টাইপ করে দিতে হবে।
কিন্তু কে টাইপ করবে ? তাহ নিজেই শু যেদিন নেই
এখ সে নিজে টাইপ করতে মানেনও না। ভাবতে ভাবতে
উঠে প্রবোধ মূখ ধুয়ে দৌড়ে বাজার গেল। বাজারে
গিয়ে সে যে কি কিনলে, তা নিজেও বুঝতে পারলে না।
ঐ একমাত্র চিন্তার বোকা নিয়ে সে বাজার থেকে যেদিনেই
একেবারে শিববাবুর ঘুমোমুখি হয়ে গেল। অল্প দিনের
মত একবার মাত্র মূখ জুলে ভালো আছেন কণাটা উজ্জ্বল
করেই সে বাড়ীর দিকে এগুচ্ছিল, হঠাৎ শিববাবুই গকে
ডেকে বললেন, আজ প্রবোধ, তোমাদের বাড়ীর লাইট
কি সব লিখে গেছে ?

প্রবোধের মনে পড়ে গেল, সে তাঁর বাড়ির আলো
জ্বলে বণে বণে শিববাবুকেই চিঠি লিখছিল। মূখ জুলে
বললে, না ত।

শিববাবু বললেন, তা হলেই হয়েছে। নিশ্চয়ই
আমাদের বাড়ীতে ফিউজ হয়েছে শেষ রাত্রে। আমি
ভেবেছিলাম আমাদের দিকের সব লাইটই বোধ হয়
গিয়েছে, তা নয়। বাকী তা হলে আমাদেরই দেখছি সব
দিতে হবে।

এর পর দুজনেই একসঙ্গে বাড়ীর দিকে রওনা হিলে।
দুজনেইই বাজার শেষ হয়ে গেছে। পাশাপাশি হাটতে
হাটতে প্রবোধের মনে অন্ন অন্ন শব্দ আসতে লাগলো।
জোর থেকে বলে বলে ছুঁতিনবার করে শুদ্ধি- শুদ্ধি সে
চিঠি লিখেছে, চিঠির ভাষাটা তার প্রাচী মূখ্য হয়েই আছে,
তাহলে ভুলটাই থাকিলেও ? বলুক না সে, কি আর হবে।
মজা কথা, জোর করে বললে, তার মাথা আছে সে কণার
নড়তে করে। একটু ভেবে চিন্তে সে বেগু কণা দিয়ে
ব্যাপারটা বুঝ করলে। বাহর-পাশে আর ত কেই নেই।
লক্ষণ বাজার নিয়ে এগিয়ে গেছে, আর শিববাবু বাজার
তার নিম্নেই হাতে।

বেগু কণাটা উঠেই সর্বাশির ঘুণাচূষে বললে, এ সব
শ্রীয়ে কথা আর তুলো না, ওপর আল'তনাত্তেও পাপ।

এই হুযোগ, প্রবোধ বললে, শিববাবু, একটা কথা
বলবো, কিন্তু মনে করবেন না। আমি—মানে বাবা
লোকের কাছ থেকেনা বকম কথা শুনতে পাই—আগনি
মাকে মাকে দুপুরে যে-টাইদে এক একবার নিজের বাড়ীতে
এসে নিজের বাড়ী গুহুতে পরীক্ষা করে দেখবেন। কথা-
শ্রুতোর শেষের দিকে বেশ একটু ক'জ আছে।

তাহ মানে ? সর্বাশির বকম দাঁড়িয়ে পড়লো।

তবে এতটুকু হয়ে প্রবোধ বললে, না, মানে অনেক
বকম শুনতে পাই কি না—

যাতার ম'কম মনে সর্বাশির প্রবোধের মামনা সারনি
দাঁড়িয়ে স্মৃতিভাবে রিজাসা করলে, ব্যাপার কি, ভুল-
লোকের বাড়ীর মধ্যে এ বকম কথা যে তুমি বলছো, এ
কোন প্রশ্ন আছে ?

প্রবোধ প্রবোধ গুলে। মূখের উগাং সফালের লেখা
চিঠির ভাষাটা এসে গেল, সেই চিঠির লিখিত ইংরাজী
ভাষাতেই সে বললে, যাতে মাকে বাড়ীতে এসে দুপুরবেলা
নিজের ঘরের জানালা দিয়ে দেখবেন তাহলে প্রবোধ
আপনিই মিলে যাবে। এইটুকু বললই সে ঘনবু করে
এগিয়ে পড়লে, যেন ছুটে পাগিয়ে যেতে চায়।

শিববাবু যাতার ম'কম মনে দুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লো।
একটুখানি শিব বাজার পর তাঁর সমস্ত মুকটা খালি করে
একটা নীরবিশাল খেদিয়ে এলো। তাহপর সে দীর্ঘ দীর্ঘ
বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

বাজী ফিরে মহাশিব জালো করে গোদীর সঙ্গে কথা কহিতে পারলে না, কোনকালে জানাচোর শব্দ করে গোদীকে বললে, আজ মনিষার বাটী কিছু আনার বাড়ী কিস্তে চাওটে পাড়ে চারটে হবে।

গোদী বলল কেন?

কাজ আছে।

মহাশিব গোদীর মুখের দিকে লক্ষ্য করে আপন মনেই বুকে নিলে, এই মাঝেই বেশ কিছু ঘুনিই হয়েছে। আর কোন বাঁকাপার না করে মহাশিব সত্যতা অকিলের দিকে তরুণা দিলে।

সেটা সাজে বাহোঁটার মধ্যে মহাশিব তার সমস্ত হাতের কাজ শেষ করে ওপরওয়ালায় সঙ্গে দেখা করে অনেক অল্পবয়স্ক বিনয় করে সকাল সকাল ঘাওয়ার জন্য ছুটী চাইল। অল্পবয়স্ক বিনয় বরফার ছিল না, কারণ মহাশিবের বাহাবয়সী হেফজী ভালো, কানেই লক্ষ্যে সঙ্গে ছুটী পেয়ে গেল।

এক দূর ভয় ও আশঙ্কা নিয়ে, একগাল লম্বা এবং কেরা পুখে মহাশিব জরতরে বাজীর দিকে তরুণা দিলে। একটা বেহাও ছুঁটার মিনিট হয়েছে, এখন সময় সে তার বাড়ীতে গেল উপস্থিত হোল। নিশ্চয়পক্ষে দুক দুক বন্ধে হস্তভাঙ্গা মহাশিব নিজের বাড়ীর দিকে দেখে একটু চিন্তিত হোল, সমস্ত দরজা জানালা ভেঙার থেকে চোপে বন্ধ। বিকালে দে বখন অকিল থেকে কেবো তখন ও এ বকন বন্ধ থাকে না। বাই বাঁক, মহাশিব আগে বাইরের ঘরে দরজার তল থেকে পোনবার চেষ্টা করলে, ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ কিছু পাওয়া যায় কি না কিছু কিছুই পাঠ পেলে না, তারপর এলো নিজের ঘরের জানাঘার। বিশেষ কিছুই সন্নিগত হোল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পাশের জানাঘার একটা সামান্য কঁক আছে, দেখান দিয়ে আর লক্ষ্যেও হুঁধোর প্রথম আলো ঘরে এনে ওদের হুঁধোর ঘরের মাঝে জানিয়ে দিয়েছে। নিশ্চয়পক্ষে মহাশিব গেল পাশের জানাঘার। সেই কাটা জানাঘাটা আবার নিচে থেকে দাঁড়িয়ে টিক নাগাল পাওয়া যায় না। জানাঘা ঘরে বেওয়ারেল মাঝে পা দিয়ে উঠে হয়ে অনেক চেষ্টা ঐ মোটা মোটা হস্তাঘোষী মহাশিব ঘন-দেই হস্তাঘোষী দৃষ্টান্ত রাখা করলে, তখন ভেতরের অন্ধকারে

ঘরের কোন কিছুই সে দেখতে পেলে না। অবচ ঘোঁষা দেই কাটাঘর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে অন্ধকারটা নিজের গুটিতে রপ্ত করে নেত্রে এতই পরিষ্কার নাশে যে সেই দুর্ভাগ্য মহাশিবের নজিতে প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হোল।

হুতাপ হয়ে সে জানাল থেকে নেমে এলো, এবং নেমে এটিকে দরজার কাছে এসে সমস্ত রূপ ঐ দরজার ওপোর বাড়িলে। হুন্ হুন্ করে ঘরে বাঁহাওয়ার কড়াঘাত করে অসহায়ের মতো সে এটিকে ওটিকে চাইতে গিয়ে দেখলে, লামনের কোয়ার্টে'ল মদীর লাইকেল হাতে হা করে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিম্মিত মদীর মহাশিবকে ঐ উল্টো বিকের জানাঘার গিয়ে বাড়ীতে পেয়েছিল, এবং ওটা মহাশিবের পক্ষে এমনই একটা অসম্ভব ব্যাপার যে, মদীর এতে ভীতিস্ত ভর পেয়ে গেছে এই ভেবে যে, বাড়ীতে বাহবয়সী কিছু একটা বিশেষ হাত হয়েছে এবং মহাশিব হস্ত বস্তার পর বস্তু হস্তার লাক্ষ্য দিয়ে কোন সাড়া পাঠ নি বলেই মিতপার হস্ত ওটিকে গিয়েছিল।

মহাশিব নিজেই চোখ খুলিয়ে নিয়ে দরজার ওপোর পুনবার সম্মোরে আঘাত করলে। এর পর গোদীর সাজা পাওয়া গেল। নিতান্ত বিরক্ত এবং ভীত হয়ে সে প্রস্থ করলে, কে, কে, কে বরজা নাড়ছে। লক্ষ্যে সঙ্গে তার ঘরের জানালা খুলে গেল?

মদীর মুখ মহাশিব বললে, দরজা খোল।

গোদী আর কোন কথা উত্তর দিলে না, মনে হোল যেন নিজা ঘর থেকে ঘেঁষিয়ে এ ঘরে এসে এ ঘরের দরজা খুলে কি জানি কোন দরজা চোপে দাঁড়িয়ে বললে, এ কি, আজ যে এর মধ্যে এসে গেলে, এই না বলে গেলে চারটে সাড়ে চারটে মদীর আদর্শে।

হাঁ, দরজা আছে তাই এদিকি, এইটুকু বলেই মহাশিব যেন জোব করে গোদীকে ঠেলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে গেল।

গোদী শুধু এই ঘেঁষেই কাটাকাটে চার, কিছু চেষ্টা করেও পারলে না, মহাশিব অস্বাভাবিক জোর দেখিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘরে ঢুকেই সে চারিক তার তার করে দেখতে লাগলো। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা লিখা

খেতে গছ তার নাকে এলো। এদিক ওদিক দেখতে গিয়ে ঘরটার পাশে সে একটা দিগারেটের পোড়া টুকরো দেখতে পেলেই শক্রের গৌরীকে বললে, আমার ঘরে দিগারেট খেয়েছে কে ?

গৌরী একবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। দিগারেট, কই ? কে, কি জানি ? জানি না তা।

সমীর এসেছিল ? সন্ধানিত প্রণ করলে।

সমীর ? অচাক করলে ! তুমি কি মনে কর এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঃসাবার ঘন তার আছে ? তারপর যেন নিজে মনেই গৌরী বললে, ওঃ, কি নোংরা মন তোমার, এত নীচ, এত ছোট জুনি ?

সন্ধানিত তার কৌতুহল হয়ে গেল। একমাত্র সমীরকেই সে দিগারেট খেতে জানে। তবে কি সমীর হাক্ক আলিতে বেধে ওর বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্তর্গত নিজের ঘরমাত্র গিয়ে হাফিজ হয়েছিল ? না, সে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু দিগারেটের টুকরোটা এলো কোথা থেকে ?

গৌরী সন্ধানিতের কাছে এসিয়ে এসে চঠান খুঁজি করে তার মাঝার হাত দিয়ে বললে, হ্যাঁ গা, তুমি কি লাগল হয়ে গেছে ? এই বুড়ো বয়সে তুমি আমার এতকাল পরে সন্দেহ করতে লজ্জা করলে ?

সন্ধানিত একেবারেই সন্ধানিত। গলে জল হয়ে বললে, তবে সব পাড়ার লোকে তোমার কাছে যা তা বলে কেন ?

অচাক হয়ে গৌরী বললে, আমার মনে ? আমার নামে আমার কে কি বললে ? ঐ কানী মাগীটাকে নিয়ে তোমার বন্ধ সব যা তা কাণ্ড করবে, তার কোন কোষ নেই, আর আমি বোলে কুণে মরছি, বাড়ীতে একলা পড়ে বাকি, আমার নামে যা তা অনবদ্য কে বটাচ্ছে বল দেখি ?

সন্ধানিত হাড় ঠেট করে বইলো, কোন কথাই বললে না।

একটু পরে যেন আঁচল দিয়ে চোখ মুছে গৌরী সন্ধানিতের মাঝার শিটে হাত বুজিয়ে বললে, দ্বিধ হও, ঠাণ্ডা

হও, বুড়ো বয়সে এরকম পাগলামি কারো না। নাও, মাথাটা মাথো। এঃ, মাঝা মস্তাহে জানাটাঃ খুলেও ঘরমাত্র ডিরকুট হয়ে গেছে, বলতে বলতে গৌরী দ্বিধঃ সন্ধানিতের কোটের বোতাম খুলে দিতে লাগল।

জামা খুলে জল খেয়ে সন্ধানিত নিজেও ডিঃসাবার অনেকক্ষণ ঘরে শুয়ে বইলো। বেশ তিনটার সময় উঠে দেখে গৌরী চুপ বেঁধে গা মুখে ফিটকাট হয়ে তারমাত্র কি সেন করছে। সন্ধানিতকে দেখে গৌরী বললে, যা করে যেন ?

সন্ধানিত মিঠি বাতহায়ে গলে গিয়ে বললে, কঃ, তা তারমাত্র কোথায় ?

কে জানে ? সে ত দেই খেয়েই বেরিয়েছে।

ও বাটাংকে দিয়ে আর চলবে না, সন্ধানিত আপন মনেই কথাগুলো বলে কক্ষরে গিয়ে ঢুকলো।

পাঁচটা মাগাম নীরোদবাবু সে ডাক দিলেন, নিববাবু।

সন্ধানিতের মনটা ভেঙেটা হয়ে উঠলো। তাইই ফেলের মস্ত ত আদ এত বিপদ। ছোটখাটু করে কি একটা কথা বলে কোথা থেকে কি যে করে দিলে ! ঘাই বোকে মাহুদ লতা জাতি, সন্ধানিত নীরোদবাবুর আশ্রমেরে সাদা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েও এলো এবং তারপর দ্বিধাভিত্তি পনিবারের অপরাধ প্রবণ বেরিয়ে হুঁতনে এসে ঢুকলেন বিড়লা ম'ময়ে। লেখান থেকে সন্ধানিত মস্ত কলৌম'ম্বরেঃ মার্টের আগেরে এসে বললোও চ'তনে এবং আঁটটা মাগাম্ব নিজেই বাড়ীতে এনে লতায়া যা বিলে। তারমাত্রেরে তারমাত্রা শেষ হয়েই অন্তরে আগমাদি শেষ করে সন্ধানিত নিজেও পরনককে প্রসেনও করলে। কিন্তু তারমাত্রের কাছে দুঃভেই সেই দিগারেটের টুকরোটা যে তাংগাচ পড়ে ছিল, সেই পাঁচমাটা সন্ধানিতের মনের ভিত্তিরে কেনন যেন খুঁজ করতে লাগলো। তখন অস্ত্র টুকরোটা আর ছিল না। না বাটারই কথা, কারণ সন্ধানিতেরে ঘর ঘোর তাঁট হেওরায় সময় সময় আবর্জনার দিকে সঠিকও অজহিত হওয়াই উচিত। (ত্রমণঃ)



রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী লীলা বিহঙ্গম

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভ্রামল তখন কবিতা দ্বারা কবেছে।
উজ্জ্বল পৌরুষ কবির ভাল লাগেনি, বতকণ না তার
ওপরে পড়েছে ভ্রামলের ছায়া।

“আমি ভালোবেসেছি বাংলা দেশের মেয়েকে
যে মেয়েকে সে আমার ‘চোখ তুলিয়েছে
তাতে আছে স্নেহ ওই রাতিঃ ভ্রামল অন্ধন।
ওর কচি হানের চিত্রণ আস্ত।

তাহার কালো চোখের ককণ মাধুরীর উপমা কেবেছি
ওই রাতির দ্বিগুণে।

নীল বনদীয়ার, গোবুলিখ দেখে আলোচিত্র নিবলনে।”

কবি কেন যে তার শেষ বেলাকার বহুখানি রাতির
বুকে বেঁধেছেন, কবির সেই স্বত, স্বাধ নাম ভ্রামলী, তার
কথা বগুতে দিয়ে কবি বাংলাদেশের মেয়ের ওই অপূর্ব
বর্ণনা দিয়েছেন। কবির কাছে রাতির সব কিছুই ভালো
লগেছে। তাই ওই রাতির রংয়ের সঙ্গে মিল আছে
হাসের সেই ভ্রামল। বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কবির এত ভালো
লগেছে। তাহের গায়ের রং যেন রাতির বুকে ক’লে ওঠা
কচি হানের রংয়ের মত। বাঙ্গালী বৈষ্ণবের ককণ কালো
চোখের যে মাধুরী কবি তার উপমা বুঝে নিয়েছেন

গোবুলি বেলায় রান হয়ে আসা আগের মধ্যে। যে
আগেতে মিশে আছে আগল রাতের ছায়া যা কবি
বেঁধেছেন দুই দিলতে নীল বনান্তের শিখরে।

কালো চোখ মেখে শুধুই যে কালো রংয়ে অস্তিত্ব
বাঁধালা কবি দৃঢ় হয়েছেন, তিনি নিজে বাঁধালা বলেই তা
নয়। ইউরোপের এ দুগে দর্পশ্রেষ্ঠ লেখক বার্নাড শও
কালো চোখের সঙ্গে দৃঢ় হয়েছেন। কচি চোখ ও নীল
চোখকে তিনি বলেছেন যেন দুটো পাখরের চাঁকরা
বসানো। কালোর মধ্যে রয়েছে অতল গভীরের ছায়া।
সেই তো গভীর মানস দারের ছায়া।

কবি বলেছেন মেয়েরা যখন লসারের মধ্যে সেবা
করাও, তখন কতবার অবসর পায় তখন তাহের জীবন
সার্থক হয়, সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন
মেয়ে স্বামী এং লসারের কাছে থেকে কেবল সেবা পেতেই
থাকে, তা হ’লে তার জীবন ব্যর্থ হয়।

গল্পগোষ্ঠীর মধ্যমতিনী গল্পে কবি শৈলবালায় চরিত্রের মধ্যে
এই কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। শৈলবালাকে নিবারণ দিতার
পক্ষে বিবাহ করেছে। লসারের লম্বা হার গ্রহণ করে
তার প্রথম পক্ষেই স্বীকৃতি দেয়। শৈলবালা তার

এবং স্বাধীন কাহ্নে কেবল সেখা বহু আর সোহাগে গমন।
এই সব থাকে। এখন কবে তারও যে কোন প্রতিদান
কোথাও আর আছে এটা সে বিশ্বাসই পেল না। তাই
স্বাধীন বিশেষের দিনে যখন হরহৃদয় স্বাধীনকে নিয়ে শৈল-
বাগ্যে কাছে গমনাওগো চাইতে গেল, তখন সে সমস্ত
কথাই উঠবে কেবলি বলল—“সে আমি কি জানি?” কবি
লিখেছেন—সংসারের কোন চিন্তা যে তাৎক্ষণিক কখনো
জাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল? সকলে
আপনার ভাবনা জাবিয়ে এবং লগলে মিলিমা শৈলবাগ্য
আবার চিন্তা করিবে, অক্ষয়-ই হোক বাতিফর হইল একী
ভাবনিক অস্ত্র। কবি লিখেছেন কেবলি পাবার মধ্যে
কেবলি চাওয়া থেকে গঠে। তাই কেবলি অসন্তোষ বড়ে
উঠতে থাকে। কবি লিখেছেন স্বাধীন অস্বাভাবিক বধে
হাওয়ার পরে “কোটা বোয়ের অসন্তোষ এবং অস্বাভাবিক
শেষ নাই। সে কিছুতেই স্থিতিতে চায় না, তার স্বাধীন
অস্বস্তা নাই, অস্বস্তা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন?”
কবি লিখেছেন—শৈলবাগ্য বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত
সোহাগ আরও লইয়া পরম অস্বস্ত ও অসন্তোষে বালিকার
স্বস্ত অসম্পূর্ণ বার্ষ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।”

কবি লিখেছেন এই রকম সেরেমানসের সংসারে
মুলা নেই। সে শুধুই পেরেছে, কিছু হিতে শেখেনি, সে
সংসারের বুকের ওপরে যেন একটা ভারের মত চাপে
থাকে। যে দুঃখ স্বাধীন শৈলকে নিয়ে আরও সোহাগে সব
হয়ে উঠেছিল, শৈলের দুঃখের পরে হঠাৎ সে একটা আঘাত
পেল বটে, কিন্তু পক্ষেই একটা স্থিতির আরাধন পেল।
আর যে মেয়ে তার ডাঙ্গা হিমে সেবা হিমে সংসারকে ভাবে
রেখেছে স্বাধীন মনে তারি জগৎ চিরদিনের যাবন।
নিরাশ্রয়ের মনে হ’ল শৈলবাগ্য যেন তার জীবনে একটা
দুঃখের। আর হরহৃদয়—“সেই তো তাহার সমস্ত সংসার
একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত অংশ
দুঃখের প্রতি-সম্মিলনের স্বাক্ষরানে বলিয়া আছে।”

তাসেই মেয়েদুঃখের সংসারে বড় অধিকার প্রতিষ্ঠা
হয়। সেবা হিমেই সে সংসারের স্বাক্ষরানে আপনায় স্বাধীন
পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে যে মেয়ের জীবনে ডাঙ্গা ও
বদল না আসে সংসারের মধ্যে তার ওজ্রে কোন
কোন স্বাধীন আশ্রয় পাতা হতেই পড়ে না। সে

চলে গেলে সংসার হাঁক হেঁকে বাঁচে।

শৈলবাগ্য, এই সৌখিন নাম আর হরহৃদয়ীয় বোটা।
নাম হিমে করি নারীর দুই ভ্রমণেই বর্ণনা করেছেন।
পুরুষের কাছে তার মুখা বেনী তাই কবি এই গল্পে
লেখিয়েছেন। সুখের দিনে উন্নত পুরুষ বোধনের মাধ্য-
মের মুখ হয়ে, দেবারতা নারীকে ভুলে আবেগময়ী
স্বকণীকে নিয়ে যুগে থাকে। কিন্তু দুদিন বই আসে তখন
সে বোঝে এই বিলাসিনী তার কোন কাজেই লাগবে
না। তখন তার মনে পড়ে দেবা নিষ্ঠা নারীকে। বিশেষ
দিনে তাই নিরাশ্রয় শৈলবাগ্যের কাছে যেতে তার পাঠ,
কাজ সে শুধুই তার বিলাস সঙ্গিনী। সে দিন সে হর-
হৃদয়ীরাই পরগণার হয়। এর থেকে কৃষি নিরাশ্রয়ের
শৈলবাগ্যের প্রতি যে মনোভাব, তাকে পুরুষের নারীর
প্রতি ভালোবাসাই বলা চলে না। সে শুধু একটা কণিকের
বিলাস চকলতা মাত্র। রাহুয় দুঃখের দিনে যার কাছে
যেতে পারে সেই তো তার জীবন সঙ্গিনী। সেখানোই
তো রাহুয়ের আসল ভালোবাসা। কিন্তু মোহন্য পুরুষ
অনেক সময়েই বিলাসের ঠিক পাবে। মতকে ভুলে
সে মাঝকে নিয়ে খুঁটি থাকে। অশেষে এক দুদিন তার
চেতনা করে আসে।

রাহুয়ের ভালোবাসার প্রমাণ কোন্‌খানে এ কথা
বলতে গিয়ে পরেছে এই রকম কথাই বলেছেন। স্বপ্নচূর্ণ
গল্পে বনীর মেয়ে তার স্বাধীনকে ছেড়ে চলে গেল তার
বাগের বাড়ী। অশেষে স্বাধীন কাছে যে দিন সে ফিরে
এল সে দিন সে তার মন-এ-ক কাছে গেল। ইতিমধ্যে
তার স্বাধীন মেয়ের হয়ে মেলে গিয়েছিল। অনেক দুঃখ
দুদিন তার ওপরে এসেছিল কিন্তু স্রোকে যে কোন কথা
আনায় নি। মনর যখন মনল যে তার হাওয়ার বদল কিছু
জানেন না, হাওয়া তাকে কিছু জানায়নি, তখন সে বোকে
বলল—হাওয়া যখন এমন বিশেষের দিনেও তোমাকে খবর
দেন নি, তখন তোমার আর সেখানে হাওয়া বুঝ। পরে-
ছে বসতে চান, দুঃখের দিনে রাহুয় থাকে ডাঙ্গা করে তার
থাকে তার আর বিলাসের আশা দু’পা। তাই শৈলবাগ্যের
মত মেয়েদুঃখের জীবনে কণিকের দুঃখের মাত্র।
হরহৃদয়ীরাই আছে পুরুষের জীবন এবং সংসারের আসল
অসম্পূর্ণ অধিকার করে। এ গল্পে কবি উন্নত পুরুষ

আর দেবদেবীনা ভোগ দর্শন নারী ভূমণ্ডেই সাবধান করেছেন। যখনই হৃৎকরী মৈলকে দেবা করেই তার প্রতি সগমী ভূমণ্ডে প্রতিশোধ নিয়েছেন। তাকে সঙ্গের দার সঙ্গের দেবার হৃৎকরী থেকে বঞ্চিত করেই তার ভীমকে বঞ্চিত করেছেন।

নারী প্রকৃতির নিদারুণ অভিমানের কথা কবি বলেছেন পল্লভঃকর "শান্ত" গল্পে। যেখানে তার ভাসবাস দেবদেবী তার অভিমান দারুণতর। হৃৎকরী সাবধানের ক্রান্তি, অপমান ও স্ত্রীর অপমানের দ্বারা এসে স্ত্রীর মুখে কটু কথা শুনে তাকে খুন করে কেল। ছোট ভাই ছিলাম ভাইকে ইংগার ভক্তে 'নল্লের ত্রাক' বলল যে সে যেন বলে যে কণ্ডার ফলে দেই খুন করেছে। সে ভয়সা ছিল যেহে হৃৎকরী বলে সে ছাড়া পেয়ে যাবে। ছিলামের হৃৎকরী স্ত্রী ভয়সা খানীক কথা শুনে বহুভক্ত হয়ে বইল। এই খুনের শক্তি গ্রহণ করে সে আর একজনকে নিদারুণ অভিমান, 'নদারুণ শক্তি' নিতে দৃঢ় নিশ্চয় হল। তাকে উকিল, তার খানী ও ভক্তের যত বকমে বীভাবার চেষ্টা করল সে তারের সব চেষ্টা প্রাণপণে ব্যর্থ করে দিল। ছিলাম ভয়সাকে ভালোবাসত, চকর ও তাকে ভালোবাসত। সেই ভালোবাসার প্রতীতি ছিল যে অপরাধ করেছে ভয়সা তার ভক্ত তাকে নিহন্তের শক্তি ছিল। পরে যখন চকরার ভক্তের ও তার খানী খুনের দার নিঃসঙ্গের ওপরে 'নিতে চাইল, তখন চকরার সেই একই কথা যে খুন সেই করেছে। এই গল্পে তার বর্ণনা দেছেন চকরা আর ছিলামের বর্ণনা ছিল একই সদা শব্দিত ভালোবাসা। ভূমণ্ডেই যেন হত যেন "কখন হারাই"। চকরা যদি মানত যে ছিলাম তাকে ভালোবাসে না তাহলে এমন করে সে প্রাণ হিতে পাড়ত না। কিন্তু সে জানে এই অস্ত্রের শক্তি তার প্রাণে কতখানি বাজবে। তাই প্রণয়ামকে সেই আঘাত জানতেই অভিমানিনী নারী জানক। ভালোবাসার এই অপরাধ সে কিছুতেই ক্ষমা করেছে না এই তার দৃঢ় নিশ্চয়। ফলে সব আগে যখন কে এসে তাকে বলল যে তার খানী তাকে যেহেতে চার তখন সে "মন" বলে খুব কিরিয়ে দিল। শুধু বলল সে একবার তার মাকে যেহেতে চার। অতঃপর যখন কে ক্ষমা চাইবার হৃৎকরী সে যেহে না এখনি তার শিষ্ট অভিমান, নিঃসঙ্গ প্রাণ দিয়ে সে তার প্রাণে

যোগ্য দিয়ে যাবে এই সে ঠিক করেছে।

কবি বলেছেন বীরের ভক্তই নারীর প্রতীক। বীরের শক্তিই হতে পেলই তার জীবন সার্থক। নারীর প্রেম বীরেরই ভক্ত। ইংগারভক্ত আছে বীর ছাড়া আর কেউ নারীর যোগ্য নয়। দেইভক্তই সব যেহেতে প্রাণ ছিল যে নারীর দরমালা পেতে হলে পুরুষকে বীরের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে হবে। হৃৎকরী ভক্ত করতে পারলেই মিলবে শৌভ, এট ছিল নিশ্চয়।

কবি লিখেছেন—

হুমার তোহার প্রতীক করে নারী

অভিভেক্ত তব এনেছে তীর্থবারি

...

...

চারে নারী তব বৎ সঙ্গিনী হ'বে

তোহার বহু ভূপ চিহ্না লবে

অব্যাহিত পবে আছে আগ্রহের

তব ভাষার আশ্রয়নের তরে

গ্রহণ করিছো সমানে সমাধরে

ভাষাত করি বাখিরা শম্ব হবে।

(হুমার—১৮ শঃ)

হৃৎকরী বহু শাস্ত্রে আছে প্রতীক নারীভাগ্য, অর্থাৎ সন্তানের দার বের বলেই নারী বহুভক্ত, কবি এখানে হৃৎকরী বলে একমত নন। কবি বলেছেন বাতৃষেই নারীর চরম সার্থকতা এটা ঠিক নয়। যেহেতে মাংয়ের কাণ্ড এক কথা বলে গৌরব কবির কিছু নেই। মাংস্তো পুত্র মধ্যও আছে।

[ক্রন্দনঃ]



শ্রোণীভুক্ত 'অপরাধী' ভূমিকায় বর্তমান সমাজ চিত্র

জয়ন্তী চক্রবর্তী

'Crime Does not Pay' একটি প্রচলিত অপরাধী
ফিল্মের নাম অপরাধ করে থাকে। সে মনে করে, এটা
না করলে, এই সাময়িক প্রস্তুতিই তাইনা থেকে মুক্ত পেতে
না।

মহাশয় বিভিন্ন বিপুল মত—পাপও একটি বিপুল।
বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত—পাপও একটি বিশেষ ক্ষেত্র। শারীরিক
প্রতির মতল সংস্কারগতি বা কেন্দ্রবিন্দু (Main
centre) একটি বিশেষ 'কেন্দ্র' বিচ্ছিন্ন পিণ্ডাসার পাপবিক
ন্যায়—পরিপূর্ণতা পায়। যার একমাত্র নিবৃত্তি আনে
যে কোন অপরাধ অতীতের মধ্যে।

হিউম্যান রাইকোলজি বিজ্ঞান করলে প্রত্যেক তথ্য
অনুসন্ধানের পথ পেতে পারি। মানসিক গুণের প্রধানতঃ
দুটি ভাগ পরিণত হয়, অবচেতন ও চেতন।
একটি অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। মনোব্যা ও বস্তুত।
'চেতন' মার্গে শুভবুদ্ধির পক্ষপাতী বিপুলগুলি অধিক
পরিমাণে অবস্থিত। অবচেতন মার্গে—অস্বাভাবিক পক্ষপাতী
বৃহৎ পরিমাণে অবস্থান করে। এই অস্বাভাবিক গুণে—
পাপবিক প্রস্তুতি পরাভাবিক অস্বাভাবিক থাকার ফলে—এই
প্রত্যেক ভূমিকায় দুর্ভাগ্য!

কোন ভাবের বিপরীত জ্বলন্ত—পরিবেশের তীব্র
সংঘাত—তার মূর্ত প্রকাশ লাভ করে অবশ্য মূর্ত
মাধ্যমে : এবং যে কোন মনোব্যা ঘটনার মাধ্যমেই—সেই
প্রস্তুতি ভাবনার মূর্ত লাভ করে। পরে তার অস্বাভাবিক
ক্ষম বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠলেও সে মনে করে—এই কাজের
অতীতের মধ্যেই—তার একমাত্র নিবৃত্তি ঘটেছে, এবং
শান্তি লাভ।

বর্তমান আধুনিক অস্তিত্ব বিজ্ঞানোপ—অপরাধী
কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম—মহা অপরাধী

(Born Criminal) দ্বিতীয়—অভ্যাস অপরাধী
(Habitual criminal) তৃতীয়—বৈধ অপরাধী
(Accidental Criminal)—দ্বিতীয় বর্তমান বিজ্ঞান
মহাশয়—কেউ কেউ Born Criminal এর
অস্তিত্বকে বিবাদ করেন না। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
বলতে চেষ্টা করেন—অস্বাভাবিক পক্ষপাতী—যা তার মনোব্যা
কোন প্রকার অপরাধ অতীতের মনোব্যা থেকে পড়ে, এটা যেমন তার
কল্পনাভিত্তিক—দ্বিতীয় বর্তমান মধ্যেই—দ্বিতীয় তথ্য মস্তিষ্ক
এমন একটি গুণ অপরাধ করে ফেলতে পারে—যাও কোন
বিজ্ঞান হয় না।

অবশ্য এই শ্রোণীভুক্ত অপরাধীরা 'বৈধ অপরাধীদের'
মধ্যে পড়ে। এবং এর সংখ্যাও অধিক বিবাদ। বর্তমান
সমাজে—অস্বাভাবিক যে শ্রোণীভুক্ত অপরাধীদের 'বৈধ' বৈধতা
পাচ্ছি—তারা বৈধও নয়—অভ্যাস অপরাধীও নয়—
অস্বাভাবিক অপরাধীও নয়।

বিশ্ববাস্তবের ভাবের দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় ভাবনার—এক
শ্রোণীভুক্ত অপরাধীদের আদিত্য অস্বাভাবিক পরিমাণে
বৈধতা পাচ্ছি। যে কোন উপরে বস্তুপাত ঘটানোই
তারই একমাত্র আদিত্য। দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় অপরাধী
শ্রোণীভুক্ত নয় তথ্য—এক বস্তুপাত ইচ্ছাধীন নিজে এবং
আদিত্য মনোব্যা থেকে বৈধতা পাচ্ছি।

'জীবন প্রবাহ' তীব্র সংস্কার—এই আদিত্য এক
দ্বিতীয় দ্বিতীয়। মনোব্যা সমাজকে ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য দিতে পারে
যাযাবর ভাবনার এবং বিচ্ছিন্ন। এবং সব কিছুকে নিষিদ্ধ
করে—তার একটা পক্ষপাতী বস্তু থেকে। দ্বিতীয় এই
দ্বিতীয় অপরাধী শ্রোণীভুক্ত রক্তবিন্দুর মনোব্যা হয় গড়ে—
তথ্যপাতি আর এর বিচ্ছিন্ন বস্তুপাত—তথ্য মনোব্যা কোন বস্তু
ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ের মধ্যে—দ্বিতীয়ের—এই—দ্বিতীয় দ্বিতীয়
চলছে।

আর দ্বিতীয়ের আদিত্য বস্তু বস্তু দ্বিতীয়—আজ
এক ভাবের অপরাধের আদিত্য অপরাধ। বর্তমান সমাজে
মহাশয় জীবনের—জীবন ভাবনার দ্বিতীয়—দ্বিতীয় মনোব্যা
যে ভাবিয়ে নিয়ে চলছে—দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়, আদিত্যের
জীবন ভাবনার আদিত্যিক মনোব্যা দ্বিতীয়। দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়
বাস্তব প্রবাহ দ্বিতীয়ের দ্বিতীয় দ্বিতীয়।

মাখার উপযোগী চতুর্থ ব্যাধাম-ভকীটি হলো—উপ:হাক
তৃতীয়-প্রণালীই অল্পতল। তবে এ ভকীটিতে তৃতীয়-
প্রণালীর মতো দুই হাত তলপেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করে না
যেহে, কেহের দুই পাশে প্রদানিত রাখবেন। উপরে
যতীয় ব্যাধাম-ভকীই মতো চতুর্থ-ভকীটিও নিত্য নিরমিত-
ভাবে অল্পতলপেট বশ-নোহোবাব অধ্যায় করতে
হবে।

পঞ্চম ব্যাধাম-ভকী অল্পতলপেট মোটামুটি পদ্ধতি
হলো—সমতল থেকে অথবা শয্যার ডিম হয়ে উঠে,
কোমরের দুই পাশে 'বতীকোম' (Buttocks) দুই হাত
যেহে, কেহের মাখা ও কাঁয়ের উপর বেহতাক তক্ত করে,
বুক থেকে পায়ে ভগা পর্দা অংশ উঠে তলে পাইকলের
পাখানী বা Paddle চালানোর ভকীতে কিছুকল
ক্রমবশত ক্ষতপতিতে দুই পা নাড়িয়ে যাবেন। নিত্যনিরমিত
ভাবে এ ব্যাধাম-বীতি অল্পতলপেট কলে, তলপেটের
পেশী, অল্পতলপেট ও বুক-চলানল ব্যবস্থা বহু-মতীয় থাকবে
দীর্ঘকাল। এ ব্যাধাম ভকীটি প্রত্যহ অল্পতলপেট পাচ-
লাভ মিনিটকাল নিরমিত ভাবে অধ্যায় করা চাই।

বেহেহে তলপেটের গঠন-মোডা বুদ্ধ ও বহু-
মাতারিক মাখার উপযোগী ষষ্ঠ ব্যাধাম-ভকী হলো—
সমতল থেকে কিবা শয্যার উপরে নতকালভাবে তৃষ্টি-
প্রণালীর মতো বেহাবশন করে ঘোঁ ঘোঁ শান-প্রশ্নপেহ
লকে লকে—কয়েকবার 'ডন' কেলবেন। এভাবে 'ডন'
কেলবার সময় বুক ঠেকবে হাতে এবং চিবুক ঠেকবে
বেহে অথবা শয্যার—একিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই
ব্যাধাম-ভকীটিও নিত্য নিরমিতভাবে অল্পতলপেট
আট-বশবার অধ্যায় কলে অচিরেই মাখের উপকার
পাবেন।

সপ্তম ব্যাধাম-ভকী অল্পতলপেট বীতি হলো—সমতল
যেহে কিবা শয্যার নটান লিখাভাবে বেহ তক্ত করে, দুই
পা উঠে তলে বকের বেহালের পায়ে পায়ে পাতার ভর
যেহে যেন বেহাল বহে উপরে উঠছেন—এমনভাবে দুই
পর্বতল উপর-নীচে চালনা করতে হবে। তবে লক্ষ্য
রাখবেন—দুই পর্বতল বহন কেহাল বহে উপরে বকে
ওঠাছেন, তখন অশ-বেশ ও সমতল থেকে বা শয্যার শ্রম
ছেড়ে লকে লকে যেন উত্থানিত তর এবং কোমর থেকে

মাখা পর্দা বেহতাক যেন বহু-লিখাভাবে রাখা থাকে।
এ ব্যাধাম-ভকী অধ্যায়কালে দুই হাত বেহে দুইপাশে
নটান-লিখাভাবে প্রদানিত করে রাখবেন। অল্প ব্যাধাম-
ভকীগুলি মতো, এ ব্যাধাম ভকীটিও প্রত্যহ নিরমিতভাবে
অল্পতলপেট পাচ-লাভ মিনিট অধ্যায় করা বশক:হ।

এই পঞ্চম ব্যাধাম-ভকী নিরমিত-অল্পতলপেট যলে, বেহ
হুঠাম এবং তলপেটের মাখা-শৌখ্য দীর্ঘকাল হবে।

আগামী মাখার বৈদিক বায়োমাত্র উপযোগী অত্যন্ত
প্রসঙ্গের আলোচনা করবার বাসনা হইলো।

[অমল:]



শিশুদের পশমী কোট

শোভনা দেবী

(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)

পত মাখার প্রকাশিত আলোচনার বেশ টোনে শিশুদের
পশমী কোট বোনার বাকী হুইশটুই বোঝা হলো।



উপরে ছবিতে দেখানো নমুনাতে শিশুদের পশমী-
কোট বসানোর সাধনের বিস্তারিত বাকী অংশটুকু বোনার
পদ্ধতি হলো—

৪৯ লাইন বোনবাব পঃ, বায়ে ২" ইঞ্চি বুনবেন ১ কাটা।
সোতা, ১ কাটা উন্টো বরণবে। কিছা আংক ৪৪গণ্ড
বুনতে পায়েন। সে ৪৪গণ্ডি হলো—নীচের দিক থেকে
৬১" ইঞ্চি বুন সোতা কাটার শেষ করবেন। গোনায়
২৪গণ্ডি ১ সোতা। পশমী কোটের সামনের, অর্থাৎ,
বুকের দিক বোনা ঘাব এই উপরে এবং প্রত্যেক পক্ষ
লাইনে ১ কোড়া বুনো ঘাবার পর ঘর করাবেন। যেমি-
ভাবে নীচের দিক থেকে ৮" ইঞ্চি অংশ বোনা হলে,
কোটের বগলের ছাঁট শুরু করবেন। সোতা কাটার বোন-
বার গোড়াতেই ৪ ঘর বন্ধ করতে হবে। তারপর সোতা
বোনাব প্রত্যেক ২৪ লাইনে ৪ বার একটি করে ঘর বন্ধ
করবেন।

এবারে পশমী কোটের বুকের দিকে ঘর কমিয়ে কাটার
২১ ঘর বাড়া পর্যন্ত ১ কাটা। সোতা, ১ কাটা উন্টো বুন
যাবেন এবং চামার বগলের অংশ ৩" ইঞ্চি হয়ে গেলে,
সোতা কাটার বোনা শেষ করে কোটের বাঁ দিকের
কাঁধের অংশ বুনবেন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে।

প্রথম লাইন—উন্টো, ৭, দুইধারে নিয়ে সোতা ১৪।
দুইধারে নিয়ে বোনাব কাজ করবেন কাটার প্রথম ৪৪
তুলে।

দ্বিতীয় লাইন—উন্টো, ৭, সোতা ৭।

তৃতীয় লাইন—৪৪ উন্টো। অতঃপর সোতা কাটার
৪৪ ঘর বন্ধ করবেন।

এবারে ডানদিকের কাঁধের অংশ বানবাব পালা।

ডান কাঁধের অংশ বচনা করবেন বাঁ দিকে যেমন
বুনছেন, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতে। 'কেবল খেয়াল রাখবেন
যে সোতা কাটার বুকের দিক এবং উন্টো কাটার
বগলের দিক বচনা করতে হবে।

এবারে শুরু করবেন—কোটের হাতা বচনার কাজ।

একাত্তর লম্বা—কাটার ১৬ ঘর তুলতে হবে। সোতা ১
লাইন বুন, ১ কাটা সোতা, ১ কাটা উন্টো বুনবেন।
প্রত্যেক কাটার ২টি করে ঘর বাড়াবেন। কাটার যেটি
৪০ ঘর হবে।

১০ লাইন বুনবেন। এভাবে প্রত্যেক ১৪ লাইনে

কাটার দুই পাশে ২টি করে ঘর করাবেন, কাটার ৪৪
ঘর হবে। অতঃপর, কোন ছাঁট না দিয়ে গোড়া থেকে
৮" ইঞ্চি বুনবেন এবং উন্টো কাটার শেষ করবেন।

পঞ্চম লাইন বুনবেন—৪ সোতা ৩, কোড়া ১।

চিহ্নিত থেকে বুনো যাবেন। কাটার শেষে ৪ ঘর রাখবেন।
সোতা ৪।

এবারে কাটার ৩৬ ঘর বুনবেন। ২ সোতা, ২ উন্টো
এমনিভাবে ১১" ইঞ্চি অংশ বুনবেন। উন্টো কাটার
শুরু করে ১ কাটা সোতা ১" ইঞ্চি বুনতে হবে।

তারপর পিছনের দিকে নীচের অংশ বোনা ৬ লাইন
'প্যাটার্ন' বুনবেন এবং চিলাভায়ে ঘর বন্ধ করবেন।

এ কাজের পর, বোতামের পটি বচনার পালা।

বোতামের পটি বচনাকালে—১০ ঘর কাটার তুলতে
হবে। পিছনের দিকে নীচের অংশের বস্তাই 'প্যাটার্ন'
তুলবেন। তারপর কোন ছাঁট না দিয়ে ১১" ইঞ্চি
বুনবেন। এভাবে বোতামের ঘর তুলুন নিম্নোক্ত
পদ্ধতিতে:

৪ ঘর বুন, ২ ঘর বন্ধ করুন এবং পরের ৪ ঘর বুনুন।

৪ ঘর বুন, ২ ঘর কাটার তুলুন এবং পরের ৪ ঘর
বুনুন।

৪ তারপর ১১" ইঞ্চি প্যাটার্ন বুনবেন ও দ্বিতীয়
বোতামের ঘরটি বচনা করবেন। ৪ পশমী কোটের চারটি
বোতামের ঘর বচনা না হওয়া পর্যন্ত ৪ চিহ্নিত অংশ
থেকে বুনো যাবেন। তারপর পশমী-কোটের গলা এবং
বাঁ দিকের সুরান অংশ পর্যন্ত বাকী সবটুকু অংশই একই
ধরবে বুনো যাবেন। তাহলেই আবার বোতামের পটি
বচনার কাজ শেষ হবে।

এবারে সেলাইয়ের কাজে তুলে পশমী কোটের সুরক
বোতামের পটির অংশটিকে জোড়া লাগিয়ে দিন এবং সুচ-
সুতোয় সাহায্যে মানানসই-ছাঁদের ৩টি বোতাম টেকে
দিন বাঁধাবেন।

তাহলেই পরিমাণটি ছাঁদে শিল্পের পশমী-কোট
বচনার কাজ সমাপ্ত হবে।



(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অভিমান

অতি ভোরে শুয়াই এর সি এ থেকে বেরিয়ে ট্যান্ডি হয়ে টোবটোর বিমান বন্দরের দিকে চললাম। প্রথমেই নবনির্মিত পাড়িনার এক্সপ্লোনওয়ে ও কুইন এলিভারেবলওয়ে ঘ'রে পড়িম ঘূঁষে গিয়ে ২১ম ঘাতীর সড়কিতে পাক দিয়ে উঠে হাইল চারেক উত্তর দিকে বাবার পথ ম্যাকডোনাল্ড কার্টার এক্সপ্লোনওয়ের সঙ্গে ঘেঁষা দিকে ঘুরে টোবটোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এলাম। এটাকে মলটন (Malton) বিমান বন্দরও বলা হয়। এখানে রয়াল ক্যানোডিয়ান বিমান বহরের মজ ডাউন্স ভিউ (Downs View) বিমান বন্দর ব'লে আর একটি বিমান বন্দর প্রতিষ্ঠাকার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে। 'মোহক বিমানব' ১৮২ নং ফ্লাইটে আমার যাত্রা শুরু হ'ল। শুধু বেলা ন'টা। বটনে পৌঁছবে পৌনে একটা নাগায়। এ বিমানগুলি দুইপূজ্জ নর, পাখা ঘোরা। তলে এর গতি কিছু দৃশ্য। আবার বোটন থেকে আরও তিন লাগু হ'ল খামবে। এই বিমানগুলিকে বেগের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। টোবটো থেকে ছেড়ে প্রথমে রচেস্টার, পরে নিরাকিউম ও আলবার্টে এসে থাকলো। আলবার্ট হ'ল নিউইর্ক রাস্ট্রের রাজধানী। এখানের বাসিন্দাদের পেলা হ'ল, সরকারী কাজ। রাষ্ট্রের শাসনকার্য এখান থেকেই পরিচালনা করা হয়। এবার এখানে আমার স্থগোপ ছিল না। তাই বিমানে ক'রে ওঠা ও নামার সময় সহরের বাহিরাবর্তন শুধু তেন দূর গিরে চকিতের মজ দেখতে পেলাম। ওঠা ও নামার ঘণ্টের সময় নষ্ট, মালপত্র

ও ঘাতী ওঠা নাগাতেতো আরোহে, বেলা প্রায় পৌনে একটা নাগায় নো বন্দরের সংলগ্ন বটনের আন্তর্জাতিক 'লেগান' বিমান বন্দর নামলাম।

আমার নেবার ভ্রম 'মেটাক্স এণ্ড এডী'র 'জন পুজার' ও আমার দুজন শুকন সংকর্মী 'অ'রিত কুইয়া' ও 'দোগাক আগরওয়ালা' (বাংলা W.H.O. বৃত্তি নিয়ে বটনে কাজ করছেন) অপেক্ষা করছিলেন। 'কুইয়া' মাঝেই অট ছোট হ'লে কি হয় অনীর শক্তি ধরে নে। আমার ভারী ব্যাগটা অন্যতলে ব'য়ে নিয়ে গাড়ীতে চললো। আমার ওঠা হ'তে কিছু বইতে হবে না। পুজারের গাড়ীতে চড়ে আমার বটনের YMCA তে গিয়ে যানে কেননা স্টাটমের হোটেল ভিডের মজ ভাওয়া হ'ল। স্টাটমের হোটলে হ'লে ভাল হ'ত কেননা এ বাড়ীটোতেই কয়েকটা তল: নিয়ে 'মেটাক্স এণ্ড এডী'র অ'ফিস। যেই হ'ল গাড়ীতে 'পুজার' ব'লল যে আমারের অবসর প্রাপ্ত ডি'বটর 'শারমান চেন' আমার দুপু'র গার্ডিংল 'ক্রেডেনিয়াল বোম' কোম্পানির বাড়ীর এ'মিনিয়ালে ক্রাবে মধ্যাহ্ন ভোজের মজ নিয়ে যাবেন। ব'লল আশী হ'লে কি হয় ক'ঠিতা কিছু কবে নি। তাই আমার আমার মালপত্র নিয়ে প্রথমে 'মেটাক্স এণ্ড এডী'র অ'ফিসে উঠলাম। এই বাড়ীতেই আঠারো বছর আগে শ্রোত শারমান চেজের সঙ্গে মালগ হ'য়েছিল। আবার সে মালগের পুনবুজ্জান হ'ল। সে'ল লাগেই এখন ক'ঠে ক'ঠে অ'ফিসে আসেন। পুজার, আমি ও শারমান চেন একনামি ট্যান্ডি ভাড়া ক'রে আঠারের মজ প্র ডনালিয়াল জী'নবীয়া প্রতিষ্ঠানের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম। এর পঠনপঠ শেষ হ'লে এটা

বইয়ের তীর্থভ্রম ও বৃত্তান্ত বাকী হবে। এ বাড়ীর উপর
ফেৎফে গার। বইয়ের বৈষয়িক দৃষ্ট দেখা যায়। দুই
ছন্দ বন্ধে 'গার্ল', 'চেলনী' ও 'মিষ্টিক' (Mystic) নদী
এক পাঠ্যে, উল্লেখের বিবে 'বইন কমন' (Boston
Common) এর উদ্ভাৱ। ভাব অব্যবহৃত কষ্ট তফাতে
শৌখিন্যের ও কমনওয়েলথ অব ম্যাসাচুসেটের গোমালি
কল্লু বৈষ্ণব বাকী। অব্যবহৃত 'বইন বন্ধ' ও 'লাগান
বিদ্যাল বন্ধ'। উল্লেখ পুস্তিক M. I. T এর বহু বাকী।

আবারও সব বইয়ের দূত সেখাণা বেখে নেই এলাহ
 বাঁচীতে। চেনে সাহেব চলে গেলেম আপন বাড়ীতে।
 'পজার' আবার কিরিয়ে নিজে এল অফিলে। ছুটীর পর
 অফিলের গাড়ীতে আবার মাল বইনের YMCAতে পৌঁছে
 নিয়ে ট্রেনে সেলাম। ট্রেন থেকে ট্রেনে প্রায় তিন
 কোয়ার্টার ঘণ্টা দাঁড়ান পর এলাহ তার বাড়ী গাওয়ার
 হেলট্রেনে। এখানে ঘোড়ার চোটে ট্রেন বেশী চল-
 কে। তবে। পজারের স্ত্রী, আইবিলের গাড়ী নিয়ে ট্রেনে
 আগার কথা ছিল। সে কিন্তু আসেনি বিশেষ কারণে
 আটকা পড়ে। ট্রেনে ট্যান্ডি লংগা দুর্গত কেননা
 লগারই তো ঘোড়ার আছে। অস্ত্র সব পজারই আবার
 দুজনে দাড়া করলাম। হাতে আবার বেশ ভারী
 স্ট্রিকেল। পায়ে যথার ভর হাঁটতে আমরা সামান্য
 অসুবিধে হ'ছিল। পরে এক বন্ধু লিফ্ট ছিলেন। অগত্যা
 আমরা লগারের সাথেই পজারের বাড়ীতে পৌঁছে সেলাম।
 পুষ্কি কাহিরি ও তার কল্লাকে আবার বেখতে সেলাম।
 ঘোষে ফেরার আগে এরা লগাই এলেনি আমাদের
 বাড়ীতে মিলা-কোজে। লগা লগাবেলো ওদের বাড়ীতে
 কাটিয়ে কিলার হোটেল। ফ্রু'টগাক বলেছিল
 বেখা করতে। রাত পাড়ে ঘণ্টা দুইয় সে বেচারী
 আবার ভক্ত অকারণ অগত্যা ক'রে কিবে নিয়েছে তার
 দামার।

পরের দিন সকালে অকিল ঘাবার আগে (দুইখই)
এসে হাজির। আবার নিয়ে যাবে অকিলে। অকিলে
দশয়ের কয়েক মিনিট আগে এলাম। এবেও সন্ধ্যা আটটা।
থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মোম থেকে তরুবার পর্যন্ত
অকিল। যান্ত্রে বেলা পূরায় নেমকর্য করছে। এবার
বাহী থেকে ৪ নম্বর জাহাজ ঘাবার Pier উপরকার

হোটেল নেমকরণ নিয়ে যাবে। তারা Pier গাফীতে
ক'রে পেছে। কব'রিত'ারা বললেন আমাথের অপেক্ষ।
কহতে হবে আরও বেড় বটা। আর অপেক্ষ। কহতে আমি
খাওয়ার সময় রান্না নই। অতএব বাওবা দাক্ অত
মাফশার, যেখানে Seafood ভাল পাওয়া যায়। তাহেই
Yankee fisher's inn এ রাতের আহার কহতে
গেলায়। বিরাট রাজ্য কীকড়ার ঠাং (King Crab)
নিয়ে জানবার খারে বন্দরের জলের ওপর বাস রাতের
আহার সাবলায়। রাজ্য কীকড়া আদা। অগণে প্রচুর
পাওয়া যায়। বেহের বাস প্রায় এক হাত।

স্ববার নকালে ঠিক ছিল যে Metcalf and Eddy
এর বয়োবৃদ্ধ মালিক H. P. Eddy এর সঙ্গে বৈধা কথব।
সম্বন্ধত পদার্থ (Podger) আবার নিজে গেল ঠার ঘরে।
কোথার কত রকম কাম এঁরা কবছেন জানতে চাওরার
তাৎ একটা নাতিগৌরব ব্রাহ্মণ ভক্তগোত্র বংগে গেলেন।
ওঁদের অধিগে নাকি ন' পাঁচেক লোক কাম করে।
কথার কথার বললাম যে বিদেশে ওদের প্রসিদ্ধির মূল
কারণ দু'খাত: তিনখাত American Sewerage Practice
বই বচনার জন্ত। সাগরবন্ত: পাঠাপুতকের আত্ম দীর্ঘায়ী
হয়ন। এদের বইখানার আত্ম পকাশ বছর পার হ'বে
গিছেছে তবু ঝাঞ্জ ও তার ব্যবহারিকতা ব্যাহত হেনি।
জিগোগ কলোম 'এটা পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করছেন
না কেন হ'

“—চোরা জটিকহিনি যি: চ্যাটাঝি। তবে সম্পূর্ণ হ’লে উঠা ছেনা। প্রথমে M, I, T, এর একজন অব্যাপককে বলা হয়েছিল যে তিনি এটিকে বস্ত্রস্থান হুগোপথেয়ী করে বিন। তিনি ছুটীতে কাগজ পত্র নিয়ে সেলেন নিজেদের কটেজ হাংসে। কিন্তু পর্বতের বদলে হু’ক এসব কল্পে। অর্থাৎ একটা অব্যাপক কোনগতিকে লিখলেন তিনি।”

তায়গর তি হ'ল—'শাখার একজন কর্মী
বোটের accident এ আহত হ'য়ে শব্দলেন। পা খোঁড়া
হ'য়ে হাসপাতালে থাকলেন। অতএব অবগত প্রভু। এই
অত্যাণে তাঁকে এ ভাৱ বেওয়া হ'ল। কোন িশেষ
ভেবন কণ হ'ল না। বিপদ এই যে এমন একখানা বই
হওয়া উচিত লক্ষ্যকেনের পর ব' বস্ত'মানে চালু বই এর

দেবে উন্নত মানের হবে। এই বৈশিষ্ট্য আবার পেট্রোল খামে খামে ভরা মাগ ঐ ভাবে রাখা হয়েছে। নিউই আমস্টের এক ডিটিং হলে, যাতে অধ্যায়ের পুর মধ্যের নিরে আগুনের হ'রে বই ছাপাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমস্টের তিন খণ্ডের বইটার এটা নতুন সংস্করণ নয় আমস্টের Condensed বইখানার নতুন সংস্করণ বৈধি হচ্ছে।

আমি বললাম—তা'হলে কাজ বেশ একটু বস্তু তো প্রথমে বইখানা নিয়েছিলেন কে? তখন কোম্পানিতে ক'রম লোক ছিল?

—আমার বাবা। ছ'জন মাত্র লোক নিয়ে কাজ শুরু করেন। Metcalf সাহেবও ছিলেন তবে Eddy কেই বিশেষ অংশে রচনার কাজ করতে হয়েছিল। পিওনার্ড স্ট্রাকচার ছিলেন Structural Engineer, বা বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। আগস্টে ১৮৯৭ সালে শুরু তবে ১৯০৭ সালে বাবা যোগ দেন তখন নাম হয় মটকাল এন্ড এডী।

—১৯১১-১২ সালের প্রথমে ছাপা হ'লে নিউইউ ডি'তিন বছর লেগেছিল নিজে টেক্সটরা করতে?

এডি সাহেব বললেন—১৯০৭ সালে এটা লেখা শুরু হয়—

—তা'র মানে দশ ধর নক্সা এতে সমি'বিত আছে তখন দে সব কাজ M and E করেনি। অর্থাৎ অস্ত্র বেখানে কাজ হয়েছিল সেইখান থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল নিউই—

—তা'তো বটেই—

এইরকম আপ্যাপ আগুনের টপেছে।

ওদের কতগুলো Company আছে জানতে চাওয়া তিনি বললেন—Metcalf & Eddy

Boston, New York, Paloalto ও

San Francisco

Metcalf & Eddy, Inc,

Boston,

Metcalf and Eddy, Ltd,

Boston, Trinidad,

Teheran Boston Engineers,

27, Vessal Shirazi Ave, Tehran (Iran)

গোবাইবেও একটা টপ অফিস আছে।

আমরা ইংল্যান্ড এক সত্বেলোকের সাথে মণীসার হিসাবে কাজ করছি। তাঁর নামে ডি'নি আমস্ট একটা ডিটিং দিলেন, আমি ইংল্যান্ডে যাও তখন। বইয়ের মালিকানা বিভাগ—সবচেয়ে ধনী লোক কাজ করে ডিটিং ডিপার্ট-মেন্টে। এ ছাড়া রয়েছে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন, অ্যান্টিস্ট্রাকচার, ইনস্ট্রুমেন্টেশন প্রভৃতি। এ'রা একটিকে পানার মত বিজ্ঞানিক, যখন মত পরিশোধন, শিল্প পরিচালনা পারা'গেছেন, আরও'ন রাখেন। অস্ত্র-মিকে ম'ক'তা, সত্বেলোক প্রভৃতির, বই'র প্রাণ প্রস্তুত, নক্সা প্রস্তুত, প্রতি'রন বৈধি, গভীর ডিটিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অংশ, দেখে নির্মাণ, মস্তা প্রতিযোগে ব্যাংক, বিমানক্ষেত্র, রাস্তা নির্মাণ, বল'র নির্মাণ বিশ্ব পরিচালনা প্রস্তুত ও পরিচালনা প্রস্তুত কাজ করেন। এ'দের মাঝি কর্মক্ষেত্র থেকে এ'রা আরও নিজেদের সম্প্রদায়িত করেছেন।

আমি কিগো'ন করলাম ভক্তো টেক'নিয়াল কথা হ'ল এখন এখন একটা আপনার কীরনের সুবিধে ঘটনা বলুন যেটা আজও আপনি চুলতে পারেননি।

তখন “এডি” সাহেব বললেন—আমার তাবিয়ত তুমি। আমি এ প্রসঙ্গ মত প্রস্তুত ছিলাম না। একটু সময় আমায় দিতে হবে।

—নিউইউ। বিশেষ বাস্তব ই বা কি আছে? এটা সাহেব শুরু করলেন “তবে বসি শোন—একদিন মহা-বুদ্ধের মত পড়েই U S Army (Corps of Engineers) এর Engineer in-chief টিনকোন করছেন আমস্টের অফিসে এই বলে যে খু। নিউই এখন এককোম বাস্তব design করে দিত হবে যা'র য'কোনও অংশ একজন লোক সহজে ব'দে নিজে নিজে যেতে পারে এবং যা' উত্তর মেসুর শীত প্রতি'র্যও করতে পারে। সে'র সাহেব টেনিসকোন হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন Engineer in chief, ক—

—আমি এ'র এককোম।

—আপনার গো'র অংশের ক'রমে তা'বে বলুন।

তবু নাছোড়বান্দা তিনি।

অন্তিমের ক'রমে বলেন “সেটা কক্সন নিউই গো'র পারবে। তবু সে'র সাহেব নিউইটা এটা'র মত কাজ

বিভিন্ন ব্যক্তি হ'লেন না।

স্বাংগের Engineer-in-Chiefকে বললেন তুমি একটু ধর। 'আমি আমারই একটি সাহেবের দায়ে তোমার কথা বলতে চাই, সে কি বলে দেখা যাক।'

একি দায়েই 'সাহেব' চোখের সাথে Engineer-in-Chiefএর যে কি কথা হয়েছে তা জানতেন না। তাই তিনি Engineer-in-Chief-এর বিশেষ সহযোগী এজেন্টে পারলেন না এবং কাজ করে দেবেন তাও বললেন।

সেই কাজে আমরা লেগে গেলাম Greenland-এর উত্তরে— 90° C temp। অর্থাৎ বরফ জমার তাপমাত্রার 90° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নীচে। সেখানে নিঃশেষে বেড়ে হয়ে থাকা বরফ কেন না দেখানে কাঠ, শেখা, শিষেট বা কোন নষ্ট উপাদান পাওয়া যায় না। হাত চামড়ার হস্তানার মধ্যে থাকবে। শীতের কথার বাবে না—নাক, কান নীচে চাপে যায়। সেখানে গিঁথে panel এর ঘড়ী তৈয়ারী করে দিয়ে এলাম। panel আঁটার সময় এমন এক দরকার হওয়া এল যে সেই হাওয়াতে একজন কর্মীকে প্রায় পক্ষাঘাত হয়ে বাকের উপর ফেললে। ভূষার (Snow) বলেই সে ব্যক্তির সে রক্তাণুগে পেল—নাহলে বেজার বিপদ হতো। এই Greenland-এ আমি বারম্বার গিয়েছিলেন। দুই কাল হ'লে আমার উত্তর বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে এখানে ঘটায় ১৫০ মাইল বেগে হাওয়া বয়। ঈতকালে ঘন অন্ধকার। এখানে আমরা ১২৫০ মালের জিনিসপত্র অর্ডার পাঠি ও ১২৫১ মালের অস্ত্র-যন্ত্র ক্রয় শেষ করেছি। এটা গ্রীষ্মকালওর Thule বোমার্ক বিমানক্ষেত্রে।

বইনের কথার প্রথম মনে পড়ে ১৭৭৪ খ্রিঃ-এ আমেরিকার দাবীতত্ত্ব। ঘোষণা করবার কয়েক বছর আগে বইন বন্দরে পৌঁছান চা-সমুদ্রের তলে ডুবিয়ে দেবার কাহিনী। ১৭৭০ খ্রিঃ-এ 'টউনলেও শুক আইন' মজুমদারী, কলকাতা, গুও-সমুদ্রের উপর যে শুক বসে ছিল তা পড়তে গিয়ে বাক-শব্দের উপর থেকে তুলে নেওয়া হ'ল। এতে এখন এক ফিল্ডেরও তার প্রকট হয়ে উঠল। এই সময় রুটিন মৈত্রেয় শব্দ সংগ্রহে যেখানে হুন্সলার পোড়কর বক্তৃতা হয় সেটিকে 'বইন ব্যাঙ্গাকার লাইট' বলা হয়। এই হ'ল দাবীতত্ত্বের জট প্রথম কথার

পাঠ, ১৭৭০ মালের যে মাসে তার দাবীতত্ত্ব কাম্পানী যে চারের জাহাজ আমেরিকার পাঠার তা' বইন, জিলা-ডেপুটি, মিউইজর্ক বন্দর গুও-এ নামানিলে আসতে চা শুক তা এর জাহাজ খুঁজে দেওয়া হয়। এই বছরই ১৯ই জুনবর আর একটি জাহাজ বইনে আসে ও সেটীও সমস্ত চারের পেটী জলে ফেলে দেয়। জুজ হ'লে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে হুন্স নামা বেলস—'বইন' মাস বহু কত, যতকম না চারের পুরোজাম মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' এ ছাড়া বইনে জনশ্রুতি বহু ও জনগণের প্রতিনিধির উপর হুন্সনৌতি চলতে লাগল। রুটিন মৈত্রেয় চা-টী হল বইনে পাঠানে হ'ল। এই নির্বাচনের বিজয়ে দাবীতত্ত্বের দাবীতত্ত্ব আমেরিকার এক বিশেষ ঘোষণা করল। তারপর নানা ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে আমেরিকার হুন্সব'ল্ট পুর্বিবীর এক বৃহত্তম অর্থদান রাষ্ট্রে পরিণত হবার ইতিহাস কারও আদে জানা নেই। রুটিন লোকসভার এই দাবীতত্ত্বের বশকে মহামতি বার্কের বক্তৃতা শুধু এক রাজনৈতিক কৌতুক নয়, এক সাহিত্যিক সম্পদও।

আমরা কাছে এর পুরের অধীশ ইতিহাসিক ঘটনা হ'ল দাবী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে খ্রীষ্টাব্দে পদ্ম চন্দ্রবর্মণী টুপলকো কলিকাতায় যে ধর্ম মহাসম্মেলন বলে দেখানে বিশ্বের নানা ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্ম-পন্থীদের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছিলেন বইনের রাজকুমার বিনয়ের অধ্যক্ষ দাবীতত্ত্ব পুর্নানন্দ। সেই সম্মেলন স্থগিত করে তার স্বরচিত কবিতা পাঠ আদর যেন কানে লেগে আছে।

প্রায় বিশ বছর আগে আমি রাজবিদ্যার স্থান সংগ্রহে বিকল মনোরথ হ'লে অপর্যবে হার্ডিঙে 'ইন্টারন্যাশনাল টুজেট' সেটের এডেটর। খ্রীমতী মৌজু এই প্রস্তানের তত্ত্ব-বক্তা হ'ল। কয়েক সাতের জন্ত আমায় থাকার জায়গা করে দিলেন তিনি। লাউ ও আমায় একা ব'লে থাকতে দেখে খ্রীমতী মৌজু আমার এক ব্যক্তিগত ঘটনাক্রম এনে দেখালেন। তত্ত্ব প্রাচীনকালের বস্তু হোপ্‌ল্যা পুণ্যের ছবি। এই ছবিগুলি কে-যেন মহাশয় ডিক্টে-র থেকে উপহার দিয়েছিলেন। ছবি-গুলি কলিকাতাই চাওতে প্রাক্তন কলকাতা এবং তত্ত্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের নন্দাবীর। ছবির ওপর তত্ত্ব-

গুলি 'অ'ত খ-এ-জ। তাত্তে অছে-এ-টো পরানী থেকে
 তিগক-চপন কাগা তুঁড়ি বের করা ডিমটোনারী সাধু।
 মাস্তাঙ্গী, মাংসী, গুহ-টী মেরে-পুত-বর ছবি, মাস-
 ত্যাগীকেও ছবি। প্রাকৃতিক সত্ত্বের মধ্যে ত্যাগরূপ ও
 নানী দুর্গ প্রাদ্যমের ছবি। তখনকার দ্বিতীয় ছবি যেখানে
 ও বর্তমান দেশভূমির সঙ্গে তুলনা করলে একটা ঐতিহ্যের
 সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ছবি অতি মনোরম আবার
 অনেকগুলি রংগে হারি পর-.....মনে হয় যেন
 ভারতীয়ের খেলো কবীর উদ্দেশ্যে তোলা। এখানে নানা
 বেশ থেকে ছেলেমেয়ে বা মেয়ে মনোরম মনোরমের মন-
 তলে। এইখানেই পৃথিবীর মনোরমের থেকে ছেলেমেয়েরা
 বিভিন্ন জাতি লাভের জন্য সজ্জিত হয়। এখানে 'হার্ভার্ড
 বিশ্ব-বিদ্যালয়' ও 'ম্যাসাচুসেট ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি'
 বিশেষ প্রসিদ্ধ। হার্ভার বিশ্ববিদ্যালয় বটনের উপনগরী
 কেমব্রিজ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকৃতিক বটনের
 Yard। পরিষ্কার একটি 'অ'ত প্রকৃষ্ণ। এখানে বড়
 পাতার আইলি-লা হার্ভার্ডের মূখ্য মুক্তিকা ছাড়া নাকি
 মস্তুর না। এইখানেই লাইব্রেরীতে নাকি পৃথিবীর
 সবচেয়ে বৈদ্য বই আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাকালগীর
 (Engineering Faculty) জিন ও বিখ্যাত অধ্যাপক
 গর্ডন ফেয়ার (Gordon Fair) সবে বেধা হয়েছিল।
 নানা আলো আলোচনার পর তখন তিনি অস্বাভাবিক
 উপদেশ দিয়েছিলেন "যেন এখানকার নকল না করি।
 ডোনারের সমস্ত আখ্যায়ের থেকে পূর্ণক। প্রয়োজন মত
 বুদ্ধি প্রয়োগ করে যেনের প্রকৃত প'বৎসে বাধ্য পৃথিবীর
 সমস্ত বই সমাধান করা উচিত। এমনও এখানকার
 পক্ষীতে টাইফয়েড (Typhoid) রোগ পথের অসুখাতে
 পাঠে। অন্তর্গতই অনবদ্য পৃথিবীর শিক্ষার পেশ
 প্রয়োজন। বিশ্ব বাধ্য প্রাচ্যমের (World Health
 Organisation) একজন ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি
 ওকে বলেছিলেন 'বিশ্ব নিরোধ করণেই ভারতের বাধ্য
 পৃথিবীর সমস্ত সমাধান হ'তে পারে। গর্ডন ফেয়ার
 বলেন "প্রথমতঃ বিত্ত পানীর জল, পরে মরশ, শাখনের
 প্রাথমিক বাধ্য করার প্রয়োজন।"

আমি বললাম—"দেই মনে পড়ে পৃথিবীর সমাধানের
 প্রয়োজন আছে বলে, আমার মনে হয়।"

"নিশ্চয়ই! দেইটেই আগে এবং খাওয়ার শোকা বিনা
 ক'রে বাধ্যপূর্ণক করতে হবে ও উপযুক্ত খাদ্য পথীরে
 লাগতে হবে। দেই মনে পড়ে বাধ্য পৃথিবীর লোকজনকেও
 প্রয়োজন।" আলো আলোচনার পর আমার পথীকাগারে
 নানা মিঠা পথীকাগার পথীকাগার করা হয়।

এই পথীকাগার প্রাচীন। কলে এর পথীকাগার
 আধুনিক বৈজ্ঞানিক রূপের নয়। আধুনিক বাধ্য,
 নানা সজ্জা পথীকাগার রয়েছে। পথীরে মধ্যে দিয়ে 'অ'ত
 নদী—চালস, মালিক ও চেমলী এনে পথীরে বটন
 কবরে। চার্লস ও মালিক নদীর তলা দিয়ে অনেকগুলি
 মুক্তকণ ও ওপর দিয়ে সেতু। মুক্তকের মধ্য দিয়ে বেশ
 চলচলও করে। এটা মালিক পথীকাগার একটি মৌখী।
 বটনের মালীর তলায় সব পথীরে কেন্দ্রে থেকে পাঠ্যক
 চলে গেছে। উত্তর দিকে দেখা হয়েছে এডারট-এ
 (Everett), প'থীরে হার্ভার্ড, প'থীরে-ক'থীরে
 ক'থীরে ছিল (Forest hill)। প'থীরে Ashmont এর
 উত্তরপূর্ব মareniac। এই অস্বাভাবিক আধুনিক বাধ্যবার
 পথীকাগার আছে।

হার্ভার্ড পথীরে (Harvard Subway) দিয়ে বটন
 পথীরে কেন্দ্রে প্রাচ্যম হয়। দূরে দেখা যায় পথীরে মারে
 সোমালী পথীরে। এটা হ'ল কমন্ওয়েলথ (common-
 wealth of Massachusetts) এর ম্যাসাচুসেটের পথীরে
 মস্তুর। নানা পথীরে ও নগরীতে জল পথীরে এই পথীরে
 মস্তুর দাঁড়ায়। এখানে ১০ লক ম্যালান পথীরে মার
 ১২০ ডলার মারে। বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি এই জল
 ম্যেট্রোপলিটন ডিপার্টমেন্টের কাছে থেকে নিজে তাদের
 নিজের সাইপে ক'রে বাড়ী-বাড়ীতে ও কলে কারখানায়
 পাঠায়। বর্তমানে জু এই জল প্রকৃষ্ণেই খেতে ১০ থেকে
 ৮০ ডলার পড়ে। আগের মধ্যখাতের লোকপান দিয়েই
 ম্যাসাচুসেট পথীরে অসুখ নানা পৌর প্রতিষ্ঠানকে
 জল বিক্রয় করতে হতো। এটা মালিক পথীরে মধ্যে ক'থীরে
 ম'থীরে ক'থীরে খালস। কেমব্রিজের মধ্যেই প'থীরে
 হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন ও লকলে জল
 পরিষ্কৃত করেন। মুখ্য পথীরে বাধ্যক'থীরে ওয়েস্টন
 (Weston) পথীরে নানা আলোচনার পর বলেন—
 "ওয়াশিংটন বাধ্য প্রয়োজন হবে, লিখলেই আমি আনন্দে

বলপায়। অতি দক্ষৰ ছাপা হৈছে যিগুৰৈক বাবে
এনেছিল সেওগো।

বেলগকোৱা পৰিৱৰ্তন পৰি দেখে আশাহ বিমান বন্দৰে
তুলে দিলেই পৰাহেৰ মুখা দাখিল কাটে। ভবে নিউইয়ৰ্কে
থাকিবও সে একটা বিকল্প বাহন্যৰ আশাহ অহুৰোহন
আছে ভেনে নিয়ে নিউইয়ৰ্কে টেলিফোন ক'ৰেও
বিহেছিল। এখন থেকোই আশাহ নতুন বহাৰেণে বন্ধ-
বিহাৰেৰ পাণা হুক।

কিছুদিন বাবে পৰাহ সাহেব Boston Globe
পত্ৰিকাৰ ৮ই আগষ্টে প্ৰকাশিত একটা প্ৰবন্ধেৰ কাটি
পঠান। ঐ পত্ৰিকাৰ Financial Reporter, Daniel,
J, Corcoran সাহেব Hub Based Company plays
big role in India. শীৰ্ষক প্ৰবন্ধে লেখে—“The
largest city and the biggest port in India, it is

the country's most highly industrialised area
serving as the economic centre of an area of a
quarter of a million square miles inhabited by
110 million people.

Boston based Metcalf and Eddy, founded
in 1897, is one of the world's major engine-
ering firms in the field of water supply and
treatment, sewage treatment, drainage etc.

The firm has over 400 engineers in its
offices here, in Newyork, Palo Alts, San
Francisco and at its field offices on projects
scattered around the world from Viet Nam
to Saudi Arabia, Greenland, Tehran and
scores of other localities.

[জয়ম:

জাতিস্মৰ

শ্ৰীঅন্ততোষ সাত্তান

যেহেদীৰ বেড়া-বেয়া একখানি তুংগৰ কুটীৰ
বিধ বংপুৰ আহে বাতানীৰ ছাচাৰ শধান;
দাখে দাখে কুকৰক-বন্ধনেৰ হস্তিৰ বিধাৰ;
সংঘেৰে ভাৰ্য্যে আছে বহিষ্ঠৰ লাউতগাণ্ডলি
শতমুখ বাহ বিধা ক্ষণদ্বাৰী কড়িৰ মাটটি।
কলপা-হিৰোঁগ ঠাণা কাওচপু বন্ধ জল-তয়া
চলকিছে একপ্ৰাণে বিসংলত আন্তৰেৰ মতো।
কুহৰ-কল্লোত-কোটা ঠান-ভাৰা খিড়কীপুহৰ।
কাঁকে কাঁকে লাখে লাখে গাংলৈৰ ঘোষা কুহৰেলা
আ'ন্তানৰ নিষ্পাণে; অস্ত্ৰচুৰী চকুচুড়া তুৰ
আ'ৰ্প কহিৰা তোলে আঁক বাঁকা গলীপথখানি
লালে লাল পুষ্পপাণ্ড; কহুতা'ল কানে কলৌহন।
কৌতুহা-কি'কাখিক বুধু ভাৰা বংশবন বিধা
হেলে হুলে ললে চলে গংবিনী কোন্ আশবধু

হুটাইয়া বুলপত্ৰ অবিলম্ব বংগীৰ বুক
প্ৰতি পৰিক্ষেপে।

হাৰ, পূৰ্বজয়ে ছিহ বৃত্তি গোৰা
এবনি প্ৰজ্জা'শিঙ কোনো এক পৰীৰ ভবনে
ভাই বৃত্তি বাহিৰি আনি আত বাট বহোবাহ
নেবুৰ তুলেও পথে উন্নতি এ নিৰ্জন পথে,—
মনে বহু কতো-চেনা তুং-চাওৰ মাটিৰ এ গুহ;
মনে হহ গোৰা শুই চলন্যৰ কলতৰ্ভব।
ককো বিপ্ৰহৰ বোৰ তুলিয়াছে কহি উম্মত।
মহামৰু কতো তৰু মায়া'কো কোমল আশায়ে
হেখাৰ তুলনীয়কো ক'মাচি সতীত-বহু
বহুমান—কিৰী-ব-বহে বুৰ বহুনে কাকো
ন-নীৰ অমৃততায় বমোজল পক্ষপাতায়
অবনত; তাই বৃত্তি-হথ মোৰ পিয়ানী প্ৰব
ভনিগায়ে চাহ কাহ হানি কিনি কাকন-পতন।

দ্বিতীয় দাহ

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

নেহি সীটের সামনে যে একজন লাবীকার এসে
হাঁচি রছেন তা ঠাণ্ডার কারণে পারেনি মলয়। আনমনা
ভাবে কি এক গভীর চিন্তার সাগরে সে ভেঙ্গে চলেছিল।
তুই ছেলের হাতে ছোঁড়া চিলের মতন পেটা চলকে উঠল
কণ্ঠস্বর থেকে, 'লেডিস সীট! চেড়ে বিন।'

চিন্তা আর লক্ষ্যের সংঘর্ষে কেমন যেন থতমত খেয়ে
নিচ্ছে মলয়। কোন বসন্তে মিলেছে তাই হালধোল
লাকানো অঙ্কন? হেই তুলে নিল সীট থেকে। জাংগা
করে দেবার ভক্ত হয়ে আদার মুখেই সে শেল বাধা।
কথার বাধার সে আবার বসে পড়ল লেডিস সীটটার
ওপরে। সীটে বসতে বসতে তার মনে হল ভক্ত মহিলার
মসৃণ চেনা চেনা। স্বাস্থ্য চারটে কথার বলা, 'ষ্টিক আছে
আগনি বন্ধ', যেন বলতে বলে মিল এ গলাব সঙ্গে তার
পছন্দর মহিমনের, লতাতা বাচাট কথার ভক্ত স্বাস্থ্য কিরিয়ে
মহিলার চোখে চোখ রাখতেই এক দূর্ভাগ্য অবাক যেন
কলকে কলকে গড়িয়ে পড়ল মলয়ের ভবর থেকে।

মলয় তাকাতার অনেক আগেই তার চোখের ওপরে
চোখ রেখে এগুয়ে তাকিয়ে আছে ললিতা।

এক বছর আগে এমন ভাবে এমন পরিবর্তিত হয়েছে
ললিতার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে তা' ভেবে উঠতে
পারেনি মলয়। তাই আজ এই এক বছরের বিরাট
ব্যবধানটা তার চোখে ভোট হয়ে এক দিনের পর অদেখার
দৃশ্য নিয়ে মনের হরজাহ নড়া নাড়ল। মলয় ভাবল, বাই
বলুক না কেন, ললিতাই তো প্রথম কথা বলল, তুমি
এবার তার কিছু কথা বলবে নাল। কেমন আছেন?

শীঘ্র ফাটা ঠাঁটের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে হাসি
হাসি হাসল ললিতা। এমন হাসিও আগে এক বিদ্যুৎ
পরিচয় ছিল না মলয়ের, এ হাসি দেখে তার মনে হল
ভেট যেন দু'দিনের এক হাসি যাচ্ছে বৃষ্টি ছুঁতে গালি

তার ফেটে। চিহ্নে কিছু পড়া বাংলা তুলে রয়েছে চোখের
সামনে, আনন্দের খঁট হাসিতে হাসি হাস রয়েছে মনের
কণ্ঠস্বর। ভয়ে আঁতকে উঠল মলয়। স্বপ্নতপ করে
চোখে লাভা ফেলে দিল, মলয়ের মনের সব ছবিটাই সম্পূর্ণ
ভাবে আঁকল ললিতার সুন্দর মর্মে। তাই একই
ভাবিতে হাসিটি কিছুক্ষণ কইরে রেখে সে কি যেন জোরে
দিল। হাসিবেত তড়ি শ্রম গুনে সাজিয়ে রাখলো মনের
ঘরে। এবার হাসিটি কিরিয়ে নিয়ে গেল স্বভাবের
অন্দরে। হালকা হুবে মলয়ের কথার জবাব দিল, ভালো
আছি, আপনি কেমন আছেন?

অকাল পক্ষতর গজিয়ে ওঠা স্বপোনী চুলের মধ্যে
আতুল ডুবিয়া বিলি কাটতে কাটতে মলয় ভাবছিল এ
কথার জবাব কেমন জাবে দেবে।

জবাব তাকে বিতে হ'ল না। জবাব দেবার আগেই
তাকে আবার প্রশ্ন করা হ'ল। প্রশ্ন তবল কণ্ঠস্বর,
চাইলো বাসে তাড়াতা।

লেডিস ব্যাগের টিপকল খোলার আগেই মলয় বুক
পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বার করে
কণ্ঠস্বরের হাতে দিয়ে বলল, 'হু নানা.....'। স্বাস্থ্য
পথে কথা খামিয়ে ললিতার বিকে তাকিয়ে চোখের জাবার
জানতে চাইল কোথাকার টিকিট কাটবে? কোথায়
চলেছে ললিতা?

'না, না, আপনি টিকিট কাটবেন কেন? আমার
টিকিট আমিই কাটছি', বাগ থেকে কিছু খুঁজা পরমা বাত
করে ল'ল।

'কাটলেন কি হয়েছে? কিছুদিন আগেও তো এক
সঙ্গে বাসে চললো আমিই টিকিট কাটতাম, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তখন আমি বিদেশ ললিতা বহু
ছিলোব। নিশ্চয়ই আমকের মত বিদ্যুৎ ললিতা তার মত?'

'ও তাই বুঝি? শুণু একটা দই, পদবীর গুলট-পালটেই বুঝি মাথা ঘনটা উঠে যায়। তুমি হলে বার আপনি।'

তা যায় না। তলে আজকর এ ঘনটা শেরিন কোথায় কোন চোবা। বালিতে ভুবে গিয়েছিল? তর হর, যদি কালকের সেই চোবা বালিতেই বা বসে যায়।' অপর্যায়ের আলা চাকবায়ত ললিত, দুখ সুরিয়েনিতাই চোখটা পড়ল কণাকটাবের হিকে। মলয়ের চাকটা হাতে নিয়ে বিরক্তির চোখে বাববার সে তাকিয়ে দেখছে তাবের দু'জনকে।

এ চাহনি অলঙ্ঘ্য, যেন সাগের বাশন। এ আলা থেকে রক্তা পাবার তর ললিত তাড়াতাড়ি বলে দিল, 'জুটো ভাষাভাষার টিকিট দিন।'

বেশলা যেন আলোর চাঁদ দেখতে দেল মলয়। তাই বিগুন উৎসাহে রক্ত করে বলে ফেলল, 'হানি হানিছ আমার ভুল হয়েছে। কিছু ললিত। সে ভুলকে তুমি ক্ষমা করে আবার সেই পুরানো দিনেতে দু'জনকে কি'রিয়ে নিয়ে যেতে পারো না?'

মলয়ের কথার চমকে হাড় কেঁচাল ললিত। দীর্ঘে দীর্ঘে তার চোখে আবেশের ঢল নামছে। যেন আনন্দাঙ্গুর পার আদীরের স্পর্শ লেগেছে।

ললিতার মনে ছবি পাড়ে ফেললই মলয় কাণ্ডকান হাবিয়ে সেই বাসন্ত্য দোকর মাঝেই ললিতার হাতটা খপ করে চেপে ধরল।

গেল গেল করেও তির মরয়ে বাসটাব ত্রেক কথ্য গেল না। বেশ করে কল দু'হে এগিয়ে বাগবার পথ এক এডও কাঁজুনি দিয়ে বাসটা বাসল।

বাস বাসলেও দেহটা থেকে রক্ত বাব হওয়া পারতে

চার না। সদা সদা চাকার শেখা বেহটা নিয়ে অনেক অনেক গড়িয়ে পড়ছে ভাষা রক্ত। দুহুর্থে হানি ক'রিয়ে বিয়েছে ভাষা প্রকাশ দুখা'লী বোডের ফর্সা ব্যস্তটা।

এক লম্বা বাস থেকে কাঁপিয়ে পড়ে ওনারথো মিলে গেল বাস ভ্রাইসারটা। তাকে হাতে ফলকে জনতার বাস বিগুন তাবের গিয়ে পড়েছে বাসটার ওপরে। পাখর আর ইটের টুকরোগ বন্ বন্ বাধা বাজতে হুল করেছে বাসের গা দিয়ে। তবে শিল শিল করে বাজীরা বাস থেকে নেমে পড়েছে। কিছু দারী অস্ত বাসের মছানে ছুটছে, অস্ত বাসের পথ পরেছে, আর হজুক বাজীরা পথে দাঁড়িয়ে দেখছে দৌধিন ভগল ডেকার বাসটার কেরনভাবে আগুন ধব'নো হচ্ছে।

সব আগুনের স্পর্শ পেয়েছে বাসটা। ঠিক সেই দুহুর্থে কোথা থেকে তেড়ে এলো পুলিশের ভ্যান।

কাঁজনে গ্যাল আর লাঠির হাপটে বর্ণকেন্দ্র ছত্রচল করে দিল। দর্শকদের পায়ে জোপান এল প্রাণ বাঁচানোর আশ্রয় বোড়।

ঘেটের ঠাক দিয়ে মগ বাজারের ভেতরে ঢুকে পড়ে ললিতা। বাজারে ঢুকেও তার ভয় ঘরনি। ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে শি'ড়ি বেয়ে উঠে চলে ওপরে। ওপরে উঠে হস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে অবস্থির প্রখাস ছেড়ে ভাবে মলয় কোবার গেল?

ছুটেছে ছুটেতে দেবেস্ত যোব বোড পার হয়ে মলয় এল দাঁড়িয়েছে হস্তি দুখা'লী বোডের বোড়ে। দেখানে শুখন শত জনতার ভীড়। সেই ভীড়েও মথোই মলয় জঁ নু প নু করে হুঁলে চলে ললিতাকে। মলয় দেখে ভীড়ের মথো অনেক লতাই আছে, নেই শুণু তার দ্বী ললিতা।





হাতের কথা

স্বরাচার্য্য

হাত বেধা সম্বন্ধে শারদীয়া সংখ্যায় একটা খোঁটামুটি আলোচনা করেছি। হাতের বেধাগুলির যে একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, এইটাই ছিল ভাঙে প্রতিশ্রুত বিষয়। এখন ব্যক্তিগত জীবনে এই হাতের বেধা কতটা বাস্তব হতে পারে এবং ব্যক্তিগত জীবন প্রতিফলিত করে তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে রাখবেন, কাল্পনিক গল্প কবছিনা বাস্তবিক জীবনে যা ঘটেছে এবং ঘটতে দেখেছি সেই কথাই বলতে বসেছি।

এক ভ্রমশোক অত্যন্ত বাবু ছিলেন। ভাগবিদ্যাসেই ছিল তাঁর অভ্যাস। অবস্থা ভালই ছিল, গাড়ী স্কুটি বোরনোয়ার বাধা থাকতো। দিনে-রাতেও, খেলা দেখার অভ্যাস লম্বা। বেশ-দুখার আঁকরমক, জালদল

খাওয়াতে সম্মত। গৈরিক কাজ বেটা বেধাওনা করতেই সে বিষয়ে ধ্যান-বিভনে না, কারোই আপল তা নয়। এক একজনকে এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দূর্বলতা ঐক্য ধরনের পরিণতির কারণ। কেহ যোষ দেখেন হাতের বা কাগোঠ,

কেহ দোষ দেখেন মাহুখের। কার যে কতখানি দোষ তার লভ্যতা এখনও জানা যায়নি।

মাহুখের কোষ ত আমরা খুবই বিই এবং বেবোত্ত। কিন্তু মাহুখই কি সবটা বোঝা? তার শিক্ষা, সংস্কার, পালন, পারিশ্রমিক অনেকটা বোঝা নয়? 'লোভ প্রলোভন

হাতের রেখায় লেখা থাকে মানবের জীবন ইতিহাস। সে লেখার রহস্য ভেদ বীরা করতে পারেন, তাঁরা মাহুখের ভবিষ্যতের কথা বলে তাঁদের সতর্ক করতে পারেন, মাহুখের নৈরাশ্রকে কাটিয়ে তাঁদের মনে আশার আলোও আলতে পারেন।

হাত রেখার এই সব অশুভচারিত কাহিনী ও ইতিহাস এবার থেকে স্বরাচার্য্য তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে কিছু কিছু বলবেন পাঠকের কাছে।

সংস্কার কর' বললেই সংস্কার এলে গেল? ভিতরে যে কতটা লড়াই চলে তা কি প্রত্যেক মাহুখ জানে না? এবং সেই লড়াইয়ে কত লোক হারছে। ভিতরে তার সংস্কার কে রাখবে? নিজস্ব bad case দেখলে, পেটলোয়ারই দরদর পাওয়া যায় বাস্তব মপতে। অনেকেরই ত মানের লহিত নিত্যক ভ্রমতার জান হয়নি। তারই মত স্কটি সম্পন্ন কয়েকটি বন্ধু ছুটল,

কারোই 'কাব' ডকে উঠল। বন্ধু বাস্তব মানান্ভাবে ফাঁকি ছিল, নিজেও অনেক কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেন। ঘরগাড়ী বিক্রী হোল, স.স.ও কেলে গেল। এমত্বে যে ক্ষতি হোল তার কোন অবস্থাতেই

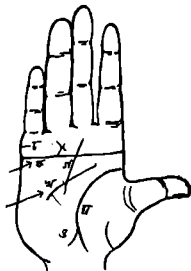
তার আনোদর মন না। একটি স্রোতকেই ঘোরে পাড়
এক কথার সর্গবাস্তব হলেন। পরে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়
হয়ে শড়ে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের কাছে হাত পেতেই
হিস কাটাতে লাগলেন। এই রকম ঘটনা খুব একটা
মুতন নয়, অনেক এই ধরনের ঘটনা বেধে থাকতে
পারেন। কিন্তু কেউ কি কখন ভাবেন যে হাতের মধ্যেই
এইরকম অধঃপাতে যাবার পূর্বগতা স্পষ্ট কথা কর।

আমি যে উদ্যতরপ বেধেছিলাম সেই রকম অসুখের
কয়েকটি প্রয়োজ্য, পরিচিত নিরে ভর সমাধে বেশ প্রভাব
সহিত জাঁকিয়ে বেগেছেন। এমন অনেকের অন্তরে যে
শৈশবিক ভাবও চলেছে তার খবর কেউ রাখেন কি ?
কাছেই কে ভাল বা দখ তার বাপকণ্ঠি টুকু লগতের
প্রতিভার নয়। কিতবেই আসল কি চিত্র তার প্রকাশ হয়
হাতের বর্ণে।

আমি যে ভ্রমলোকের পদম্বেদেছিলাম তাঁর গুরুগ্রহ
ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং এত প্রবল যে অল্প গ্রন্থানগুলি
তার কাছে নগণ্য ছিল। কাছের কোণ, বিলাস, আলস্য
মিথ্যাবাদিতা তার সর্গস্থ হয়ে দাঁড়সে। মস্তিষ্ক বেথা
বা থেকে বৃদ্ধির বিচায় হয় সে ছিল অল্প এবং কল্পনা
প্রবণের দিকে। পুনরায় হুগাহল ও একান্তই সেই
বেথাত্তে বুদ্ধ ছিল। কাছেরই বিচায়, বিশেষণ, ব্যতবতা বা

সাহসকে দুর্বলতা থেকে উদ্ধার বহু তা তাঁর চোখে ছিল
না। এই বুদ্ধির অস্ততার উপর হুগাহবেগ অত্যন্ত বেশী ছিল।
কাছেরই হুগাহ দিবে যে স্রোতাক্রমে তিনি গ্রহণ করলেন,
তার ভ্রম সংশয় ভাগ করতে তাঁর অস্বীকা হলে।
সাংসারিক দায় দায়িত্ব বা ছিল সে সব অগ্রহ বা প্রত্যা-
খ্যান করে একটা ঘোষের আওতে অব্যাহত মত বৃত্তকে
লাগলেন। কোন উপদেশের তিনি কর্পণাত অবলেন না।
বৈদিক স্রোতই চরম জ্ঞান করে সর্গের জলাভূমি ছিলেন।
তাঁর বৃত্তা অত্যন্তে ছিল একান্তই, সমগ্র করতলে ছিল
কোণের লাগল। প্রতিবেশক, মান, জ্ঞান, বুদ্ধি, ছিল সব
নগণ্য। কাছেরই বৃত্তিগুণ দুইটি স্থিতি কাম ও মোহ তাঁকে
দুদিসায় করে ছিল।

এর ভ্রম মাত্র কে ? সবটাই কি ওই ভ্রমলোকটি ?
তাঁর বেগের ধারা, পারিবারিক ও বিজ্ঞানগত শিক্ষা কণ্ঠের
পড়িল আবাহাওয়া, হীনকর্তৃত্ব বুদ্ধিবাহকের পরিত্রাণ কি
এই অবশেষে হয়ে গেলো। কখনো ? অস্ত্র তাঁর যে বহু
যেই ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এখন ব'র বেশ
সবটাই যে দিক হাত কিত্র সাংসার দিবে—ভ্রম-
লোকের বিপদ কোথায় কেন এবং কি কণ্ঠের ছিল।
আত্মকালকার সমাজের যিনি হাতের কথা মনে ভণ



ক—জ্বর বেধ

গ—ভাগ্য বেধ

খ—মস্তিষ্ক বেধ

ঘ—জীবনী বেধ

ঙ—স্বপ্ন বেধ

চ—বিবাহ বেধ

(১) কনিষ্ঠাঙ্গুলী ছোট—বুদ্ধি চর্চা, মস্তিষ্ক চর্চা কম।

(২) অনামিকা অধিকপুষ্টি—সাহসিকতার অধিক।
আমোর আচ্ছাদে অধিক কতি।(৩) মধ্যাঙ্গুলী বৃদ্ধ এবং অঙ্গুলী সকল হঠতে
সমকোণে অবস্থিত—আত্মীয় ও মেরী স্বভাব,
বসন্তপ্রধান।(৪) ও বেধা—চাকলাকারক, উচ্চ চরিত্রের লব্ধ—
কল্পনা প্রবণতা।

(৫) ক বেধা—অত্যধিক অস্বাভাবিক

(৬) খ বেধা—অবিবেচনা, হঠকাহিতা, দুবিধা-
বাদিতা, অগ্রগম্য চিন্তামোহিত।

(৭) গ বেধা—জীবনে সংঘর্ষ।

কথা। কাজেই হাতের মান নাই, হাতের বার্তা। শোনিবার কাগজেই বা আগ্রহ আছে।

এই তত্ত্বলোকেব রহস্য দেখা উভয় হাতেই দেখা শক্ত দেখার কঠোরতর শেষ দুই প্রান্ত পর্যন্ত চিত্ত ছিল। এই জন্ম দেখার কোন টেট না থাকার প্রেক্ষাপট অবস্থা ঘটে ছিল। এক নিমেষের প্রিয়জনকে নিমেষের সান্নিধ্য ঘাঘরি মস্ত অশ্রুধীর মোহ ছিল। মৃত্যু দেখার অপরিপক্বতা যেহেতু নিমেষের ভুল কোন দিনই নিমেষের কাছে থকা পড়লোনা। পরের বুদ্ধি শোনিবার মস্ত Adaptability তাঁর ছিল না। কারণ বৃদ্ধা আত্মলে ছিল এক যোধ্য ভাব, বৃদ্ধ লম্বাটে কবচলে ছিল আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, মাসেল হাতে ছিল জোপের ঘোঁক। অকৃত্য চক্র ভে গকে অকৃত্য দালিয়ার শেষ করল। অস্বাভাবিকভাবেই অস্বাভাবিক থাকার উচ্চ প্রকাশময় চিন্তা বা চেষ্টা দেখা পেল না। পার্থক্যিক মনোভাবই হাতে দিয়ে রাখল। Rationalityর বিকাশ তাঁর হোল না। ছোট ছোট মোটা আত্মলগুলি আপন ও ভোগচিন্তার গভীর মধ্যেই ডাকে আবদ্ধ করে রাখল। কাজেই তার জীবনের উৎকর্ষ আলোকে কোথা থেকে? তাঁর জীবনের এই গতি, ধারা ও পরিণতি নানান দেখা, চিন্তা, হৃদয়ের গঠন ইত্যাদিতে হস্ত-আকাশে উজ্জ্বল নবজন্মের মত দেখা ছিল। প্রশ্ন আসে—কে পড়ে? কে বেগে? কে শোনে? কে মানে?

(চলবে)

চৈত্র মাস কেমন যাবে?

চৈত্রমাসের গ্রন্থসংগ্রহ শুভাশুভ দেখা যায়। গ্রন্থগাথারি, চক্র ও বক্রণের সহিত শুভ সন্ধ্যা করলেও প্রকাশপতি ও বৃহস্পতি গ্রন্থসংগ্রহের প্রতিবিশ্বেতার বিবেচনা অবস্থান হজেন। কেবল তাহাই নয়, রাহব ছায়ায় ঢাকা পড়তে চলেছেন। যদি ধীর গৃহে অবস্থান করছেন, তাঁর অধিপতি বৃহস্পতি গ্রন্থ পরম শত্রু বৃহতের গৃহে অবস্থান করছেন। কাজেই মাসাধিপতি যদি বধন বেকা-মোহ, চৈত্র মাসের সাধারণ ফল কী করে প্রকাশ্যে করা যায় বলুন।

রবি বাহনসংক্রান্তের কার্যকর। কাজেই বিভিন্ন বাহন-পর্যায়কে এখনও অনেক প্রতিজ্ঞা অবস্থান রাখা দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত অর্থের টান বোধ হবে এবং হঠাৎ সন্ধ্যার সন্ধ্যায় হতে হবে। কর্তব্যসংক্রান্তের রবি আগ্রহ থাকলেও প্রচুর বাধা এসে পড়বে। অশ্রু চক্র ও বক্রণের সহিত রবি ভাল সন্ধ্যা থাকতে জ্ঞান ও কল্পনার দিক দিয়ে অনেকখানি এগোনা যেতে পারে। কাজেই এখন nice plan-এর সময়, execute না হয় পরেই করা যেতে পারে।

চক্র শবির ক্ষেত্রে শনি বৃহত। চক্র ও তাঁকে বৈরী পুষ্টি হিজেন। কাজেই মানসিক জীতি, শুভতা এবং বহু মনোমাম প্রত্যাহা মনে এই মাসে কিছু হবে বৈ কি। অশ্রু এটা কঠোর উঠে শুভের মূখ দেখে যাবে। কারণ চক্র ঠিক দুর্জন বা পীড়িত বলা যায় না। মনোবল ধরে অগ্রসর হলে শুভফল সুচিত্ত।

মঙ্গলগ্রহ বলবান, থাকার হস্তা। সাধন অবলম্বন করা যায় তাহাই শুভগ্রহ।

চক্রগ্রহ যেকোন আশ্রমে পুড়ছেন, শনির সান্নিধ্য আগ্রহ তাঁর ও হজেন, চক্র বৈরীপুষ্টি দিয়ে ভাবেই আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছেন। কাজেই ভোগ, বিলাস, বাজনা এ মাসে নিকট ভোগা থাকা ভাল। চক্রগ্রহ বৃহত ও ভূগা রাশির অধিপতি কাজেই যাহের বৃহত বা ভূগা লব, অথবা চক্র বা রবি এই দুই গৃহের কোনটিকে অবস্থিত তাঁদের কিছু গুরুত্ব হবেই। অশ্রু বৃহত রাশি থেকে গ্রহ মনোবল ভাল থাকার, বৃহত লোকেরা শুভতা বেগ পাবেন না।

এবার ব্যক্তিগত মানবল বিবেচনা করা যাক।

বৈশাখ—ধীরের বৈশাখ মাসে জন্ম তাঁদের চৈত্র মাসে কাজকর্মের যোগাযোগ অনেক। মাথার শুক হাড়ি এলে পড়তে, দেখা যাচ্ছে। এই চাপ থাকবেও অনেকদিন কারণ হাড়ি পুষ্টি ও চিকিৎসাকার শনি সবে আপনায় রবি রাশিতে পূর্ণাঙ্গ করেছে। আপনায় যা ঐচ্ছল্য তা ঢাকা পড়তে চলেছে নানান অমোঘ অস্থিবিধায়। আপনায় চাই খেঁচা, দ্বিহতা। তাহলেই আপনায় ভবিষ্যৎ দিনগুলি হৃদয় ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে পারবেন। এত গেল বন্দর দুই আড়াইয়ের সাধারণ কথা। এ

বাল্যের দল বিলাসে, কর্ণে আত্মনিবেগে কালে ভাল করবেন। স্বপ্নের যোগাযোগ এলে গ্রন্থে করতে পারেন, বুদ্ধি, বিচার, বিশ্লেষণ, শিরি চর্চা ইত্যাদি ব্যাপারে তৎপর হউন।

আত্মনিকে বিলাস বা আত্মপ্রতিষ্ঠা দাঁড় করাবেন না। কেবল relax করে নেবেন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর্ণে তাঁপিরে পড়ায় যত্নে।

কাজ থেকে বা শৈতন্য হতে চাকা কড়ি হাতে এসে পড়বে, চিন্তার কারণ নাই। তবে স্বপ্নে আপনায় তোলা আছে। ধর্মচর্চায় বাধ্য অনেক, বুদ্ধির চাকলাও থাকবে। মধ্যে মধ্যে দুঃসাহসিক কর্ণে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পেতে পারেন।

ভৈরব মান—বৈদ্যে ভৈরব মানে মন্য ভাবেই আর ভালই হবে। গৃহবাসী সংস্কার লাভও আশা করা যায়। কর্ণে যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। বাধ্য গরব করবেন না। একটু সময় হয়ে কাজ করলে যেটাছুটী ভাল কলই পাবেন। সন্তান বীষের আছে তাঁদের অনেককিছির উৎসে চলেছে, সত্যি। কিন্তু এ মাসে ভাবের লব্ধে যদি কিছু শুভ plan থাকে এগিয়ে যান। আপনি বিবাহিত হলে আপনায় স্ত্রী বা সখীর যেটাছুটী একটু কড়া থাকবে। উপায় নাই। পরকে যদি মনন করতে চান, এইটাই আপনায় লম্বা। কিন্তু জানেন ত এসব ভাবে নিজের অগাধি কিছুটা এসে পড়ে। এ মাসে আপনায় বায় কবেই হবে। বন্ধুস্বজন বাড়তে কিছু যোগাযোগ হতে পারে। যত্নের ঠিক আধার কোণটিতে বলে ধৌর করবেন, সে হযোগ বোধ হয় এ মাসে পাচ্ছেন না।

আবহ—বৈদ্যে আবহ মাসে মন্য তাঁদের চৈতন্য ভালই দেখি। গৃহস্থের অস্ত্র তে অনেককিছির থেকেই চলেছে। সে দিকে কতকটা হুসিবে হলেও হতে পারে। শিশুশাস্ত্র বাধ্য ভাল দেখি। কর্ণে অনেক কড়াই আছে সত্যি, কিন্তু প্রদায়ের পক্ষে শুভ। আর ভাল হবে, পরে মনিত থাকবে। পড়াশোনায় চেষ্টা করে মন দিন, খাটলে কল ব্যাপন হবে না। যদি ভেবে থাকেন বুদ্ধির জোরে পরীক্ষার বকে উঠে থিনা মহড়ার মেরে দেবেন, তাহলে আত্মকে বলতে হচ্ছে 'sorry' মনটা উচ্চ চিন্তার থাকলেও কঠোর স্বাভাব্য আপনাকে প্রয়োজনীয় বৈদ্যনি

কাজের মধ্যেই থাট স্তম্ভিরে দেবে। আপনি Cinema চরিত্রের লোক হলে আপনায় ভাল ভাবিবে হবে বলে মনে করছি। ভৈরব বা আবহ মাসে মন্য মেন উকীল বাবুও ভাল নাথ ও কাজ করবেন।

বীষের সন্তান আছে, তাঁরা সন্তানদের মান-বিধ চূর্ণকতা অশোভন করার মত সচেতন হলে ভাল করবেন। তাঁদের ব্যাপারটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে বাঁচলে ভাল হবে না।

বীষে বিবাহিত ভাবের পতি বা পত্নীর স্বাধা ও মেনাজ হুসিবে নথ। কিছুটা বৈধা বকন, এই উৎসে চলে যাবে। উত্তরাধিকার লব্ধে বীষের কিছু পারায় যোগাযোগ আছে, তাহা এই বিবর্তে তথির হুক করে দিন, লব্ধী তত্বীহের উপর ছাড়বেন না।

প্রাবণ—বীষের প্রাবণ মাসে মন্য, তাঁদের স্বাধা বাহিষ্য এসে পড়ছে। সাংসারিক বিন্দুস্বজা ও হুসিবে সন্তান হতে হবে মধ্যে মধ্যে। স্বাধার স্বাধা, কবিতা থাকলে, বিশেষ ভাল থাকবে না। একটা না একটা শারীরিক চূর্ণকতা পেয়েই থাকবে। এখন গৃহ সংস্কার ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা লম্বা মন্য মন্য নেওয়াই বাকী। বন্ধু-স্বজন নিয়েও কিছুটা বিবর্ত বোধ করতে হবে। এ সব কল কেবল চৈতন্য মাসের মত নয়, অস্ত্রতঃ বদল হুকে এই বাধ্যতেই এগোবে। কাণেই কোন প্রকার অংকোচ চলবে না। আর ব্যাপন দেখি না, কিন্তু বাধ্যতাই বৈধ। কাজেই আদিক অসংখ্য কিছু থাকার কথা এই মাসে। যদি বিবাহ না করে থাকেন এ মাসে বিবাহের কথা বর্তা বা যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। আপনায় অমত না করাই বাকী। ব্যাপসী হলে, বাবলা প্রদায়ের চেষ্টা করুন। লোকের লব্ধে যোগাযোগ বৃদ্ধি বকন। বিবাহের কল ব্যাপন নথ, অবশ্য পরিভ্রম এঁড়িয়ে হবে না। সুহা-বহাধি বা আত্মীয় জাতি সংক্রান্ত যে উৎসে চলেছে, এ মাসে তার কম দেখি না।

ভাত্র—বীষের ভাত্র মাসে মন্য তাঁদের স্বাধা বাহিষ্য কিছু করতে হতে পারে। পারিপার্শ্বিক অসন্তোষ লব্ধপ্রব থাকবে না। অনেক লম্বা দুঃসাহসের কাজ করতে হতে পারে বা কোন বিবাহের সন্তান হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য ভাল বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। অর্থ ব্যাপারে আপনায় উৎসে রয়েছে। আর অবশ্য ভালই হবে। বীষের মনি-

ততটাই যেনে শক্ত করতে পারবেন। শিতার দ্বারা ভাগ্য চলেবে না, শক্ত-সেয়ার ভিনি পীড়িত হোখ করতে পারেন। মা'ও যেনেবে তাঁর কর্তব্যমানার একটা limitation এনে পড়ছে। বিজ্ঞার ব্যাপারে ফল খাপে নহ। কামের বন্ধাট কিছু এনে পড়ছে। একদিনে যাবে না। চাই ধৈর্য ও সতর্কতা, নচেৎ যোগ্যতার উপর নিম্ন এনে পড়তে পারে।

কানুন—ধানের কানুন মানে জম্ম তাঁদের বৃত্ত ভীত থাকবে। তৎপরতা ও যোগ্যতার সন্ধিত কাম করতে পারবেন। খাটুনি ভালই থাকবে, উপায় নাই। বরশীর যোগাযোগ এনে পড়তে পারে। দ্বারা খাপে বেশি না, তবে অথবা চিন্তা বাড়াবে না। নিজের বিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠা অটুট থাকবে। ব্যবসারে অর্থশক্তি বেশি, তবে খরচ হয়ে যাবে। হানাতের পন্থানগমন সম্ভব। ধর্মসাধনার ভাল অগ্রগতি হতে পারবেন। যেখানে শান্ত রাখুন, ভোগের বিকে নম্বর কম দিন। বিবাহের কথাবার্তা এলেও যোগাযোগ পিছিয়ে যেতে পারে। সর্কর কথার জন্ত চেষ্টা করতে হবে। দিনা চেষ্টায় সম্মান শক্ত হবে। সম্মান হানি ভাল। তাদের হারদ্বারিত্ব ও কর্তব্যযোগে বাড়তে চলছে।

চৈত্র—ধানের চৈত্র মানে জম্ম তাদের চৈত্র মানে নৃতন বন্দর শক্ত হচ্ছে। কাজেই চৈত্র মাসের গ্রহসংস্থানে কেবল চৈত্র মাসের ফল প্রকাশিত হবে না, যেটা নুটি ভাবে সাগা বংশের ফল এই গ্রহসংস্থানেই দেখাচ্ছে।

বহিরাগতিতে বাহু ব্যাকার চৈত্র মাসের জাতকদের দ্বারা বংশেরই দোষ-কোঁপ করতে হবে। বিবাহ হয়ে যেনে থাকে চলবে না। অনেক সময় হঠাৎ বন্ধাট এনে মিত্রত করে কুলতে পারে। তবে সাংসে ভয় করে এগোলে গাফিলি ও কর্তব্য সম্পাদন করে উঠতে পারবেন। অর্থে ব্যাপারে কুপনতা এনে পড়তে পারে, কিন্তু খুব ব্যয়সংকোচ করে উঠতে পারবেন না। ব্যবসারে উৎসেগে লেবে একে অনেক হঠাৎ emergency অবস্থার সম্মুখীন হয়ে উঠতে পারে। partnership ব্যাপারে বন কবাক দ্বারা চুক্তি-ভঙ্গ ইত্যাদি হতে পারে। তবুও চাকরী অনেক। আদীন সাংসা বাহুগীর। পতি বা পত্নীর জন্ত উৎসেগে চলবে। তাঁর মেজাজও যাবে যাবে যোবা জার হবে। শত্রু কথায় নাচবেন না। আপনাকে অথবা উত্তেজিত করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য।

সাংসারিক ব্যয় কিছু এনে পড়ছে। খর ব্যাকার বিকে নম্বর না থাকলে সে সব ক্রমব: অগোছান হয়ে পড়বে। আর তপস্বে, চিন্তার করণ নাই। ধর্মব্যাপারে উৎসাহী হতে পারেন, তীব্রপর্যটনও সম্ভব হতে পারে।

বৈশাখ মাস কেমন যাবে

বৈশাখ মাসের গ্রহ সংস্থান ভাল নহ। বিশেষ করে অনেকগুলি গ্রহ বর্ষার মধ্য করেছে। ব'ই উচ্চ হলেও নীচ শনি ব্যাকার আক্রান্ত এবং হাচ বৈশাখের মধ্যে অর্থাৎ ১৮।১২ এপ্রিলের মধ্যে শুরু ও বরষের সঙ্গে বর্ষার মধ্য পূর্ণ করছে। কাজেই বহু বাধা বিঘ্ন অবস্থায়। কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে ব্যতির নিঃশাল কেনা সম্ভব নহ। কল-চীন মধ্য অধিকতর তিক্ত হবার আশঙ্কা করা যায়। বৈশাখ মাস চীন কেন আরও ইংল্যান্ড ব্যাপারটা হোয়াংসার উল্টে বিকে ব্যাকার সম্ভাবনা। এক কথায় যে সব দেশের মধ্যে পশ্চিম বিদেশী ভাব রয়েছে এবং যে সব সরকার বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশ-বেশি আছে তাদের মধ্যে গড়মিলের আদিতাই দেখা যাবে, তেতাই কাহারও ভাবে বুঝবেন বলে মনে হয় না। মোট কথা গঠন শুলক কিছু আশা দেখা যায় না, সবেতেই প্রতিবন্ধকতা। এমন কি তাপ আক্রমণ আক্রমণই অনিবার্য। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এইজন্য গ্রহকল তখন বক্রিগত স্থল স্থিতি বক্রতা পাওয়া যেতে পারে অস্থান করে নিন। ব'ই হোক ব্যক্তিগত মাসকল নীচে জানাচ্ছি।

বৈশাখ—ধারা বৈশাখ মাসে ভয়েছেন তাঁরা নৃতন ব'ই পা দিচ্ছেন। কাজেই তাঁদের পক্ষে এই গ্রহ সংস্থান শুধু বৈশাখ মাসের ফল জানাবে না, সমগ্র বংশের ব্যয় কেমন ফল আশা করা যায় তার আভাস দিচ্ছে। ধানের হাটাই বৈশাখে জম্ম তাঁদের পক্ষে বৈশাখ মাসটা এবং এটা নৃতন বংশেরটা যেতেই ভাল না, বহু বিকল্পীয় তাঁদের পেতে হবে। যেটা নুটি ভাবে ১লা থেকে ২০ই বৈশাখের জাতকের পক্ষে অর্থাৎ ১২ই এপ্রিলের থেকে ২২শে এপ্রিলের জাতকের অনেক অস্থিবিধা ভোগ করতে হবে।

ব'ই হোক বৈশাখ মাসের যেটা নুটি ফল এই।

আপনাকে ঘাড়ো লাগ-বাতিব এসে পড়েছে। বহু তরুণ, অশান্তি ও উত্তেজিত মনোবিশিষ্ট যৌবন যৌবন হইবে। কিছু তুল হিলাব করে কোমলও পাবেন। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকবে। বেশ অসংখ্যক বা অসংখ্যক ভাবে নিজে তুল করে বলবেন না যেন। যদি বিচার করে কাজ করেন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও হিতে পাঠবেন। যদি পড়াশোনা করেন, পত্রীর ভাবে ডুব যান। নতুন আশাহত হতে হবে। অর্থ ব্যাপারে খারাপ নয়। প্রয়োজনীয় অর্থ টিক জুট যাবে। জাতি আত্মীয় ভাইবোন সংক্রান্ত শাস্তি দেখিবে। উত্তরবাহী জালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে। হৃদয় আপনাকে তাঁদের মত অনেক লাগ-বাতিব পালন করতে হবে। আপনি নিজে খেতেই অনেক বিপদে লক্ষিত পড়বেন। পুষ্টি ব্যাপারে বা বন্ধুত্বের মাধ্যমে কিছু লাভ হবে। ঐশ্বর্য বাড়া বা লাভী কোনও ক্ষমতা এং অগ্রহ আছে তাঁরা বাড়ী বাড়ী লাভের মত হোঁ করুন। ঐশ্বর্য বাড়ী বল বা কোন প্রকার সংস্কারের মতকণ্ড তাঁরা এই সব কাজে অগ্রহাধিক হতে পাবেন। যেটা দুটো ভাবে লাভগত, বন্ধুত্ব, ও সম্পত্তিগত লাভ লাভ।

ঐরা বিবাহিত তাঁদের পতি বা পতীর বাহা ভাল দেখিবে। ঐরা অধিবাসিত তাঁদের পক্ষে বিবাহে কোন প্রকার বাধা আসতে পারে। আমার মতে ঐশ্বর্য বৈশাখ মাসে ওয় তাঁদের এই বৈশাখে বিবাহ না করাই বাঞ্ছনীয়।

ঐদের সন্তানাদি আছে, তাঁদের লজ্জা নঃক্রান্ত টেগে অশান্তি এসে পড়বে।

বোঠ—ঐদের বোঠ মাসে ওয়, তাঁদের আর ভালই দেখি এবং যেটা দুটো ভালই থাকবেন, কতকটা আনন্দে কিছু ব্যয় হবে অল্পের মত, কয়েকটি লাগ বাই ওয় ভাল হইবে যাবে। না চাইলেও অপরের সহিত বাগ-বিত্ততা এনে পড়বে। ধর্ম চর্চা করে আসে হইবে, যদি জীর্ণ গ্রন্থ করেন সে দিকে সুবিধে আছে। কর্ম ব্যাপারে বলাই দ্বারা আশঙ্ক দেখি। যদি জনসেবা করেন, এগিয়ে যান, যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। উকীল, ডাক্তার, শিল্পী, শিক্ষক, ছাত্র, জ্যোতিষীর পক্ষে লাভ। মোটেই ভাল নয়, কারণ বুকের অর্থ বা বিপদ। বিশেষ করে

জ্যোতিষ, আশ্বিন, অগ্রহাষণ ও চৈত্র মাসে ঐদের মন ভাবের পক্ষে ঐ সব কর্মকাণ্ডের বাধা বিয় অনেক বেশী।

অপের মতে প্রত্যেক বিবাহ বর্জন করবেন, কারণ প্রত্যেক ও ওয় পক্ষতা দুই দেখা যায়। শিষ্টাচারের মতকটা মোটেই ভাল নয়। আত্মীয় চিত্তা প্রাধান্য লাভ করতে পারে। চিত্তি পক্ষে আদান প্রদান বাড়তে পারে।

আখা—ঐদের আখা মাসে ওয় তাঁদের কতক কিছু পক্ষেও তেজ বিক্রম, প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে। অপ্রতিষ্ঠা বলাই রাখার মত ওয় কায়েলা ভোগ অবশ্যকারী। বেশী লেখ বলা: কাজ করে শরীরের দিকে দৃষ্টি আলাপা করবেন না। উত্তরবাহী ভোগ দেখা যায়। বিচার শুভাশুভ, কতক বিষয় ভাল হলেও, কতক বিষয়ে অত্যন্ত অসন্তোষ জনক হতে পারে। কর্মসম্পত্তি যান ব্যতির ইত্যাদি শেতে পাবেন। কর্ম স্থানের আবহাওয়াও যেটা দুটি ভাল থাকবে। আর ভাল দেখি। প্রয়োজন হলে লাভ করতে হবে। উত্তরবাহীকার মতে প্রাপ্তি যোগ দেখা যায়। পারিবারিক লাগ-বাতিব বহন করতে হবে। বিবাহের ভাল যোগাযোগ দেখা যায়। ঐদের লজ্জা দি আছে তাঁদের লজ্জা সংক্রান্ত কতকটা চলবে। পতি বা পতী হুখ আশা করা যায়।

প্রাণ—ঐদের প্রাণ মাসে ওয় তাঁদের অর্থোপার্জে যে বাবাই আশ্রয় শেষ পর্যন্ত লাভ বিধে যেতে হবে। কতক বিষয়ে পারিবারিক হুখ থাকলেও কতক বিষয়ে বহু অশান্তি হতে পারে, নিজেই হৃদয় হঠকাত্তি করে বলবেন। আত্মীয় মননপক্ষ লাগ-বাতিব বাই থাকে তাঁদের মতকণ্ড বা তাঁদের সংক্রান্ত লাভ, সুবিধা দেখা যায়। আমার মতে তাঁদের মতে যোগাযোগ রাখাই বাঞ্ছনীয়। বৈশাখ মাসে contract, agreement কিছু হতে পারে, এবং হলে খারাপ হবে না। ১৮১২ এপ্রিল মাসের চাকর চাপ খেতে পাবেন। সন্তান স্থান ভাল। শিল্পী চর্চা এবং চলচ্চিত্র অভিনয় ব্যাপারে সুবিধা হবে। কর্মব্যাপারে যোগাযোগ বন্ধে করতে হতে পারে। আর ভাল হবে। তবে আর ঠেকাতে পারবেন না।

ভাঙ্গ—ঐদের ভাঙ্গ মাসে ওয় তাঁদের বিবাহের যোগাযোগ বেশী। বিবাহিত ঐরা, তাঁদের পতী হুখ বা পতি হুখ আশা করা যায়। অর্থের অভাব হবে না। অশুভ অর্থ-

প্রাপ্তি ব্যাপারে কিছুটা উবেগ অশান্তি না ভোগ করে উপায় নাই। ব্যবসায়ীর পক্ষে সমস্যাটা মন্দ কি! ভাল বন্ধু সাহায্য পেতে পারেন। ঠাকুর কলকারখানা আছে, তাঁদের অংশ চিন্তায় কোন প্রচেষ্টা নাই। আপনাদের সাধারণ নৃতন হাতিখ এসে পড়ছে, তবে চিন্তার কারখানা নাই। জাতি-আত্মীয়ের পক্ষে সমস্যাটা তত ভাল নয়। ভোক্তার মন হবে না। কাজে নাম করতে পারবেন। বহু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসা প্রসার করার চেষ্টা করুন।

আশিন—ধানের আশিন মাসে জ্বর তাঁদের অনেক বিপর্যয় আনবে এসে পড়লেও, শেহনশা হয়ে যাবে। শিশুর বিন্দু দেখা যায়। নিজেও অবিরেচনা করে বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে পারেন। এক এক সময় ভুল বিভা বৃদ্ধির ব্যাধি নিজের ক্ষতি করে ফেলতে পারেন। কোন প্রকার হঠাৎবিজ্ঞা বাহ্যিক নয়। বিবাহের ভাল যোগাযোগ উপস্থিত হতে পারে। বিবাহিত যুগে তাঁদের পতি বা পত্নীর অর্থ ও স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। সন্তান সংক্রান্ত অনেক উবেগ অশান্তি ভোগ করতে হবে। শোভা করে বেশী ভোজন করলে উর্ধ্বের অসুখ ভাল থাকবে না। শত্রু চিন্তা বা খোঁচচিন্তা বেধা দিতে পারে। কোন কোন আত্মকের মাতুল সংক্রান্ত চিন্তা আগতে পারে। গৃহস্থের স্থান ভালই, তাঁদের প্রাধান্য বাড়তে পারে। মাতৃস্থান শুভ। কর্ণের উবেগ, হাতিখ ও কামেন্দ্য থাকবে।

কান্তিক—কর্ণ ও বিভাগসংক্রান্ত শুভফল, অস্ত্র বিদ্যার খুব উৎকর্ষ দেখা যায় না। ভ্রবণাধি ঘটবে, আত্মীয়-বন্ধনের সঙ্গে মেলোমেলনা বাড়তে পারে। শত্রু কাছে কাছের থাকবে, নিশা বা কোন প্রকার গুপ্ত শত্রুতা করাও দস্ত সব সময় ভৈরী থাকবে। উপায় নাই। বস্তুটা সমস্ত শত্রুদের neutralise করার চেষ্টা করা উচিত। বেশী আগ্রহ, বেশী initiative, বেশী স্পটবিজ্ঞা, বেশী চাকলা অনেকের পছন্দ হবে না, বরং হিসাব উত্তর করবে। বিবাহের যোগাযোগ শিথিলে যেতে পারে। শ্রীতি বা প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। বিদ্যার মনোনিবেশ করার চেষ্টা করুন। ফল ভালই হবে। কাজের পণ্ডিতীরা বাড়িয়ে ফেলতে পারেন। খাওয়ান হবে না। বরং plan ভালই হতে পারে। অনেকের সঙ্গে বিবাদ বিদ্রোহ ঘটতে পারে। অর্থচিন্তা

বেশী করবেন না।

অগ্রহাষণ—এই মাসে ঠাকুরের চর্য তাঁদের বৈশাখ মাস ভালই কাটবে। পারিবারিক চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সাংসারিক কিছু করতে হলে কঠিনতা পোড়াতে হবে হস্তব। আশ ভাল হবে, তবুও মনের তৃষ্ণি হবে না। পরী বা পতির প্রাণত্যাগ বাড়বে। জাতি-ভ্রাতা এবং আত্মীয় সংক্রান্ত শুভ ফল দেখা যায় না। তাঁদের মানসিক অস্থিরতা, ক্রোধ হতে পারে। বিভাগ ব্যাপারে বেশ কিছু-কাল পরে আপনাদের মনোনিবেশ করাই শক্ত হচ্ছে। তবুও ভোগ বিলাস অলস প্রাণ করে বসি পড়ার দিকে ঝুঁকি করেন স্থল উপলব্ধি পর্যন্ত করতে পারেন। প্রণয়-শ্রীতি ব্যাপারে যোগাযোগ দেখা যায়। সন্তান সংক্রান্ত আশেখিভাবে শুভফল বিবেচিত হয়। শত্রুত্ব হলেও শত্রুকে ধ্বংসে পারবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। দাম্পত্য লুপ্ত হতে পারে। অত্যাচার দেখা যায়। উত্তরাধিকারসূত্রে যদি কিছু পাওয়ার কথা থাকে, সে আশা বৈশাখে ছেড়ে দিন। গৃহে বহুসন্তান করতে পারেন। বাধা থাকলেও কৃতকার্য হতে পারবেন। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল বেশি না। কর্ণে ভৈরব স্থল পায়েন না। শিশুগণের পক্ষে সমস্যাটা মোটেই ভাল নয়। আপনাদের মানসিক ব্যাধি দেখা যায়।

গৌর—আপনাদের আত্মীয়-বন্ধন এবং প্রতিবেশী নিয়ে উবেগ থাকবে। অনেক সময় বিবাদশত্রু বা উবেগকারক পুত্রাদি পেতে পারেন। উর্ধ্ব পাড়া হতে সাধারণ থাকবেন। অহোরের নিয়ম ও পরিমাণ বজায় রাখার চেষ্টা করুন। সন্তানাদির স্বাস্থ্য মোটেই ভাল বেশি না। তাঁদের ব্যাপারে ঠাকুরের বর মেওয়া প্রচেষ্টা। গৃহে আশেখ-আল্লাহ বা উল্লেখ্য হতে পারে। কর্ণে উবেগ ঘাই থাকে বৈশাখ মাসে কোন বিপর্যয় নাই। বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ দেখা যায়। প্রণয় শ্রীতি শাসনের ব্যাপ্ত হলে মনঃক্লেশ হতে হবে। বৃদ্ধি অনেক বয়স সাধারণ আশে, ভাল চিন্তা করে কাজ করবেন। স্বাস্থ্য ছেলে বা মেয়ের বিবাহ বেধেন তাঁরা বৈশাখ মাসে চেষ্টা করুন।

মাঘ—মাঘের মাঘ মাসে জ্বর, তাঁদের অনেক সাংসারিক পারিবারিক জ্ঞান ভোগ করতে হবে। স্থলের কথা ছেড়ে দিন, বাহ-বাতিখই বেশী এসে পড়বে। স্বাধীন ব্যবসায়

অবশ্যই কেবা যায়, তবে Steady থাকবে না। তাই-
বোন সন্তোষ কিছু লাভ হুবিধা দেবি। তাঁদের বিবাহ,
কর্ম বা অকর্মকার গুণফল হবে। বহু বাধার নিয়ে বেশী
কষ্টের যেতে পারেন। ব্যাভার বাবা ভাল দেখি না।
হায়েব সন্তান আছে, তারা সন্তান সন্তোষ গুণ ব্যাবহাৰিতে
এসিয়ে বান্। গৃহে শক্ততা পেতে পারেন। পারিবারিক
অশান্তি অনেকের সাহায্যে মল্ল হতে পারে। উত্তরাধিকার
যুগে বাঁধের প্রাপ্তি যোগ আছে তাঁদের অনেক কাঠ খড়
শোড়াক্তে হবে। বাঁধের বিষয় সম্পত্তি মল্ল করতে হয়,
তাঁদের দিক্‌বাহী বিলম্বন। বাঁধের Heart দুর্বল তাঁদের
অধিক পতিভ্রম বন্ধনীয়। কর্ম বহু কষ্টে ভোগের পথ
তবে কিছু হুবিধা পাবেন।

কান্ডন—বাঁধের কান্ডন রাসে মল্ল তাঁদের আবেগ বৃদ্ধি
পেতে পারে। আরও বৃদ্ধি পেতে পাবে। পুণ্যদি ব্যাপারে
সন্তোষ করতে পারেন। কাঁহাও গাড়ী বদল বা বাকী
বদল সন্তোষ। বাঁধা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহ যোগ দেখা
যায়। বাঁধা বিবাহিত তাঁরা পারিবারিক ব্যাপারে
অনেকটা ভুলে বাবেন, অসন্তোষ অনিচ্ছতা সবচে একটা
পাকা বাধার উপন্যাস হতে পারবেন। জাভা ভরী

মহাটা ভাল নয়। তাঁদের মানসিক অশান্তি হতে পারে।
তাঁদের মল্ল আপনাকেও অনেকটা Sacrifice করতে
হবে। কর্মে বাটুনি লম্বানে চলবে। তাতেই আপনাত
প্রতিষ্ঠা ঠিক থাকবে। উত্তর ছাড়বেন না। পারেন ও
অন লম্বাও লম্বা যোগাযোগ বাড়িয়ে ফেলুন। সন্তান
বিষয়ক উৎসাহ দেখা যায়। তাঁদের Constructive
কাজে সাহায্য করুন, কোন প্রকার বাধা দেবেন না।
তাঁদের তবিবাহ লম্বা আপনাত এখন ভাবার প্রয়োজন।

১৫৯—বাঁধ আপনাত চৈতন্য মালে মল্ল হয় এই বৈশাখ
ব্যক্তিগতঃ মল্ল হুবিধার অচাং হবে না। বিবাহ বা প্রণয়াদি
ব্যাপারে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। অর্থকর প্রচুর দেখা
যায়। আর কতকজন কি ? আর তাঁরা আগেরই মল্ল হা
করেই দাঁড়িয়ে আছে। বাঁধা বিবাহিত তাঁদের দাম্পত্য
মল্ল কতকটা মল্ল হবে, পতি পত্নীর মল্ল ভাল না থাকাই
সন্তোষ। কর্ম ব্যাপারে কিছু অধিক facilities পেতে
পারেন। আন্তরিক মননের কোন গুণ পরিবর্তন সন্তোষ।
বাঁধা দলীত লাবন্য আছে মল্ল তাঁরা উৎসাহ করে এসিয়ে
যান। নাট্যমগ্নতাও উন্নতি করতে পারেন। রত্ন বাক্য
প্রয়োগে সন্তোষ প্রয়োজন, নচেৎ অর্থবা শক্ত বৃদ্ধি হবে।

একটি মৃত্যু

শান্তশীল দাস

কোনো মতে কারত্রেণে দিনগুলো কাটছিল তার,
কাটছিল কোনো মতে টেনে টেনে বাধা পেয়ে পেয়ে ;
তবুও হুঁচোখে তার মল্ল ছিল কিছু আলোকের,
কিছু আশা হুঁচিনের মল্ল ভরা ছিল সে তখনো।

সেই আশা শেষ হ'ল, লব মল্ল মূছে গেল তার,
এখন নেইক আর কোনো। হায় কোনও জীবন ;
চলে গেল একবারে লব বাধা হাট্টিয়ে পাত্রে,
দকাল বিকাল লম্বা নেই আর তার কাছে নেই।

অথবা দু'চোখ ভরা মল্ল, মল্ল কত হাট্টিয়ে,
মল্ল আজ কেমনো, কী জীবন আধারের মল্ল,
একটি প্রাণী শিখা কোনোমতে মল্লছিল, তাঁও
নিভে গেল, অন্ধকার, চারিদিকে মল্ল অন্ধকার।

এই অন্ধকার সে তো দেখেবে না একটুও কিরে,
তার মল্ল আলো-মল্ল, তার মল্ল নিঃশব্দ নিঃশব্দ।

বিজয়ী বসন্ত

শ্রীসমীরণ রুদ্র

ছোট্ট ট্রেন। সেদিন নদী পেরিয়ে ট্রেনে পৌছান। আগেই রাত বশটার সেই ডার্টন ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছিল। কি কবি। অগত্যা রাত ভিনটের কোলকাতাপানী ট্রেনখানার মত অপেক্ষা করতে হল। তখন বসন্তকাল, ফুলফুল হাওয়া মিছে। হটকেন ও বেজিটা ওয়েটিকেনে বেধে প্রাটফর্মের একটা বেজিতে এসে বসলুম। আধঘাটাঘের আলোর একধন দুবতীকে দেখলুম প্রাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। না, সঙ্গে কেউ নেই। মনে হচ্ছে একাই, অথচ পুরনো বেশ ছায়া শাড়ী, ভল্লভেরই মনে হল। সেই মহার্ঘ বসন্ত ও ভুলথকে ছাপিয়ে কিন্তু উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে ভবিষ্যৎ যৌবন, যেন একটি সংহত প্রাণ। রূপ ও লাবণ্যের এখন পরিপূর্ণ বিকাশ আমি এর আগে কখনো দেখিনি। একটু দূর থেকেই আমি এ সব দেখেছিলাম।

আমার মনে কখন সন্দেহ হল। মেয়েটা বাজী থেকে পাশাচ্ছে না তো? কিংবা ওর আত্মহত্যা বা আত্ম-হত্যার কোন গুণ বাসনা নেই তো? এমনও হতে পারে হয়তো যে প্রেমিকের ভালবাসার মধ্যে ওর মন হারিয়ে যেতে চেয়েছিল সেই পুরুষটি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধিকে দেখি আপ লাইনে সিগন্যাল দিয়েছে। আপ গাড়ী একটা কোলকাতা থেকে আসছে। আমি জানি এই বেল গাড়ীটা এই ছোট্ট ট্রেনে থরবে না। মেয়েটাও দেখি প্রাটফর্ম থেকে কখন হুলুৎ করে নেবে গেছে। লাইনের আগে পাশে উল্লেখ্যভাবে দাঁড়িয়ে। সর্বদা, তাহলে বা তেবেছি তাই। আর খসে বাক্য তো যা না। মেয়েটা এবারের দেখলুম আপ লাইনেই উঠেছে এবং লাইনের উপর

দিয়ে দাঁড়িয়ে। কালবিগল না করে আমি বৌড় দিলুম। শুভকর্মে গাড়ীর বেজিলাইটেই আলো দেখা যাচ্ছে। আমি বৌড়ে যেতে যেতে বেশ লাইনের ওই ছড়ানো হুড়ি ও পাখরগুলোতে হঠাৎ চোকাখ খেয়ে পড়ে গেলুম। বিশ্বের বিঘড় ও হস্তব্যাক হয়ে গেছি। আমার হাতের তালু, হাঁটু দুটো ও কপালে কীধর চোট লেগেছে। দেখিকে জ্ঞান না করে ধর্মান্তি ভাড়াভাড়ি উঠে আমার বৌড় দিলুম, মুখে চীৎকার করে বললুম “সাবধান, মনে যান, বেশ আসছে।” দেখি সেই দুবতী লাইনের ওপর দিয়ে এবার দৌড়তে শুরু করেছে। আমিও ওর পিছু পিছু বৌড়াছি। পিছনে গাড়ীর তীব্র ভীক হইসেল শোনা গেল। আমারের ঘর ঘর ছুঁই ছুঁই অথবা—আমি ওকে ধরেও ধরতে পারছিলাম। প্রচণ্ডভাবে টেঁচিয়ে বললুম “আগে আগে—ওকি কহছেন? লাইন থেকে নেমে পড়ুন। এখনি কটা পড়বেন। গাড়ি এসে গেল যে।” সন্তবতঃ ইঞ্জিনের ড্রাইভার আমারের হুসনকে বৌড়তে বেগেছে। গাড়ীর পতিও দেখি অনেকটা কমেছে। আমার কান বেটে গেল হইসেলের মধ্যে। ভীষণ অথবা তখন। আমি ওর একটা হাত এই সময়ে কোন বকবে ধরে কেনলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে লাইন থেকে নিচে লাফিয়ে পড়লুম। গাড়ি না থেবে এবার ধীরে ধীরে আমারের পাশ দিয়ে সশব্দেবিয়ে গেল। মাঝার ওপর চোরে মালের তাহার ভরা আকাশ। চারিদিকে হু হু করছে শক্ত লুৎক ভরা প্রাণ্ডর। নদী থেকে আসছে নানা মলের হাওয়া। সেই মেয়েটির মর্দা কোমল হাত তখনো আমি বসন্তবীতে ধরে রেখেছি। উত্তেজনা

আমি তখনো কাঁপছিলাম। দেবপুর ঘেঁরে যা। অল্প বয়সের
যয় আছে ওর যৌথনে। কি? কি? ক'ছিল তীব্রভাবে।
দেই নিচক, মিশ্রীমিরী হত নভার তবাব মছোৎসবে
আমরা দুজনে তুমু নীরবে বর্ণেছিলুম পাশাপাশি। ই।
আমরা শুকনো ঘাসের ওপরই বসে পড়েছিলাম। তখন
আমি কে অত বাছাবাছি করে। আমি ইচ্ছিক পড়ে-
ছিলাম। কতজন কেটে গেল। মনে গেল কতকাল,
কতস্থ। ও হঠাৎ কৈদে উঠলো, কৈদেই বলল আমার
আপনি ঠাঙ্গলেন কেন? কেন ঠাঙ্গলেন বসুন। আমি
কি অপরাধ করেছি আপনায় কাছে?"

আমিও পাটো প্রস্থ করলাম "ধরতে পেছলেন কেন?
এই ভীষনকে নষ্ট করবার অধিকার আপনার নেই।
কাকুই নেই।" এবার নিষ্ঠে কঠে সে বলল "আপনার
এই উৎসাহ ও কৌতুহল সাধারণ সৌভাগ্য ও শালীনতাকে
ছাপিয়ে যাচ্ছে না কি? আপনি কে তা? আমি জানি
না। আপনার পরিচয় জানি না। তবে কেন আপনার
এ কৌতুহল? জবে একথা ঠিক আপনি আমার আপন-
জন কেউ নন। তবু স্বীকার করবেন আজ আপনিই আমার
বীড়িয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। আমি চিব স্বপ্নী। আমার চরম
দুঃখের মধ্যে আপনি আজ এলেন আমার প্রাণধাতারূপে,
বহুভূপে, আকাশপাখার মূর্তি বাস্তব নিয়ে। জীবনের
বানী নিয়ে। মনে করেছিলাম আমি বোহিনী নক্ষত্রের
মতন থাকবো এই চন্দ্রের পাখের কাছে কাছে। কিন্তু সেই
বিলাসভাতক চন্দ্র আমার ঘরে বহিরাগত জলে দিয়ে
অন্ত লীলা সন্নিধি রয়েছে। তাই ভাবছি প্রকরে কি
কখনও স্ত্রীমেলের স্বাক্ষর ফোটে? হুঃপাখার বেশে মূলভের
অভিধা? আমি তুল করেছিলাম। তাই কাঁপছি। তাই
ধরতে পেছলাম।" এবার আমি ছোট্টের হাত ছেড়ে দিমে-
ছিলাম। মূলভি বজায় রেখে আমার পাশাপাশি তেঁরি
বলে বসলাম। সব গুলে-না-বলা কোন সোপান করার
মাত্রা আমার মনকেও ভাবাক্রান্ত করে তুলল। ওর
জীবনের একটা কল্প ইতিহাস নিচুই আছে। হঠাৎ
আমি অচেনা অগাধ বাহুল্য বলে বগতে চাইলে না। দুঃখ
বদি নাই থাকবে তবে ঐ মেয়েটা এভাবে মৃত্যু পেছল
কেন এই যৌবন নিয়ে? অহুঃ মনের উৎসাহ ল্পন পেলে
হয়তো ও মনকথা বলবে। তাই আমার গুকে স্বেচ্ছা

কঠে বিভ্রাট করলাম, "আপনার নাম কি? অবশ্য করা
করবেন বিভ্রাট করছি বলে। কারণ এ ক্ষেত্রে আমার
বিভ্রাট না হবে উপায় নেই।" মিথ কঠে সে বলল—
"বোহিনী। ডাক নাম ময়না।"

"আপনি পড়াশোনা করেছেন কতদূর?"

"আমি বি এ পাঠেই এবার দিয়েছি।"

"কোলকাতাতেই থাকেন?"

"হ্যাঁ। ওখানে আমার মাসীমার বাড়িতে আমি
থাকি। এখানে আমার কাকা ও কাকীমা আছেন।
তাই এলোছিলাম। এখানে প্রায় প্রত্যেক দুটিতে এসে
থাকি। বামতী পূজার দুটিতে এলোছিলাম। ওখানে
কোলকাতাতে আমি চাকরী করি।"

"কি চাকরী করেন?"

"মরকারী অফিসে টেনো-টাইপিটের কাজ।"

"আপনার বাবা ও মা আছেন কি? তাই বোন
কেউ?"

"না ঠাও কেউ নেই। এখানে আমার কাকাই আমার
অভিভাবক, তাঁর ওখানে ধান কল আছে। ওখানে আমার
মহোদয়শাই আমার অভিভাবক। তাঁর ওখানে ডেল
কল আছে। মাকে বাবাকে হারিয়েছি কোন ছেলেকেলায়
তা আমার মনেও নেই।" মেয়েটির চোখে আমার মল
এল। সে বলতে লাগল "আপন কাকা তো তাই কাকা
আমাকে খুব ভালবাসেন। তিনি অপুত্রক। মহোদয়শাইও
নিমেষ মেয়ের মত ভালবাসেন। তাঁরও কোন মেয়ে নেই।
দুঃখ ছিল না কোথাক। রয়েছে নিমেষ পড়াশোনা নিয়ে
থাকি, এরপর এসে পড়ার ইচ্ছাও আছে। কাকেই মধ্যে
আনন্দ পাই। সত্যমিন কাজ নিয়েই থাকি। মশটা-
পাটো অক্ষি করি। এইই মধ্যে মানে আমাদের
অক্ষিসেই একজন মন্থর, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবী পুরুষকে
মন ছুঁতেছিল আমার এই কাঁচা বয়সের মায়। আমি
প্রথমে অত বুদ্ধি নি। সেই বুদ্ধি অক্ষিার যে মন্থর,
লম্বা, পঠ ও বিলাসভাতক আমি ওর মন্থর বুদ্ধি দেখে
প্রথমে অত পত বুদ্ধিতে পাবিনি। আমার বস্তু তো, প্রায়ই
ভেবে পাঠাতো ওর চেতন। দুটিই পরে ওর পাড়িতে
চাপিয়ে নিয়ে বেড়াতে যেত। পতি কথ। বলতে কি ও
কাছে থাকলে, কথ। বললে, ভাল লাগতো। পুলক আগতো

আমার বেছে। আমার জন্যে পড়া পড়ার অন্তরালে
বেঁচেছিল একটি কুঁড়ি। তারপর একদিন রাঙা পাগড়ি
বেলে সেই কুঁড়ি যে যথু বনে প্রেমের মূল হয়ে ফুটে
উঠবে তাও আমি তখন বুঝতে পারিনি। একটা বছর
এমনি ভাবেই কাটল। তারপরই বুদ্ধদেব ওর প্রত্যাবরণ।
সব ছলনা, চাতুরী ওর খরা পড়ল। সেই হৃদয় প্রেমিক
সবর আমার, তখন মাথা ঘিটে বেতে অস্ত্র ফুলে যথু খেতে
একদিন উড়ে গেল। গোবিন্দী নক্ষত্রের মত চিরদিন
ধাকবো চক্রেয় পাথের কাছে কাছে সেই বপ্ন আমি যে-
ছিলুম, তা সেই বপ্ন আমার হাওয়ার মিলিয়ে গেল।
এখন আশ্বহত্যা ছাড়া আর পথ নেই।”

আমার মনে হল এই হতভাগ্য নারীকে আমার যাকি কিছু
শোনানো উচিত। শায় প্রেমের কার্টে আমি তাই বললুম—
“আমার নিজের বিধান হাছুরের কল্যাণেই হাছুরকে হাতে
মাফে চরম হুং তলপান দিয়ে খুঁসেন। এতে স্ত্রীকে পড়বার
মত কিছু নেই। আপনি অনেক কিছু ঠেকে শিখলেন।
এই ঠেকে দেখা জানি হাছুরকে অধুনের পথে নিয়ে যার।
তবে একথাও ঠিক তাই বলে সব পুঙ্খই খারাপ হয় না।
সব পুঙ্খই লম্পট নয়। এ সংসারে ভালবাসাই ভগবান।
পৃথিবীতে একটি মাত্র বিশ্ববর্ষ আছে বা রয়েছে তা হল
ভালবাসার ধর্ম। ভগবানে বিশ্বাস বেধে কাহনোবাকো
সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই ভগবানকে ও তাঁর সত্যানন্দের ভাল-
বাসতে হবে। তা না হলে মনে শক্তি ও শক্তি পাবেন
না। তুলে যান আপনায় প্রোবাক অতীতকে। আমার
নতুন করে জীবন আরম্ভ করুন। আমি বিধান কবি
নারীর আত্মা পৃথিবীর সাহসকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উল্ল’
খেকে উল্ল’। আমি আছ বেগের মধ্যে পাশের আশ্রয়না
তুলীভূত হয়ে উঠছে। কিন্তু আপনি সেই অমিত্যেজা
নারী। আপনি হতাপ হবেন কেন? আপনায় তো
ভেঙে পড়লে চলবে না। আপনাকে যা বলছি এ সবই
আমার বিধানের কথা। আমি বিধান কবি নারী ভগ-
বানের হৃদয়ভর স্ত্রী। ভগবান আগে পুঙ্খ স্ত্রী
করেছেন, তার-রে স্ত্রী করেছেন নারী। আমাদের বহু
সাহসিকা বলেছেন “নারী থাকেই পবিত্র, কারণ নারী
হৃদয়।” মহাত্মাভক্তার বলেছেন ‘নারী, আর ওর, অকল
আর ধর্ম দুটিই হয় না।’ তাই আপনি হৃদয় থেকে কোক

হু করে ফেলুন। আপনি অপরিস্রব হন নি। আমার
বেছুন না, আমার বহন পরিত্রা। এই পরিত্রা বহন কল
এক রকম জীবন সংঘর্ষে কেটেছে। আমি জানি আরও
ত্রিশ পরিত্রা বহন অন্ততঃ দুঃখে কষ্টে আমার জীবন কেটে
যাবে। এও আমি হাছুর হৃদয়ে লোকে ও বাচার লোকে
হটকটায়। কিন্তু আমি তাই পে সব আমার জীবনে এলে
তালই, না এ-লই যা ক্ষতি কি? যদি হৃদয় না পাই, কপালে
যদি শক্তি না থাকে তাই বলে আমি আশ্বহত্যা করবো?
আমি যে মেয়েটিকে, মানে গোমাকে ভালবাসতুম সে একটি
ভদ্রী, বুদ্ধী, হৃদয়ী মেয়ে, যুখে সবসময় ললম স্ত্রী হাদি
লেগে থাকতো। তার প্রেমে আমি ডুবে গেলুম। সেও
আমার ভালবাসতো। তুমি শেষ পর্যন্ত যে আশাকে বোকা
বানিয়ে অস্ত্র এক দিব্যকায়ি বনী পুঙ্খকে নিয়ে করেছ।
এতে আমি মনে মনে খুঃ হুং পেয়েছি। কিন্তু তাই
বলে আমি আশ্বহত্যা করবো! কেন? কিলের মত?”
আমি চুপ করলুম। আশ্বা চোখের লালায় ওর হৃদয়ের
গোনার বালা ছুটি চিকচিক করছিল। ওর কানের
ফুকাটাতো বক বক করছিল। ওর গায়ের কাপড় অনেকটা
তোলা ছিল। বেৎলুর ওর পা, পায়ের গোছ বেশ ভারী,
ভরম্ব ও হৃদয়। ওর ঠোঁট ছুটি পাতলা, হাতের পাটি
হৃদয় গোছানো, নাক লম্বা। চোখ দুটি টানা। ওর
দুটি খুঁ সজীব ও চকল। আমার যেখানটার অকলো
মাসের ভগ্ন বসেছিলুম তার এখানে ওখানে বন তুলসীর
অল ছিল। মাথার ওপর একটা বাগাচুড়োর সাঁচ ছিল,
তার পাতার বনভালের হাফ বাতালের মত হজিল।
বোহনা এবার আমার মিজ না করল। কিন্তু আপনায় নাম ও
পরিচয় আমি এখনো কিছুই জানতে পারিনি। এবার
বলুন আপনায় পরিচয়। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়ে-
ছেন এখন আর আপনাকে পর ভাবতে পারছিনে।”

হেসে বললুম “আমার নাম বিঘল। উদ্ভিদ বিভাজনে
এক, এ-সি তে আমি প্রথম জৈবীর প্রথম স্থান অধিকার
করেছিলুম। এখন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীতে অধিষ্ঠিত।
মাইনে মশ পকাশ। আর আমার সংঘর্ষে, কি জানতে
চান হলুম। ই্যা, কলো আমার আশ্ব ও মোটেনি তাই
এখনো অবিবাহিতই আছি। সত্যি বলতে কি আমি
উদ্ভিদ সংঘর্ষে পরবরণা কনি, তাই হয়তো হেরেয়া আমাকে

অশঙ্কল করে। অথবা আমিই হঠাৎ যথেষ্টের লক্ষ্যে, এতদিন ভাবতে ছুটলুম পাইনি। কোলকাতার এক-খানা শিখর পৈতৃক বাড়ি আছে। বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। আমি একা। অবশ্য অন্ত্যস্ত আত্মীয় স্বজন অনেকই আছেন। বাড়িতে এক বিধবা শিল্পীবা আছেন। কোন-কখনে দিন চলে যায়। চাকর ও ঠাঁহুর আহার সংসার চালায়।”

বোহনা বলল “বিশ্বনাথু। কিংকর আশ্চর্য বৈশুণ, এই পৃথিবীতে পরজানের চেহারাও ঠিক হাল্ধের মতই হয়। আমি মাত্রইই ভেবেছিলাম হৃদয় নাথের সেই পরজানকে। সে কুহিত পশুর মত আহার এই বেরটাকে পাঁকের মতো টেনে নিয়ে ডাকে কারকে ছিড়ে হত্যা করতে গিয়েছিল।”

বললুম “হয়তো এই নিম্ন। পরজানকে নানা গুণে কুহিত হতে হয়। তা না হলে বর্গকে বিলুপ্ত করবে সে কোন হাতিয়ারে? কুহিত পশুর মতোই আপনাব পত্রিগর হয়েছে। পরিপূর্ণ হাল্ধের লগ্নে হয় নি। তাই আত্ম-হত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন।”

মোনা বলল “হৃদয় একদিন আমার হাত ধরে প্রতি-ক্রটি দিয়ে বলল তার সর্ব্ব উপহারের। হ্যাঁ সে তাই বলেছিল। আর তার সেই প্রতিক্রিাতে আমি বিবাস করেছিলাম। আমি এর আগে কখনও পরজান দেখিনি। তাই সেই সর্ব্বের প্রতিক্রিাতে আমি কলিত হয়েছিলাম, অশিত হয়েছিলাম, আর মাটি। পৃথিবীটাকে আগের গড়া অধরাবতী করেছিলাম। কিন্তু পরজানের হৃদয়ে একদিন ঠাঁহু ফুল পেল। তার বিয়ে করার প্রতিক্রিতি হাওয়ায় ছিটিলে পেল। হুহু কেটে পেল। তাল তেঙে পেল। হৃদয়ের কপটতা বহা পড়ল। আমি শুঁকে তখন যেজ্ঞার মুক্তি বিলুপ্ত। না বিয়ের উপায় ছিল না। জোব করে কি ভালবাসা আহার করা যায়! সে পানিয়ে বাঁচল। একি ভালবাসা? নারীর হৃদয় নিয়ে ছিমিছিম খেলা। সে নির্ব্ব, সুখের। হৃদয়ের মতো এটি খুঁজল পরা ভালো-মালুম সঙ্গে থাকে পরজান-এই লারা বেশ অনেক আছে। তারাই ছিটিলে আছে হাওয়ায় বহে হাওয়ায় মুক্তি বহে।”

বললুম “ওই পরজানই নেই, মাত্রই আছে। হাওয়াই হয় যেহেতু। তবে সেই বৈষয় লাবনা দিয়ে অর্জন করতে

হয়।”

গাংগেব মিটি হঠাৎ এভাবে বলে আসছিল। সেই বাতালে মাঝে মাঝে ভেদে আসছিল বনৌবির তীত্র হৃদয়। সে গড়, হৃদয় মত মাঝকতা পূর্ণ। নিশ্চিন্ত হাত, মাঝে জননী, নিশ্চয়, নিশ্চয় বনকুহি ও গ্রাহ্য। আমায় হৃদয় শুধু পাণ্যপাণি বলেছিলাম বেশ লাইনের ধারে বলেই চাপড়ার তপস। চাহিদায়ে তিরিগ নিষিদ্ধিগর কারো। নৈতিক লগ্নে ও হৃদয় তুতিতার অহংকার ছিল আহার। অতিশয় লগ্নেতন হন নিয়ে আমি জীবনের সর্ব্বকোরে চলা-কোরা করি। কিন্তু সেই আহার প্রবল লগ্নেতন হন আহারে ভোহনার সর্ব্বনাশা বৈষয়গরী আশেপাশে এখন যেন ছিমিছিম খেলতে লাগল। আহার পূহীতের কোবে কোবে যেন নতুন গ্রাণ লকার করে দিল। আশ্চর্য অসুস্থতিতে হন আহার ভরে উঠল। আমি বললুম “এই পরজান যেমন পুত্রের তপ নিয়ে আছে, তেমনই এ গুণে সেই পরজান যেহেতু হৃদয়ে আছে। তখন সে হল পরজানী গেরে। আমার হৃদয়েই হৃদয়ের একজাংগতে বহুখা খেয়েছি। তাই আমার এখন একে অস্ত্রের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে পারি। পারি নাকি? আমি হো আগেই বলেছি আমারে যা আহার করেছে তা হৃদয় গেরে ময়, কোন নারীর প্রত্যা-খানের বৈষয় ময়। আমার মতাকে, আমার প্রত্যেকটি ম-হুকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে একটি পরজানী নারীর বীচতা বলতা ও কাপট্য। থাকে আমি পৃথিবীর মতই কোমলতা, দালিত্য ও লাগ্য বিয়ে আর পৃথিবীর মতই কাব্য ও লজ্জিত বিয়ে গড়ে কুণেছিলাম তার কুণতা ও কুণতা আমার মাথার মধ্যে বিফাক কাঁটেব মতই বিনকাত কারফাছে। আমি মোহাং কথাই বলছি। বিফা করে সে আমার চক্রিমদীন বদনায় দিয়ে মেরে পড়ল। থাক এখন একথা। আপনিও এক অনিচ্ছাস্বরী হইলা কিন্তু হুতচাণিনী, আমার বৈষয় নারীর একটি অধার আদ্য হাতে তাই আহারের কাছে আমি উন্মাদিত করলাম। করলাম এই আহার যে আমার আহারের পথ বাঁধা যায়, নতুন দিন ভেঙে আসা যায়। হৃদয়েই আমি প্রত্যন্ত হোক। বলত আপনায় গায়ে কিছু লাগেনি। আর যদি লগ্নেও থাকে আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি তা হুছে যেহে। আমার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।

কারণ এতগুণে ভর্তুহীনা হুগুণ নারীর বিপদ আছে প্রচুর।
নতুন কীরনের পথে আপনি আবার হাত দকন।
আজ রাতে এক বপাত্রব আকাঙ্ক্ষা আবার হুগুণে থেগা
করছে। চেয়ে দেখুন হাতার হাতার ডাবা জলছে ঐমন্ত
বড় আকাশে। ঐ ডাবার পানে চেয়ে চেয়ে আপনার
বিপুল সৌন্দর্য ভাব বন্ধে ধারণ করার তৃষ্ণা আবার বৃক
যোগেছে। আপনি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজী
হবেন ?” সে বলল “আপনি একজন অববয়ত দুর্নীত
অধিব্য, তত্ত্ব সজ্জিবস্তার নয় কর্তীনপুণো। এখনকি বিভাগ,
বৈক্যো। তাছাড়া আপনার মত্ব অন্তঃকরণ, আপনি
বয়স। নির্ভয়, নৃপনে নয় আপনার ভ্রত মন। আপনার
এমন স্তম্ভর পৌকবস্তব্য চেহারা, আপনি নারীর নয়ন-
হজন তো বটেই, মনোবজনকারীও। আমি আজ খুশিতে
বিশেহায়া। কি বকম আশ্চর্য দেখুন এক মুহূর্তেই জগতে
কতো অঘটন ঘটে যায়। এক মুহূর্তেই প্রলয়, এক মুহূর্তেই
প্রেম। আপনি আজ সন্ধে আছেন বলে এই নিরাশায়
নিভুতি রাখে আবার আশো কোনো কিছুতে ভর্য করছে
না। উপরন্তু সমস্ত নতুন, সমস্ত অপরূপ মনে হচ্ছে। তাই
ভাবছি ভালোবাসাই সমস্ত। ভালোবাসাই আমে, ভালো-
বাসাই বের, ভালোবাসাই ভবে রাখে। আপনি মৃত্যুর
থেকে আত্মকে মৃত্যুর পথে নিয়ে এসেছেন। আবার বলি
আমার নরনের বন্ধকে আজ আবার আপনি স্বেচ্ছাস্বিকৃত
করেছেন, আমার মনে হচ্ছে আমার অস্তর বেরনার ডাবা
জনতে পেতে অস্তরীক হতে এক অনিন্দ্যাস্বাদ্য প্রেমিকের
হৃদয় হুটে এনে বৃক ধাঁড়িয়েছে এবং বসেছে আজ আমার
সম্মুখে। এ হল সেই প্রেমিক পুরুষ। সেই আপনি।
এ সেই আপনারই বৃত্তি। আপনি আমার অতীতের কলঙ্ক-
র কীরনের কথা জেনেও আমাকে গ্রহণ করতে চাইছেন।
এ আমার আশীর্ভিত সৌভাগ্য। আপনার সেই উদার
ও বহান্ হুগুণের স্পর্শে আবার মেগে উঠেছে আমার
প্রাণের কামনা, আমার আশার হৃদ হৃদ্যের মত বঁ চতে
লাগ হয়েছে।”

দে রাত আশা সেইভাবেই চৈর মালের
তারার ডাবা আকাশের নীচে বলে কাটিয়ে বিদূষ। অপরি-
নীয় আনন্দে সমস্ত কোথা বিয়ে যে কেটে গেল তা বুঝতে
পারলুম না। হুগুণেরই কোলকাতা বাবার কথা ছিল।

কিন্তু কেউই আশা কোলকাতার ফিরলুম না। উদার
নবায়ণ কিরণের আভাস দেখা গেল পূর্ব দিকতে।
মোহনাব এ-টি হাত ধরে আমি বললুম “চলো তব্বে এখন
তোমার কাকাবাবু ও কাকীমার অম্মমতি নিতে যাই।
উদার অম্মমতি আশা পাশো তো ? তাবলেই প্রতীক্ষার
পূর্ণাঙ্গি। এতবয় আশার। এক বিছানা ঘুম। আর
হুগুণের অম্মমতি পূর্ণাঙ্গি।”

মোহন। হেসে বলল “আমি জানি আমার কাকা ও
কাকীমা এতে খুব খুশী হতে মত দেবেন। আমি এতো-
কিন বিয়ে করতে চাইনি বলে ঔদার মনে খুব কষ্ট ছিল।
এ-ন ওরা খুশী হতে আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আরতুমি
যখন আমাদেরই স্বপ্নাত, আর লাগতি ঘর, আর এ-এ-
নিতো ষষ্ঠী স্নান কষ্ট। বড় চাকুরে। তখনতো আর
কথাই নেই। কিন্তু তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে
তাতে বললে না। ছিলে অচেনা, হলে কতই চেনা।
পূনার নৈবেদ্যের মত আশা এই বেহ ও মন আজ আমি
তোমারই হাতে তুলে দিতে চাই।”

আমি হেসে বললুম “এখানেই মনীষবাবু হলেন
আমার শিষ্যবাবু। তিনি আমার এক মস্তকী টেনি-
গ্রাম করেছিলেন। তাতে আমিযেছিলেন যে শিল্পীর খুব
অম্মম। তাই এখানে হুটে এনেছিলাম। এগে জানলুম যে
শিল্পীর অম্মম বটে ভবে তেমন কিছু বৈধ নয়। আমলে
তিনি মানে দিল্লীমা একটি লেখাপড়া জানা হুগুণী মেয়েকে
পছন্দ করেছেন আমার ভ্রত। উদার খুব ইচ্ছা যে সেই
মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে বিয়ে তিনি আমার পলাতী
করে যাবেন। মেয়েটি নাকি খুব মন্দরী এবং কোলকাতার
চাকরী করে। মেয়েটির বাবা ও মা নেই, কাকাই নাকি
অভিত্যাক।”

কম্পালে মোহন। বলল “তারপর কি হল ? সেই
মেয়েটিকে তুমি দেখলে ?”

হেসে বললুম “না, দেখা আর হল না। কারণ ক্ষিতি-
মোহন বাবু অর্থাৎ মেয়েটির কাকা আমার শিষ্যবাবু-এর
কাছে এগে গেলিন হঠাৎ অত্যন্ত হুগুণের সঙ্গে চানালেন
যে সেই মেয়ে নাকি এখন বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে
না। তাই হুগুণিত মনে কিয়ে থাকলুম। ভাবছিলাম
কপালে হয়েছে বিয়ে নেই।”

মোহনা ঘেলে বলল "আরে কিত্তিমোহন ব'লু তো আমারই কাকার নাম! আর সেই মেয়েটিই হলুম এই হত-তাপিনী, আমি। হিঃ হিঃ তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করে দিলুম? কি লজ্জা! আর এখন এখন সকালের যং গালটেছে। আকাশ নীল। আমি এক ডানা তাকি গাখী। মনে হচ্ছে তোমাকে রক্ত মস্ত হয়ে চিনি।"

বলল "এখন আর হুঃ কোবার? তুমি তো এখন মৃত হয়েছ। এই বিয়েতে তাকী হয়েছ। বিধাতার ইচ্ছাই বোধকরি এইরকম ছিল। তাই কিভাবে কতো বিপত্তির মধ্যে তোমাকে পেলুম। এখন অ'ব কেনে হুঃ নয়,

এখন শুধু অনিন্দ। এখন চলো বাই দুজনে মিলে তোমার কাকার কাছে আর আমার পিলেমশায়ের কাছে। তাঁরা দুজনেই আমাদের বিয়েতে খুব পুণী হবেন। কারণ তাঁরা তো এই লম্বাই করেছিলেন। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের এই প্রেমকে অলম্ব অমর করুক। চিরস্থায়ী করুক।"

তখন বলাকাব সারি আকাশে উড়ে চলছে। প্রভাতের চকলতা গাছেব পাড়ার পাড়ায়। আর উজ্জ্বলিত উৎসবের মেলা বন হতে বনান্তরে ছুটে চলেছে পাখিদের পানের কথা দিয়ে।

অশরীরী

সন্তোষকুমার অধিকারী

—নম্ব না? কে কড়া নাড়ে?

—আমি, যার অগতঃ রূপ

অনন্তরূপে রত ছিল আভাসিত:

বুঝে অতল বেঁকে—সেই আমি এসেছি নিশ্চূর্ণ—

যার ঘরে' নাকি বিতে,—হোয়োনা বিন্মিত।

—কায়'কর্ষ?

—আমারই গো। যার মূহু কর্তব্যর সনে

বুহ হুঁত, বিতে শুধু পাখিও তুলনা।

নদীর স্রব্ধে যেতো—সেই লম্ব প্রতিকর্ষি বুন'

আমিই ডেকেছি,—তুমি বোঝনি? বলোনা!

—কি নিবিড় অচ্চকার? অচ্চকারে আকাশ নিস্ত্রিত

কি নির্জন চারিদিক?

—আমি কাছে আছি

আবার আড়াল দিব; কৃষ্টি জ্ঞে'শর্শে' রোমাঙ্কিত

বিশ্বত সে জীবনের সার্ধ্বকে ঘাতি।

গুহু হাত। বাহাদুর অচ্চকার নিঃশব্দ বিহীন

তায়কার উজ্জলতা ছাটার আবৃত:

শর্শর অচ্চকারে খোজে কোন আশাতীক মন?

কড়া ঘরে' নাকি ঘের অশরীরী মৃত।

* Walter De La Mare—The Ghost

বিচিত্র বিশ্ব

পরিমল শুভাচার্য্য

অবিস্মৃত ও অলৌকিক কাহিনী

বিচিত্র বিশ্বের বিবিধ প্রান্তে কত বিস্ময়কর ঘটনাই যে প্রতিদিনের ঘটে চলেছে, তার হিসাব ক'রে নেওয়া যায় না। তবুও তার কিছু কিছু ছিটে কটা। অশ্রু বধন লোক মুখে বা ছাপের পৃষ্ঠায় জনসাধারণের প্রাণে ধরে পড়ে তখন এককল লোক নিশ্চিন্তে বেলে উড়িয়ে যেন, বলেন ওটা। আর কিছু নয় বিশেষ এক ধরনের মেশার কল। আরেকদল মতাদৃশ বৈধা লোকের ঘটনাক্রমের পর্য্যালোচনা করে খির শিখাতে আসেন, বলেন, হ্যাঁ এও সম্ভব, নিত্য সত্য বিজ্ঞান সম্মত ঘটনা। আমি ঘটকে যেখিনি বলে এখন সব বিস্ময়কর ঘটনাক্রমকে অবিস্মৃত করবার কোন দৃষ্টি নেই। এমনই কিছু অবিস্মৃত ও বিস্ময়কর ঘটনা আপনাদের উপহার দেব। কানেন প্রত্যেকটি ঘটনাই লভ্য, শুধু সামাজিক কারণে কোন কোন ঘটনা ঘনি, কাল ও পারিপার্শ্বিক কারণে পরিণত হওয়া বাতিল হতে পারে।

এই আধুনিক যুগের বিশ্বের বিচিত্র প্রান্তে নানা ধরনের অবিস্মৃত ও অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে : সেই সব বিচিত্র কাহিনী এখান থেকে এই “বিচিত্র বিশ্ব” বিভাগে পরিবেশন করবে। পরিমল শুভাচার্য্য।

— সম্পাদক

নেই। আর কুটো চিত্রের আশ্রয় নেই। উত্তরদিকের কোণে ছ'তিন জন লোক এক মাথুক ঘিরে বলে গতিক। সেখানে যত। বিশ্রাম ঘরের কোণে জন। ১১/১৩ পূর্ব-দিককারী বলে আসেন। সামনে চিত্র। অশ্রু, তারি উত্তর দিকের গহন রাখছেন তাঁরা। সংস্কারের বাতিল। করে ছেলে-ছোকরার বল বাইরে চলে গেল চা-দিশারওট খাওয়ার জন্য। আমি এখিক-ওখিক কিছুকল চলাফেরা করে এক সময় গন্ধার ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালাম। হৃৎকলন নিঃশব্দী লোককে দেখলাম ছেঁড়া ও ময়লা কাঁচা গারে

কিছু করে থাকতে। স্থানী বেশ নির্জন, সামনে আদি গন্ধার বাংলা স্রোত বয়ে চলেছে। বেশ শীত শীত করছিল। কিংবে আসার উত্তোগ কংডেই হঠাৎ নগরে পড়লো একটু তরিতে দেখানে ঘাটের দাঁড়ি শেষ হয়ে গন্ধার ঘাট দেখা যাচ্ছে, দেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে

প্রত্যেকের শ্রমক্ষেত্রে অসামান্য

বহুদিনের বিখ্যাত মহাকাব্যের কেওড়াভাষার ঘটনাক্রম ঘটে। পূর্ব বেসীতিন ঘরনি, আর বছর পাঁচেক আগে। - অগ্রহাণু মাসের পঞ্চমিক। প্রত্যেকের এক বৃত্তকালোকে বৃত্তরেখ নিয়ে অসামান্য অমরা বধন পৌছল তখন রাত প্রায় ১১টা। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। সেজন্য লোকজন

আছে একটা অর্ধগলিত ঘরদেহকে ঘিরে। প্যা-দুর্গন্ধ ন'কে যেতেই শরীর ঘন কঁপে উঠলো। নাকে কলম চাপা ঘিরে একটু এগিয়ে গেলার ঘরদেহটীর কাছে অসীম কোতুলি নিয়ে। ঘাটের ক্ষীণ অলৌকিক দেখলান, ঘরদেহটী কোন একটা পথের দিককারী। গারে বহু বলতে কিছু নেই, শুধু কোমরে একখানি ময়লা কাপড়

জড়ানো। পাশে একখানি লাঠি ও একটি ভিকাপাত।
সামনে দাঁড়িয়ে থাক। লোকটিকে দেখে মনে হল সেও
বোধ হয় ঐ একই ভিখারী দল্লভারের লোক। তখন
মাত্র এই লোকটির গায়ে একখানি ছিঁড়া শাওয়া আছে ও
গলার একখানি মলম চায়ের জড়ানো। মুখে সাধা খোঁচা
খোঁচা দাঁড়ি গোল। মাথার একমাথা সাধা জঁকড়া
চুল। স্তম্ভের দিকে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কি বেন দেখছে।
একটু কান্না এ'গরে বাগার চোঁটা কবলাম, স্তম্ভের দিকে মুখ-
খানা দেখবার জন্য, কিন্তু বিশেষ হবিধা হলনা, একেত
আলো কয়—ভরসা মাত্র একটি বিলম্বী ব্যক্তির আলো।
তাকে আবার ঐ ভীষণ পড়া গল্প বের হচ্ছে। কাছে
খোঁচা দাঁড়ি না। তবুও বেন হল জড়ার মুখেও ঐ রকম
সাধা সাধা দাঁড়ি-গোল, মাথার সাধা চুল।

দূর থেকে একা একা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কাণ্ডটা।
দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা এখানের দীর্ঘ দীর্ঘ এগিয়ে গেল মড়া-
টির মাথার দিকে। পাশে রাখা ঠাণ্ডাডান হাতখানা নিয়ে
হাতে দাঁড়ার নিয়ে ভিখারীটি ভাল করে ঘুরিয়ে ঘিরিয়ে
দেখতে লাগলো। মনে হল লোকটা যেন স্তম্ভ ভিখারীটির
হাতের ভাষা পড়বার চেষ্টা করছে। ভীষণ কৌতূহল হল
আমার, ঐ রকম ঠাণ্ডা নির্জনে দাঁড়িয়ে আমার ঘুর মরা
লাগলো, যেন একটা ভৌতিক ঘটনার একমাত্র সাক্ষী
হওয়ার অপেক্ষার আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে। এবার
হাত বেধা শেষ করে লোকটি মড়াটির কপালে একবার
হাত রেখে আপন মনে কি বেন বিড়বিড় করে বললো,
দূর থেকে সামান্য একটু শব্দের আকারে তা আমার কানে
এল। এবার সে মড়াটিকে ভিখারী প্রদক্ষিণ করলো
দীর্ঘ দীর্ঘ। পায়ের কাছে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে পায়ের মাথা
ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। ঠিক এমন সময়ে
আমার কানে এল এক লম্বিনিত হবিস্বনি। নতুন সব এল
আমাদের। পিছনে দিকে মুখ করিয়ে বেবলাম, হ্যাঁ, লোক
জন চুপে মড়াটার নিয়ে।

আবার মুখ কেরালাম ঘাটের মড়া দিকে। চমকে
উঠলাম, আগন্তুক ভিখারী লোকটি আর সেখানে নেই।
সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাক খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও
দেখতে পেলাম না।

কেনন একটু ভাব ভাব করতে লাগলো। আমি ভুল

হবিনি তো? না, কারণ ঘণ্টার মড়াটা শুধনও দেখানে
পড়ে আছে। মড়া চূর্ণক বের হচ্ছে। দীর্ঘ দীর্ঘ দাঁড়ি
ছেড়ে মরণে ঢুকলাম। নতুন মড়াটাকে একপাশে নামান
হয়েছে। ভারলাম এক কাপ ডা খেয়ে আনি। উত্তর
দিকের গেট দিয়ে বের হবার সময় দাঁড়ি খাটটার উপর
পাঠিত নতুন মড়াটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।
বেবলাম ঘাটে যে বৃদ্ধ ভিখারীটা এতক্ষণ আরেকটা মড়াকে
প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল, সেই মড়াটাই এই
খাটটার উপর শুয়ে আছে। কিছুতেই বেন বিশ্বাস করতে
পারছিলাম না। একশনা মত ছির মলম চায়ের সাধা
মরা আরিত।

এমন অবিস্মৃত ঘটনা দেখে আমি কিছুটা বিব্রল হয়ে
পড়লাম। কেনন যেন বিশ্বাস হতে লাগলো যে ঘাটে
আমি য'কে দেখে এসাম সে এই লোকটারই প্রত্যয়েই।
সামান্য মরাটটা আমার কাঁটা দিয়ে উঠলো। দীর্ঘ দীর্ঘ
দাঁড়ি ছেড়ে বাইরের একটা চায়ের দোকানে এসে
বসলাম। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে।
তাকিয়ে রইলাম সাহসের অন্ধকার আকাশটার দিকে।
কিছুক্ষণ পরেই একমল সবরমদী ছেলে দোকানে এসে
চুকলো। এবাই ঐ বৃদ্ধ ভিখারীটার স্তম্ভেই এনেছে।
আমি ভিখারী বললাম কারণ তার প্রকৃত পরিচয় আমার
এখনও জানা হয় নি। কিছুটা কৌতূহল নিয়েই পাশের
একটি ছেলেকে লুপে জিজ্ঞাস্য করলাম—আপনারাই তো
ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে নিয়ে এসেছেন—না? ছেলেটি আলু
হয় খেতে খেতে উত্তর দিল—হ্যাঁ, কলম থেকে এসেছি।
ও আমার কেউ হয় না। পাড়ার দ্বারের বাতায়নি এক
কোণে থাকবার জায়গা দিয়েছিলাম। ভিখারীই বলতে
পারেন। উত্তর শুনে আমার আর এক বিস্ময়ের আগন্তে
গিয়ে পড়লাম। আগ্রহ দেখাতেই নিতে চোকেই ছেলেটি
বলে চললো—ভাল নাম ভা: কপালকর চট্টোপাধ্যায়।
আমরা অবিশিষ্ট প্রথম প্রথম বনভ্রম ক্যাপো মদর। পরে
ঘনিষ্ঠতা হতে ডাকডাক ক্যাপো বলে। উনি ভিখারী
ছিলেন না। বলেছিলেন হুগলী জোয়ার কোন এক গল্প
গ্রামের বনী বলে। ক্যাপোদার মুখে তার জীবনের কিছু
বিহীন খণ্ড ইতিহাস শোনা দিল। ভুললোক কি ছিলেন
—কি হলেন। আর থেকে বহু বছর আগে দুটি মরম

সন্ধ্যার সময় ঘিরে যা চিরবিহার নিগেন পৃথিবী থেকে। তার পরে সন্ধ্যা এলেন নগ্নাঙ্গে—জান হবার পর দুই ভাই বুলেন নগ্নাঙ্গে থাক। অন্তর। সন্ধ্যা অন্তরী ছিলেন একথা বোঝাই যত যখন বহন হল, তখন আর সন্ধ্যারের বিচ্ছেদ লড়াইর যত নাশল তারের হইল না। বাবাও অত্যন্ত যত্নজনকভাবে প্রেমবশি হয়ে সকালে প্রাণ হারালেন, অস্ত্রিম সময়ের ছেলেদুটিকে কাছে ডেকে শুধু বললেন—আমি অম্ব বাণ, কথা করিস বাবা, কাল-নাগিনীর তাত থেকে যদি প্রাণে বাঁচতে চান, এত্নি হুঁতবে পালা। বলে নগ্ন কিছু টাকারও ব্যবস্থা করে নিলেন। এম পর বাপের বেগুণ আচরের নাম ব্রহ্মাচার আর কৃপাশঙ্কর—এই লখল করে এবং নগ্ন কিছু অর্থ নিয়ে ১৭ বছরের দুটি ছেলে রাতের অন্ধকারে সবার অলসো পৃথিবীর ভনাচনা হাতিয়ে গেল।

ক্যাপাখা যুগেই তুনেছি ৭ মিনিটেব বড়তাই ব্রহ্মা-শঙ্করবাবু দেয়াতুনে কাঠের গোলায় কান কতেন। আর কৃপাশঙ্করবাবু হোমিওপ্যাথি পাণ করে ভাক্সারী করতেন কনকাতার এক কুখ্যাত পতীর নিকটে।

এরপর বহু বছর কেটে গেছে। ক্যাপাখা হঠাৎ এক-দিন খোড়াহু থেকে বহুতাই কৃপাশঙ্করবাবুর চিঠি পেলেন। কাঠের গোলায় আন্তন সেপে মালিক লরপাত হয়ে পেলেন। অত্যন্ত চাকরী গেল। তিনি এক সন্ধ্যারের বহুতাই তাইয়ের কাছে আসলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটলো অস্তবকম। একদিন রাত্রে সেই কুখ্যাত পতীর এক পুত্র বোম্বি বেষণে পিছে সামনে বেসলেন সেই কালনাগিনী সন্ধ্যাৎ। তবে, আতঙ্কে, বিহ্বল হয়ে স্বাভাবিক পুথ্যোগ করলেন জাঃ কৃপাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। মনে হয় সাধারণ কিছু নাথার বোঝ হোচ্ছিল তাঁর। পরে পরে যুগে বড়োতে লাগলেন ভাক্সারবাবু। ব্রহ্মাশঙ্করবাবুও এসে জাইয়ের খোঁজ পেলেন না। সেও বোধহয় বাস্তব স্বাভাবিক যুগে সিক্তে করছে কিনা কে জানে? তবে ক্যাপাখা ইহানো প্রাণেই বলতেন, একদিন না একদিন তাঁর তাইয়ের সঙ্গে দেখা হবেই।

আমার মতত শরীর খা খর করে কাপতে লাগলো। মনে হল যেন বহুকালের হাতিয়ে বাত্যা সূর খুঁজে পেয়েছি। চৌবিলের উদয় খাবার পড়ে হইল। ছেলেটা হাত ধবে

হোকান থেকে টেনে আনতে আনতে বদলান—আন্তন আমার সঙ্গে। যেখানত তাঁর যখন ভাইকে চিনতে পাঠেন কিনা? তুমিও একমতম হুঁতে হুঁতে গন্ধার ঘাটে এসে পৌছোয়—কি আশ্চর্য, মৃত্যুহেটা দেখানে নেই। শুধু বাবা আছে একটি ফুলের হোড়া আর একটি মৃণকটি, তখনও অগছে। নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম শ্রমানে। চট্টবিকে তাকিয়ে খুঁজছিলাম। নাঃ, নিরাশ হতে হইনি এবার। পালেশ ছেলেটিও হুটে গেল ক্যাপাখার লাগটায় কাছে। কর্তৃপক্ষের হস্ত অধুনাও হুটে বেওয়াগিন মৃত-যেহ একসঙ্গে একই চিতার চাপিয়ে দেওয়া হইছে। আন্তন যবে বহন হইছে। কি আশ্চর্য মিল দুই মৃত্যু! অনেক আশা নিয়ে দুটি ভাই এতদিন এই পৃথিবীতে হাত রাখারি করে এয়েছিল, চলেও গেল ঠিক সেইভাবে তবে সঙ্গে করে কি অভিজ্ঞতা নিয়ে গেল আনি না।

প্রোফেসর প্রতিজ্ঞা

ঘটনাটি ঘটে পত্তবহুর মে মাসে। বিমানচেষ কোলে এক শৈশবহর—গুপ্তকামিতে। আমই কিছুকাল আগে আমার কোমরনার বর্শন করে গুপ্তকামিতে দ্বিবে এয়েছি। এখানে আমকের স্বাভাবিক কাটিয়ে কাল লকালেই বাস ধরে কত্রপ্রভাগ হয়ে বদ্বীনাগরান চলে যায়। পূর্ব পবিত্রিত চিঠিতেই উঠেছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমাধের কুলী ও পথ প্রাথমিক উত্তরগ্রন্থের লোকটার নাম কুলী-লাল। সে বাইরের বাগাখার এককোণে বসে স্বাত্তব খাবার তৈরি করছে। স্বাক্তি আমবা চারজন। আমি, আমার ছোটতাই ও তার দুই বন্ধু। ওরা তিনমনে ঘরে বসে গল্প করছে। আমি বাইরেই বারান্দার দাঁড়িয়ে কুলী-লালের কামকর্ষের তথ্যক ও সাংখ্যা কয়তি, যাতে খাওয়া-দাওয়াই পাট ভাড়াভাড়া গেরে শুয়ে পড়া যায়। কান পেতে শুনি ওরা যবেই মধ্য একটি অনমপ্ত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে। যে ঘটনাটি মাত্র ৭ দিন আগে এই চটির এই ঘরেই ঘটে গিয়েছিল। আমাধের সঙ্গে কোমরনার বর্শনারী আরও স্বাক্তি ছিল। ঠিক ৭ দিন আগে আমবা লবাই এখানে এতদিন তাইই বাত কাটিয়েছি। এক স্বাক্তির তত্ত্বাধ্যানে এককল স্রীপুত্র স্বাক্তি চলেছিল

প্রায় আশাধের সঙ্গে সঙ্গে। সেই বনে দুই সমরস্রগী
বহুত ছিল, কিন্তু অশ্রুণী, একজনর সঙ্গে একজনর কোন
ভাবেরই ছিল ছিল না। একজন বাঙালী, নাম বরেন
বসু। আর একজন অবাঙালী, নাম জ্যাকব। দু'জনের
বয়স ৫৫ থেকে ৬০-এর মধ্যে। ক'বিশেষ বেতাই স্ব মস্তা সহ
একসাথে গল্প করতে করতে আসছিলেন। আশাপা পু-
টের জানলাম দুজনে নাকি এবই কে.স্বামীনাথর অঙ্গীকার।
বাক্য: ও বাঙালী দুইই ক'বিশেষ। বেনারসী শাওর বিখ্যাত
চলিত কাব্যের। অশ্রুণী দু'জনেই মোটামুটি ভাল।
বরেনবাসুর ছুটি সন্তান। একটি পুত্র এবং একটি কন্যা।
জ্যাকববাসু অবিবাহিত। এদের সাম্প্রদায়িক কথা শুনে
দু'খ থেকেই শোনা।

গুরুত্বপূর্ণ থেকে কেবলনাথ বসুনা হওয়ার আগে
দিন বিশেষের পাণ্ডা-ব'গুয়ার পর দুজনের মধ্যে হঠাৎ
দু'জন ভগ্নতা হুজ হয়ে গেল। আত্মকে বাতে আমবা যে
হয়ে ব'ল করছি ঠিক সেই ব'হেই। পেনিনও আমবা আম-
কের মত চারজনই ছিল। দুজনের কথা কাটাকাটির
মধ্যে দু'জনের যে-স'লিগ'দের বিশেষ বিখ্যাত কাটল ব'হেছে।
এখন আর কেউ কাটকে ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছে
না। বরেনবাসুর ব'হুতা, যে আর বাঙালীর জড়িত থাকতে
চায় না। তাঁর বিশেষ ব'হুতা ব'হুতা ব'হুতা হোক, নইলে
তাকে ঠিকার চেষ্টা করলে তার ভাল খুব ভাল হবে না।
বাইহোক, মোট কথা দুজন সুখোমুখি থেকে শেষে প্রায়
হাতাহাতি হওয়ার মোক্ষ। হুজরাব দীমা হাজার
বেশে আমবা অজ্ঞাত স্বামীনাথ ছুটে এসে বোকাতে চেষ্টা
করল। যে এভাবে এমন ব'ল নিয়ে তাঁরই পথে এগোন
যায় না। বাঙালী ক'বিশেষ। বেশে বিব'গুয়ারই ক'বিশেষ।
কথা শুনে বরেনবাসু দু'পাশ, লক্ষ্য, অশ্রুণী একসাথে
গিলেহারা হয়ে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে নিজের আলোচনা স্থলকে
ডেকে 'নিয়ে কড়ের বেগে বাইরে ব'হুতা গেলেন। বাঙালীর
সহ উপস্থিত স্বামীনাথ উপস্থিত বলে গেলেন, না, প্রায়
থাকতে আর এমন অসামর্থ্যের সঙ্গে পথ চলতে না। স্ব'র
কিহে বাই ত'রপ'র ব'হুতা মালপত্রের ব্যাটাকে ধানি বোকাতে।
বোকাতে কত ধানে কত চাল। পিছন থেকে জ্যাকব-
বাসু এমন একটা অসীল মন্তব্য করলেন, যা শুনে তৎক্ষণাৎ

কানে আঙ্গুল দিতে হল। যা, ভগ্নবান, এখন ব'ল নিয়েও
লোকে এ পথে প' বাড়িতে সাহায্য করে!

বরেনবাসু বেগেবেগে চলে বাঙালীর পথেই অসামর্থ্য-
বাসুও মালপত্র নিয়ে তৈরি হলেন। বেগলার একটু পথেই
তিনিও ব'হুতা গেলেন। বাঙালীর সহর স্বামীনাথকে
বলে গেলেন—আপনাকে যে টাকা পয়সা ধরা দিয়েছি, সে
সব আর কেহও দিতে হবে না। এবার থেকে আমবা
দুজনেই আশাধ হয়ে পথ চলতে। স্বামীনাথ হুজগ' হয়ে
বইলেন। দু'বে জ্যাকবব'র সহর দেহটা পাছাড়া পথের
দীকে বিস্ময়ে গেল। এরপর জ্যাকবব'র সঙ্গে আশাধের
দলের মত একবার দেখা হয়েছিল গৌরীহুজের চটিতে।

বেগলার উনি আর সামগ্র্যমাত্র পথও অতিক্রম করতে
পারেন নি। কেবলনাথ ব'লন আর হলনা। গৌরীহুজ
থেকে অশ্রুণী শরীকে নিচে ফিহেলেন। দুর্ভাগ্যই বলতে
হবে। বরেনবাসুর কথা মিথ্যা: করতে সংক্ষিপ্ত উত্তরে
উনি শুধু বললেন—তাকে কোথাও গ'মে পাওয়া যাচ্ছে
না। আমাকেই তার মালপত্র স্থল দিয়ে নীচে নামিয়ে
নিয়ে যেতে হচ্ছে। মনে হয় কালী কিহে গেছে। এই
ঘটনার এইখানেই সমাপ্তি।

এবার আমবা কিহে আলি আগের গল্পে। এই
অসামর্থ্য ঘটনাটি নিয়েই আমবা ছোট ভাই ও তার ব'হুতা
তখন আলোচনা করছিল। এত তখন প্রায় ৮টা। বাইরে
জীবন ঠাণ্ডা। অন্ধকারের মধ্যে পাছাড়ের উঁচু উঁচু ডেউ-
গুলো ঘন বৈতোর মত দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় ছোটো
পাছাড়া স্থলী মালপত্র নিয়ে এগে আমবাধের বাসান্দার
এককোণে বেধে ঠাপাতে লাগলো। মুখে টর্ক ফেলেই
চিনতে পারলাম এটা সেই বরেনবাসু আর জ্যাকববাসুর
স্থলী। হঠাৎ এমন অলমবে এদের এখানে দেখে একটু
বিস্মিত হল। কারও গুজবো প্রায় তিনদিন আগে
কিহিত পথে ব'হুতা হয়েছিল। অথচ আমবাধের পিছনে
হয়ে গেল কি করে? একটু পথেই দেখি জ্যাকববাসু
আলছে। শরীর বেশ ক'ব' মনে হল। আমবা মুখের
উপর চর্চের অ'গো ক'বে চিনতে গেছে খুব বেশ খুশী
হলেন। একটু অলমবে হুজের ব'ললেন, ভালই হল
আজকের রাতটাই মত একটু স্থান দিন। তিনদিন পথে
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি। শরীর আর বইছেনা।

লোকটার প্রতি ঘড়ই পূর্ণা থাক, এমন অসময়ে এমন নির্বাণ্ডব স্থানে অহনন করতে যেন নরম হল। বসন্তা'র ঠিক আছে, তেতরে আহুন। বাইরে কথাবার্তার শব্দ পেয়ে ভেতরেই অসময়ে গল শব্দ হয়ে গিয়েছিল। তাইকে জেবে বিছানা সঠিকে ঘরের এককোণে জরকিষণবাবুর ঘরে শোও বা জাণকা করে দিতে বললাম। কুলি হু'লন এগিয়ে এসে সে ব্যবস্থা করে দিলে সে ঘা'ত'ব মত বিচার নিজে চলে গেল। কথা হল কাল সকালে এসে বাসে চলে দিয়ে ছুটি।

এর মধ্যে আমাদের খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। জরকিষণবাবুকে নিমন্ত্রণ করলাম। উনি জানালেন স্নানকে গরম দুধ আছে, আর স্নান আছে দ্বিতীয়। ওই খেয়েই বাতটা কাটিয়ে দেবেন। অমুখ শরীরে শক্ত কিছু পাওয়া ভাল হবে না। এরপর কথাবার্তা বেনীদু'র এগোল না। বয়েনবাবু'র বোঁজ-খবর নেওয়া'র চেষ্টা করতেই উনি এড়াবার চেষ্টা করলেন, বললেন, "কান্নাইহেই কিংও গেছে। স্নানই হয়েছে, এ বাত। বড় দু'র্গব, কুক হ'ক্, খবে বাগ, বাই কিংই বাই। বজ্জকেই সব অংশ লিখে দিয়ে আমি ছুটি নেব। তরি বং ছেলেপুলে আঁচ, সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। আমি এখন বিয়েই করিনি, তখন আর"—কিছুক্ষণ পরেই তিনি জরকিষণবাবু'র দাঁক ডাকলেন। এক হাত তক্তাতেই আমার শোওয়া'র বেডিং পাঠা। ছোট তাইয়ের হল দু'মহে পড়েছে। আমি টর্ট আগিয়ে কেঁধে লিমে'র নিচাকা'র তাইরী লিখলাম। কথেকথানি চিঠিও লিখলাম আত্মীয়-বন্ধনের উদ্দেশ্যে। শু'ত প্রায় বাত ১১টা হল। টর্ট নিশিবে একসময় তরে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলার জানিনা। মাতব্বাতে হঠাৎ মনে হল কে বেন বহকা খেলবার চেষ্টা করছে। ঘরের ভিতরে অমটিবো'রো অছকার। কখন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। তাই বা তার বজ্জের ডাকা ঠিক হবেনা। শেষে অছকারে কিছু একটা ঘেঁষে ভয় পেলে উল্টো বিপ'তি হতে পারে বং জরকিষণবাবুকেই ডাকা থাক। বীরে বীরে দুই পলায় ডাকলাম। বেললায় সাক্ষ্য নেই। চূণ কবে লড়ে হইলাম হাতের কাছে টর্টটা বাগিয়ে ধরে।

কিছুক্ষণ চূণচাপ। একটু পরেই মনে হল কে যেন ঘরের মধ্যে চলে বেড়াচ্ছে। মনে হল জরকিষণবাবু

খাবার কাঠে কে যেন দাঁড়িয়ে দু'কোণে পড়ে কি দেখছে। ততক্ষণ টর্টের আলো ফেললাম। জরকিষণবাবু'র ঘরের উপর থেকে কখন সঠিকে দাঁকিবে উঠে বসলেন। দুখে ভীষণ ভয় পাওয়া'র চিহ্ন—কখন যেন বজ্জের ডোকাটা ঠা'র। কিন্তু ঘরে আর কেউ নেই। আমার বা পাশে তাইয়েবা ঘুমুচ্ছে। জরকিষণবাবু আমার দিকে ডাকিয়ে বসলেন—আমার ভীষণ ভয় করতে বাবুদী। একটুও ঘুমুতে পারছিলাম। বজ্জ আমার কণ্ঠি কববার চেষ্টা করছে। ভয় দেখাচ্ছে।

আমি আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—সে কি বলছেন, বয়েন'ত কান্নাতে, এখানে আসবে কি করে? নিশ্চই কোন স্যোরেও কীতি, আমা'বের ঘরাপর্ব ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বাকি রাতটা জেগেই কাটাতে হবে। কোন ভয় নেই—আগনি গুণোম। আমি ভেগে আছি। বলে টর্ট নিশিবে ঘিয়ে লতক হয়ে মেয়ে হইলাম। অত-কারে জরকিষণবাবু'র মেলেই বলে হইলেন। কিছুক্ষণ চূণ-চাপ। প্রায় মিনিট বশেক হবে, তেব দরজা ঠেপার শব্দ। এবার আমি বিছানার উঠে বসলাম। জরকিষণও তখন বসে। মনে হল সে ভীষণ ভয় পেয়ে ঝাঁপছে। আমি আগেও বেললায় হজরার উপর। বেললায় হজরটা একটু নড়ে উঠলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কে—ক—? ব.জা'রুণ্ডে এগিয়ে যেতেই জরকিষণ আমার হাত চেপে ধরে বললো—বাবুদী, আমার ভীষণ ভয় লাগছে, বেখংহর হস্ত এগেছে। এমন অবিদ্যাত কথাটা শুনেই আমার খাবার ঘেন খুন চেপে গেল, দেখতে হবে কখন তা'বে কান্নি থেকে বসে এখানে এসে তাকে ভয় দেখায়। অত-কিষণকে আর সুযোগ না দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম হজরার দিকে। শু'ত তার আগে আমার দাঁটার ক'ছে রাখা মোমবাতিটা জেলে লিগায়। হু'এক পা এগোতেই হজরটা হজর করে খুলে গেল। আমি বিস্মৃত অবস্থায় হু'পা নিছিয়ে এলাম। কিংও ডাকালার জরকিষণের দিকে। চমকে উঠলাম বেখে—ঠিক জরকিষণের শিঙ্কনে হাত চারেক ঘুরে মচেন হস্ত দাঁড়িয়ে। আব্দা অছকারে তাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি। ভাল করে ডাকিয়ে বেখে নিউরে উঠলাম। লাতা বেহে অস্তের চিহ্ন, আকাকাপক রক্তমাখা। শব্দ শরীরটা ঘেন হাটিব দিকে

কিঙ্গের ভায়ে ছুবে পড়েছে। ডানমুখে একটা জলন্ত প্রতি-
 হিংসার ভাব। চেঁড়িয়ে ডাকলাম—বনেনবাবু! আবার
 দৃষ্টি অঙ্গবৎ করে তরুণকণ্ঠস্থ বনের দৃষ্টকে দেখতে
 পেয়ে একগিকে ঘরের বাকখানে দাঁড়িয়ে বলিঃ নাট্যের মত
 কাণ্ডে লাগলেন। মনে ধন বনেনবাবু বীরে বীরে—
 কিশকণ্ঠস্থ দিকে গিয়ে আসছেন। তাঁর ডানহাতখানা
 কিছুটা তুলে খোলাদরবার দিকে ইঙ্গিত করছেন, অকিশকণ-
 ঠস্থর অঙ্গ দল হাতটা ভেবে আতঙ্কে ঝুঁকড়ে গিয়েছে।
 ঠ হতে কাঁপতে বসলেন—বিশ্বাস কর দল, আমি তোমার
 মারতে চাইনি। যথার্থভাবে তুমি বাঘের মতো পড়ে
 গিয়েছ। আমার সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, জমি বাড়ি যা
 আছে সব তোমার ছেলেরোগের দ্বিধে হবে। প্রাণে
 যেতো না। আমার দয়া কর দল। বলে অকিশকণ্ঠস্থ
 ক্রমশঃ মস্তে নির্ভরমত বাইরের দরবার দিকে পিছুন তিরে
 এগিয়ে লাগলেন। দস্তর মুখ চোখ আর অঙ্গভঙ্গি বেগে
 মনে হল, অকিশকণ্ঠস্থ সে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে
 যেত চাইছে। দরবার দিকে তখনই এগিয়ে যেতে
 লাগলো। একটু এগিয়ে অকিশকণ্ঠস্থ হাত ধরবার চেষ্টা
 করলেন, কিন্তু বুঝা। অকিশকণ্ঠস্থ হাত একটা ভগ্না
 চীৎকার করে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে
 মিলিয়ে গেলেন। দুই ঘুরিয়ে মস্তে দিকে তাকিয়ে গিয়ে
 যেখানে—সব কাঁকা, দল নেই। ঠিক সেই সময় আমার
 ভাই ও তার বন্ধু। তিনজনে একসঙ্গে চীৎকার করে
 আমার কাছে ছুটে এল। বৃষ্টিলাল এতক্ষণ ওরা কখনো
 তলা থেকে সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে। শুধু প্রাণের
 করে চুপ করে ছিল। সমস্ত শব্দী তখনও কাঁপছিল।
 বগলায়, আর কোন ভাব নেই বনেনবাবু আমারে কোন
 কতি করবেন না।

খোলা দরজা দিয়ে শেষ বাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আসছিল।
 দরজাটার ভাল করে বিশ্রীটে বিশ্রী। হাতধড়ির দিকে
 তাকিয়ে বেশি, হাত প্রায় আড়খিট। ওঁদের বগলায়
 তোমার দ্বিধে হয়ে বসে। তোমার হাতে আর বেশী বাকি
 নেই। আমি তোমার জেপে ঢাকি। দুঃ আর আসবে
 না।

এখন একটা মর্যাদিক ঘটনা সংলগ্ন চোখের সামনে
 অঙ্গের মত ঘটে গেল। গোখ বুলেই যেন সব কিছু স্পষ্ট

দেখতে পারছি।

নাগান চিত্তার হাতটা কেটে গিয়ে একসময় ভোর
 হল। বাগলায় শুঁড়িয়ে নিয়ে বসে। হালান বাস টাওয়ার
 দিকে। কিছুক্ষণ এগিয়েই গলা কহরার একদল পাখাড়া
 পথের উপর কোন কিছু একটাকে বিব দাঁড়িয়ে জটলা
 করছে। বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ি পিটে লাগলো।
 কেন একটা অঙ্গভঙ্গির আশঙ্ক করে তাইদের দাঁড়িয়ে
 বলে ছুটে গেলার দিকে। গিয়ে দেখলাম অকিশকণ্ঠস্থ
 হিম্মতগত দেহটা নিশ্চলভাবে পথের উপর মুখ খুঁড়ে পড়ে
 আছে। এখন একটা বিরোগাভ কাহিনীর শেষ দৃষ্টটি
 দেখে চোখের পাতা ভিজে উঠলো। ভাবলাম, আমি
 এমন আশিরাভা ব্যবসার শেষ পৃথক কার জয় হল। আর
 দাঁড়ালাম না, কাণে আমারে প্রথম বাস ছাড়বে সকাল
 ৭ টায়।

পদ্মরস পূর্ণচন্দ্র

আজ সারা পৃথিবীতেই পদ্মরস ব্যবসার খুবই ঐশ্বর্য
 ঘটতে চলেছে। পদ্মরস-কর এক থেকে গিয়েছে দে
 পথে ঘাটে তেমন লোক মধ্য। বলে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।
 প্রথমে মনেও হবে এমন হেল কুচুচ চুলগুলো তার নিম্নের
 কিনা। বহি সৌভাগ্যক্রমে দেখা যা। যে দাঁড়িয়ে তার
 মাথার এমন হৃদয় কেশরার গজিয়েছে তাহলে জগতে
 হৃদয়—বাঁধা কি দামে দিকোবে, হৃদয়ের কেলুন না, না তর
 কিছু বেশি দামই হবে—তরু চুলের মদন তাই চুলের মত
 গোছাটি আমার চাই-ই চাই। কয়েকই মুকতে পারছেন,
 চালেও মনে চুলের চ'বটা ফলাও করে করতে পারলে
 বিশ্ব বাতের চাল চুলো ছুটাই একটা মনোমত ফলালা
 হয়। গোটা ইতালীতে নাকি চুলের কাবার খুব ফলাও
 করে কা হচ্ছে। প্রায় গোটা চম্পেক পূর্ণচন্দ্র তৈরির
 নামজার কারখানা গজিয়েছে সেখানে। বড় বড় ব্যবসা-
 দারো সারা পৃথিবী থেকেই এই ছাটা ই চুল সংগ্রহ করে
 ইতালীতে তাই পরবার করছে। ওনে খুবই আনন্দিত
 হবেন যে সেখানে নাকি ভারতীয় ইটাই চুলের কর খুব
 বেশি, বিশেষ করে তা বহি ভারতীয় রমণীর হৃদয় কাই
 নেই। গত ১৯৬০ সালে ইতালী পূর্ণচন্দ্র বিশ্বে বদলী
 করে প্রায় বহিষ হাজার ডলার কমিয়েছে। আর
 বর্তমানে ১ টি বদলীর পরিমাণ নাকি আট কোটি টাকা।

কিন্তু ভারতের কোচী কোচী লোক যদি দেখে এই ব্যবসায় হালোপ নিয়ে মাথা দুড়তে আরম্ভ করে তাহলে সমস্ত ভারতটাই অধিরে পরা ক্ষেত্র হয়ে পড়ে।

অসম্ভাব্যবাদ

রাজধানী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাগ্রাফিকোলজি বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ হোমেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মহাশয়, আজ প্রায় ১৭৮ বছর ধরে এই ভগ্নাভর রক্তভ ভেদের চেষ্টা করছেন। অনেক গবেষণার পর তিনি এই দ্বির দিচ্ছিলেন উপনীত হন যে পুনর্লব্ধ বা চন্দ্রাবস্থায় এগুটি সম্পূর্ণ লতা ও নিত্য বিষম। কম করে হলেও প্রায় আটশো দ্বিতীয়ের বিশ্বকর্মের সব ঘটনা তিনি ঘর লঙ্কারে সংগ্রহ করে নিবিষ্ট করছেন এবং এর বর্ণনা দাঁত দিয়ে বলছেন যে মাহুত কখন কখন তার পূর্বসূরীর নানান ঘটনা ও ইতিহাস বলতে পারে বা বাচাই কালে যেথা যায় অসম্ভাব্যবস্তুতে তা বর্ণে বর্ণে মিলে যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যেমন করে মাহুত তার পূর্ব স্মৃতিতে এ অসম্ভাব্যপ্রিয় জ্ঞানকে পারে সে বিষয়ে তিনি নতুনভাবে গবেষণা শুরু করেছেন।

যাক একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল যে আশ্বিনের শেষের প্রাচীন মুনি ঋষিরা ভিগ্নাব্যাহারী না হলেও তেমন মূর্খ ছিলেন না।

অসম্ভাব্য প্রাণরক্ষা

দুর্ঘটনা যেখানে নিশ্চিতভাবে ঘটতে যাচ্ছে এবং মৃত্যুক যেখানে সামান্যমানসি আশ্বিন কণা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, ঠিক সেই মুহূর্তে মাহুত যদি দেখে যে, না সে মরেনি, বরং আছে সশরীরে অক্ষত অবস্থায়— তেমন বিশ্ববাস আশ্বিন বোধকরি পৃথিবীর আর কোন কিছুতেই যেন না। ঠিক এমনি একটা কল্পনা ঘটনা ঘটে গেল দ্বন্দ্বম এগারশোটে। ইতিহাস এগারশোবছরের একখানি ভাই কাইট বিমান গৌহাটীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে, তার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ঋষিগণিত 'মাতিনিং' হয়ে গেল। এটিও ইঞ্জিনিয়াররা বিমানটির বাহ্যিক অংশতা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে 'ফিটনেস সার্টিফিকেট' দিয়েছিলেন। ৪০ জন যাত্রী উৎসাহ লঙ্কারে বিমানে উঠে বসলেন, বেশী ভাগই নারী ও শিশু। আর মাত্র

চারেক উল্লেন বিমানের কর্ণধারী। নিম্নের পাইলট ক্যাপ্টেন কৃষ্ণাচর বিমানটির কমান্ড নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে টেক-অফ করলেন। পক্ষবাহিনী অতিমুখে। প্রথমে যাত্রী খানেক বিমান দ্বিবি উড়ে চললো। গড়গোলার বৃষ্টি তার শব্দে। ঢাকার কাছাকাছি পৌছেই যেথা গেল ইঞ্জিনে ঠোঁটমত গড়গোল। বিমানদেহিকারের ডেকে বিপদের আশঙ্কা জানিয়ে যাত্রীদের লোক বিতে বলা চল তড়াতাড়ি। ভীষণ বাতাস। বৃষ্টি হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বিমান-দেহিকারের পক্ষভাবের চন্দ্রাবস্থার ভাবপ্রকৃতি যাত্রীদের মনে লক্ষ্য হল। ভিজ্ঞানাবাহ করতাই জানা গেল বিমানের চাবটি ইঞ্জিনই বন্ধ। বিমানটি ক্রমশঃ নিচের দিকে নামছে। মুহূর্তে যাত্রীদের গোথের মধ্যে আতঙ্ক ছাড়া নাহলো। সামনে অব্যাহতি মৃত্যু, বাঁচার কোন পথ নেই। শুধু ক্যাপ্টেন কৃষ্ণাচর কমান্ডের ভয়ে কোন কারণ নেই। সামনে ঢাকা এগারশোটে, তিনি সেখানে নাহবার ভক্ত যোগাযোগ করলেন, কিন্তু ভাণ্ডা বিতরণ। ঢাকা কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বিমান তখনও নামছে। ক্যাপ্টেন কৃষ্ণাচর বাঁচার আর কোন পথ না পেয়ে বম্বেরে ডিগের আলার দিচ্ছিলেন বিমানের মুখ ঘোরালেন। নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে ৪০ জন যাত্রী ও বিমান কর্ণধারীরা এগারশো লাগলেন দ্বন্দ্বমের দিকে। দ্বন্দ্বমের কন্ট্রোল টাওয়ারে যখন এই জ্বলন্তাণ এগে পৌছল যে চাবটি ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্ভবতঃ তার। শুধু বাঁচার ভেলে কোন এক অদৃষ্ট শক্তি। ক্রীড়নক হয়ে দ্বন্দ্বমের নামাঃ চেষ্টা করছে। তখন দ্বন্দ্বমের লাগ লাগ পড়ে গেল। সর্বনাশ কি হয় কে জানে। দুর্ঘটনা প্রতিভাধরে সব বকর আয়োজন মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেল। বানওয়েত কাছ থেকে অগ্রগোলনীর সব কিছু লবিগে ফেলল ডাক্তার, নার্স, যখন একটা গোটা মেডিক্যাল বোর্ড ড, অ্যান্থ্রক্স, গুলি, অস্ত্র বড় বড় অস্ত্রার সবাই কল্প মিঃমানে অগ্নিকা করতে লাগলেন এই দর্শনিক দুর্ঘটনার নৌব লাক। হতে। মৃত মানসিক শক্তি সম্পন্ন ক্যাপ্টেন কৃষ্ণাচর লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে আসতে লাগলেন দ্বন্দ্বমের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বন্দ্বমের আকাশে ভেসে উঠলো। ভাই-কাইট বিমানের মৃত্যু চোখো। কল্পনাধানে সমস্ত হয়ে

হ'চ্ছে। সব কিছু মেশিনের মত ঘটে গেল। বীণে বীণে বাঁচাপ, তেমন করে কোন শক্তির বলে বিমানটি ডানা মাটির মুকে নেবে এল ভাইকাউন্ট। একটুও কঁাসুনি মেলে দিবে এল, এ বিশ্বাসের গোর আতঙ্ক কাটেনি নেই। কিছু, ইঞ্জিনগুলো সব বন্ধ। কোন বকমে সিঁড়ি বিমান বিজ্ঞানীদের কাছে। তাঁরা শুধু ভাবছেন—এ লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাত্মোহা নেমে এলেন কুড়কলে। অসম্ভব—চাংটি ইঞ্জিনই বন্ধ—তবুও বিমানের দিবে অংশ। কেউ কেউ বাইরের ছাটিতে না বেঁধেই জ্ঞান হারানেন। অসম্ভব!

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল ৪০টি প্রাণ। কে

বিস্মৃতি

শৈলেনকুমার দত্ত

সবে ডানা পাওয়া পাখিটা উড়ে এল :
 ভয়েতে ভীষণ কঁপে বলে ভিজ ভিঃ
 আমার ঘরের মাঝে কি যে দেখা গেল
 বলল চোখের 'পরে ভাব করে নিজে !
 মুখ কুলে তাকাব কি বললে দে রবে—
 আমি এক অনাথা গো চাই শুধু ঠাই :
 তোমার 'এ ঘর মাঝে' এটুকু কি হবে
 এত বড় পৃথিবীতে কোথাও না পাই।
 কীৰ হামি যেনে মুখে ফলে বেই তারে
 ছাল ওঠা দেহটাকে ভাঙা চেরি-বায়ে,
 অথচ অনেক পরে দেখি একেবারে
 শেষ হয়ে গেছে ঠাই শোকে-ভরা শাঁকে।
 এটুকু থাকার নেপা সব জানি চিতে
 তবুও ভোগাই নিজে কঁাকা পৃথিবীতে !



স্বপ্ন বাসর



মীরাবায়

ডাই হয়ে পড়ে থাক। এঁটো কলাপাতা আর খুঁচী
গেলাদের মাঝে নাক চুঁবিয়ৈ ভৈবিক ডাঁড়নার তার
আঁখি প্রস্তুতিকে যেটোতে বাস্তব কতগুলো ঢেঁড়ী কুঁচু,
ভাবের পাশে কতগুলো শীর্ণকার তিমিরীর ছেলেও
জুটেছে কুঁচুগুলোয় সহকর্মী হয়ে। এই আঁখি প্রস্তুতির
ডাঁড়নার এখানে মাথায় পত্তরে আর কোন তফাৎ নেই,
মহাশূন্য খুঁচিয়ে দিচ্ছে এই নিজেই। আকৃত্তিকে পার্থক্য
বাক্যেও প্রকৃতিকে ঐ ভাবগুলো লাই এক হয়ে গিয়েছে।
ঐ দু'র বাঁহ নব্বয়ের বড় বাঁচীটা থেকে সানাইএর হু
জেনে আলছে, অনন্যমাগধে, আলোবাত্তির চাকডিকে।
বিহেবাঁচীটা পথচারীদের কাছে যৌব ঠাণ্ডিয়ার কথা সর্গের
জানিয়ে দিচ্ছে। রাত্তার ওপরেই ভবের একতলা টিনের
ঘরের নড়বড়ে দরজাটা খুলে দু'র বাড়িরে একবার বিহে
বাঁচীটার দিক ডাকান ঢেঁড়ী। বাঁচীটার তিনতলায়
একটা বিশিষ্ট ঘরের দিকে নজর দিয়ে একটা দীর্ঘবাস
কেসল সে। ঐ ঘরটা নীল'র ঘর, তাইই আজ বিহে। ঐ
উজ্জ্বল আলোর নিচেই হস্ত হাতী ক্যাপটের ওপর গরনা-
কাপড়ের হোকান লাটিয়ে নীল'র নবজীবনের অভিসার
স্বের প্রাণাশায় মুহূর্তগণ্ডা গুণকে। বর'র ঢেঁড়ী বন
দর বেথেরে শেল। নীল'র শেই ঐবর্ষায় বাঁহরাণী মৃতিটা
চাকু বোধবার গুণ্ড ওর ঘনটা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এইতো বহর কতক আগেও ওরা দুজনে একই সপ্তে
পড়ত। ক্রকের বগলা তখনো শাক্তীর আঁচল হিঁচিয়ে
আগামী বৌধনকে নিয়ন্ত্রণ জানাটনি। কীচা বসল তাবের
দুটি কচি ঘনকে সামাজিক উত্তরীচুর শাৰ্ফকাষোথ শেখাতে
পারেনি। বড় বাঁচীর সেরে নীল'র মনের কণটি খুলে
অধাধ নিমগ্ন জানিয়েছিল এই একতলায় টিন'র ঘরের
ঢেঁড়ীকে। একটু বড় হওয়ার সঙ্গে মাক ঢেঁড়ীকে দু'র

ছাড়িয়ে যেন সাপারের কর্মসূত্রে বেঁধে যেওয়া হয়েছিল।
অজাবের সাপাবে মূলকলোকে দিয়ে বিলাসিতা করবার
মত অৰ্ধলজ্জিত ঢেঁড়ীর সাবাব ছিলনা। সে সময়টা সাপারের
কাছে শেহেরে লাগালে সাপারের উপকার হয়, মা'এর
কাছে সগরকা হয়, তাইইখানগুলোতও দেখাশোনার
দগাধা হয়।

ছোট তাইটার খুলের শক্তিত খাটটা যা দকালবেলায়
অন্ত বাড়ীতে ডাডা করে পুঁথিয়ে বিচ্ছে এবং সকালে বাবার
অকিমের, তাইই খুলের ভাত যোগানোর বাড়িঘটা
পড়ে ছেঁটেপীর ওপর। তাই ঐ নীল'র মত নিত্যনূতন
সাক্তীর চলক বিজ্ঞানর হয়ে বেই দুনিয়ের খুলে পত্তরে
যাবার মূল্যও দেখায় ?

আলাকরা গোথের তাপসা স্ত্রীর সাধনে তার ও নীল'র
বন্ধুত্ববনের বিহতশক্তি একটা মধু'র আবেশ এনে দেয়।
নীল'র মূল রেফে কলোথ দুকেছে, এবং তার কলোথের
পরাণ কবেশেপ হয়ে গিয়েছে তা ঢেঁড়ীর জীবনে স্রাস্ত্রিহুর
পলাতক। মুহূর্তগুলোও যথো আর বহা পড়েনি। তখু
আজ সকাল থেকে নীল'র বিহের সাপাইএর হুয়ে বাঁহর
বাবে ও বেন আনমনা হয়ে উঠেছে। কেমনি মনে জাগছে
খুল জীবনের বদায় শক্তি। একদিন ওয়া দুজনে পত্মপতের
কত নিকটে ছিল আর আজ সত্য সমাজ তবের কোথায়
গরিয়ে বিয়েছে। দুটি খুঁচোনোখুল কিনোয় কয় খুঁচো
উঠেছিল বাডাবিক নাবীজবহের পরিণতির সম্ভাবনা নিয়ে,
একজন বিকশিত হোছে পশুপুৰুষ মনে নিজেই মাঝে
নূতন স্ত্রীর কাছখানে আক সে তার বিশেষ স্বর পথিককে
জীবনে বধন করে নিতে লম্বাযোহের মাকে প্রস্তুত। আর
সে নিজে ? বাড়িপ্রায় বে জীবন কাণো কীটটা তার
খুঁচো ওঠার মখে সমস্ত হুয়ে খেরে কাঁহরা কবে দিচ্ছে, এই

হুকড়ে বাওয়া কৌশলই বেধবনে কোথায় গে তাই নতুন জীবনকে অভ্যর্থনা জানাবে? ওসব চেষ্টার কাছে যন্ত্র-বিলাস। ভবুও নীলার বিষয় কথা শুনে পর্ষদ এক একবার ভাবতেও তার ভালো লাগছে বৈ কি।

রাত্তার একটা বড় বাড়ী হর্ব দিয়ে চলে গেল। তার ডীর মধ্যে চেষ্টার চিত্রার মাল ছিঁড়ে গেল, এমনকি এদোমেলো চিত্রা সে আজ লক্ষ্য থেকে সরছে, যের এখনো কত কাজ বাকী রয়েছে। নড়বড়ে ঘরখাটা বন্ধ করে ও ভেতরে ঢুক এল। সমস্ত সংসারটার এক অনীষ ভূত্বার যেন চাপা আর্দ্রতার গুহায়ে, চোকবার ঘরখাটাও তৈলভূয়া একটা কর্কশ আর্দ্রতার ভূলে যেন সমস্ত বাড়ী-টার প্রবল ভূত্বার সঙ্গে একজুড়ে হুব মেলান। ঘরে এসেও চিত্রার হাত থেকে হুক্তি নেই। নীলা চমক আরও হৃদয় বেধতে ধরেছে কনের সাথে, কত আশ্ব, অভ্যর্থনা আশঙ্ক, সবই ঐ মেয়েকে কেন্দ্র করে—নীলার সবই আছে ভগ্ন, যৌবন, ঐশ্বর্য, বর্ণাশ্রম আর এতগোত্র প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ রাত্রি! নিজেই অজান্তেই চেষ্টা একবার নিজেই যেউলে হওয়া শরীরটাকে দেখে নিল। অস্তাব অনটন যৌবনের প্রবীণতার ব্যাক্তি যোগ করতে পারেননি, তবে তার কণাধাতে সে ভুল ভুল, যৌবন ভীক পদক্ষেপ ঘরে পড়তে উত্তত। বেধে যৌবন পালাতে চাইলেও মনের যৌবন জাগে হাবী জানাতে ছাউন।

লক্ষ্য হয়ে আসছে, হাতের রাত্রা লাভা হয়ে গেছে। ঘন ঘন শীতের আওতায়ে ভেসে আসছে, যোগ হু হু এলে পড়েছে। ভীড়ের ফাঁকে একবার টুক করে গিয়ে নতুন বরকে তার নীলার সেট াগীর মত সাঙ-সম্বাটা দেখে আসবার তার প্রবল লোভ হল। পরের মলিন বাড়ীটা ধুলে বাল বেঁকে হাঁএর ভুলে রাখা হু-লিনের পুরানো ছরীপাড় বাড়ীটা বাধ করে পরল চেষ্টা। বাবা নিঃস্বস্ত হাবার আসবে গেছেন, হাও এখনো কাজ সেয়ে ক্ষেতেননি, তাই যখন হুটোকে কোর করে লগ্ননের আলোর গুণালে পড়তে বসিয়ে চেষ্টা রাত্তার বেধিয়ে এল।

সেট দিয়ে ঢুক লাননেই হালানের হুসজ্জিত মক, বহ-লোকের জুড়, আলোর বোশনাই হুলের হুবায়ে জায়গাটা যেন বর্ণাশ্রম বলে ভ্রম হয়। পৃথিবীর কোন ম্লানি যেন

এখানে আসতে পারছে না। ভীড়ের হাবা থেকে মাথা তুলে চেষ্টা কোনরকমে বরকে বেধে নিল। ছোট্টোলায় ঠাকুরবার কোলের কাছে তার নিজের বিষয় কালনিক গল্প সে অনেক শুনেছে। তিনি বর্তমান 'লাননের চেষ্টা-হাবা' যে বহু আলোকে সে হালপুত্রের মত দেখতে হলে, রাত্তার সিংহাসনে তাকে বসান হবে। আর চেষ্টারটি লাননের হাবার মত, নৈলে হালপুত্র বহু করবে কেন!

বড় হয়ে এই গল্পের কথা মনে পড়ার তার হাসি পেত, হাবার দেহাঙ্ক হালুকের বহন আর আলার অমু ভবিষ্যৎ! কিন্তু সেই কল্পনাই যে বাস্তব হু আল সে চোখের সামনে দেখছে। হালসিংহাসনের মত বগান আলো করেই তো হালপুত্রের মত নতুন বহু বলে আছে, তারলে ঠাকুরবার গল্পখাটা নেহাৎ বিখ্যা নয়, কাছের ভাগো লভাও হয়। ভীড় ঠেলে বাড়ীর কেতবে চেষ্টা এগিয়ে গেল। এবাড়ীর প্রতিটি আলিগলি তার চেনা, ছোট-বেলার অনেকবার এসেছে। সিঁড়ি বেধে ও তিনতলার উঠে এল, নীলার সম্বাটা একবার দেখতেই হবে, এত লোকের হাবা কেট তাকে লক্ষ্যই করবেনা বহুগে গিয়ে দেখে আসতে পারবে। কিন্তু লক্ষ্যের উত্তরলার গুহ বুকট। টিপ টিপ করতে লাগল, পা-এর গতি রূপ হয়ে এল, গুহ গতিতে চেষ্টা তিনতলার নীলার বহুর সামনে এসে দাঁড়াল। উজ্জল নীলাভ আলোর কনের সাথে রাত্রিই নীলাকে অপকৃপ দেখাচ্ছে। নিজেই গোপন করে ও হাউিয়ে হুগল, নীলাও তাকে আলচিনবে না সেও নিজেই চেনাতে চায় না, রহস্য হু সে শুধু তার হালনিক কল্পনার একটি বাস্তব রূপ দেখতে এসেছে। ঘরের ঐ যন্ত্র-রাজ্যের সঙ্গে চেষ্টার বাস্তবক্ষেত্রে কোন পরিচয় নেই। নিছক কল্পনার ভূমি সামনে তার এখানে আসা।

ভগ্ন হয়ে দেখতে দেখতে সে আর সবই ভুলে গিয়ে-ছিল। ঐশ্বরের কী মনোযোগিনী রূপ। হুগল নিশিত হাবী-কঠোর উজ্জল হু তার চমক ভাঙল। লাত্তা গুহনার চলত নিশিত সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে, তাই হু নিশিত উজ্জল শোনা গেল, 'সবে হাও, সবে হাও, বরকে ছািবনালার নিয়ে হাওয়া হচ্ছে।' বিয়ের শুভ মুহূর্তের আগে কোন কুৎসিত অশুভ নীচ জাতীরে হুগলনি নিশিত এই নাকি এ বাড়ীর রীতি, তাই বরকে মাঝখানে বেধে বহিলানু

অন্ততঃকৈ দূর করিতে করিতে সৌভাগ্যকে বহুর নদে
কড়া গ্রহণের আগলে নিয়ে মরণপথে উঠে আসছে। যবে
গোথের সামনে কান্ধের পর্দা ঘরে আছেন একমল পাছে
দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অস্তিত্ব কিছু প্রবেশ করে। সৌভাগ্যকে
আটখাতে বেঁধে রাখবার এই অস্বস্ত প্রচেষ্টার টেপীর হানি
পেল। টেপীর শ্রীনি মূর্তির বিকে তাকিয়ে এক মহিলা
চোঁচিয়ে উঠলেন, মরে যাওয়া বর উঠছে যেখতে পাছ না ?
কোথেকে যে এইদব আজোথেকে মেরেগুলো! এদে কানের
ভাঙগার ভাঙকবে দাঁড়াচ্ছে, সব যেন রক্ত দেখতেজুটেছে !”
একটা ঝাপ ঝাঙ্কলোর দৃষ্টি ছুঁড়ে মরে তিনি হেলেরলে
উঠে গেলেন।

টেপীর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল, নিজের
অজান্তেই একটা দীর্ঘকাল কেসে ও মেনে আসতে আসতে
নারীরাগাহিনীর সমাধি বহকে একপগকে ঘেঁষে নিল।
সত্যিই অনাহতবাহের নিরুৎকোহলব শেভার এখানে কাণা
অহুতিত হোচ্ছে কিন্তু উপবাসী মনটা ও মরণমহৎপারের
নিয়মভিত্তি মূণগাঠে বলি হতে চায় না। ঐতো কবি-
ঘোষ, কেতকী বস্ত্র মরণেই তো তার আর নীলার সঙ্গে
পড়ছে তাতা তো আত্ম সমাজের বিশিষ্ট বহর হাড়শ্রের
জোরে এই বিয়ের আগের নিরস্ত্রিত হোতে, কিন্তু তার
চিনের বহর বসবাস আর দীর্ঘ হীন বেশবাস তাকে ওদের
বেকে অনেক নীচে ছুঁতে কেসে বিয়েছে। তাগাদেবতা
মুক ও বহিঃ, অভিমোদ জানাবে কার কাছে ? কিন্তু
ভাগ্যদেবতা এক বিষয়ে কোন পার্থক্য করেনি নারী-
জগতের, প্রাণবিক্ত বৃত্তিগুলো ধনী গরিব নিবিধেবে সব
নারীর মনে সমানভাবে জাগিয়ে দিয়েছেন, নইলে নীলার
এই নতুন বর্ণের মধ্যে তার নিজের মনেও ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি-
টাই কি সে দেখার ভর্তুকি ছুটে আসেনি ?

একতলার মেয়ে শূত্র বহাগনে প্রাতি গুর নমর পড়ল।
বহাগনটা খালি তবু তার চারপাশে লোকমনের সমারোহ
একটুকু কমেনি। টেপী নিজের মনের অস্বনিহিত
দুখিটাই এখানে আবার দেখতে পেল। তার মনের রাজ-
সিক ভোগবৃত্তিগুলো ঠিক অবনি সমারোহে তার জীবনের
নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।
কিন্তু তারও বহাগনও যে ঐরকমই শূত্র দে অতিথিটি যে
আজও এনে শৌচোনি।

নীলার ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপটি চিন্তা করে সে নিজের সঙ্গে
তুলনা করল, ব্যক্তিকল্পে নীলার সঙ্গে তার তুলনা হয় না
সত্যি কিন্তু নিজের মনের রাজস্ব সে নিজেই রাজধানী।
তার এই বানীগিরি তো আর কেউ কেউ নিতে পারবে
না ! নীলার বিয়ে, নীলার বিয়ে, দকাল থেকে মনটা তার
ভয়ানক উত্তরনা হয়েছিল। বেঁধে ঘাবার পরও তো মনটা
পাঠ হচ্ছে না ? এদব ভাববিলাসগুলো মোর করে বহন
করে টেপী বাড়ির বিকে এগোল।

বাড়ী ঢোকবার টিনের দরজাটা খোলা ছিল বোধহয় বা
কাজ থেকে বিয়ে এসেছেন। ভাইবোনগুলো ভাব অহু-
পস্থিতির সুরোগে লঠের হুপশে তার পড়ে বুঝাচ্ছে। বা
বোধহয় রাত্তারবহর বিকে গেছেন এখনি ডাক পড়বে
ভাইবোনদের ঘর থেকে তুলে যাওয়াবার অত্র। হঠাৎ
নিজনির্বিশিষ্টক সংসারেই এই বানিটার বিশপকে টেপীর
মনটা বিস্তার করে উঠল। সংসারের চক্ষিপথটাই নিঃশব্দ
যিরে রেখেছে, আর অস্ত্রতঃ কয়েকটাঘণ্টা ও নিম্ন একান্ত
করে ভোগ করবে। এশমহত্ব ও নিজের পৃথিবীতে
মদ্রাজী হয়ে থাকবে, কারোর চক্ষুক্ষেপ সহ্য করবে না।
রাত্তারবহর গিয়ে থাকে জানিয়ে এক কিছু খাবেনা, শরীফটা
ভালো লাগছেনা। সে শুভে হচ্ছে তাকে যেন আর না
ডাকা হয়। বা দুএকবার ডাকাডাকি করবেও যেন অহু-
কায়ে পড়ে থাকা নিশ্চুপ মূর্তিটার কাছ থেকে কোন
সাড়ো শব্দ পেলেনা তখন আপন মনে বকতে বকতে
টেপীর নিত্যকর্মগুলো কোনমতে শেষ করতে লাগলেন।

বার মনবহর বড় বাড়ীটার বহাগনে আগের বহ এসে
বসেছে। কিন্তু যে বহকে টেপী দেখে এসেছিল এ সে
লোক নয় এ একজন নতুন বহ, কিন্তু একে দেখতে টেপীর
আরও ভালো লাগছে। ওর মনের কল্পনার মূর্তির সঙ্গে
এ নতুনবহের আদর্শ সাদৃশ্য রয়েছে ! বহকে উকি মেয়ে
দেখেই টেপী সেই ভিনভলার ঘরে উচ্ছল আগের নীচে
গিয়ে বসল। কি আদর্শ আজতো তাইই বিয়ে সে সব
বুঝে গিয়েছিল কেন ? কিন্তু এত লাড়ী গানো তার গারে
কি করে এল বা টিনের বহ কেণে সে নীলারের বাড়ীতেই
বা কি করে এল ? নীলার চেয়েও এখন তাকে কম হৃদয়
দেখাচ্ছে না ! নীলার বাবাই হুত তার বাপাকে
বিয়ে দেখার অত্র এ বাড়ীতে ভেকে এনেছেন। বড় বাড়ী

না। হলে সমাহারোহে যিয়ে হবে কি করে? এত স্মরণ বর, এত গল্পনা সাজী কোনোদিন তার হবে একথা লে ভাবতেই পারিনি।

চতুর্দশ পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে তাকে ও যেন নতুন করে নিম্নে দেখতে পেল। তার সমস্ত অতীত-পাণ্ডুলিপি যেন ঐ বরের বেশে এসে হাজির হয়েছে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে টে'নী যেন দৌড়গোরে এই রান গ্রহণ করছিল, নীলাই তবু বাতরানী হয়নি, এবার সেও হতে চলেছে। ধনী সমাজে বাতরানীদের ছাড়পত্র তারও করতগপত। আনন্দে তবপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার দেহমন, মাথাগুচ্ছ উল্লাসে যেন ও ফেটে পড়তে চাইছে। বাসলেও গবেষক ভূমিতে যিয়ে দেহেরা সব একে একে বিহার নিয়েছে। টে'নী এইটাই চাইছিল। নিরাশা বাসর শরমে ও তার পথের গণ্ডের অভ্যাগত অতিথিকে এতটা আপনায় করে কাছে শেতে চায়। ও তার সমস্ত ইচ্ছা দিয়ে গুণে মিত্র চায় এই বয়সীর চুরুটলোকে। বন্ধের বনের মত আগলতে হবে এই বাতরানীকে। এর পলাতক পল্লবগুলোকে 'স্বপ্নাব বোজা' দিয়েও অন্ততঃ ধরে রাখতে হবে।

নতুন বর ওর গায়ে আলোভোভাবে হাত বাখল।

'সুন্দর আজকের রাতটা। বড় সুন্দর, নর? কিন্তু এর রূপটা বড় গুলনাময় এতে আনন্দগর্য্য হয়োনা তাকে ঠেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।'

টে'নী অস্বাভাবিক বরের দিকে তাকাল। নতুন বরের মুখে এ কি বরংগের কথা!

'হানো, জুংগের কঠিন ভূমিতেই এ রাতের প্রকৃত মূল গাঁথা। যেমনটা কঠিন পথের তপস দিয়েই জীবনের রাস্তা সম্পূর্ণ হয়। জুংগে যদি ভালো করে চিনেছি, সেইটাই জীবনের সত্যকারের রূপ, তাকে ওর পেরে এড়িয়ে যেতে গেলে পথে পথে ঠকতে হয়, আর এই ঠকবার ক্ষতই জুংগের মোহময় রূপ ছলন করতে আজকের মত বিশেষ বিশেষ রাতের সৃষ্টি করে।'

টে'নীও বিদ্রোহের সীমা নেই, এতো নতুন বরের কথা নয়! এতো জীবন বর্ণনের সহস্রাধিক কথা শোনাচ্ছে কোন বার্মানিক, এতো তারই জীবনবর্ণনের শেষ কথাগুলো এই পথম অতিথির মাধ্যমে তার সাপাংসংকীর্ণ জন্ম নিয়ে দিচ্ছে।

অনুচিন্তায় টে'নী বলতে চাইল। 'গোলা জীবনভোর জুংগের তাহে আমি ক্রান্ত কর্তৃত্বিত হয়ে আজকের এই রাতটি কাখনা করছি, আজকের রাত এ আনন্দটুকু পাথের হিন্দাংব লক্ষ্য করতে দাঁও, নাহলে সারা জীবন কিসের পূঁজি তাকিয়ে চলব? আমার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তি তপ তুমি, তোমার কাছে এ তারতম্য কথা শুনতে আমার ভালো লাগবে না। হোক কণিক, হোক স্বপ্ন ছলনাময়, তবু এ রাতের তুমি আমার স্বপ্ন মত্তব করে তোল, আমার সাগা জীবনের চলবার পাথেরাতে তবিয়ে দাঁও।'

কিন্তু ওর সমস্ত গলাটা যেন বুঁজে বন্ধ হয়ে এসে, সমস্ত চেতনা স্বপ্নিতের প্রেমের আলিঙ্গনের মাঝে এক পথম সুখাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তইই হো লে চেয়েছিল, নারী জীবনের ত্রিগুণন কাখনা এই তো স্বাভাবিক পূর্ব-গতি, তার চাওয়া পাওয়ার মাঝে আচ্ছন্ন।

টে'নীও হাত ধরে লে আবার বলে, 'এগো সত্যজীবন তুমি আমার পাশে আমার অবিচ্ছিন্নতার সঙ্গী হয়ে এসে দাঁড়াও, জুংগে তর না পেয়ে আমার যেন জীবনকে টিকমত চিনতে পারি।' টে'নীও হাত ধরে সত্যিই কে যেন টানছে। চমকে স্বপ্নগগর থেকে ছিটকে টে'নী নিম্নের ছেঁড়া বিছানাটার চলে এসে। হাত ধরে টানছে যা আর লক্ষ্য লক্ষ্যে জীবনব্যক্তি পাথেরগুলো একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে, 'লক্ষ্য অটুট! বাগল, কাল দেখা থেকে সেই যে লাট রাষ্ট্র বেয়ে যুঝেছে এখনও যুঝ তাকবার সময় হল না? বলি আমার তো পথের বাড়ী পিঠি বঁধতে যেতে হবে। এ সংসারের গুটিবর্ণের যুঝে তাড়টা যোগাবে কখন? বাশ ভাই কি না খেয়ে আশিস ইচ্ছা ধাবে?'

চোখ বুললে তাকাতাড়ি টে'নী উঠে দাঁড়ায়, রাতের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল, এইই কি জীবনের সত্য-কারের রূপ? এর মধ্যে কেবল কিছু নেই? আর যে স্বতীচিকার পেছনে যনটা নিরন্তর ছুটে চলেছে সেটা কি আলোয়ার ইচ্ছিত? জীবনে চলবার পাথের খনি সবে তো উন্মার করা হচ্ছে, আরও কি কি যেভাবে তার মস্ত আর তার সাধাবাধা নেই। খুণ সহমতাবেই ও বৈদম্বিল কালের মস্ত পা বাড়ায়।

আজ পৰ্য্যন্ত যেখানে যত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খোঁজ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে কিছু না কিছু ধর্মীয় অলঙ্কার বা অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে সে মন্দির যদি প্রাচীন হয়, তারলেত কথাই নেই। যুগে যুগে, বারে বারে কত ভাবেই না ঈশ্বরের লীলাকমল প্রকৃতিত হয়েছে পৃথিবীর বুকে। কত ভক্তজনকেই না যা তার মাতৃনায়েম জ্ববয় অভিযে দিয়েছেন। প্রাচীন এক জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীকল্পনাময়ী কালী মন্দির' দেখে সে কথাই বার বার মনে পড়েছিল। মন্দিরটি বহু পুরাতন। মাঘের শিলাময়ী মূর্তিটি গ্রায় চারশত বৎসরের পুরাতন হবে। মধ্যস্থলে সুস্ফুট প্রাঙ্গণ। মাঘের মূর্তিটি অর্পূব ঐতিহ্য মণ্ডিত। মাঘের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মন আনন্দে ভরে উঠবে। পদতলে বস্ত্রভাষার বল যেন মাঘের চরণ বিরে হাসছে। এ যেন সার্থক জীবনের হাসি। এমন একখানি মাংমূর্তি না দেখতে পেলে জীবন যেন অসার্থক হয়ে যেত। অথচ কলকাতার কত কাছে। আদি গঙ্গার তীরে এই দ্বাপন শিবমন্দির ফুল মাঘের মন্দিরটি অবস্থিত। ঢালীগঞ্জের ৪০ নং সরকারী বাস ষ্টাণ্ডে নেরে সামান্য পথ হেঁটে গেলেই মন্দিরে পৌঁছান যায়। অথবা বেসরকারী ৪০ নং রুটের একবারে শেষ প্রান্তে নামলেও দেখা যাবে সামনেই মন্দির। বর্তমান পুরোহিত শ্রীমসিতদাস চৌধুরীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে। সহজ, সরল বৃদ্ধ। সবা হাস্য-ময়, মাঘের উপবৃত্ত পূজারীই বটে। তাঁর কাছেই গল্প শুনছিলাম।

আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগেকার

কথা। কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িয়ার বিখ্যাত জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী প্রবৃত্ত সুসম্পত্তি এবং ধন সম্পত্তির মালিক ছিলেন। এই জমিদার বংশের গোড়াপত্তনের সময় এমনই বংশে একজন মহান সাধক কথ্যগ্রহণ করেন। সেই সাধকের একসময় একটি কস্তাসহান ভূমিষ্ট হয়েছিল। রূপেপুণে অতি অদ্ভুতনীয় ছিল সেই কস্তাটি। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই কস্তা অকস্মাৎ মারা গেলেন। কিন্তু কস্তার সাধক পিতা কস্তার এই খোচনীর মুহূর্তে ভাবনভাবে মর্মান্বিত হলেন। কস্তার এই করুণ বিয়োগ বাথাকে ভোলবার কোন সাধনা সেদিন তিনি খুঁজে পেলেন না। তিনি পাগল-প্রায় হয়ে বিভিন্ন স্থানে একাকী ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় একদিন গভীর রাতে তিনি একটি অপ্রত্যাশিত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন,—তাঁর সমুদ্রত্যা কস্তা স্বয়ং এসে বলছেন, বাবা তোমার আমি ছেড়ে চলে এসেছি তুমি দিন বিন এই ভেবে কেন ঘিছে মনে হুংস করছ? আমি তোমায় ছাড়া কি কখন একমুখ থাকতে পারি, না পেরেছি কোনদিন? শোন, তুমি আমার তোমার স্বকস্তা রূপেই আমার ফিরে পাবে। আজ হতে পুনরায় আমি তোমার কাছে তোমার কস্তা রূপেই চির দিন বাঁধা হয়ে থাক। আজ এই রজনী অসান হবার পর তুমি সোজা চলে যেও দ্বাপি গঙ্গার তুলে। দেখানে কুলবর্তী একটি বৃক্ষের ডলায় বেথতে পাবে একটি কুটি পাথর। পরম ভক্তি স্তরে সেই পাথর দিয়ে তুমি সেখানেই নির্মাণ করে তোমার উই দেবীর প্রতি-মূর্তি। .জেনো তোমার গড়া সেই প্রস্তর মূর্তির মধ্যেই আমি চিরময়ী হয়ে চিরদিন বিরাজ করব। এই কথা কটী বলেই তাঁর সেই মৃত্যু কস্তা সহসা

অনুষ্ঠা হয়ে গেলেন। সাধকের এই অলৌকিক স্বপ্ন দর্শনে তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল এবং আনন্দে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। স্বপ্নে এই আনন্দ সংবাদের পেয়ে সাধক অত্যন্ত অধঃস্থিত হইয়া প্রোভাত হইতেই ছুটে এলেন ভীম প্রান্তা আদি গঙ্গার তীরে। এসে তিনি সত্যা সত্যই দেখলেন, গঙ্গার তীরে পড়ে রয়েছে তাঁর সেই স্বপ্ন নিকিষ্ট কৃষ্ণলিঙ্গ। আনন্দে সাধকের হৃদয়ের দিগে গড়িয়ে পড়তে লাগল অবিরল আনন্দ অক্ষয়। মা-মা বলে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাধক সেই পবিত্র শিলায় উপর। সেই ভায়েই শিলা দিয়ে সেই দিনই সাধক মায়ের আদিষ্ট মূর্তি নির্মাণের শুভ সঙ্কল্প করলেন। পরে অতি অলৌকিক উপায়ে সকল হয়েছিল তাঁর সেই শুভ সঙ্কল্প।

শোনা যায়, সাধকের প্রতি মায়ের স্বপ্নাদেশ হবার পর মা তাঁর মূর্তি গঠনের জন্য ভবনত ভক্তকে পুনরায় স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই ভক্ত শিল্পীই নির্মাণ করেছিলেন মায়ের এই করুণাময়ী মূর্তি। এক শুভ সন্ধিক্ষণে সাধক মা করুণাময়ীর সেই শিলাময়ী মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মাকে ভাগিয়ে তুললেন। ত্রিদিনের ভরে হারিয়ে যাওয়া সেই আগরতলী কন্ডাকে এইভাবে পুনরায় মায়ের মধ্যে ফিরে পেতে লাগল যেন আনন্দে অত্যন্ত মাতো-হয়ে উঠলেন। প্রতিদিন তিনি তাঁর অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য নিয়ে প্রাণভরে পূজা করতে লাগলেন মা করুণাময়ীর। এইভাবে কিছুদিন আনন্দের মধ্যে দিয়ে গত চব্বার পর, হঠাৎ একদিন ওপার থেকে মায়ের ডাক এসে পৌঁছল সেই সাধকের কাছে। বংশের প্রাণ পুরুষ সেদিন চির বিদায় নিয়ে গেলেন সত্যা, কিন্তু তিনি আমাদের এই দেশ ও দেশের জন্যে বেধে গেলেন তাঁর ভীমের স্রেষ্ঠ অমর কোঁঠ। সার্বণ বংশের এই আদি প্রত্যক্ষিতা জননী মা করুণাময়ী পরম ভায়েত হয়ে আজও বম্বিময় বিরাজিত হয়ে আছেন। মায়ের এই শুভ আবিভাবে সমগ্র সার্বণ বংশ আজ ধ্বংস ও পথিত। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত সন্তানের দল আসতে লাগল। তারা মায়ের কাছে তাদের মনের বাসনাকে পূর্ণ করার বিনীত প্রার্থনা জানিয়ে যেতে লাগলেন। মা তাঁর সন্তানগণের

মনের বাসনাকে পূর্ণ করলেন। মা যে আমাদের করুণার কল্পিত। গঙ্গার পশ্চিম কূলবর্তী সার্বণ-দেব এই মন্দিরের চারিপাশ একদা গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকলে গ্রামবাসীরা কেহ সচরাচর এই স্থাপনস্থল স্থানে বড় একটা আসত না। মায়ের এই মন্দিরকে নিয়ে এ অঞ্চলে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়।

নিম্না নির্ধারিত সময়ে মায়ের পূজা যথারীতি সমাপন হয়ে যাওয়ার পর, মন্দির যখন গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যে, তখন অকস্মাৎ মধ্য হারিয়ে দিকে এই মন্দিরের দ্বাপাশ এক অস্বাভাবিক আলোর ভোজিতে আলোকিত হয়ে উঠত। আর সেই উজ্জ্বল আলোময় মন্দিরের বন্ধ কপাটের অন্তরাল থেকে কানর ঘণ্টা ও লম্বা বেজে উঠত। এমন কি পবিত্র ধূপ-ধূনার সুগন্ধ পাওয়া যেত বলে শোনা যায়। সেই মনোহর অলৌকিক পরিবেশ বেধে গ্রামবাসীদের মনে হত, যেন মায়ের কোন একনিষ্ঠ ভক্ত বৃষ্টি সেই নিশ্চিন্ত রাতে একায়ে মনে মন্দিরে বসে পূজা করে চলেছেন। কিন্তু কেউ যদি কখন কোতুলক বশতঃ সেই উজ্জ্বল আলোকে লক্ষ্য করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেত, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই আলোকরশ্মিকে পুনরায় সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখা যেত। আর সেই কানর ঘণ্টাধ্বনিও সঙ্গে সঙ্গে শুক হয়ে যেত। মন্দির প্রান্তণে এই ভৌতিক ঘটনাকে হামেশাই ঘটতে বেধে গ্রামবাসীদের মনে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। আবার কেহ কেহ মায়ের প্রত্যক্ষ জীবার কথা শ্রবণ করে একান্ত ভক্তি সহকারে দূর থেকে মায়ের উদ্দেশ্যে গড় হয়ে প্রণাম করত। এই সব ঘটনাক্রম ধূপ একটা বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট কথা নয়। আজ থেকে মাত্র পঁচিশ খ্রিস্ট বছর আগের কথা। সে সময় এই গ্রামের আলো পাশের লোকেরা মায়ের মন্দিরের ধারে শৌচাদি করে দিন দিন মায়ের এই স্থানকে ভয়ানক অপবিত্র করে তুলেছিল। শোনা যায় তারাও নাকি সময় সময় মায়ের এই পবিত্র স্থানে বিভিন্ন ভৌতিক চাহাকে প্রত্যক্ষ চলতে ক্রিয়তে দেখত। তাদের মনে হত, কোন অনুষ্ঠান মহাপুরুষ যেন এই নির্জন মন্দিরের চতুর্পার্শে নীরবে পদচারণা করে চল-

ছেন। যেদিন থেকে তারা এই ভৌতিক অবতনগুলিকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিল, ঠিক সেই দিন থেকে তারা মাঘের এই স্থান মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করে সেখানে সর্বপ্রকার শৌচাঙ্গি কার্য্য বন্ধ করেছিল। এর পরেও আরো কতকগুলি অলৌকিক ঘটনাকে সেখানে ঘটতে দেখা গিয়েছিল। সে ঘটনাগুলি ছিল খুবই চমকপ্রদ। তখন এখানকার গ্রামবাসীরা মাঘের এই মন্দির ঘেরে নানা যাজ্ঞগানের আদর বসাত। মন্দির প্রাঙ্গণে তাদের মিলিত এই আনন্দ উৎসব দীর্ঘ দিন ধরেই চলে আসছিল। একবার তাদের সেই যাজ্ঞ উৎসবের দিনে বিরাট একটি অলৌকিক কাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। শোনা যায়, সেই অলৌকিক কাণ্ডের পর থেকে নাকি কেউ আর কোনদিন মাঘের সেই জাগ্রত স্থানের শাশ্ত্র নীরবতাকে ভঙ্গ করে কোন রকম নিছক আনন্দ অমুষ্ঠানের আয়োজন করেনি।

সেদিনের ঘটনাটি হলো এই:—কোন একটি বিশেষ দিনে গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে মাঘের মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বিরাট যাজ্ঞগানের আয়োজন করেছিলেন। পালা গান সেদিন যথারীতি ভালই জমে উঠেছিল। কিন্তু মধ্যরাত্রির দিকে হঠাৎ দেখা গেল, অসংখ্য বিহ্বল সাপের দল অকস্মাৎ কোথা থেকে এসে ক্রমে সেই আগরের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে।

আর একবারও ঠিক সমরূপ যাজ্ঞগানের অমুষ্ঠানের দিনে দেখা গেল হাজার হাজার মৌমাছির ঝাঁক হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে আগরের সকল নিরীহ

প্রাণীদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। বাংবার এই অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ার, প্রাণীদের পক্ষে যাজ্ঞগান শোনা অত্যন্ত ভীতিজনক হয়ে উঠল। তারা দ্রুত এই অভাবনীয় বিপদের উপায় উদ্‌ঘাটনের জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শোনা যায়, ঘটনার দিন কয়েক পরেই নাকি গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেরই একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। মা যেন তাদের স্বপ্নে ডেকে বলছেন, ওরে আমার এই স্থান ভক্ত সম্ভ্রামনের জগ্রে রক্ষিত। আমি যে আমার ভক্ত সম্ভ্রামনের জগ্রে যুগ যুগ ধরে এই পুণ্যস্থানে বিরাজ করছি। কাজেই তোরা আর কোনদিন এত পবিত্র স্থানে শৌচাঙ্গি করে আমার এই স্থানকে কলুষিত করিনি। আর আমার ভক্ত সম্ভ্রামনের সাধনায় বিদ্রু ঘটিয়ে এই স্থানে কখন কোন রকম আমার অমুষ্ঠানও করিল নি। মাঘের এই স্বপ্নবোধ পাওয়ার পর গ্রামবাসীদের মধ্যে এক মহা দোরগোল পড়ে গেল। সেই দিন থেকে তারা সকলে মাঘের এই প্রত্যাদেশ অমুযায়ী সেখানে সর্বরকম শৌচাঙ্গি কার্য্য বন্ধ করে দিল এবং সবলবলে তারা একদিন মাঘের কাছে এসে মাকে ধুমধাম সহকারে ষোড়শোপচারে পূজা দিল। শোনা যায় তাদের আয়োজিত সেই বিরাট পূজা মহোৎসবের পর থেকেই নাকি অতি আশ্চর্য্যভাবে সেই গ্রামের সকল অশান্তি চিরতরে দূর হয়ে গিয়েছিল। এই সুরম্য মন্দিরটি আজ বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠেছে।



জলপাইগুড়ি

চিত্রিতা দেবী

স্বপ্নেতে অকস্মাৎ

ক'পদিয়ে গড়ে বসে,—

নির্বাসিত গৃহাধিপত্যে ।

কতের ডাক্তার হাজে ।

হস্ত শিক্ত বকে বহি—

কায়ে নারী,—অসহায় !

বিফল পুত্র চাও,—

প্রলয় গর্জনে ধায় ।

হাঙ্গ'কার আশে বস্ত্রবি রণ,—

হস্ত মুক্তা ধায়,—

স্বধার্ত্ত প্রসনার :—

ধরে ধরে গড় শাস্তির সুখ

মুহুর্ত্তে চুটে যায় ।—

জীবন নদীতে স্রবণের বান দিকে দিকে গর্জায়,—

সহসা বালিকা কাগিরা উঠি। সহস বালি চাও ।—

কি হোল হঠাৎ ?

কেন এ আঘাত ?

বলো কাহ পাপে,—হেন অভিপাণ ?

নিষ্ঠুর নিষ্ঠতি,—নিষ্ঠুরতর করণার ভগবান ।

নিজের সৃষ্টি নিজেই ধ্বংস করিছে অনিবার্য ।

না না,—তবু নয় বিধাতার পাপ,—

আছে আছে আছে, বাহু-বাহো পাপ,—

তোমার এবং আমার, এবং আগে অ'গোঁ আঘো,—

সবার লবার ।—

কুহ স্বার্থ গর্জন করে

অতৃপ্ত কামনার ।—

কেন এ কাহনী ?

কেন নিষ্ঠুর প্রকৃতি অন্ধপ্রায় ।

আপন সবা আপনি ছি'ড়িয়া

দুই হাতে আঁকড়ায়

ছিন্নমতা প্রায় ।

না না, তুমি লব নিষ্ঠা তোমার হৃদয়িত ন

একেবারে ।

তাকিহো না তবু সন্দেহ করে,

তোমার বিধাতে পবে

তবু মুহূর্ত্তই নাই এ ধরাধি,—

আছে আছে প্রাণ অ'গোঁ যেথায়,—

দিকে দিকে জাখো, ঐ জাখা যায়,—

আবার শান্তি, আবার স্থিতি,—

আবার নতুন আশা ।

শান্ত ওঠিনো আবার কহিছে

নবজীবনের কাহা ।

নিষ্ঠুর নিষ্ঠতি, প্রকৃতি অন্ধ,

তবু অনন্তে আছে আনন্দ ।—

মাজবেধে প্রাণে আঘো আছে প্রেম,

অমৃত গন্ধে ভরা ।

এল এল এল যে আঁকো যেথায়,—

যায় যা লাগা আঁকো গো যেথায়,

নবীন জীবন গড়ে তোল ফের,—

নিজের করণায় ।

কতি বা চড়েছে ন'ই তাহ শেষ,—

জীবনের ক্ষত তবু হবে শেষ,

তোমার, তোমার এবং আমার,—কবর হইতে বেহুঁয়াবাস,

নদীর হতন থাক যবে থাক,

নব কলোপ বহি ।

নব আগ্রহে প্রাণ শূন কহি,—

এল পো লফলে,—এল তুলি গতি ।—

নব উজ্জবে নতুন নগরী ।—

নব জলপাইগুড়ি ।

কুয়াশার স্বাদ

কুমারববু

টাকার ধান্দার ঢাকুরিয়াতে গিয়েছিল। সুবিধে হল না। কি আর করা যাবে! আমার প্রয়োজন ও অপরের প্রয়োজন নিশ্চয়ই এক হতে পারে না। কিরবার সময় লেভেল জুসিংএর কাছে এসে বেখলামি মাসের বোকায়েন বুঝ ভক্ত। হুগলে বাস বাস, বাহুরে বাস বাস। আচ্ছা, ব্যাশারটা যদি উঠে! হুত, অর্থাৎ অমরা যদি মাস না খেয়ে বাস খেতাম ও ছাগলরা বাস পাতা না খেতে আবারেই বাস খেত তাহলে ব্যাশারটা কি রকমের দাঁড়াতে? তখন বোধ হয় গোয়া ছাগলদের বাওবাধর মস্ত ছাগ ছাড়াই বাহুরে বোকায়েন লটকান থাকত!

ট্রেন লাইন ধরে বেঁচে আসছিলাম বালীপত্তরে দিকে। একটা নতুন পাঠাল হয়েছিল লাইনের ধারে। অল্প একটু ঘুটে বেওয়াও শুরু হতে গেলে পাঠালের গায়ে ঠিক বেওয়া যাচ্ছে না কোনটাও প্রয়োজন বেশী। এটাও বেওয়াই হতে পারে যে একটা প্রয়োজনের সঙ্গে আরও একটা প্রয়োজন জড়িয়ে রয়েছে। যেমন ঘর গুল ছাগলের বা তোঁরাব আমার নিয়ামস্তাও তত্তে ট্রেন লাইনের ধারে পাঠাল বেওয়াটা প্রয়োজন, আমার পাঠালেও গায়ে যে ঘুটে বেওয়া হয়েছে সেটারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, নিম্নক পাঠালের শোভাওর্ধ্ব করবার তত্তে নিশ্চয়ই ঘুটে-জলো বেওয়া হটনি শুখনে, যাঁরা ঘুটে বিয়েছে তাঁরা ওজলো বিক্রি করবার ক্ষেত্রেই বিয়েছে কাঁচ ওধের টাকার প্রয়োজন, যাঁরা ঘুটেজলো কিনবে তাহেও ওজলোর প্রয়োজন আছে, লজার উত্থন ধরাবার আলানী পাওয়া যাবে।

ট্রেনলাইন ধরে ইটতে মল লাগে না। ছোটবেলার সময়ের মল খেতে সময় ক্যান্ডেমসেট ট্রেনলাইন ধরে প্রাইই ইটে যেতাম। ওখানে আবারেই একটা বাগান ছিল। ট্রেনের কাছাকাছি একটা কালভার্ট ছিল।

এখানেও রয়েছে; এটাকে অবশ্য কালভার্ট' না বলে নর্দাইই বলা উচিত।

কালো মতন একটা খোটাখোটা মেয়ে আমার আগে আগে ট্রেনলাইন ধরে ইটে চলছে হাতে একটা গিটার নিয়ে। বোধ করি কোন ফুলে যাচ্ছে শিখতে। ছোটবেলার অকণাও ছুটির দিনে পানের ফুলে পেরুর শিখতে যেত। খোটাখোটা শুধর বেশ ভালই বাজাক অকণা। মেয়েটার বোধহয় খুঁ লখা চুল। বেগীটা এসে প্রায় নিতনের ওপর পড়ছে। বেগীটা অবশ্য অংশ চুলের না false কে জানে? বেগীর শেষে হলরে বড়ের একটা ফিতে প্রমাণপত্র মতন করে বাঁধা রয়েছে। মেয়েটা ইঠাৎ বেশ একটু জ্ঞত লরে চলতে শুরু করল। গোবর ফুলের ফেরী হয়ে যাচ্ছে। চুলে তাগে তাগে কিতের প্রত্যাপতিও নিত.ব. ওপর লাকালাকি করতে শুরু করে দিল জ্ঞানক জ্ঞাবে।

ট্রামে উঠলাম। কণাকটার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট চাইল। মল্লপীঠা বেখলামি। বিরক্ত মুখে কণাকটার অকণিকে চলে গেল। মল্লপীঠার ওপর নানাবলী অভ্যাস, বগলে ছাতা, পায়ে বুটজুতা একজন বুড়ামতন লোক উঠল। লাল গেজি হাক প্যান্ট পরা একটা ছোকরা সঙ্গে রয়েছে। ওরা দুজনে লেভিল্পীঠে বলল। বুড়া লোকটি আগে বোধহয় পুরুতের কাজ করতেন এখন বিটাগার করেছেন। কোন পুথানো বহমান বাড়ী হতে Call এল এনও মাঝে মধ্যে attend করতে করেন। সময়ক বকবারটাই বহন সকলেই শুখন কি আর করা যাবে!

ফার্নোভেড ঠপ্পল হতে এককোড়া দ্বাদী স্ত্রী উঠল। হাতে গোলাপের বড় একটা তোড়া। দ্বাদী কণার দ্বিবে তোড়াটাকে বুড়ে বহল স্ত্রী হুতো নিয়ে বাঁধতে লাগল। বউটাকে কেমন বেন মিছানো দুর্ভব মতন বেন হল।

স্বামী কাম্বীওলাদের মত লম্বা চকড়া। একটা জ'হরেল
বোঝে আছে। বোধ হয় কোন অকিঞ্চিৎকর মনস্কামনে
গোলাপমূল উপহার দিয়ে কাল বাগাবার মতলব আছে।
বউটাকে নিয়ে যাচ্ছে তোষাশোষণ করতে যাতে
আরও দুবিধে হয়। পকেটের অংগা বোধ হয় আমায়ই
মত। কনডাক্টর ওদের কাছে গিয়ে টিকিট চাইল না।
অন্তমতঃ হয়ে গোলাপ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।
অকণ্ঠে খুব ফুল ভালবাসত। অবশ্য রক্তনীপঙ্কটাই ও
বেশী লাইক করত। ও এখন আমেরিকাতে রয়েছে,
হাত এই বছরের শেষের দিকে কিয়ালও ফিরতে পারে।
পঞ্চদশ ওর একটা চিঠি পেয়েছি। 'তোষাকে ভালবাসি
কি না জানিনা, যেমন জানিনা আমি নিজেও ভালবাসি
কি না। আমরা সবলেই তো আগলে নাসিগানবানী।
আজকে এখানে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম রঙটা
খুব নীল, কিন্তু ভালবাসার রঙটা কি? বেগুন? নরক?
লাল? হলুদ?.....'

ট্রাম লাইনের ধারে একটা ক্যাকটাস উপড়ে কে ফেল
দিয়ে গেছে। ক্যাকটাসটার গায়ে রাহি বসছে। বীথেন
সাম্রাজ্য মাঝা পেছে। একটা বোটা লোক রিকশা করে
যাচ্ছে। খুব হাসিখুশী। সন্ধ্যের বাজারের খলোটাও খুব
মোটা। লোকটা বোধ হয় বোলগোবিন্দবাবুর মতই খুব
তোতলপ্রিয়।

মেজদার হোকান বন্ধ। বাড়ি কিং এলাব। পঞ্চম
মাসিক রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেবাঙ্কিলেন। ছোকরা
জাহাঙ্গীরটা কাল করতে করতে কিছুক্ষণ শুনল, পরে আবার
দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কাল অকিয়ে একটা জোব
মিটিং হয়ে গেছে। বার ত'রিখ হতে strike হবে কি না
টিক বোকা যাচ্ছে না। অবশ্য কোন কিছুতেই কিছু
হয় আসে না। পীডায়গুলো তো শেষ অবধি তলে তলে
মালিকপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভোঁরাবই। রক্তনীতির
বাবদটা আকাল বেশ ভালই চলছে। গরম গরম
লেকচার বেড়ে লোককে বোকা বানাও। বা হয় একটা
আন্দোলন বা strike বাগাও। ভেতরে ভেতরে মালিকের
সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের মাথের গুড়িয়ে নাও। পরে
রঙকা মাসিক কাছাকাছি করে আন্দোলনটা বানচাল করে
দাও। বাস, তুমি একটা মজা বড় পীডায় হয়ে গেলে।

হাতে তোমার একফোঁটা জলও লাগল না, বাছও বধা
হল। তোমার লজ্জাপনায় কেউ গলেহ করতে না। মনের
অন্ত বাতলরতা তোমার লাগতে ভাগ চাইলে বেচিয়ে এসে
একটা মজুন হল তৈরী করে নাও। ব্যাপারটা ঠিক
অনেকটা ভালারে বেয়েছেলের মতই। বোধ হয় তা'রা
চাইতেও খাবার। আসল ব্যাপারটা ওদের কাছে কিনে
আগেই বহুই পরিষ্কার তাই ওরা লজ্জাপনায় দেখায় না
হেনানীও হবে না।

কদিন ধরে খুব ভগোটা চলছে। আকাশে বেধ জমে
রয়েছে বৃষ্টি হবে কি না কে জানে। না হলই ভাল।
কলকাতা শহরে একটু আর্দ্র সৌখিন বৃষ্টি চলতে পারে,
বেশী বৃষ্টি হলই মজা। ঠাকুরন ঘরের মধ্যেই অধিষ্ঠিত
হয়ে বিরাম করতে থাকবেন।

পাড়টা মজা নয়। চকড়া রাস্তাটা বানিকটা সোজা
গিয়ে ঘুরে পার্কের দিকে চলে গেছে। টকটকে লাল
শাড়ী পরা একটা মেয়ে কাল রঙের একটা ব্যাগ হুড়িতে
বোলাতে বোলাতে এদিক পানে আসছে। আরও কাছে
এগিয়ে এসে মেয়েটা। পাশের বাড়ীর দরজায় এসে বেশ
খান্নাতে হুহ করল। ওপরে বাজান্নার দিকে তাকাল
একবার। চোখটা নাহিরে ঘুঁটা ঘুঁড়িয়ে নিল। পাশের
বাড়ির দুখুঁজোদের বড় মেয়ে অনীতা। সপ্তাধনিক হল
বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে অবশ্য নিয়মাসিক প্রেইটেন-
গুলো সেয়ে নিয়েছে। এখন মাথার চকড়া করে একরাশ
শিঁদুর। একটা পুরুষের সঙ্গে permanently গুঁর ব্যবস্থা
হয়ে গেছে তারই বিজ্ঞাপন। বিয়ের আগে খুব ডািগিপাল
ছিল। "আজুচোখে রাখে রাখে তাকাত। এখন আর
তাকাবে না। আচ্ছা, ব্যাপারটার মানেটা কি? একজোড়া
ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকবে তার মত মত বায়েলা করবার
ঘরকারটা কোথায়? স্ত্রীপুত্র লোককে দেহম্বর করে
ডেকে আন বাড়িতে, একখান টাকা খরচা করে বাঁপি
শানাই ঘটা বাজাও, পুরুত এসে খোঁবার মালুম কি মজার
পড়ে; "হবেস্তর ছব্বা তব, তব্বা ছব্বা মন, ববিৎ
ছব্বা মন, তব্বা ছব্বা তব।" ব্যাপারটা হল যে দুজনে
একসঙ্গে থাকবে তাদের বিবাহ। দুটো ছেলেমেয়েকে অর্থাৎ
একজন লোক বানিকটা ফুল বিহীনপ্রিয় ছিটিয়ে সারা
জীবনের মত একেবারে সিনেট দিয়ে বেগালুম জুড়ে থেবে।

পাশাপাশি Registerও তার খাতোগল্লব বগলদ্বারা করে
বসবাবে হাছির। চুরকর ব্যাপার একদাথেই চলবে।
কায়বায়টা মন্ড নয়। যেমন বর দুইশীর্ষ মাংস রেখে উত্তরনে
গোধের নিকরে। নতরা হল তারপর তাকে বন্ধন্যে বিধবার
হস্তিত্ব রূপা যায়। কোন অস্থিরেই নেই। আসল
ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে গিরে গোবর। জোবার
হুবিবেশত কাছে লাগাতে পাথলেই হল।

বিদ্যা ১৭ চাইরের ওপর অত বড় বড় নজা করে কি
লাভ? লাল হলধে মধুখ নীল কোন রঙের কবিতা নেই।
এত বড় চাইবটা কিনেছিলাহ কোন? এটা তো ভবল
বেতের চাইব, অমিত বোধ কাল বদলিল ভাল একটা
চাকরী পেলে অরণ্য আমেরিকাতেই হয়ত খেতে যেতে
পাবে। চিঠিতে লেইকমই লিখেছে ভকে। I am
begining to forget you like you forget me
.....মন্ড মাংসনা জীর রীতল। অরণ্যর একটা Mini
Radio ছিল। জাবে হাতের এক কোণে বসে বাজত।
টেকো ব্যাচেলার বুড়োটা সব লম্বরে ওর কাছে হাছির
মন্ড বলে থাকত।

সন্ধ্যাবেলা জবানীপুরে হারামাঙ্গের বাড়িতে গিয়ে-
ছিলার। তারারাম বাড়ি ছিলনা। ওর বউ বলল
জনাঅরক বন্ধুর লাক্ষে খেবিরেছে। বোবহুই কোন
Bar-এ গেছে মাল খেতে। drink করলে খউ তার-
রামকে কাছে ভেতে ফেরনা লেই জুয়েই তারারাম আখও
বেশী করে মাল খায়।

টাবে বলে বেজার ভীড়। খানিকটা হাটলে মন্ড হয়
না। আন্ততোষ কলেকের বেওয়ারে একগাখা শোটার
মাথা রয়েছে। লাল আঙন দিকে দিকে ছড়িয়ে বাত।
এমন ইতলিই ইন তেনিস। অর্ধনরা উমিলা ঠাকুর।
অব্যাহাঙ্গীরা বলে ওরবিলা ঠোঁগোষ। কিসের আঙন,
কেনই বা আঙন, কোখায় বা ছড়িয়ে যেওয়া হবে? লকাল-
বেলার কাগজে পড়ছিলার কোখাকার ইউনিভার্সিটিতে
ছাত্রী নাকি বেয়াও করে প্রকেশ্যবধের বেথড়ক ঠেঁপিয়েছে
-ত টেবিল চোবর ভেঙে জায়াব বেলে দিচ্ছে। বিবের পর
উমিলা নাকি কোখাকার মহাচাপী হয়ে গেছে। কে
জানে? লেবাসবনের বেয়ালে বেয়ালে লাল জিকোপের

মহিমা প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। পনের পরমা। মাত্র পনের
পরমার জন-সংখ্যা বৃদ্ধি যোগ করবার কষতা হাতের
মুঠোর ভেতরে এনে বেওয়া হয়েছে।

হাজরা হোস্তের কাছাকাছি আলভেই বৃষ্টি নাহল।
দাঁড়ান দাক খানিকক্ষণ। বনলতা বিশদীর মাথনে একটা
জুকাওলাকে খিবে কতরঙলো। সেবে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে
হৈ টেট করছে। জুকা খাচ্ছে। একটা বেওয়ারিণ ব্যাঙ
ওসেব কাছে দাঁড়িয়ে জাবর কাটিছে। চোখের দুটী
দার্শনিকের মত উঠান। পেটটা গোবর জালবরক ভক্তি
আছে। পংখ পংখ তেলেভাঙা জাম্বয়ে একজন। গিয়াজী
আলুর চশ, বেত্তনি। লোওটার মূখে একগাখা ব্রণ
হয়েছে। মাক মাক এক আখবার ব্রণওলা চুলকে
নিচ্ছে। জীচাপাকা বাবদি চুলওলা একজন লোক গোটী-
কয়েক বেত্তনি কিনল। পরণে আখমলা পাভারী।
বেত্তনি খেতে খেতে বোলাটে ওপর ভেতর দিগে বেথানে
যেয়েওলা জুকা খাচ্ছে দেখিক পানে ভাটিয়ে হটল।

জল বাষবার কোন নয় নেই। মনে হচ্ছে মাধারাত
চলবে। টায় বাল সব বড় হয়ে গেছে। দুজন ট্যান্ডি-
ওলাকে পাকড়ালু। একজন মাঝে না বলে ভাগিয়ে
ছিল। অপবতন গড়িয়াহাট যেতে আটটাকা ঠাকল।
বনলতা বিশদী হলে একজন জন্তলোক বেথিয়ে এসে
ট্যান্ডিওলাকে খুব অহুন্ন করতে শুরু করলেন তাকে
বিক্রিশুখ পৌছে দেবার জন্তে। ট্যান্ডিওল পনের টাকা
বলল। জন্তলোক আবার অহুন্ন করতে লাগলেন ভাড়াটা।
কিছু কষাবার জন্তে। জন্তলোক অহুই ছেলেকে নিয়ে
ভাড়াখানায় এসেছিলেন, বৃষ্টিতে ভিকলে ছেলেটীও হয়ত
নিমোনিয়াও হতে পারে। পাভারী ছাইভাখি খুব কুখসিত
ভাবে হালতে হালতে মাথা নাকতে লাগল। পাভারি খেতে
কোনকাতার এসেছে পরমা বোজগাব করতে, তোমার
ছেলে নিমোনিয়া হয়ে বলল কি ওর গাড়ি চাপা পড়ে মরল
ভাতে ওর ভাতি মরে গেল।

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। এগোন
দাক। জল জেতে খানিকক্ষণ হাটলার। মন্ড লাগছে
না। খানিক পরেই অবস্ত বিরক্তি ধবে গেল। লেক
মার্কটের কাছে এসে একটা রিক্সাওলাকে পাকড়ালু।
ও গড়িয়াহাট পৌছে বিতে বাজী হল। চাই টাক।

লাগবে। অ'র'র হয়ে বিবস্যাণা জল ভেঙে ভিজেতে ভিজতে চলল।

চারদিকে এককোমর জল। গাভিগুলো সব বহা জানোয়ারের মত ছুঁড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে ওদিকে পড়ে আছে। মাকে মাকে এক আঁধা ডাল জেকার বাস মাকে আর প্রাণ ঢেঁটে উঠছে। লোমনাথ হামির মেথতে গিঠে-ছিল'র বখন, তখন Arabian Sea-র ঢেঁটে লেগেছিল। Lansdowne-এর মোড়ে দোঁধ Traffic Control কববার আলোগুলো আপন মনেই জলছে নিভছে। জলেই তোড়ে সব আইনকাছন ভেসে গেছে। ভাঙার জলের ঢেঁটেতে লাল নীল হলধর আলোগুলোর Reflexion দেখতে বেশ ভালই লাগছে। অসুত অসুত নানা বসন্তের Shape ঠৈঠি হাঙ্ক আবার পরস্পর ঠাই ভেঙে যাচ্ছে।

লোকটা সব কোমর অবধি কাপড় গুটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। মেয়েটাও কাপড় গুটিয়ে জল ভেঙে চলেছে। ওদের ঘেঁষে ঘেঁষে ফর্স জায়গাগুলো একটু আঁটু দেখা যাচ্ছে। মাকে মাকে ওরা কাপড় টেনেটেনে এদিক ওদিক ঢাকবার চেষ্টা করছে। অস্ত্র সব মেয়েই ফর্স। নর। একটা ডবল ভকার বাস চলে গেল। প্রাণ ঢেঁটে উঠল। ঢেঁটগুলো এসে মেয়েদের ফর্স ভেঙতে হাঙ্ক দিতে লাগল। একজন বুনী মেয়ে তার সঙ্গী কাঁধে হাত দিয়ে লা'করে লা'কিয়ে Balance করতে লাগল। সোমার উত্তর গড়নও খুব হালদ। ওর শরীরটা খুব Proportionate, হাক্সন Sexy figure ওর। কবে আবার ওর লস্ক দেখা হবে কে জানে? লস্কাল সোমার আগার কথা ছিল। অ'সেনি। চন্দননগর থেকে ডেলি প্যাগেজারী করে ও। ওর বুকোর মধ্যে খুব ডুবিয়ে শরে থাকতে ভাল লাগে। আমা'র ক'কা পিঠের ওপর হুন্স হাতগুলো দিয়ে জড়িয়ে রাখে ও। মনে হয় Arabian Sea-র ঢেঁটগুলো অ'মাকে নিয়ে লোকালু'কে খেলেছে।

I am not a queen, I am a woman ইহানীং বাণের চাইতেও বেশী নাথ করে খেলেছে নানী' সিঁদা'। আমেরিকাতে ওর বেকার্ডের লাক্স sale...

অ'স'র আরও গোটা'করক' ডিক্সি দরকার। সেই-জন্তেই ও আমেরিকার গেছে বিদেশ থেকে ডিক্সি আনতে লাগলে ও বোধহয় আরও অনেক টাকা হোজগার করতে

পারবে। এখানে ডাক্তারী করে ও যা হোজগার করছিল তাতে বাধহয় ওর মন ভগছিল না। আসলে কোর্নিকু-তেই কাক'র কোর্নিকিন বোধহয় মন ভরে না।

একরান মেঘ মনে বয়েছে অ'স'র আকাশে। কত-বড় বিরাট আকাশ। তাকাতোলা সব মেয়ের আঁড়ালে কোথায় হামিরে গেছে কে জানে? কত গোটি বহর আগে ওই ভাষাগুলো বেঁচে ছিল হামির আলো আ'ক পৃথিবীর মাছের চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে। আচ্ছা, প্রত্যক্ষ বহর কত?

কোথার যেন পড়েছিল'র লম্বের লস্ক লস্ক মাছের সক্রিয় অবস্থানগুলো জীর্ণ হয়ে জী ম থেকে একদিন করে বায় কিস্তি লজ্জাকারের আবেগ জিনিষটা কোনদিনই হবে না। হতেও পারে ইয়া। সব কিছুই তো এই বসন্তই অবর্তনন-এক থেকে থাকা বা বোকা অসম্ভব। কত ও অ'স'র লম্বের লস্ক এক নয় নিশ্চয়ই। মাছের বেশ নিজে কাটাছেঁড়া করে অ'স'র, সোমার হুন্স মেহী' নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে আমা'র। আবেগটাই বা কি মনটাই বা কোথায়? এক ধরনের গাছ আছে যা মাঠ থেকে মাঠে ভেসে চলে বেড়ায়। কলের কুক লাল নীল হলধর আলোগুলো চিন্তার চৌহুরী Abstract ছবিগুলোর মতই নানারকম Shape হচ্ছে। পরস্পর ঠাই সব ভেঙে চুঁসবার হয়ে যাচ্ছে।

বহরানগুলো চারদিকে সব জলে হয়ে পড়ে বয়েছে। অ'সি কাঠের তৈরি জীর্ণ এক ভেগার জেলে বৈভবনী-পার হচ্ছে। আচ্ছা, বৈভবনীটা কোথায়; ওপায়ে কি আছে; নাকি সবটাই গিলাখুরী মাপার? সিঁদা'টে বহর ম। কালি রায়ে অ'স'র একটা লম্বের বহর দেখছি। আমা'র চাংজন লোক বিলে একটা বসন্ত'র ওপর দিয়ে ধোঁড়ে চলেছি। একটা বসন্ত নিয়ে চলেছি পোড়াবার জন্তে। বসন্তটা কার কে জানে? অনেক খুব হতে খুব হো'ব একটা ডিকটিক আওয়াজ ভেসে পাগেছে। কোথাও বোধহয় একটা বসন্ত টাইমলি বড়ি আছে। হতে পারে। কটা বাজল দেখবার জন্তে বাঁহাটটা ফুলে ঠিঙাটোটা দিকে তাকান। আচ্ছা মুখিল, বড়িটা একটাও কীটা নেই। হতান হয়ে অ'স'র দিকে তাকা-

লম্ব কটা বাজল জানবার জন্তে। কি আশ্চর্য! আশাধর
সবাইয়ের চেহারা এই একই বসবস। কোন তরুণ নাই।
আমি একাই চাইবন লোক কখন হলো? ইতিমধ্যে
আমরা সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেলাম। বাড়িঘাট নাথিকে
থাকল। একটা লম্বা চাঁদর দিয়ে মড়াটার পা হতে
মাথা আঁধি ঢাকা রয়েছে। আমরা পরাম্পরের দিকে
তাকালাম। চ'রম্বনেই একদমে চীৎকার করে বললাম
King Save the God.....আমি আমার বাকি
তিনজনকে বললাম কাঠ বোগাড় করে আনতে। ওরা
সমুদ্রের দিকে নেবে চলে গেল। আমি একাই মড়াটার
পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বইলাম অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ।
সময়টা হাত না চিন ষ্টিক বোকা যাচ্ছে না। ওগা আর
কেউ কিং এল না। আমি ষ্টিক কলমার বাড়িগাতে
আঙল লাগিয়ে দিলেই হবে। বাড়িঘার অ'গু'নেই মড়াটাকে
পোড়ান হবে। একটা সিগারেট বের করে ঠাঁটেব
কাঁকে গেলো বললাম। পকেট হতে লাইটার বের করে
ধরলাম সিগারেটটা। লাইটারটা বেতালম্ব না। এটা
দিয়েই মুদ্রাটটা লেবে নেওয়া যা'। এ'গিয়ে এসে
মড়ার খুব হতে চাবখটা খুলে ফেললাম। কি আশ্চর্য!
এ যে আমি! কখন হাতা গিয়েছিলার জানতেই পারিনি।
মড়াটাও আমার দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে আমার
খুব হতে সিগারেটটা কেড়ে নিল। খুব আশ্চর্য করে

আমার সিগারেটটা টানতে লাগল ও। আমার খুব ব্যপ
হতে লাগল। সকলবেলায় অন্তিকটে বিদ্রো পানওলাটার
কাছ থেকে এক প্যাংকট পেয়েছিলাম। তাও প্রায়
ডাল দাম দিতে হয়েছিল। বাজারের সমর প্রত্যেক
বছরেই পানওলাবা সিগারেট লুকিয়ে খেয়ে থাকে বিক্রি
করে। আমার মড়াটাকে আমি বাড়ি বের টেনে তুললাম।
ও আমাকে বেশে ধরে আমার পকেট হতে সব সিগারেট-
গুলো নিয়ে নিল। টানতে টানতে আমাকে সমুদ্রের
ধ'রে 'নরে এসে এক হাতা মেঝে জলে ফেল দিল।
সমুদ্রের জলটা ভরানক ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা জলে বেশীক্ষণ
থাকলে আমার নিমোনিয়া হতে পারে। হাত পা দু'হাতে
লাগলাম ওপরে ওঠবার জন্তে। তলিরে বেতে লাগলাম;
অনেক নিচে, নিচে, আরও নিচে.....বাপাঘাট ষ্টিক
বোকা যাচ্ছে না। আমার কিরকর জাবে চলা উচিত
সমস্ত বাপাঘাটই কেমন যেন গেলেমেলে ও অবতীর্ণ।
বেছর বলে বেঁচে থাকটা না কি একটা সমর বাপাঘাট।
আমার তো উন্টো মনে হয়। যবে বা'গাটাই সবাইতে
মজার বাপাঘাট।

দরুৎগে হাত, মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নাই।
আমরা নিজেগাই আমি না কোনটা লাল কোনটা কালো।
পাইকিবি হারে সব Colour Blind হয়ে গেছি আমরা
খোববহ!



স্বাধীনতা

মুক্তমন্ত্রাসভা

বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মুক্তমন্ত্রাসভা প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগ আসন হরণ করিলেও কে মুখ্যমন্ত্রী হইবেন তাহা লইয়া সংসদগণের মধ্যে ৮ দিন তর্কিতা কথা কাটাকাটি হইয়াছে। মুক্তমন্ত্রাসভা যেটি সনাতন এবং মতো ৮০ জন বার কমান্ডি হ'ল। সেজন্য বাহকমান্ডি নেতা ত্রিভোক্তি বহু মুখ্যমন্ত্রীর পর পাইবার দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সংসদের সভ্যসভায় পূর্ববর্তের মুখ্যমন্ত্রী অমরকুমার মুখোপাধ্যায়কেই মুখ্যমন্ত্রীর পর বেওয়া হইয়াছে। অমর ত্রিভোক্তি বহু উপ মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। নিম্ন মন্ত্রিসভার নাম প্রধান করা হইল। আরও কয়েকজনকে মন্ত্রী করা হইবে তাহাদের নাম এখনও স্থির হয় নাই। নাম ঠিক হইলে মুখ্যমন্ত্রী তাহাদের দপ্তর ঠিক করিয়া দিবেন। মন্ত্রীদের নাম—

(১) অমরকুমার মুখোপাধ্যায়—মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ, বাণিজ্য (আর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠা), পশুপালন এবং সমাজ শিক্ষা।

(২) ত্রিভোক্তি বহু—মহাকর্ষী মুখ্যমন্ত্রী, বাণিজ্য (সংবিধান, নির্বাচন, সেশাল, প্রদান, পুলিশ এবং প্রেস)।

(৩) ত্রিভোক্তি কোচা—জমি ও জমি-স্বত্ব।

(৪) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—উৎস পুনর্বাসন এবং জেল।

(৫) ত্রিভোক্তি বহু—শিক্ষা। (৬) জনাব আব-উল হক—বাণিজ্য (সামান্য)। (৭) ত্রিভোক্তি সেন বহু—সংসদ। (৮) জনাব গোলাপ ইয়াতহানি—বাণিজ্য (সামান্য) এবং অসামান্য প্রতিষ্ঠা)।

(৯) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—আবাসিক। (১০) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—সামান্য-উৎস। (১১) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—বন। (১২) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—আবাসিক ও শিল্প, আয়ো-

জনসভা কর্তৃপক্ষের দপ্তর। (১৩) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—আবাসিক, পরিচালনা ও উৎস এবং গৃহ। (১৪) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—সেবা ও সলফ এবং জমি বিভাগের পুষ্টি, জমি, উৎস এবং পশু ইতিপেশন। (১৫) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—সমাজ ও সমাজ কল্যাণ। (১৬) জনাব আব-উল হক—জমি—জমি। (১৭) জনাব কানাইলাল ভট্টাচার্য—জমি। (১৮) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—জমি ও জমি। (১৯) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—আইন ও আইন প্রদান। (২০) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—অর্থ, (২১) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—সামান্য বিষয় ও জমি হইল। (২২) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—আবাসিক। (২৩) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—পুষ্টি। (২৪) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—মহাকর্ষী ও মহাকর্ষী উৎসের হাটবন্দী। (২৫) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—পুষ্টি। (২৬) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—উৎস ও উপজাতি উৎস। (২৭) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—উৎস ও জনসংযোগ। (২৮) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—আবাসিক। (২৯) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—জমি (হাটবন্দী)। (৩০) ত্রিভোক্তি সেনগুপ্ত—পুষ্টি (হাটবন্দী)।

স্বাধীনতা পক্ষের মুক্তমন্ত্রাসভা—

পশ্চিমবঙ্গের আইন তৈয়ারীর ক্ষমতা হইতে সভা আছে। (১) প্রাথমিকভাবে তাহা নির্বাচিত ২০ জন সভ্য দ্বারা গঠিত বিধান সভা এবং (২) বিশেষ নির্বাচকসমূহের দ্বারা নির্বাচিত ৬০ জন সভ্য লইয়া গঠিত বিধান পরিষদ। এখানকার সভ্য মুক্তমন্ত্রাসভার সভ্য সংখ্যা অধিক। আরও বিশেষ পরিষদের অধ্যক্ষের সংখ্যা অধিক। এখানকার বিধান সভার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বিধান পরিষদ তাহা পূরণ হইয়াছে না করিয়া যে অংশে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই অংশটি বর্জন করিয়া বাকী অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

বাগীচের পথ নুতন সংবিধান প্রচলিত লখন করে এইজন্য শোচনীয় ঘটনা ঘটে আর না ঘটবে এইজন্য ঘটনা পূর্বে আর হয় নাই। কাজেই বৃক্ক-বট তার ব্যতীত।

বল ইতিহাসে নুতন নজীর সৃষ্টি করিয়াছে।

শিশুশ্রদ্ধা—

কলিকাতা স্বামিনগরীর জনজীবন প্রায়ই নানা স্বকম গণযোগ ও বিশৃঙ্খলার বিপরীত হইয়া পড়িতেছে।

সত এই এপ্রিল ববিবার সন্ধ্যায় বন্ধিন কলিকাতায় স্বীয়স্বপ্নবোধের টেডিয়াবে একটি “ওলফা” উপলক্ষ্য করিয়া বিরাট হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ও জলি চালাইতে হইয়াছে এবং প্রাণহানিক হইয়াছে।

এই অস্থানবোধ ব্যবস্থাপনার নানাব্যকম ত্রুটি বিদ্যুতি থাকতেই নাকি সমবেত জনতা আরম্ভ হইয়া উঠে। ইট-পাটকেল নিক্ষেপ হয়, চোখের প্রভুতি ভাঙা হয় এবং অগ্নি সংযোগও করা হয়। ব’ল্লেব একটি সবকারী বাস জখ্মীকৃত হয় এবং কয়েকটি প্রাইভেট-মোটর গাড়ীও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পল্লীরপের মহিলাবাও দুই-লোকের ঘাটা নানাভাবে লাহিতা হন।

সমীচের জলসা উপলক্ষ্যে একজন বিশৃঙ্খলা ঘট। অত্যন্ত পরিতোষের বিষয়। জলসা উপলক্ষ্যে বিশৃঙ্খলা একজন জ্ঞানিক না হইলেও, আরো কয়েকজনেরও ঘটনা হইয়াছে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পল্লিবন্ধ সবকারী ও পুলিশ বিভাগকে আতঙ্কের অস্থানবোধ তাঁরা বেশী দুঃস্থানে এই বহুপের জলসা অস্থানবোধ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেন। এ বহুপের অস্থান কলিকাতায় এখন আর না হওয়াই বাছনীয়।

গত ৮ই এপ্রিল, কানিশ্বর “গান্ এও সেল্ ফ্যাউরী”তে আর একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। এখানে ফ্যাউরীর পোতের ভলিতে কিছু ক’রী হতাহত হইয়াছে। এর প্রতিবাদে ১০ই এপ্রিল সাবা বাগ্গার ধর্মঘট পালিত হয়।

কিছু দিন পূর্বে দুর্গাপুর টীল ফ্যাউরীতেও ভলি বর্ধনের জন্য কিছু লোক অগ্নি হতাহত হইয়াছিল।

এইসব শোচনীয় ঘটনার তত্ত্ব হওয়া উচিত এবং কল্লুশক, পুলিশ ও সরকারের উচিত দরুণের ব্যবস্থা অব-

এব ওপর ছাত্র-অধ্যাপকিতা সাগিরাই বহিয়াছে।

বেশ কয়েক মাল ধরিয়া কলিকাতা শহরে বিব বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রের নানা অভাব অভিযোগ লইয়া শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করিতে দেখা গাইতেছে। কয়েকজন পূর্ব একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ছাত্ররা ঘরে খোঁজাও করিলে নুতন উপাচার্য স্নানতোন পেন পুলিশ ডাকিতে বাধ্য হন। তখন জনসংখ্যার পুষ্টিগের অধ্যাপকের মত পুষ্টিগের ওপর যে ব্যয়োগ করে। গত ১০ই মার্চ উপাচার্য আবার এক-বল ছাত্র কর্তৃক নিহত হইয়া ৮ ঘট। দেখাও হন। তাঁহার লগে কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। অধ্যাপকের অধিক সংখ্যক ছাত্র উপাচার্যকে উদ্ধার করিতে আসিলে দুইশক্রে ভীষণ হাঙ্গামা হয়। উপাচার্য ও অধ্যাপকরা ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হইয়া দুর্ভাগ্যভাগ্য করেন বটে, কিন্তু সংঘর্ষের সময় কক্ষ যায় নাকর একজন যুগ পথে নিহত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় আড়াই এক টাকা কামের সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

এখানে পুলিশ কোনরূপ প্রত্যক্ষণ করে নাই—দুই-মাসিয়া সব দেখিয়াছে ছাত্র। পরদিন ১০ই মার্চ একজন ছাত্র নিহত হইয়া কলি হাউসে গাইয়া কলি হাউসের মহাশিত কয়েক হাজার টাকা সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে এবং কর্তব্যচারীদের হারহোর করিয়াছে। সকলেই জানে কলি হাউস একটি খাব বের বোতল। ছাত্রবাই তথায় বেশী সংখ্যায় গাইয়া থাকে। বোতলটি একটি সমবার শহিত কর্তৃক পরিতালিত। বোতলনের কর্তব্যচারী সকলেই সমবারের সদয়।

যাহাই হউক না কেন বোতলটি তদন্ত করা বোন কার্য দেখা যায় না। নিহত কক্ষ রয়েছে সব লইয়া ১০ই তারিখে কলিকাতার বাগ্গাশে মিছিল করা হয়। কলিকাতার প্রায় সবল ছুল, কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং বি, এম, সি প্রথম অংশের পরীক্ষার পাঁচটি কেন্দ্রের পরীক্ষা ভর্তুক হইয়া গিয়াছে।

তদা যায় ছাত্ররা এখন কয়েকটি প্রাণনৈতিক বলে

বিভক্ত এবং তাহাদের ফলাফলটি এই সকল গণপোলের কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। গণপোলের ফল একদিকে নিম্নীচ চাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং অপর দিকে 'ককি হাউস' বোকারের দ্বিতীয় কর্মচারীদের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। যুক্তরাজ্যের নতুন মালিকগণ গঠনের পর পদক্ষেপ এই ছাত্র-চাকরাণী অস্ত্রের পরিচালনা বিষয়।

যাযাবুর বিশ্ববিভাগেরও একজন ছাত্রের গণপোলের ফলে সেখানকার কাজকর্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উপাচার্য প্রবীণ শিক্ষারতী প্রিয়দত্ত গুহ পরভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাস্তি-ক্ষমার ক্ষমতা পুলিশ চাকরাণীরাই নহে। একদিকে একথা যেমন সত্য, অন্যদিকে ছাত্রেরও এমন কিছু কথা উচিত নহে যাহাতে কর্তৃপক্ষ পুলিশ চাকরিতে বাধ্য হন। এই উভয় দৃষ্টান্তের মধ্যে কোনমতই পরিচালনা করা বর্তমানে একজন অনন্ত হইয়া পড়িতেছে।

মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহারকে উৎসাহিত করা—

খ্যাতনামা ব্যাচিটার ও রাজনৈতিক নেতা শ্রীমোহন কান্ত আচার্য কলিকাতা হাইকোর্টের নতুন এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। পুরাতন এডভোকেট জেনারেল শ্রীমদীন্দ্র চন্দ্র বসু পরভাগ করার উপর খানি হইয়াছিল। মোহন কান্ত বসু মনসিংহের মহারাজ নবীকান্ত আচার্য মহাপুত্রের অন্ততম পুত্র।

ভিত্তি মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষা—

বিষয় দিঃ কবে ও কি ভাবে নৌকার চড়িয়া সমুদ্রে পাড়ি দিয়া 'বেলায় লড়া জয়' করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস সাহসে আজ স্মৃতি গিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষের দুই সাংসদী বৃন্দ জর্জ এলবার্ট ডিউক ও পিনাকী চট্টোপাধ্যায় গত ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে একখানি ভিত্তি নৌকার যাত্রা করিয়া বিশাল সমুদ্রে পাড় বাহিয়া তেজিগ দিলে এই সার্ভ সুবাহার সন্ধ্যায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 'লাওকল' দীপে নামে। পরাকা উত্তোলন করিয়াছেন।

দুইজনই সাধারণ ধর্মের ভাষ্যপট্টে ছেলে, তাহাদের এই ভ্রমারমিত অভিযান ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যুগ্ম করিল। এদেশের ছেলেরা বিশেষ করিয়া বাঙালী ছেলেদের আজ যে বহুগুণায়িত অসীম সাহসিকতার, বিশাল

দীর্ঘাও অসাধারণ বৈদ্যের পরিচর দিতেছে তাহা পিনাকীর ভাষায় সার্থকতার স্মৃতি করিল। আশ্রয় এই তরুণ-ধর্মের অভিমতন জানাই এবং প্রার্থনা করি ভারতীয় তরুণের বল জীবনের সকল ক্ষেত্রে এইভাবে সাফল্য অর্জন করিবে ডিউক ও পিনাকীর যত নতুন ইতিহাস স্মৃতি করিবে।

পূর্বপাকিস্তান কি পূর্বপাক হইবে—

শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানের নেতা। সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তানের সহিত পশ্চিম পাকিস্তানের যে বিরোধ চলিতেছিল তাহা লইয়া, পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসীরা বাংলা ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি প্রভৃতি চারটি, উপপ্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে। এইসকল পূর্বপাকিস্তানের নেতা মুজিবুর রহমান সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে গঠন করা হউক। ইহার বহু কারণ বর্তমান।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম হইতে বহু লোক পূর্বপাকিস্তানে আনিয়া চাকরী, ব্যবসা প্রভৃতির সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। আবার পূর্বপাকিস্তানের সহিত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্র হইতে কড়া আইন উঠাই দওয়ার পূর্বপাকিস্তানের দ্বিতীয় জনসাধারণ নানাক্রমে অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেছে। একই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও নানা অসুবিধা হইতে বঞ্চিত আছে। কাজেই পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসীরা রহমান সাহেবের প্রস্তাবটি সাগ্রহে স্বর্থন করিবে।

শ্রীমুখ্যমন্ত্রীর নতুন আলিঙ্গন—

গত ৩য় দশমবার বর্ধমান জেলায় কোগ্রামে কবি শ্রীমুখ্যমন্ত্রীর স্মৃতি ৮৭ বৎসর বয়সে পদার্থের বেশে বহু দূরী তাহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে সর্জন্য জানাইয়া আনিয়াছেন। কোগ্রাম বর্ধমান পথ হইতে ২৫ মাইল দূরে অজয় ও কুনাব নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত। মুখ্যমন্ত্রীর কবন পদ্যে বাস করেন নাই। সাধা জীবন চৈতন্যময় প্রণেতা কবি সোচন সাহেব

শক্তি বিচক্ষিত নিজ পৈতৃক বাড়ীতে বাস করিতেছেন।
পথ পূৰ্ণ হইলেও ভয় দিনের উৎসবে তাঁহার গৃহে বিশেষ
লোক লহাশয় হইয়াছিল। লহাশয় অতিবিশিষ্ট যেমন
কবিকে নানা উপহাৰে সম্বৰ্দ্ধনা করিয়াছেন কবিও তেমনি
লহাশয়ে ভূষিতোৰে আশীৰ্বাদিত করিয়াছেন। কবি
অন্যদিনে আশীৰ্বাদ কবি হইয়া শাস্তিময় জীবন কাটনা
করি।

শান্তিময় জীবন

অলপাইওড়িয়া বনী বাবদায়ী এবং দিল্লীর
লোক লহাশয় প্রাক্তন লহাশয় নজিবোবদন ঘোষ মহাপুৰ
গত ১২ই মার্চ ১৩ বৎসর বয়সে দিল্লীতে
পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ঐশ্বর্যমল ঘোষ
বর্তমানে লহাশয় লহাশয় এবং বেঙ্গল বিভাগের খবাই বন্দী।
ঘোষ পরিবার উক্ত বয়সে নানা সমস্যাটোনের সহিত
বৃদ্ধ থাকিয়া সেবাসীল প্রভা অক্ষয় করিয়াছেন।

কেমনে ভুলিব তাকে ?

ঐশ্বর্যমল গুন ভট্টাচার্য

(১)

আচক্ষিতে অলক্ষিতে নিইয় লহন,
করিল হরণ মোর জীবন রতন।
হৃদয় মানস ভনী, ছিল আশা তব করি,
কাল সিদ্ধি জলে হার হইল বগন,
ভেঙ্গে দিল বিবি মোর হৃদয় বগন।
তবু,

না মানে প্রবোধ ঘোষ এ অঘোষ মন,
পাইবারে বরণন হারানো রতন।
তাই আমি বুঝি তাহে, পথে পথে য হে যারে,
কষ্ট যেন করে তার বনি অধেবন,
যেতে চাই যেনা মোর বিবেচী নন্দন।

(২)

পথত নিশীথে যেমন পূর্ণ লহন,
হীংকের মত শোভে নীলাশর গায়;
তেমনি এ ভাষায়া অধরেতে অনিবার,
শোভিত কাষন্য যেন শরদিকু প্রাণ,
কিছু—আম লুপ্ত মোর মানস অঘর।

বিধানিষি তার শক্তি জাগিয়ে মনে,
লম্বুখে বিবাজিত যে প্রবক্তা লহ,
বিশ্বস্তির অঙ্ককারে কেমনে লুকাই তাহে,
কেমনে ভুলিব তার শক্তি অহুশম ?
জুড়ায় কেমনে অগো বিনা সে রতনে ?

কিশোর

জগৎ



পরীক্ষা প্রসঙ্গে

শ্রীজ্ঞান

প্রতি বৎসরই নানা রকম পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই প্রতি বৎসরই কোনও না কোনও পরীক্ষা বিতেও হয়। পরীক্ষা কি? 'পাশ' করলে বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানে "এমোশন" পায় বা মূল থেকে কলেজে প্রবেশের অহুমতি পায় বা আরও উচ্চতরের পরীক্ষা বিধে 'ভিত্তি' লাভ করে। এই সকল পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য সকল ছাত্র-ছাত্রীই জানে। সাধা বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীরা কি রকম পড়াশুনা করেছে তারই পরীক্ষা বা "টেস্ট"—তাই নয় কি? এই পরীক্ষা গ্রহণের রীতি বা ব্যবস্থা না থাকলে কি করে বোঝা যাবে যে ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা পড়াশুনা করেছে এবং ঠিক মত করেছে কি না। তাই সকল দেশেই শিক্ষার সকল স্তরেই

এই পরীক্ষা গ্রহণের রীতি চলে আসছে, তবে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির হেতুকে থাকতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা সকল দেশের ছাত্র-ছাত্রীকেই বিতে হয়—তা নইলে তো তাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, স্বধনশক্তি ও পার্যাপ্তক কি রকম পাঠ করেছে, তার কোনও মান বা standard ঠিক করা যাবে না, এবং ঠিক করতে না পারলে তাদের উচ্চ জ্ঞানে ওঠান বা 'ভিত্তি' দেওয়াও কি সম্ভব হবে? তোমরাই বল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা না করলে কি করে বোঝা যাবে যে তারা ঠিকমত পড়াশুনা করেছে? তাই সকল দেশেই ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকেই। আমাদের দেশেও এই পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চলে আসছে বহুকাল ধরে।

কিন্তু ইদানীং এই পতাকা বেগুটা এক শ্রেণীর ছাত্রদের
যেন টিক মনোহত হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। কারণ
প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ছাত্রেরা পতাকা গ্রহণের সময়
নানা রকম অসুস্থ্য অবলম্বন করছে তো বটেই
তা ছাড়াও পতাকার 'হল'-এ উচ্ছ্বল আচরণ
করে চেহারা টেনিগ ভাঙছে, পতাকা তুলুণ করে
ঝিঞ্জে, এমন কি গার্ডের উপরও হামলা করছে।
অসুস্থ্যভরণে অবতর বলা হয় পতাকার এর নাকি
'কঠিন' হয়েছে। কিন্তু পতাকার প্রশ্ন কি সব সময়
খুব সহজ করতে হবে যাতে পতাকার্তারা অন্যায়সে, অক্লেশে
সামগ্র্য হস্ত পড়েনা করেও উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে।
তা যদি হয় তাহলে পতাকা গ্রহণেরই বা দরকার কি,
আর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করবারই বা দরকার কি।
উপরন্তু মান বা standard অসুস্থ্য পড়াননা না করবেই
যদি পতাকা পাশের কৃত্তিক অর্জন করা চলে বা 'ডায়ী'
লাভের সম্ভাবনা লাভ করা যায়, তাহলে তো পাঠ্যগ্রন্থ ছাত্র-
ছাত্রী কেউই লেখাপড়া করতে চাইবে না, শুধু টাকা
দিয়ে "সার্টিফিকেট" কিনে নেবে।—তাই না? আর
যে সব বিভাগের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রকম ব্যবস্থা
চলবে সে সব শিক্ষাগতম থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী 'পাশ'
করে বেরিয়ে আসবে তাদের মধ্যে জনসামগ্র্যেরও এবং
অস্ত্রান্ত্র গ্রহণের বা বহির্বিদেশ লোকের কি ধারণা হবে।
—তাহলেই হে। লোকেরা কি এই সব ছাত্রদের বাইরা
হেবে, না দিকার হবে!

পুলিশ দিয়ে বা সত্ৰু বাড়ি দিয়ে এই সব দুঃসমনস্ক ও
লক্ষ্যাকর আচরণ নিবারণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র
তোমরাই,—যাদের সন্তুষ্টি আছে, বিবেচনা শক্তি আছে
—সেই রকম সং ও সাধু প্রকৃতির সত্যকার ছাত্ররাই
তারের বিপক্ষেরী সংগঠিতের সুবিধে, উপদেশ গিয়ে
এই সব আচরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে। তা যদি
তোমরা পার তাহলে জানবে তোমরা দেশের এক বিশেষ
করে শিক্ষাক্ষেত্রের এক বিরাট দুঃসমস্যা দূর করতে
পারবে এবং জাতিও তেমনোবে কাছে এই জন্ত চির
কৃতী থাকবে। আশাকরি এ বিষয়ে তোমরা দৃষ্টিগতই সচেতন
হয়ে ছাত্র-সমাজের এই দুঃসমনস্ক কলম দূর করবে।

অচিন পথের যাত্রী

নির্মলচন্দ্র চৌধুরী

এক

চির জুবারে ঢাকা জন মানবহীন অস্মাত দেশ বেক
প্রবেশ যে কেমন—উত্তর বেক বা দক্ষিণ বেক—পৃথিবীর
সেই অচেনা দেশে কি আছে; কেমন সে দেশের আকাশ
বাতাস—কেমন পশুপক্ষী বাস করে সে দেশে একথা
জানবার মত কত দুঃসাহসী দিগন্তরী দীর বার বার
গিয়েছেন সেই দেশে। তাঁদের কেউ গেছেন হাতিয়ে,
কেউ অন্যায়ের প্রাণ কিংগেছেন সেই দীমানীন ভূমির
দেশে। তবুও মানুষের জ্ঞানের পিণাসা করে নি।
দেশের সারা তাঁদের মন বাঁধতে প'য়ে নি, কতি ছেলের
মহত্মাধা হানিও তাঁদের ঘরে বাধ্যতে পারে নি,
বুড়ার তরুও তাঁদের পথ হোদ করতে পারে নি; আবি-
ষ্কারের উদ্ভাবনার কত দুঃসাহসী বীর প্রাণ বলি দিয়ে
আরও অমর হয়ে আছেন পৃথিবীর নানা দেশে।

এই সকল দুঃসাহসিক বীরপাত্রী পৃথিবীর দুই প্রান্ত
মুহুরেক আর ক্রমেতে কত বিপন্ন সাধার করে যে গিয়ে-
ছেন আত্মকের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে করনও করা
যায় না লেখা। পারে হাঁটা পথ, আর জ'হাডই ছিল
তখনকার যাত্রীদের লক্ষ্য। এদের কেউ বা ডিগন্তের মত
হাতিয়ে গেছেন সেই দীমানন্ত বরফের দেশে, কাথো বা
জাহাজ চাটিনিরেকের বরফের চাপে চূর্ণ হয়ে গেছে!
স্তবন একমাত্র বান কুহুটানো সের পাড়ীকে সফল করে
—একহাতে কীবন আর একহাতে বৃত্তকে আদিকন
করতে করতে বেক যাত্রী বেড়িয়ে পড়ছেন পথের
সন্ধানে। শেষে পথ বধন আর বেগেনি, সেরপাড়ী
বধন অচল হয়েছে, তখন শীতল বরফ দিয়ে বর তৈরী
করে তাহাই বধো আলোর নিয়েছেন তাঁরা। রাসের পথ
মাল কাটিয়ে গিয়েছেন তাঁরা সেই বরফের ঘরের মধ্যেই
—যদি কখনো কোনো জাহাজ মাছ বহতে গেলিকে
আসে এই আশায়! যে সেনাপতি কোনো একট

দুই হাজার হাজার মানুষ ঘেরে বীর বলে প্রাণনা
 পেয়েছেন, এই নিতীক ভীষণাত্মক বল—সেই ডেভিল,
 ব্যাটল, বস—সেই পাখী, ক্রাফলিন, ক্রানলেন—সেই
 কন, শিয়ারি, আদুগলেন—ঐরাব চোরে বীরকে অনেক
 বড়, পৌরো-গৈরো অনেক বহন।

এই বীর অভিযাত্রীরা বার বার প্রাণন করেছেন,
 অস্ত্রের বল বল নষ্ট, ঘেঁহুর বলও বল নয়,—মনের বলাই
 পতিতাবের বল। সেই বলে বলাই ধাড়া, তাঁরা মেরুদেশটা
 জয় করতে থাকে থাকেই যাত্রা করেন। দাড়া বেশে
 ভোপে ওঠে অশুর্জ লাড়ো—চারিধিক থেকে আসতে থাকে
 কত কতক দাড়াবা—চাকা, পাসা, ভায়া-কানপু-খাডুয়া,
 আরও কত কি। যাত্রার পথে যদি কারও মরণ না প'ওয়া
 যায়,—যদি কেউ হন নিরুদ্দেশ—অমনি ঠিকে উঠার
 ক'রতে বেশের লোক বেড়িয়ে পড়েন নানা পথে। অর্থাৎ,
 তই বা মৃত্যু—কিছুই তাঁদের পথ আটকায় না।

এখন একজন বীর অভিযাত্রী ছিলেন হুইভেনের এলি।
 বেশন চাপনার তাঁর মত বিখ্যাত কেউ ছিলেন না তখন।
 বেশনই তখন আকাশ পথে ভেসে চলা একমাত্র যান
 ছিল; কাশন এরাগেনের আবিষ্কার হয় নি তখনও।
 বেশের এ প্রাচ্য থেকে আর এক প্রাচ্য উড়ে যেতেন
 এলি তাঁর বেশনে চেপে। ভায়েন মনে কত দুর্জয় আবি-
 ষ্কারের কাহিনী; আশা ভাগে তাঁর মনে—আমিও কি
 হ'তে পারবো না এদের মত দুর্জয়? তবে মৃত হতে
 থাকে তাঁর মনের বাসনা।

বেশন শীতের লম্বা। অন্ধকার তখন হীতে, অতি
 দীর্ঘ পৃথিবীতে মনে আসছিল। চারিধিক দূরায় ঘেরে
 গেছে—প্রথম বাতাসে দূরারকণাগুলি তুলার মত উড়ছে।
 সেইদিন হুইভেনের বিজ্ঞানমজা ভবনে এলি যে কথা
 ক'লেন—“আমি বেশনে উঠতে উঠতে মরণ মরণে বেশ-
 নেই যাবো!”

কানের কাছে একটা বোমা ফাটলে মৃত্যুর ঘেঁহন
 অবস্থা হয়, এলিও কবচাও উপস্থিত মৃত্যু:র কানে
 ভেঁহনি শোনালো। “বেশনে চেপে হুইক যাত্রা। এ কি
 পাগল, না ক্যানা!”

বিজ্ঞান মজার প'ওয়েও মধ্যে এলিও খোঁপায় হস-
 ত ক'বেই গেল। পতিতেরা তর্ক তুললেন—“বেশনে চেপে

আকাশেই না হয় ওড়া গেল; কিন্তু হুইকের বিকে বাব
 কি ক'বে? বেশনের পতিবিধিও আর যাত্রীর হাতে নয়—
 যাত্রীই থাকবে বেশনের অধীনে। বাতাসের মধ্যে বেশন
 যে বিকে যাবে, যাত্রীকেও তো সেইবিকেই যেতে হবে।
 নিজের ইচ্ছামত ব'বীনভাবে বেশনে চেপে এলি হুইকের
 বিকে যাবে কি ক'বে?”

এলি বলেন—“তা হোক না বেশন বাতাসের পতি-
 বিধির অধীন, আমি বাতাসকে স্বয়ং ক'রেই যাবো।”

একজন প্রাণ তুললেন—“কেমন ক'বে তা হবে?”
 বাতাসও সব সময় একটিকে ব'বে যায় না। এখন বেশনের
 বাওয়া হ'কার উত্তর বিকে, তখন হঠাৎ বাতাস বইবে
 দক্ষিণ বিকে। সে অবস্থায় বেশন ঠিকমত চলবে কি
 ক'বে?”

এলি বলেন—“তাতে কতটা কি হ'চ্ছে? আমি
 কড়ের মুখে বেশন ছাড়বো হুইকের বিকে। আমার পথ
 আমি ঘেরে রেখো—আপনারা শুধু একটা বড় বেশন
 আমাকে তৈরী ক'বে দিন।”

একজন বলেন—“হুইভেন মরণ রেপের কাপড়ের বড়
 একটা খলির মধ্যে কাঁধাঙ্কাজেন প্যাস ভরলেই তো বেশন
 তৈরী হলো। কিন্তু সে প্যাস আর বেশনের মধ্যে ক'দিন
 বড় থাকবে? অমত, যাতে প্যাস ডাড়াডাড়া বেঁধিয়ে না
 যায়, সে কত না হয় বেশনের পায়ে ধানসিই লাগানো
 হ'ল। কিন্তু তাতে আর কতটা হুবিধা হবে?”

মজার নানাবকম তর্ক হলো। বীমাংসা হলো না
 কোন কথারই। অনেকেই লম্বের ক'রতে লাগলো
 প্রত্যাহারকে। কেউ কেউ তো পাঠাই বলল—“এ আর
 কিছুই নয়, মরণ তুলে চাকা বাঁধার কথী।” একবার
 প্রতিবাদ করল আর একজন—“তারা হুইকভার বললো,
 —এলি তো তাঁর দাড়া জীবনটাই কাটিয়েছেন বেশনে
 পড়ার পথকা ক'বে। তিনি তো কতবারই বেশনে উঠে
 এক মরণ থেকে আর এক মরণে যাত্রাযাত্র ক'রেছেন।
 তাঁর পক্ষে বেশনে উড়ে হুইক বাওয়া এমন কি মনস্তত্ত্ব
 প্রত্যয়।”

বিজ্ঞান মজার বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হলো না বটে,
 কিন্তু এলির প্রত্যয় বেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। জনে
 হুইভেনের সীমানা ছাড়িয়ে সে কথা ইউরোপের নানা

বেশেও ছড়িয়ে পড়লো। ইউরোপের নানাবেশ নানা প্রাণে লম্বা কংচে লাগলো প্রস্তাবটাকে। তাঁরা তুলে ধরলেন এক নতুন প্রস্তাব; “ভীষণ শীতের দেশ হুয়েক! সেলুনে উড়ে না হয় এটি হুয়েক গেলেন। কিছু তখনকার ঠাণ্ডার বেলুনের গ্যাস পর্যাপ্ত হয়ে যাবে দেখানো। তখন সেলুনে উড়বে কি ক’রে? গ্যাস কমে গিয়ে বেলুনে তো তখন আছাড় খেয়ে পড়বে। তখন মান তো বাবেই, প্রাপ্যতা যাবে এটি বা।”

এটি শব্দের কালমে প্রবঞ্চা নিয়ে কি উপায়ে বেলুনে চেপে হুয়েক যেতে চান তা সকলকে বুঝিয়ে বললেন। এককল তাঁর কথা যেনে নিল;—আর এককল বললো—অসম্ভব। এতো পাগলের কথা!

আর এককল নতুন এমটা বর্ক তুললো—“এটি তো বলছেন, বেলুনে ঘাতী যাবেন তিনজন। তাহলে শীত-মানানো জায়া কাপড়, ডেইরি মানানো সাথ লম্বা—অসম্ভব; তিন চার মাসের খাবার জিনিষ, সেলুনে পোষাবসার স্থান, প্রেম পাতি, ক্যানভাসের নৌকা, হুড়িমড়া নোকা—পাল, আর নানাবকনের বহু আর অস্ত্রপত্র—এত লটবহু কি একটা বেলুনে বইতে পারবে, না বেলুনের গতোনাতেই এত জিনিষের স্থান সংকুলান হয়।”

এটি উত্তর দিলেন—“সে সস্তা আপনাদের চিন্তার কোন কাণে নেই। বেশ অভিযানের চক্রে এখন সেলুনেই তৈরী হবে ১৮’ এত জিনিষ নিয়েও অনায়াসে অঁকাপে উড়ে যাবে। আসার লম্বা বাঁধা যাবেন, তাহলে হুঁকনকে আঁচিই বেছে নেবো,—তাঁদের বন্ধু বিজ্ঞানে আর কটোগ্রাফীতে বদল; আর হ’লে হ’বে তাঁদের বন্ধ শিকারী—যাতে বেশ সকলে যদি কোন বিশেষ লক্ষ্য আক্রমণ করে তখন যেন আত্মরক্ষা করা যায়। এমন আবার বরকার শুকু টাকার। বেশী নয়,—যাত্রা এককল টাকা হ’লেই আমি বেলুনে বৈরী ক’রে হুয়েক অভিযানে অগ্রসর হ’তে পারি। হুইডেন থেকে হুয়েক কতই বা হু? কয়েক হাজার মাইল যাত্রা—বলতে গেলে আসাযেঁহের প্রতিবেশী। কাজেই হুয়েক অভিযানের পৌরষ হুইডেন অধিবাসীরাই নিজে হবে; ইউরোপের সস্তা কোন দেশকে এই পৌরষের দাবী-দাব হ’তে বেওয়া হবে না। সকলের আগে যাব আমরা। হুইডেনের অর্থ হোক।

এটির দাবী—ক লক্ষ টাকা; টাকার অল্পটা কম নয়। কিছু টাকার অকাব হলোনা। চারিদিক থেকে অল্পস টাকা এসো অর্থহিনের মধ্যে। হুইডেনের বামা পর্যাপ্ত টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন। নানা বেশ থেকে চিঠি এলো এটির নামে—“দামাকে লম্বা নিয়ে নিম, আমি বেশ অভিযানে আপনাদের নকী হতে চাই।”

আবশ্যনকারীত্বের স্তেত্তর থেকে এটি, বেছে বেছে হুঁকন লক্ষী নিলেন। একজন টীওবার্গ, অস্ত্রজন ফ্রেন্কেন টীওবার্গ ছিলেন বিজ্ঞানী—ওস্তা ছিলেন কটোগ্রাফীতে। বেশপ্রবনের আবহাওয়ার শক্তি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার এবং বেশ সকলের বৈ-সঙ্গিক পুত্রের ছবি তোলায় সস্তা আগ্রহী ছিলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে বেশ সকলকে শরীক করবেন তিনি। আর ফ্রেন্কেন? তখনকার হুইডেনের একজন নামকরা একিবিয়ার ছিলেন তিনি। তা ছাড়া বন্ধ শিকারী এবং পালোয়ান হিসেবেও হুইডেন ছিল তাঁর হুইডেনে। শোকে বলতো—ফ্রেন্কেনের বন্ধুত্ব গুলি কখনও কখনও না।

টীওবার্গ আর ফ্রেন্কেন নির্দোষিত হওয়া মাত্রই এটির কাছে এসে বেলুনে ওঠা নামার এবং বেলুনে চালনার কল-কৌশল শিখতে আগ্রহ করলেন আর ওরিকে জাল বেশের প্যাঠী সহরের এক কাংখানার এটির বিশেষ নির্দেশে বৈরী হ’তে আগ্রহ হলো অভিযার বেলুন—“ইপল”। বেখেণ্ডনে হুইডেনে লম্বা জেগে উঠলো—“এটির কয় হোক।”

এটি শিব করলেন হুইডেনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গটেনবার্গ বন্দর থেকে বেলুন নিয়ে কাংখানো তাঁরা যাবেন পিঙ্কবার্জে লিপে; সেখান থেকে বেলুনে উঠে যাত্রা করবেন হুয়েক দিকে। পিঙ্কবার্জে থেকে হুয়েক বহুত্ব অনেকটা কমই হবে।

১৮৯৬ সালের জুন মাসের প্রথম লম্বাহে হাজার হাজার বর্ষকের জালাসির মধ্যে হুইডেন কাংখানো “কির্গো” বন্দর এটি ও তাঁর দুই লম্বাখা আর “ইপল” বেলুন নিয়ে গটেনবার্গ বন্দর থেকে ওস্তা হ’লেন তখন দাবা হুইডেন হুয়েক আনন্দের দাবা পড়ে গেল। শত লম্বা হুইডেন নরনারী গর্জে উঠলো—“কর হুইডেনের লম্বা! আর এটির কয়।” (ক্রমশঃ)

আয়োডিন

গৌর আদক

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। ক্রান্তীয় এক বৈজ্ঞানিক মিঃ বার্নার্ড কোটিস নামা রক্ত সাংযুক্তি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করছিলেন যে তা থেকে গোলা-বাকল তৈরির জন্য সেরা আবিষ্কার করা যায় কিনা। এই নিয়ে গবেষণা করতে করতে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন এক মূল্যবান পদার্থ আয়োডিন।

আয়োডিন মাতৃবের বেহের এক অপরিহার্য পদার্থ। কাটা বা ছেঁড়ার আগে মাতৃব প্রভি-বেধক হিসাবে আয়োডিন ব্যবহার করে থাকতো। কিন্তু আজকাল বাগারে প্রভিবেধক হিসাবে আয়োডিনের বিকল্প প্রচুর শুধু বের হবার ফলে আজকাল প্রভিবেধক হিসাবে আয়োডিনের সে ব্যবস্থা কম নেই, কিন্তু মাতৃবের শরীরে নিত্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে আয়োডিন যে এক অপরি-হার্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মাতৃবের শরীরে নিত্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে যতগুলি উপাদান সরকার তার মধ্যে আয়োডিন একটি এবং আয়োডিন নিত্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ছোট বড় সকলের শরীরে এক মিলিগ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ প্রত্যাহ প্রয়োজন। এবং শরীরে আয়োডিন পূরণের জন্য সকলকেই যে সমস্ত ক্ষমিতে আয়োডিন আছে সেই সমস্ত ক্ষমির লাব-সজী আহাশ করলে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন পাওয়া যায়। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় আয়োডিন সংগ্রহের সব চেয়ে সহজতম উপায় হলো খুন। খুনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন আছে এবং তার খারাই আমায়ের শরীরের প্রয়োজনীয় আয়োডিন পূরণ করা যায়।

শরীরে আয়োডিনের অভাব হলেই গলগণ্ড হয়ে থাকে। কারণ গলার মধ্যে যে থাইরয়েড গ্রাণ্ড আছে, সেখানে থাইরয়েড হরমোন নামক এক প্রকার রস উৎপন্ন হয়, সেই রসই শরীরের কর্ম-

ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে। সেই রস উৎপন্ন করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আয়োডিন। আয়োডিনের অভাবেই শরীরের কোষগুলি ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং এই ক্ষীণ কোষগুলিতে প্রয়োজনীয় থাইরয়েড হরমোন রস সংগ্রহ করতে গিয়েই গলগণ্ড হয়। গলগণ্ড সাধারণতঃ গলার বাহিরেই হয় এবং অনেক সময় ভীষণাকার ধারণ করে গলার ভিতরকার শ্বাসনালী বন্ধ করে দেয়। এই অবস্থাকে গলগণ্ড বলা হয়।

শরীরে আয়োডিনের অভাবে যে গলগণ্ড হয়, তা মার্কিন বৈজ্ঞানিক মিঃ ডেভিড মেরিন প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছেন।

শিশু সাহিত্যের সম্মেলন

গত ৫ই ও ৬ই এপ্রিল বিহারের বাটলিয়ার নিচিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ আবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চাশ জন শিশু সাহিত্যিক প্রতিনিধি হিসাবে এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য-পাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সম্মেলনের সাক্ষাৎ কামনা করে বাগী পাঠান। ৫ই এপ্রিল সকাল বেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে সংগঠন বিধির পরিবর্তন, পরিবর্তনগুলি গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে ১৯৬০-

• সালের জন্য কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয় :—

সভাপতি :—শ্রীমন্ত বসু। সহ সভাপতি-বৃন্দ :—সর্বজি অমিল নিয়োগী, কুমারেন ঘোষ, বীহেন্দ্রলাল বর, রতনলাল, পি, মেনো, গুরুবাল-সিং কুল মুমতী পাইগোচানকর ও ডঃ গোপাল চন্দ্র মিজ। সাধারণ সম্পাদক :—শ্রীউৎপল হোম রায়। দৃশ্য-সম্পাদক :—সর্বজি শান্তি ঠাকুর ও প্রভাতেশ্বর কালী। কাব্যাবাক :—ডঃ বিমলেন্দু নাগরায়। সভ্যবৃন্দ :—সর্বজি ডঃ অমীম বর্ধন, মৈলেন ঘোষ, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দুর্জি দত্ত, বিহার সরকার, মুনীম মল্লোপাধ্যায় ও মিলীপ কুমার বাগ।

বুল অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন নাট্যকার শ্রীমদ্রথ রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ দান করেন ইণ্ডিয়ানকপার কর্পোরেশনের চিকিৎসকাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এম, সি দত্ত। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কপার কর্পোরেশনের ওয়ার্কস্ ম্যানেজার শ্রী এম, এম, রায় ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন শ্রী অখিল নিরোগী। বিভিন্ন ভাষার শিশু পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মিসেস্ সুভাষানিয়ম্। বিভিন্ন অধিবেশনগুলিতে সভাপতি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকেন ডঃ অসীম বর্ধন, ডঃ যশবন্তঃ এম, কে বিশ্বাস, অখিল নিরোগী, মিঃ সুভাষানিয়ম্, মিঃ এম, সি, দত্ত প্রকৃতি। একটি ভাষা-গল্পীর অনুষ্ঠানে সাক্ষরদের সঙ্গে কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য স্বপনবড়োকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুন্দের 'কহুরক' গীতি আলোচনা ও সাধুবাবা অভিনয় এবং শিশু সাহিত্যিকদের বনফুলের 'কবর' ও মদ্রথ রায়ের 'মরাহাভী লাখ টাকা' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সাধুবাবা' অভিনয়ে সর্বশ্রী শিখা দাস, কৃষ্ণ হোম রায়, লোপাধ্বজা মুৎসুদিক, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দেবপ্রভ মুখোপাধ্যায় ও বলন। বঙ্গোপাধ্যায় প্রকৃতি এবং শিশু-সাহিত্যিকদের অভিনয়ে সর্বশ্রী মদ্রথ রায়, অখিল নিরোগী, তৃপ্তি কুমার মিত্র, কল্যাণী রায়, ধূম্রাণি দত্ত, উৎপল হোম রায়, শান্তি ঠাকুর, প্রভাত শেখর কানী, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দত্ত, লোকেশ হোম রায় ও বাবল মজুমদার সকলের প্রাণস্ফা ভাষন হয়। মৌভাগুর ইন্ডিনিং ক্লাব ও ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় দুই দিনের নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন অকৃতপূর্ব সাক্ষর্যমণ্ডিত হয়।

মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বশান্তি :

১৯৫০ সালের ১৬ই জুন ইউ, এন্ রেডিও জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিল। বিশ্বশান্তি রক্ষায় কয়েক নানা প্রকারের পরামর্শ দিলেন আইনষ্টাইন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে পৃথিবীবাসীরা জনমত তৈরী করতে বললেন। বললেন—যুদ্ধ তৈরী বন্ধ করে—

একটা—অতি-জাতীয় সংস্থার হাতে সব দেশের সব মারাত্মক অস্ত্র শত্রু কুলে নিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। ইউ, এন্, রেডিও পক্ষে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে কি করা উচিত এই প্রশ্নে মহামনীষী আইনষ্টাইন বললেন—মহাত্মা-গান্ধী প্রশ্নিত শান্তির পথই জগতে প্রচার করা উচিত। তিনি বললেন :—

Taken On the whole, I would believe that Gandhiji's views were the most enlightened of all the political men in our time. We should strive to do things in his spirit— not to use violence in fighting for our causes, but by non-participation in what we believe is evil."

(Ideas and openions
by Albert Einstein)

কিন্তু গান্ধীজীর প্রশ্নিত পথ সম্বন্ধে তাঁর দেশের লোকের কতটা আগ্রহ আছে দেখা যায় ?

সুকুমার গুহরায়, কলিকাতা—৭





চিত্তগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের যে খেলাটির কথা বলছি সেটিও খুব আকর্ষণীয়। কাজেই এ খেলার কলা-কৌশলটুকু বলা হবে নিয়ে ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আগরে ঘনিষ্ঠিকরতা দেখাতে পারো, তাহলে তুমি আনন্দ-পরিবেশই নয়, তাঁদের স্নানিতম হৃদয় লাগিয়ে দিতে পারবে।

তোমাদের সকলেরই ধারণা আছে—অগ্নি আগুনের তাল ভক্তখানি প্রচণ্ড—একটু ছোট্ট লাগলেই ফোঁড়া পড়ে... পুড়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের বিচিত্র-বহুস্তর রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার কৌশলে এমন আগ্নেয় উপায়ে অগ্নির জ্বালানো সম্ভব যে দে-আগুনে কেবল জ্বালানো যোগ্যই ফুটে অথচ কোনো কিছুই স্নানিতম জ্বলে-পুড়ে যাবে না। অর্থাৎ, মোহন-কথার ব্যতীত বলে—“ঠাণ্ডা আগুন” বা ‘Cold fire’। ব্যাপারটা শুনে হয়তো তোমাদের ভাব হবে—হ্যাঁ, তাহলে বলি শোনো—এই আগ্নেয় কায়দাটির আসল রহস্য।

গোড়াতেই বলে রাখি—এ কায়দাটি দেখানোর জন্য যে সব সাব-সরঞ্জাম ব্যবহার—সবই কথা। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—কর্কের ছিপি ঠাণ্ডা একটি ‘কাঁচ-সুপী’ বা Glass Flask—সাধারণতঃ, মূল-কলেবর ‘ল্যাবরেটরী’ (Science Laboratory) বা ‘বিজ্ঞান-গারে’ যেমন ছিপি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন—কাঁচের তৈরী একটি কাপা-নল, একটি পেলিদ-কাটার ছুঁড়ি, একটি স্পিরিট-ল্যাম্প (Spirit-Lamp), এক বাঁজ বেশলাই, এক পাত্র জল এবং

করক টুকরো ‘ফস্ফরাস’ (Phosphorous) রাসায়নিক-পদার্থ। এই রাসায়নিক-পদার্থটি তোমরা একটু চেষ্টা করলেই যে কোনো জ্বালো গুহের যেকোন খেকে কিনে আনতে পারবে। তবে খেয়াল রেখো—‘ফস্ফরাস’ ব্যবহার করার সময় কিছু খুব ছিপিয়ার থাকতে হবে—না হলে বিপদ ঘটতে পারে লান্দ্র একটু অসাবধান হলেই।

উপরের সর্বসরঞ্জাম সাব-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহে হবার পর, খেলার কলা-কৌশলের পাল্লা হুক করে।

খেলা দেখানোর সময়, প্রথমেই ঐ কাঁচ-সুপীর ভিতরে তবে নাও খানিকটা ঠাণ্ডা-জল—তারপর পেই জলে ছিপি করে নাও করকটা ‘ফস্ফরাসের’ টুকরো। এবারে কাঁচ-সুপীর খুব বদ্ধ করে নাও করকের ছিপি এটে। তারপর ছুঁড়ির সাহায্যে বেশ লম্বাটুকুরে ছিপি রখা-ভাগ এফিড়-ওকোঁক উপর খেকে নীচে পর্যন্ত ফুটো করে, সেই ফুটোর ভিতরে এমনভাবে বসিয়ে ‘নাও ঐ কাঁচের কাপা-নলটিকে যেন নলের প্রান্তভাগ যেন ছিপির বাইরে উঠে যাবে থাকে।

এবার বেশলাই-কাটির সাহায্যে স্পিরিট-ল্যাম্পটিকে জ্বালিয়ে নাও এবং খুব সাবধানে সেই জ্বলন্ত-ল্যাম্পটি লাগিয়ে রাখো কাঁচ-সুপীর তলার—কাঁচসুপী খেকে অল্পতঃ পক্ষে এক-আধ বিঘত তকতে। তাহলেই জ্বলন্ত ল্যাম্পের আগুনের ঐটে কাঁচ-সুপীর ভিতরকার ফস্ফরাস-মশালো জলটুকু বিচি ফুটে হুক করে যাবে।

এভাবে জলটুকু ফুটে হুক করার কিছুক্ষণ বাবেই দেখবে—কাঁচ-সুপীর মুখে-খাঁটা ছিপির ফুটোর মাঝে বসানো কাঁচের কাপা-নলের প্রান্তে ‘ঠাণ্ডা-আগুনের’ স্পিটান-শিখা লজ্জা অল্পতঃ হুক করেছে।

এখনটি ঘটনার কারণ—জলীয় বাষ্পের সঙ্গে ফস্ফরাসের খুব দৃঢ়-তপা যেহেতু থাকে এবং বাইরের বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধান রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে আগুনের শিখার মতো উজ্জ্বল গোলা-আগ্নেয় জ্বলতে থাকে।

এই খেলা—এবারের বিজ্ঞানের খেলাটির আসল মজা। আগামী সংখ্যায় এমন-বহুস্তর আরেকটি মজার খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।



মনোহর মৈত্র

১। জমি-ভাগেদে হেঁ কালো :

বাড়ী	১
৩	২
৪	

উপরে যে নক্সাটি দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমন-ধরনের জমি আর বাড়ী ছিল বামবাবুর। বামবাবুর চারটি ছেলে আর একটি মেয়ে। বৃদ্ধ বয়সে বামবাবুর দুর্ভিক্ষা হলো—তিনি মাঝে পেলে হাত্তো এই বাড়ী আর জমির ভাগ-বাটো-খাটো নিয়ে তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ কলহের স্বষ্টী হয়ে। তাই তিনি উইল লিখে বাড়ী আর জমি ভাগ করে দিলেন মিহের ছেলে-মেয়েদের হাতে। বাড়ীটি দিলেন মেয়েকে এবং চারটি আনাছ-সহ জমিটুকু সমান-অংশে ভাগ করে দিলেন চার ছেলের হাতে। জমিটুকু বামবাবু এখন কারবার ভাগ করে দিলেন যে প্রত্যেকটি ছেলের ভাগে পড়লো—একটি করে আনাছ এবং সমান-অংশের জমি। বলতে পারো, বামবাবু কি ভাবে জমিটুকু ভাগ করেছিলেন ?

২। “কিন্দশারি জগতের” সত্য-সত্যাদেশ

কিন্দশারি :

যুক্তি কথের দু'জন চাষা হাটে চলেছিল বাঁধাকপি বেচেতে। পথে দেখা হতেই প্রথম চাষা দ্বিতীয় চাষাকে বললে,—ওরে ভাই, তোমার যুক্তি থেকে একটা বাঁধাকপি যদি আমাকে দাও তো আমার যুক্তিতে ঠিক তোমার যুক্তিতে বহুগুলি আছে, সেই লংখা হবে।

এ কথাব কথাতে দ্বিতীয় চাষা বললে,—তাঁর চেয়ে বহু তোমার যুক্তি থেকে যদি একটা বাঁধাকপি আমাকে দাও, তাহলে আমার যুক্তিতে বহুগুলি থাকবে, তার লংখা হবে তোমার যুক্তির বাঁধাকপির সমান-সমান !

তোমার হিদার কথের লংখা তো—প্রথম চাষা আর দ্বিতীয় চাষার যুক্তিতে বোটা কতগুলি করে বাঁধাকপি ছিল ?

[বচনা : পার্সীজীভব মুখোপাধ্যায় (ইদাপুর)

পত্নী মাসের 'বাঁধা' আর হেঁ কালো

উত্তর ৪

(ক) ভোড়-লংখা

(খ) বিগোড়-লংখা

(গ) যোগকল এবং বিগোড়কল উভ্যকই সেই বিশেষ-লংখা দিয়ে ভাগ করা যাবে।

(ঘ) ভোড়-লংখা

২।



উপরের নক্সামতো টেবেরে বোখা টানলেই চারটি সমান-আপেক্ষার অংশ দিগেবে।

পত্নী মাসের দ্বিতীয় 'বাঁধা' আর হেঁ কালো

দিক্বেদে :

মুগোড়না, দৌ-কর, বুতা ও বামি (কলিকাতা), পাখুর, কল্লনা, খোঁবা, চন্দ্রনাথ, নীলকণ্ঠ, মুরতী ও কুখা বাল্যাপাধ্যায় (কা-পুর), কাকালী, চন্দা, মমিতা মুগোড়না, গুজরান, বাহুবের, বিশ্বধো ও কুদের দিগে (কলিকাতা), লালটু ছোটন, বিজ, কান্ত, কণা, মুদ্রা ও চামেলী ঘোষ (বিলাদপুর), কৃপাল দিগে (কলিকাতা), অলক, তিসক, মূর্ণা ও মমিতার বাঘ (কলিকাতা), দোলন, হোচনা ও কনোত্র লাল (কলিকাতা), হিরাণ্ড, হুগোড়, মিত্রাণ্ড, হাগোনন্দ মুখোপাধ্যায় ও হুগা বাঘ (শিলিগুড়ি), মাহোনাতা, হোপেনাতা, জিনংউরেশা ও বহুদল রংঘন (কলিকাতা), বিজা ও দৌগোড়

জাজা (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, পুতুল, হুবা, নৌপু ও নতীব নুখোণাখা (হাওড়া), জব্বর ও হুলতা বেবনখা (কলিকাতা), অলকা, অলল, পুলক, বেংগী, মীনা ও ছোট্ট (ভিলাই), বিষ্ণু, মাখন, মখন, নৌপু ও বাংলু হাল (হুদহ টিকাগড়া, কলিকাতা) ।

পত্র স্রষ্টাশ্রম একাধি বর্ধার উত্তর দিচ্ছে :

বিখনাথ ও বেবকোনকন সিংহ (গয়া), ভাওর, কুকগাল, অদুচ, প্রণাথ, কুনসোহন, নির্বল, বিখবেব, স্বধোপ, মাল ও নন্দলাল (কলিকাতা), দৌতা, হুমিতা, যুথেকা, কাবেরী, রানকুক, ভাওতপ্র, হুহাথ ও নুগেননাথ গণো-

পাখা (নিউ দিল্লী), হুনাথ, মালবিকা, কাকন, চন্দন ও গোপা হার (কলিকাতা), বিলটু, পলটু, মহিম, হুবেশ ও হুনমা লেন (লক্ষৌ), চন্দ্রিমা, পুলকেশ, অনিমেথ, লিপিকা ও গৌরী চৌধুরী (কলিকাতা), অবিষ্ক, অভিজিৎ, হুথিৎ, কাননিকা, শম্পা ও খোকন হু (বোখাই), বিজয়েজ, বিনয়েজ, অজয়েজ, দবিঠা, পত্না, শোভনা ও মালতী চট্টোপাখা (কলিকাতা), নৌহার, পবিজ, অওহ, গোবিন্দ, মণিক, বিলল, ছায়া, মারা, হুমিতা, জিলেখা ও বিক্রমজিৎ হালখা (কানপুর), নিখিল, শোভা, মারীন, অনিল, ভাষহুদব ও কুননদিনিী অহ (কলিকাতা) ।



সংকলন

পোপ পল দি নিন্দাম্ব

এক ভাষণে বাইবেল উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন—“যদি কোন পার্শ্ববর্তনে বনো ব্যক্তি নিজের জাতিকে দারিদ্র্যের মধ্যে দেখে দ্রুতকার্য বদ্ধ করে রাখে; তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম কি করে খেলা করবে।”

“(If some one who has true riches of this world sees his brother in need and closes his heart to him, how does the love of God abide to him?)”

এক ভাষণে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করে এই কথা বলেছেন খুষ্টান অগতের ধর্ম গুরু পোপ পল দি নিন্দাম্ব।.....পোপ পল নানা দেশ ভ্রমণ করে ভাষণ বিচ্ছেদ। তিনি ভারতে এসেছেন, যুক্ত রাষ্ট্রে গিয়েছেন—গিয়েছেন ল্যাটিন অ্যামেরিকায়।

তিনি সমৃদ্ধ দেশগুলির উদ্দেশ্যে এই উপদেশ বর্ষণ করেছেন। কৃষি সংক্রান্ত নিরক্ষারূপ পরিবর্তনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন—নিষ্কা করেছেন দরিদ্র দেশগুলি থেকে অর্থ লুণ্ঠনের। যে সব উপনিবেশবাদী দেশ দারিদ্র্যের মধ্যে, উপনিবেশগুলিকে ফেলে রেখে চলে যায় তাদেরও তিনি নিন্দা করেছেন। তারা ভাবী কালের পৃথিবীর জন্যে কি সমস্তা রেখে যায় তাও বোঝাতে চেষ্টা করেন।

পোপ পলের বাণী শুনিয়ার সমৃদ্ধ দেশের নায়কদের কানে পৌঁছেতে জানি, কিন্তু মর্মে কবে পৌঁছবে কে বলতে পারে।

ধীরেন মিত্র। পার্ক সার্কাস

সম্রাট হুচনার যন্ত্রের কৃতিত্ব :-

যারা সুর সৃষ্টি করেন, সম্রাট রচনা করেন, তাঁদের সকলের সামনে একটা কঠিন সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। জানিনা সে সমস্যা সম্পর্কে তারা নিজেরা ততটা সজাগ ও সচেতন কিনা। সমস্যাটি হচ্ছে—সম্রাট জগতে কম্পিউটারের আবির্ভাব। কম্পিউটার ইতিপূর্বে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করে, ও ক্রীড়াঙ্গণতে দাবা খেলায় আশ্চর্য জনক কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বর্তমান কালে সেভিয়েট বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারের সাহায্যে সম্রাট-রচনা সম্ভব করে তুলেছেন। বস্তুতঃ তাঁদের প্রস্তুত কম্পিউটার উরাল-২ সম্রাট রচনা করে বিশদ্য সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি আরও একটা মজার ব্যাপারও ঘটেছে। উরাল-২ রচিত ৮টি সম্রাট আর রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্রাট বিশেষজ্ঞদের রচিত ৮টি সম্রাট নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। কুড়িজন চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সম্রাট বিশেষজ্ঞের কাছে সেই ১৬টি সুর বাজিয়ে শোনান হয়েছে। তাঁদের জানান হয়নি কোন সুরটি মাহুঘের তৈরী, কোনটি যন্ত্রের। যদ্য রচিত সুর পেল ৭টি মাত্র খারাপ নম্বর। আর মাহুঘ রচিত সুর পেল ১৬টি খারাপ নম্বর, অন্তরিক বস্তুর সুর পেল ২২টি ‘চমৎকার’ নম্বর। আর মাহুঘের সুর পেল মাত্র নয়টি।

যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শৈলেন বাবুর সম্প্রদায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন তা দেখবার জন্যে অবশ্যই আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীকমলেশ আতা, বরাহনগর

গীতা পাঠের মাধ্যম্য :—

সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে গীতা কাবুলের
বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থা পাঠ্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে।
গীতা যে একটি অবস্থা পাঠ্য গ্রন্থ তা বলাই বাহুল্য।
আরমান নৈর্দৈশিক নিবেশ গীতা ও মহাপ্রভুতাকে
খুব উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। স্তন্যে প্রথম মহা-
বুদ্ধ কোন কোন দেশ মৈত্রদের মধ্যে গীতার
বাণী প্রচার করেছিল :—মৈত্রতা যাতে উৎসাহ
পায়—ভীষণ মত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না
আসে। শুধু গীতা কেন সমগ্র মহাভারতই মানব
জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রেরণার
উৎসস্থল। গীতা ও গীতামহ মহাভারত যে শুধু

যুদ্ধের প্রেরণাই দেয় তা নয়—শান্তির সময়ও তা
অবস্থা পঠিতব্য। কিন্তু জড়বিজ্ঞানে আধিষ্ট
ভারতীয়গণ গীতা কিংবা মহাভারতের দিকে
মনঃসংযোগ করবার সময় পান্ধেন না। ভারতীয়
শাস্ত্র-সমূহে তাদের ঘোরতর বিতৃষ্ণা। তার
ফল যে কত খারাপ তা বলার প্রয়োজন নেই।
এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশ এমন দুর্দিন আসবে
যখন লোকেরা কাবুলীদের কাছ থেকে শুধু টাকা
ধারাই নেবেনা, গীতার শিক্ষাও নিতে বাধ্য হবে।
সাবধান! সেদিন বেশী দূরে নয়।

চিন্ময় আচার্য্য, বর্দ্ধমান

প্রশ্ন

ক্রীমুনীলকুমার বসু

স্বাধীনতা আবিষ্কার

কাড়িতেছে জীবনের স্বাধীনতা কুহক অধিকার।

অনন্ত যুদ্ধে

অগণন পাহাণের বোকা নৌরবে বাহিনী যুদ্ধে।

হিত দর্শনহারা

দুর্গ পথে বাতী পথ খুঁজে ভ্রান্ত বিশেষণ।

জীবনের প্রতি করে গভীর

সুস্থায়িত্ব অসন্তোষ একদিন যবে ফেটে পড়ে,

শোষণ বেরীর মূলে

পলে পলে উৎসর্গিত স্বাধীনতা যুদ্ধার্থে তলে

প্রশস্ত বলির আগে

বাচিব্যব তাদিহের কঠিন প্রয়াসে যবে লাগে

বেগেছি তখন—

উৎকর্ষ রূপাণ হতে বধ্যভূমে ঘাতক যেমন

শালন ছুটিয়া আসে

মিশ্রিত হুগার তলে বাচিব্যব সে কঠিন প্রয়াসে।

প্রশ্ন আগে শুধু

স্বাধীন-মুখল-আইন নির্ধাচিত্তে যোদেয় প্রতিজ্ঞ।

বিচারের ক্ষেত্রে

বিধা-বন্দ আও শিল্প সশস্ত্র বিশ্ব লাগে না লাগে।

দোষিত প্রতাপ যত

সম্মান সতর্ক দৃষ্টি কার তরে রয়েছে উৎকর্ষ ?

মুখোশ খসিয়া পড়ে বিচারের প্রহসন যত।

ঐক্যবদ্ধ জনতার সংগ্রামী চেতনা করে পলাহত।

হিস্তিবর্ষ শালনের শোষণ মূল্যে যত

অগ্রনের পশু শক্তি বলে চলে অব্যাহত।

তাই বাবে বাবে

প্রশ্ন আগে, শতাব্দীর অগণিত লোক কে কাব শিবিরে ?



বোম্বে বনাম বাংলা

খ্রী'ন—

বাংলা যেনে বাংলা চিত্র ও বোম্বেই চিত্র বা হিন্দী চিত্র দুই চলে আগছে বহুকাল থেকে। বিশেষ করে কলিকাতা শহরে তো অধ্যাপালীর সংখ্যা কম নয়, তাই বোম্বেইয়ের হিন্দী চিত্রের চাবিকাঠি রয়েছে যথেষ্ট। তা ছাড়া বাঙালীরাও তো কম হিন্দী ছবি দেখেন না! শুধু হাত্রে বাংলা ছবি দেখবার মত বস্তুই আবেদন নিবেদন করা যোক, হিন্দী ছবিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে পূর্ব কদম বাঙালী বর্ষকই শুধু হাত্রে বাংলা ছবি দেখতে হনঃস্থির করেন। অবশ্য চলচ্চিত্র অধ্যয়নী বাঙালী বর্ষক বাংলা ছবি দেখতে বিমূঢ় নন, কিন্তু হিন্দী চিত্রও তাঁরা যথেষ্ট বেশে থাকেন। এর কারণ আর কিছুই নয়, হিন্দী চিত্রের যথেষ্ট আকর্ষণ আছে বাঙালী বর্ষকের কাছে। বাংলা চিত্রে যা পাওয়া যায় না, বোম্বেই হিন্দী চিত্রে বর্ষকেরা তা পান

বলেই তাঁদের একাংশ হিন্দী চিত্রের এক অনুরাগী। এখন বাংলা চিত্রে যদি হিন্দী চিত্রের যা কিছু আকর্ষণীয়তা পরিবেশন করা যায়, তা হলে হতে পারানো বর্ষক শুধু বাংলা ছবি দেখতেই চাইবেন। কিন্তু বাংলা ছবিকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দী চিত্রের মত করা সম্ভব কি? যেটেই নয়! কারণ বাংলা চিত্র-নির্মাণাত্মকের পক্ষে বিরাট ব্যয়সাধ্য বোম্বেই চিত্রের অনুরূপ চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। বোম্বেই হিন্দী চিত্রের ব্যয়বাহুগাই ঐ ছবিতুলির প্রধান আকর্ষণ। সম্পূর্ণ বড়ো চিত্র তোলাই বিরাটে ব্যয়সাধ্য, তার ওপর নৃত্যমুদ্র, সাংবাদিক দৃশ্য, গাড়ী, যোডা, ট্রেন, এমন কি এগোয়েন, হেলিকপটারের দৃশ্য প্রভৃতি প্রচুর খরচা করে তোলা হয়। সঙ্গীত-নৃত্যও খরচা হয় পূর্ব। তাবশর কান্দীর প্রভৃতি স্থানের বহির্দৃশ্য

তো আছেই। এই সব বিশেষ বোঝাই চিত্রের খণ্ডা হয়
যুগে। কিন্তু সর্বস্বত্বীয় বাজার থেকে এরা এমন কি
মধ্য-প্রাচ্য ও মূ-প্রাচ্যের বহু স্থানেই ফিল্ম চিত্রের চাহিদা
থাকার সঙ্গে সব কাছাকাছি থেকেও অব্যাহত হয়। তাই
বোম্বের চিত্রনির্মাণকারী যে বিরাট ব্যবসা করেন তা উঠে
এসেও তাঁদের লাভের অংক বড়িই হয়। কিন্তু বাংলা
চিত্রের ক্ষেত্রে অবস্থাটা হয় মস্তরকম। সর্বস্বত্বীয়
বাজার বাণিজ্যেতে বাজার তো ঘুরেও কথা, তবু বাংলা
যেহেতু ভালো আসে নাগের যন্ত্র কয়েকটি গ্রহণে বাংলা
চিত্রের চাহিদা আছে। তাই অর্থ আহরণে বাংলা চিত্র
বোম্বাই চিত্রের সমকক্ষ তো নাই, তুলনায় অনেক পিছনে
পড়ে আছে। অবশ্য বাংলা চিত্র জগতের দিক থেকে রয়েছে
একোবারে ঈর্ষা! তবু তাবুতেই নয়, বিশ্ব-বাজারে বাংলা
চিত্রকে অন্ততম শ্রেষ্ঠ আসনে বসান হয়েছে! কিন্তু দুর্ভাগ্য
যে বাংলার পোবে, ভারতব্রহ্ম এই বাংলা চিত্র-ব্যবসার
আজ অবশ্যকর্তে অর্জব!

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পরিচালনা, উৎকর্ষার্থেই অভিনয়,
উত্তম গল্প বা চিত্র-নাট্য—এই সকলের একত্র সমাবেশ
হওয়া দরকার বাংলা চিত্র আজ ব্যবসার ক্ষেত্রে দার খাচ্ছে।
সমালোচক, ডির চলিত বর্ণকের অসুষ্ঠ প্রমাণ ও সাজী
পুথকার পাত ৩৫৫ বাংলা চিত্র দ্বন্দ্বীয় কৃপা থেকে আরও
সজিত। অবশ্য বোম্বাই চিত্র অসুখচিত্রী গর, এবং সাধারণ
জগতের পরিচালনা ও অভিনয় ব্যাড়াই বাজার মাং করে
চলেছে। এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়
বোম্বাই চিত্রের প্রধান আকর্ষণ তার আমোদের অংশ।
সাধারণ বর্ণকদের আমোদিত করাটাই হচ্ছে বোম্বাই
চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই আমোদ (entertainment)
কেওয়ারটার ওপরই গোথের চিত্র-নির্মাণকারী সব চেয়ে বেশী
বর্জ্য করেন। তাই তাঁদের বেশী ভাগ চিত্রই আমোদ-
জনক নৃত্য, গীত, হাস্যরস দিয়ে থাকে। এর ওপর আর-
কাল আমোদ সন্দেহ, দণ্ড, উৎকর্ষ, উত্তেজনা, ধোঁয়াক
প্রভৃতি জাতেরও পরিবেশ করে বর্ণক যতকৈ আকর্ষণ করা
হচ্ছে। হাস্য-রস নৃত্য-গীত সঙ্গ, মনোরম বহির্ভূত

মহলিত এবং হাস্য-কৌতুক, রোমাঞ্চ-রোমাঞ্চ, বীর-
বীড়ন প্রভৃতি বদ-বস্তিত বোম্বাই চিত্রের আকর্ষণ তাই
হতে পড়েছে প্রায় সর্বজনীন। সাধারণ বর্ণক বিবেচনা-
বিষয়, নৃত্য-ভরক এলবিশেষবোম্বাই না। কি হওয়া উচিত
ছিল, আর কি হওয়া উচিত হয় নি তা নিয়ে ভাবের মাথা
বাথা নেই। তারা চার ছবি দেখে আমোদ পেতে, আনন্দ
লাভ করতে—আর তার সঙ্গে কিছু শিক্ষা কিছু আদর্শ ও
যেগাম্যবোধ যদি থাকে তো আরও ভাল।

অপর পক্ষে বাংলা চিত্রের মানা শুণ থাকলেও এবং
নৈতিকজ্ঞানের প্রশংসা পেলেও বলব আমোদ-প্রমোদে
(entertainment) দিকটা বাংলা চিত্রে একটু অবহেলিত।
সেটা অবশ্য অনেক সময় কতিপয় বর্ণকদের গ্রন্থনাই
আনে। বাই হোক, বাংলা চিত্রে আমোদের অংশ
কম থাকার বৈশী ভাগ বর্ণক, এমন কি বাকালীরাও,
ফিল্ম চিত্রেই জীড় অস্বাঃ। বর্ণকদের এই কঠিকে বলতে
পারলে ভাল হয়, কিন্তু এই অর্থনৈতিক হাল্লাড়ের মুখে তা
বোধ হয় অসম্ভব। আর বলানো তো ঘুরেও কথা কতি
যে আরও ক্রমনিয়গামী তা বোধহয় দখলেই হতে
পারছেন।

এ ছেন পরিবেশিত বাংলা চিত্রের তথ্য কি?
নে কি বোম্বাই এর মতন হতে পারবে? কিন্তু আগেই
বলছি তা হওয়া বাংলা চিত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন
উচিত নয় ঐ বকম ভগ্নচিত্রী চিত্রনাট্য লেখা, তেমনি
সম্ভব নয় ঐরকম উচ্চতরের বন্ধী কটোগ্রাফী, উচ্চ টেক-
নিকের। তাই বাংলা চিত্র বোম্বাই চিত্রের সমকক্ষ হতে
পারবে না টেকনিকের দিক দিয়ে। আর তবু পালা-
কালো কটোগ্রাফ আমোদেও গর দিয়েও বাজার মাং
করে মাথা ঘুরে না। তাই বাংলা চিত্রকে অত্র পথ স্তেবে
যেখানে থেবে এবং আশা করি তা বাংলা চিত্র-নির্মাণকারী
জানছেন।

বোম্বাই বহাষ বাংলার এই চিত্র-প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরি-
শ্রেকিতে তাঁদের আরও তাবতে থেবে এবং নতুন পথের
সন্ধান করতে হবে।

অবস্থা বলাহি :

দৌমিয়-তত্ত্বা অন্নিয়ত "পরিষ্কৃত" চিত্রটি নৃক্তি প্রতীকার রয়েছে। "ভীষণত্ব" ও "কলিত্ত নায়ক"-এর কাল ও এগিরে চলেছে। শ্রীমদ্রক্তকথের বান্য-জীবন অবদনে ওচিত "ভীষণত্ব"-র "বালক পদাবয়" চিত্রটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন বিগেথ সেন এং চিত্র-নাট্য ও নিবেদন তিনি।

সম্প্রতি নৃক্তি পেয়েছে বাংলা ভিন্ন "পিতাপুত্র"। নায়ক-নাট্যকার চরিত্রে ভগবান করেছেন স্বয়ং দত্ত ও তত্ত্বা।

বিশ্বী চিত্র নৃক্তি পেয়েছে তিনটি। প্রথম চরিত্রী পরিচালিত "ভূমি পে কোন আচ্ছা হায়" প্রথমে চিত্রটিতে নায়ক-নাট্যকার চরিত্রে আছেন শামি কাপুর ও বিংতা।

দ্বিতীয় পরিচালিত ও প্রযোজিত "বহায়া" নায়ক 'বিলাস' চিত্রটির নায়ক দ্বিতীয় নৃক্তি নিবেদী এং তাঁর নাট্যকা বলা চলে দু'জন। এ দু'জন হচ্ছেন বাংলা শিল্পী ও শিল্পী ঠাকুর।

প্রথম প্রতীকণ-এর তত্ত্বা নৃক্তি "বাতা বচাকালী" পরিচালনা করেছেন বীরাচাই বেপাই।

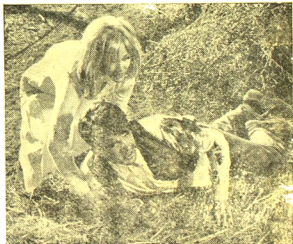
দ্বিতীয় ছবি ও গি ক'নিকাতা এং এখন চলছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "নিউ এলবার" চিত্রপুত্র প্রদর্শিত "Bonnie and Clyde" এং মিনার্টা চিত্রপুত্রের "The Night of the Generals".

Warner Brothers'-এর "Bonnie and Clyde" চিত্রটিতে নায়ক বীরাচাই তত্ত্বা বসন্তে যে দ্বি বাক ডাকতি, বাহালানি প্রতীতি হত, সেই দ্বি বসন্তে অংগনে এই বোম্বকত্ব চিত্রটি নিষ্পিত হয়েছে। Warren Beatty এং Faye Dunaway দু'জনে Clyde Harrow ও Bonnie J. Parker নায়ক নায়ক-নাট্যকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তবে এ নায়ক-নাট্যকা ডাকতি দ্বলের এং বাহালানিই তবের কাজ। অভিনয় তাঁদের চরিত্রাভূষায়ী ভো হয়েছে, উপরন্ত বসন্ত ঐ দু'টি ডাকতি চরিত্রকে তাঁরা অভিনয় প্রদে জীবন্ত করে তুলেছেন। Michael J. Pollard-এর অভিনয়েও প্রদর্শনীয় হয়েছে। এই শিল্পহীন দু'জনের অধিকারী দ্বিতীয়তাকে দর্শকেরা চটকবেই দ্বিতীয় কয়েত আরম্ভ করবে তাঁর জে-হিবকতা অভিনয়ের গুণে।

'Bonnie and Clyde' একটি দু'জনে চিত্রের

Warren Beatty ও Faye

Dunaway,



"Bonnie and Clyde" চিত্রটি পরিচালনা করেছেন Arthur Penn এবং অভিনেতা Warren Beatty হচ্ছেন প্রযোজক। চিত্রনাট্য লিখেছেন David Newman এবং Robert Benton.

"The Night of the Generals" চিত্রটি বিভিন্ন মহাপুরুষের পটভূমিকা নিয়ে তৈরি। একজন মানসিক রোগগ্রস্ত জার্মান সেনাপ্রধান, যিনি বেশ কয়েকটি মন্ত্রণা সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য জার্মান সৈন্যবলের একজন সেনাপ্রধানের চরিত্র নিয়ে এই চিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। জার্মান সৈন্যপ্রধানের চরিত্রের অভিনয় করেছেন বিখ্যাত অভিনেতা Peter O' Toole এবং তাঁর বিপরীতে সেনাপ্রধানের চরিত্রের অভিনয় করেছেন Omar Sharif. এই চিত্রটিতে দুই জনের জেনারেলের চরিত্রের Poter O' Toole যে অভিনয় করেছেন তা অনেক দূরত্বের মতন—এক কথায় বলা চলে অনবদ্য!

এই হোটেলের লাইটে বসে আলোচনার জগৎ পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী বলেন—আমরা চাই মূলতঃই আনন্দ দিতে এবং সেই ভাবেই ছবি তৈরি করি। সেসে বলা যায়—আপনার মনু ছবিটি "তুমি মে কৌন আঁজা ছাতি" আপনার নাম (প্রমোদ) অক্ষরগুলোই হয়েছে, বন্ধ-বন্ধিগের লাক্ষ্য অনিবার্য।

ভিনাইয়ের শেষে চলে আসবার সময় ওর মুখাঙ্কিত বলায় —"আপনাকে পছন্দ করতাম ভাল দেখাওঁতার চেয়ে আপনাকে অনেক 'ছোট' দেখতে।" তার হেসে বললেন—"আপনার এ কম্প্রিমেন্ট অনেক দূর।"

সাহিত্যিক সংস্থা :

বাংলার সাহিত্যিক ও শিল্পীরা যিলে গঠন করেছেন একটি নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থা। সংস্থাটির নাম রয়েছে "বকলেখা"। এর সভাপতিত্বপদে আছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সহ-সভাপতিত্বপদে আছেন : কবি শ্রীযশোব্রত বসু, নাট্যকার শ্রীযশোব্রত বসু, শিল্প-সাহিত্যিক শ্রীযশোব্রত বসু (বিশ্ববৃদ্ধি), বসন্ত-আরতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং সাহিত্য-শিল্প-পরিচালক ও শিল্পী কুমার বিশ্বনাথ বসু। সংস্থার নির্ধারিত হয়েছে "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সহ-সম্পাদকত্ব রয়েছে "সাহিত্যভারত" সম্পাদক শ্রীযশোব্রত বসু, শিল্পী শ্রীযশোব্রত বসু। কোষাধ্যক্ষ নির্ধারিত হয়েছে বঙ্গোপকণ্ঠ শ্রীযশোব্রত বসু।

"বকলেখা"-র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে মিলন সৃষ্টি করা। এদের প্রথম প্রয়াস-রূপে শ্রীযশোব্রত বসু তৈরি একটি নাটক "বঙ্গীয় সাহিত্য সংগঠন" প্রদর্শিত হল গত ২৪ বৈশাখ মাস পার্ক এর "রাষ্ট্রকবি মিলন ইন্সটিটিউট অব কালচার" ভবনের বিবেকানন্দ হল-এ। নাটকটি পরিচালনা করলেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং এতে অংশ গ্রহণ করলেন : শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বসন্ত বসু, অশ্বিনী বসু, কুমারেশ্বর বসু, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, বীরেন বসু, ভবতীজীবন, বসন্ত বসু, বসন্ত, বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, অম্বু আশা, বসন্ত বসু, শৈলেন বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায় (বসন্তোপাধ্যায়), মৌর্য আশা, রমেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পী। অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর তার নিম্নোক্ত শ্রীযশোব্রত বসু। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত বিখ্যাত জনগণী অভিনেতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। জানা যায় "বকলেখা" এই নাটকটি এবং অন্যান্য আরও নাটক বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালিত হবে। আশা এই বকল একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা সাক্ষর করা হবে।

ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এতক পমাত চিত্রের যৌন আবেগের পূর্ণ প্রয়োগের যোগ্যতা বাকি হিসেবে রাখণের চেয়ে ডুইউকেই উপযুক্ত বাকি হিসেবে নির্বাচন করেন এবং তার ওপরই পরিচালনার ভার দেন। বিষয় সম্বন্ধে যৌন প্রধান এই চিত্রে স্ত্রী ক্রিয়াবিধ বাস্তব চিত্রিত্রে Lysa de Puti অভিনয় করেন যার প্রতি ট্রান্সিথ থোলাস্‌জ হুগারের একটা হস্ত কামনা ছিল। এমিল তেনিংসের ভাবগোষ্ঠী পানশব্দটি "বন" হস্তক জীবন করে তুলেছিল। ব্রিটিশ অভিনেতা Warwick Ward আর্টনেলির চিত্রে রূপ দেন। চিত্র জগৎ বা সফল উপযোগী পতাকার বৈদিক সৌন্দর্য ও মানসিক পঠনের সত্ত্ব হিন্দু পুস্তিক বর্ণের উৎসী আখ্যা বেওয়া যায়। যৌনজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি "ভাষাটি"তে প্রাচ্য (বেওয়া) হয়েছিল এবং আমেরিকার দেশের বোর্ড

এই বিষয়ের অভ্যন্তর গোড়া ছিলেন। কিন্তু কল্পনাক ভাষা-ভাষেই জানতেন একত্রে কর্তব্য কি ভাষা ভাষা-ভাষেই সেটা পানক করেছিলেন।

বিশালবাক্যকতার কথা জানতে পেরে হুগার তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে জেলে যায়। ক্রাশ ব্যাক পদ্ধতিতে কাহিনী আয়ত্ত হয় যখন হুগার কাহিন্যের শেষে মুক্তি পাকে। কয়েকটা পোষাক পরিভাগ করে চলে যাওয়ার সময় একজন কণ্ঠস্বর ওয়ার্ডেনের অস্থিরভাবে সমস্ত কাহিনীটি হুগার বিবৃত করেছে। (.....আজকের ক্রাশ ব্যাক পদ্ধতির সঙ্গে আনন্দা খুঁই পরিচিত কিন্তু আজ থেকে চ্যাপ্লিন বছর আগে?) চিত্রটি দেখ হয়ে যাওয়ার পরে তার পতাকুল মুহূর্তগুলি মনের তন্ত্রীতে অস্থিরিত হতে থাকে।

ফ্রান্সোয়া ত্রুফোর সঙ্গে কিছুকণ

ত্রিভী চরিত্রিকা সেন

প্রঃ। ভাষ্য: বা অন্যর করে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শনী হতে বাদ দেওয়া হয় তাবের সম্পর্কে আপনায় ধারণা কি ?

উঃ। একটি চিত্র সম্বন্ধে তাবের আশাধার বা অতীতপূর্ব চরে, ইং। আশা করা ছাড়াইই সারিল। নতুন পরিচালকের কোন ছবি এখন বর্ষক মনে। তখনে সফল হয় তখন তার মধ্যে অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে, যথা খুঁই পাবার জীবনের কাহিনী অথবা কোনবলিট কাহিনীর চিত্ররূপ বা কোন বিখ্যাত তারকার উপস্থিতি। অনেকের ধারণা যে বহু চিত্র পরিচালকই কোনরূপ চিত্রা না করে কাহিনীর চিত্ররূপ বেনে এবং বর্ষক মনোবলনে বর্ষ চিত্রগুলি

তারই পরিণতি। কিন্তু পরিচালকের কল্পনা এবং তাহার বাস্তব রূপের মধ্যে আত্মক ছোঁয়া পার্থক্য থাকে। পূর্তন

"The New Wave" বলে পশ্চিমে চিত্র-শিল্পের যে নতুন ধারা চলেছে তার খবর অনেককেই হয়ত রাখেন। এই নতুন ধারার অন্যতম নেতা বোধ হয় ফ্রান্সোয়া ত্রুফো (Francois Truffaut), তাঁকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় আজও শেষ হয় নি। বর্তমান সাক্ষাৎকারে ত্রুফো যে সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন তা সকল দেশে হয়ত বা সকল কালে বিদগ্ধমাজ ও চিত্রশিল্পে সংশ্লিষ্ট অনেককেই তার মুগ্ধোন্মুখ হয়েছেন।

সম্পাদক—পট ও পীঠ

হিসাবে হাটেল ভাণের করেকটি চিত্ররূপের আলো-চনা করা যেতে পারে। এই চিত্রগুলির মধ্যে কিছু ছবি খুঁই নতুন কিন্তু বর্ষকবের বুদ্ধির অধরা, কিছু ছবি চিত্রাকর্ষক এবং কিছু ছবি একেবারেই ব্যর্থ।

চিত্রনাট্য বলতে বর্ষকরা বা বোঝেন, পরিচালকের নিকট তার ভিন্ন অর্থ। ছবি বা বাণ্যাতিক অসাক্ষ্যের পেছনে থাকে পরিচালকের

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অথবা তিনি যে বিশ্ববস্ত আত্মবিকতা ছাড়া আনন্দ

কিছুই অপেক্ষা রাখে। কয়েকটি বিষয় আছে যা দাখল করার দিবে অসম্ভব করে এবং তা যে তাহেই পরিবেশিত হউক না কেন সাধারণের চরিত্রের তথ্যে তা অসম্ভবিত হয়েই। এখানে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা দেখানো—যেখানে কোন সমস্যা কিছু করা হচ্ছে। তার সমাধান চিন্তা বিষয়। সে ক্ষেত্রে ক্যামেরা এক চরিত্র হতে অপর এক চরিত্রে যুগে বেরাচ্ছে, পরিচালক মনে করতে পারেন যে একটু আগে দেখা চিত্রটি বর্ণকথের চিত্রতে অগ্রবিধা হবে না, কিন্তু বাস্তবে দ্রুত বর্ণকথের অগ্রবিধা হয়। অর্কের ব্যাতিয়ে চিত্রশিল্পিক দুই ভাগে ভাগ করা যাক। প্রথমত: যে চিত্রগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং চিত্র গ্রহণকালে পরিচালকের শির মনোভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ A Bout de Souffler এবং হরা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্র যেগুলির বিষয়বস্তু খুঁজে চিন্তা ও বিচার বিবেচনার পর গ্রহীত হয়। উদাহরণস্বরূপ গোয়েন্দা কাহিনী বা বহুস্তরন কাহিনীর কথা বলা যেতে পারে। Paviot এর Portrait Robot, Doniol-Valcroze এর La Denonciation এবং Chabrol এর L' Oeil du Malin চিত্রগুলি খুঁজে উজ্জ্বল হয়েছিল কারণ চিত্র গ্রহণের পূর্বে এই চিত্রগুলির খুঁজিমাটি দেখতে Kast এর তার অভিজ্ঞ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোক অথবা Moussy তার অভিজ্ঞ চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে বিচারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। ইহা সত্য যে ঐ তিনটি চিত্র আকর্ষণ-মূলক হলেও বর্ণকথার পরিচালকের বক্তব্য ঠিকমত গ্রহণ করতে পারেনি। হারা হটক আবার মনে হয় না যে সকল চিত্রের তাগাই এইজন্য মন্দ। আবার একটিগাত্র ছবি Tirez Sur le Pianiste বর্ণকথার মনোভাব বাস্তব এবং এর জন্য আমি নিজেই দায়ী বলে মনে করি।

প্র: আপনি বর্তমানে সমালোচক, আজকের দৃষ্টি দিয়ে আপনার পূর্বের পরিচালকের কৃত্যিকারে কিভাবে বিচার করবেন?

উ: বর্তমানে আমি কিছু পরিমাণে সমালোচক ছিলাম। তখন Art পত্রিকার লিপ্যন্তর। তারপর এখন পরিচালক হবার আমি সমালোচকের ভাষায় কথা না বলে আমার প্রথমভাগিতে পরিচালকের ভাষায় কথা বলেছি এবং প্রথমদিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখা আমার পক্ষে

সহায়ক হয়েছে। এখনও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি আমার সম্পূর্ণ পরিভাষা করেনি। আমি এখন একটি চিত্রনাট্য তৈরী শেষ করি, আমি তার যোগ্যতম ব্যক্তিতে পারি না কিন্তু তার ব্যক্তিগত সমস্যা সন্ধান থাকি। এই অতীত আবার চিত্র গ্রহণকালে গঠনগতিকতার কারণে পতিত হবার বিষয় থেকে রক্ষা করে। এক একটি চিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ সন্ধাননা এক এক রকম। ছবিটি কাব্যাহরণী না হয়ে পড়ে অথবা চিত্রটি অভিনয়্যার ভাবলেন না হয়ে পড়ে যে বিষয়ে সত্যক হতে গিয়ে ছবিটি বোম্বাস্ট হয়ে পড়ে। যেমন আমার Jules et Jim নামক ছবিটি। এই চিত্রে Jeanne Moreau যে কৃমিকার অভিনয় করেছেন তাকে আমি খুব সহায়কৃতি আকর্ষণকারী রূপে প্রতীয়মান হোক তা চাইনি; কলে তার কৃমিকার তাকে খুব শিষ্টর বলে মনে হয়েছে।

প্র: আপনি এখন তো আর সমালোচক নন, চিত্রপরিচালক। এখন কি আপনি সবকিছু চিত্র দৃষ্টিতে দেখছেন?

উ: নিশ্চয়ই। এখন আমি যে ভাবে বিচার করছি তা সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়ের। এখন যদি আমি আবার চিত্র সমালোচকের ভাবে বিরোধী, আমি সম্পূর্ণ অন্য ভিন্ন ভৈরী ব্যবহার কথা চিন্তা করব। তার কারণ কিন্তু অন্য। যে ধরণের চিত্রের কথা আমি লোভন্যের মধ্যম ভরজার তা এখন আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এবং তার ঝুঁকিও শট দৃষ্টিতে পারছি। পূর্বে আমি যে সকল কথা বলেছি তা এখন কেউ উদ্ধৃত করলে আমি বড়ই বিরক্ত বোধকরি। Arts পত্রিকার আধিনিমিত্তে এখন থেকে জিজ্ঞাসের পর বলার প্রয়োজন নেই, প্রবেশের ঘটনা বহু বার বলা হয়েছে, লক্ষ্যতরে চিত্রগ্রহণও হয়েছে এবং ঐ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করাই ভালো। অপর পক্ষে চিত্রনাট্য রচনার তৎকালীন সময় থেকেই একটা অপভ্রষ্টতা দেখা দিয়েছে এবং খুব বলিষ্ঠ একটা কাহিনী কোন চিত্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য বলে এখন মনে করি না। এইসকলগুলি চিত্রনাট্যের প্রতিবাদেই আমি Jules et Jim ছবিটি তৈরী করি। অনেকে আমাকে পরামর্শ দান করেছিলেন যে বইটির ঘটনা তৎকালীন সময় থেকে বর্তমানে নিয়ে আসার মন্দ। সবকিছুই দ্বিতীয় সহায়কের পট-কৃমিকার বেশ ভালোভাবেই প্রয়োগ করণে মনোবশ

ছিল। কিন্তু যেহেতু নানী ও প্রেম নিয়েই চিত্রটি, আমি বর্তমানের হাজার একটি স্পোর্টস্‌কার, হুইচি ও গ্রামাকোন আয়মান) করতে পারি নি। আমি প্রকৃত অর্থে একটি নতুন চিত্র উপহার দিতে পারতাম। কিন্তু আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম তাতে আমার নিজের স্থির বিশ্বাস ছিল যে কুড়ি পঁচিশ বছর পূর্বে যেটো গোশেন মায়ার হিসেন্স পারকিনসন, বি গ্রোন ইয়াস্ প্রভৃতি চিত্রে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন আমিও মূল গ্রন্থের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা তা করতে সক্ষম হব। ঐ চিত্রগুলির একমাত্র ত্রুটি যে তারা কচলিত স্রোতি অমুখ্যারী ছিল। কিন্তু যিনি এসে হাটিতে বাবে যিগকে তবুও ঐ চিত্রগুলি একটি ৮০০ পৃষ্ঠা পুস্তক পাঠের আনন্দ দেবে। Kast-এর চিত্রের ফ্যান্স বা আমার বিশেষ মনোমত ছিল তা সবেও আমি কোন ফ্যান্সানের দ্বারা হই নি এবং হুত্তেও চাই নি।

প্রঃ। অগ্নিনার হতে বর্তমানে গ্রাহেল ভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ?

উঃ। মাহুয়ের চিত্রাবলী নিত্য নূতন পথে ধাবিত হয়। এই সূত্রে পঁচটি কুহুমার্জ্য বলে মনে না হলেও একথা সত্য যে এখন সব কিছু ঠিক পথে হলে তখন মাহুয়ের আকাঙ্ক্ষাকেও তা অতিক্রম করে যায়। ১৮৭২ সালের শেষ দিকে প্রয়োজন্য ক্ষেত্রে যে সহচরগতি দেখা দিয়েছিল, তা কয়েক বৎসর আগে যন্ত্র-ও অগোচর ছিল। হার্গার্টে ডুহাস এর একটি প্রবন্ধ তিনি Hiroshima, Mon Amour-এ Resuais-এর সঙ্গে কাজ করার এক বিবরণ দিয়েছিলেন। Resuais তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁরা এই আলর্গে বিশ্বাস নিয়ে কাজ করবেন যে বাতে বইটি ব্যবসায়িক দৃষ্টি পায়। সুতরাং এই মনোভাব এবং পরবর্তী কালে "হিরোশিমা"র অসাধারণ জনপ্রিয়তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় বলে মনে করি। আমায়ের প্রত্যেকেরই প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি এখন Les Quatre Cents Coups-এর স্মৃতি করছিলাম তখন আমার হাতেই ছিল হুড়ি হাজার পাউণ্ড। কিন্তু খবর বেড়ে গিয়ে দাঁড়ার পঁচিশ হাজার পাউণ্ড। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম এবং ব্যবসায়িক মাল্য লক্ষ্যে যেনে লক্ষ্যস্থান হয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটি শেষ হবার পর ক্যানে যিগ উৎসবে ও বাহিরে যেখানেই এর চোখ বেশি অর্ধ

পেয়েছিলাম এবং একমাত্র আবেশিকা যুক্তগোষ্ঠী পরিএশ হাজার পাউণ্ডে ছবিটি বিক্রি হয়েছিল।

কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিশ্বাস করেন যে চিত্রের ব্যবসায়িক মাল্য নির্ভর করে যৌন, নতুনত্ব ইত্যাদির উপর এবং এই মাত্র তাঁরা নতুন যুগের মাত্র হতে হয়ে যুগে বেড়ান। এ কথা স্মরণীয় যে প্রথম হার্গার্ট আপোষের মধ্যেই নিহিত। মনে কখন একজন প্রাথমিক একজন পরিচালককে নিয়োগ করলেও যিনি ইতিপূর্বে কোন ছবি পরিচালনা করেন নি। প্রাথমিক মনে করেন যে এই পরিচালকের একমাত্র প্রাথমিক একজন ডাল আলোকচিত্র শিল্পী বা ক্যামেরাম্যান। এইখানেই তিনি মত বড় ভুল করেন কারণ যে ক্যামেরাম্যানের আলোক চিত্র গ্রহণের পদ্ধতি ত্রাপিকাল তিনি আনকোরা নতুনকে নিয়ে কাজ করতে পারেন না। ফলে আকর্ষণবিহীন বর্ণবিবরণ এক ছবি প্রস্তুত হয়। Decae বা Coutard-এর দ্বারা এই আলোকচিত্র শিল্পীরা নবীন পরিচালকদের সাহায্য করতে পারেন না। উপরন্তু এরা না পারেন ক্যান্ডিস্‌কাল পরিচালক তৈরী করতে, না পারেন ছবি তৈরী করতে।

দর্শক সাধারণও একই ভুল করেন। মাহুতার ক্ষমণের চিত্রনাট্যকার বা তারকার গুণর দ্বায়িত্ব অর্পণ করেন বা তাঁদের আভ্যন্তরীণ নহে। আভ্যন্তরীণ নানারকম ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ইত্যন্ত: বিবিশি পথে চালিত হয়েছি। আভ্যন্তরীণ ছবি তৈরী করার মনন করণার Rivette-ই আমায়ের মধ্যে লগ্নাশেখা কর্তব্য ও দক্ষ ছিল। সেইসময়ে প্রকৃত পক্ষে Astruc-ই নিকট পরিচালক বলে জাহির করতে পারতো এবং আমায় অবশিষ্ট কয়েকজন নিজেদের ধ্যান ধারণাকে ঠিকমত ব্যক্তবে প্রকাশিত করার সাহস পাইছিলাম না। Rivette-ই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তবে প্রকাশের পথটি নির্দেশ করলেন। তিনি আমায়ের একত্রে ডাকলেন, তাঁর অভিমত হলেন এবং কয়েকজন পরিচালক একত্রে ছবি করবেন বা ঐ ধরণের তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আমায়ের আগে আছে যে আমায় Resnais-এর কাছে আমায়ের দগভুক্ত হবার আবেশন নিয়ে গিয়েছিলাম। কাগজে লগ্নে এটা বুঝে সাধারণ ব্যাপার ছিল। Astruc, Resnais-কে সহকারী হিসেবে গ্রহণ করবেন; Resnais সহকারী হিসেবে পাবেন Rivetteকে, Rivette আমাকে

সহকারী হিসেবে গ্রহণ করবেন ইত্যাদি। বাজেট ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়েছিল এং আমরা আঠারো হাজার পাউন্ডের মধ্যে ছবি তৈরী করতে পারবো বলে স্থির নিশ্চয় হয়েছিল। আমরা প্রচেষ্টাকরের কাছে এই বলে ধর্গা দিয়েছিল। যে তুমি একটা ছবিতে পঁচাত্তর হাজার পাউন্ড খরচ করে, আমরা ঐ টাকাঃ মধ্যে চারটি ছবি তৈরী করে দেবো তার মধ্যে একটির ব্যবহারিক মাফল্য নিশ্চিত। Resuais, Astruc এং সন্ধ্যাই আমাদের প্রভাবে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন কিন্তু তারা তখন পেশাবাদী হয়ে গেছেন এবং তাঁদের নিকট বহু চিত্রনাট্য ও অন্তর চুক্তি থাকার আমাদের অন্য পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। আমরা Dorfmanu এং Beardar কাছে Rivette, Chabrol, Bitsch এং আমরা দেখা এক চিত্রনাট্য নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম। এই চিত্রনাট্য অবলম্বনেই

Les Quatre Jendis নামে চিত্রটি তোলা হয় ও Rivette পরিচালনা করে। আমার ব্যক্তিগত খাবার যে Alain Cavalier এর পরিচালিত Le Combat Dans l'Air-র দৃশ্য দেখে জড়ী ও গুণাবলী ঐ চিত্রনাট্যে বর্জমান ছিল। কিন্তু কোন প্রযোজকই আমাদের প্রভাবে এগিয়ে আসেন নি। সুতরাং আমাদের ধারণা হোল যে কোন প্রযোজকই কল্পনাতে ছবি করতে চান না। কিন্তু তখনও আমাদের জানতে বাকি ছিল যে প্রযোজক নিজের অর্থব্যয় করে ছবি করেন না, তিনি প্রযোজনীর অর্থ ঘোণাড় করেন এং শতকরা একটা অংশ তাঁর পকেটস্থ হয়। যত বেশী খরচে ঐ ছবি তৈরী তাঁর লাভ বেশী হবে। সুতরাং আমাদের প্রভাবে যে কেউ দারুণ ছেয়েন না এটাই স্বাভাবিক। [ক্রমশঃ]

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

সরীর চ্যার্টারজি—ছক খানসাহা লেন, কলিকাতা
বাংলার কাকীর জীড়া কি ?

০ বোনা বাবা, ছবি বাবা ও ইন্দুল কপেজের চৈবিল চেণার ভাড়া। গুমাগন ভাড়াটা এর সঙ্গে ধরা যেতে পারে কিনা ঠিক বলতে পারলাম না।

মদন বজুজা—কাটিঘাট

০ এই বৎসরে অসীল প্রণের জবাব দেওয়া হয় না।

ভক্তিব্রত দাসগুপ্ত—কেহাভগা বোড, কলিকাতা

অর্ণবা দেব, কাংবো বহু, জাবাই বহু, আরতি গাংলীর

(নতুন পাতা খাঃ) জীবনী জানতে চাই।

০ জীবনী জানবার জন্যে বাজারে আসো অনেক পত্রিকা

তো আছে। ও বাপায়ে আগবের নাইবা টানলেন।

যেমগাহে (চিত্রশিল্পী হিসেবে)

০ বীণেশ বসু—গোপপুত্র বোড, কদমা

নটী বিনোদিনীর বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

০ বিনোদিনী নটী ছাড়া একজন মূল্যবোধ ও ছিলেন তখনীয়ন কালে। বাগনা ও কনকনিনী নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ এবং আত্মকথা নামে পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। দেবালের প্রবীণা অভিনেত্রী ঐশ্বরী ভগবতাবিনী ব্যতীঃ আর কোনও অভিনেত্রী তখনকার দিনে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না।

অভিনয় নৈপুণ্যেও বিনোদিনীই প্রথম মহাপুরুষের রূপা লাভ করে বক্তা হয়েছিলেন। তখনকার দিনে চৈতন্যদাসের বিনোদিনীর চৈতন্যের জীবিকাভিত্তিক ধর্মে তৎকালীন সময় বাংলাদেশে তত্ত্ব রপে ভূগে গিয়েছিল। ঐরাবতুক পদমহৎপুরুষ বিনোদিনীর চৈতন্যের অভিনয় দেখবার

জন্মেই প্রথম নারীশালায় পথদূলা হন। অতিনয় বর্ষনে
ভাষাবিহী হইবে “ভাষাবিহী হইবে” বলে বিনোদিনীকে
তিনি আশীর্বাদ করেন। বঙ্গদেশে এইরকম নারীশালা আর
কাকুর হইবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়াংশের ব্যতিক্রম
ও বিনোদিনীপ্রতিভা। দ্বিতীয়াংশের জন্মস্থান ও দায়িত্ব,
আমল বহো নাটকে লক্ষ্য, বাৎসর্য ও দীর্ঘায়ুসংক্রান্ত
বাহ্যের বন্যাসে কৈকেয়ী, বঙ্গদেশে পতি, ক্রাচিঃ প্রভৃতি,
নন্দকরকীর্ত্তে রম্যকীর্ত্ত, উত্তরলীলা ও নিমাইসুখ্যে প্রভৃতি,
বুদ্ধদেবে গোপা, বিশ্বকলে চিত্রাঙ্গ, প্রভৃতি এই নাটকে
বহু ভূমিকার অভিনয় করে শ্রীমতী বিনোদিনী সে সময়ে
বঙ্গনাট্যশালায় যুগান্তর এনেছিলেন। এক্ষণেও সর্বদা
একাত্মিক কাকুর, জগৎপাশ্বিনীতে তিলোত্তমা ও আশ্বেষা,
দুর্গাশিনীতে মনোহরা, কপালকুণ্ডলায় কপালকুণ্ডলা,
বিষয়কে কুম্ভ, বিদ্যাবিনোদীতে বিলাসিনী কাব্যকবিতা প্রভৃতি
চরিত্রাভিনয় তৎকালীন বাংলা দেশের রসময়কে ডাকে দ্বারা
আগমনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। স্বয়ং দ্বিতীয়াংশের বলতেন যে
কল্যাণচরিত্র চরিত্রাভিনয়ে বিনোদিনী অস্বীকার্য ছিলেন।
তু মক। উপযোগী তৎপরিচয়, গোপা ও মেক আপ স্বয়-
ং স্বয়ং অতুলনীয় ছিল বিনোদিনীর। পরবর্তী যুগের
অনেক অভিনেত্রী বিনোদিনীর অগ্রকরণে সাক্ষ্য গোপা
তৈরী করেছেন।

সিবানী ভৌমিক—মজলি বোত, নারেকেন্দ্রাক।

হাটে বাতারে ছবি আউটডোর স্ট্রীট কোয়ার
হয়েছিল।

০ গ্যাটকের কাছে।

ব্রজেন ঝাল—মনোহর পুত্র হোভ, কলিকাতা

তিন ভুবনের পাঠ—ভেবোনবী, না ভেবোনবীর পাঠ
—তিন ভূমণ।

০ আপে বলুন পাঠ্যাব্যব চৈল না তৈলাব্যব পাঠ।

ব্রজেন ঝাল—মনোহর পুত্র হোভ, কলিকাতা

“কলী গাইন বাবা বাইন” ছবিটি নাকি দ্বিতীয়াংশ বাবুর

শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নিদর্শন বহন করছে? আপনার কি
অভিমত?

০ দ্বিতীয়াংশ বাবুর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নিদর্শন? এখনও
অবধি কীরূনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম কি দৃষ্টি করতে পেরেছেন
দ্বিতীয়াংশ বাবু?

আলোক বসু—হৃদয় প্রোভেই

নতুন পাঠ্যাব্যব আওতে গাঙ্গুলীর চরিত্রের অভিনয়ের
অগ্রদূত বাবা জানাবেন।

০ কথা বিলাস জানাব।

৭ এম, এম, হোভ, কলিকাতা

০ পুরো নাম টিকানা না থাকলে প্রবেশ উত্তর দেওয়া
হয় না।

ভপন স্ত্রী—মহেন্দ্র গোপালী লেন, কলিকাতা

ইন্দ্রাবীর মিত্রকে হঠাৎ মিলে আর্থ থা। প্রেসিডেন্ট
হয়েছিলেন, আর্থ থা। হঠাৎ মিলে ইন্দ্রাবীর থা। প্রেসি-
ডেন্ট হলেন। এম হা। কি প্রমাণিত হল?

০ প্রমাণিত হল যে ইতিহাসের বিচার অত্যন্ত
নির্ভুল এবং নির্ভর।

খোদেজা খান—মমনা, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান

আমাদের এখানে পশ্চিম বাংলার কোন ছবি মুক্তি পায়
না। পশ্চিম বাংলার ছবি পূর্ববর্তী বর্ষবাদের মধ্যে উচ্চ-
মানের শিল্পকর্মের মধ্যে তবু ঐশ্বর্য ছবির সঙ্গে আল
অবধি আমাদের কোন জ্ঞান পরিচয় হল না এটা বুঝই
হুঃখের বিষয়। আপনারা এখানে ঐশ্বর্য ছবির মুক্তির ব্যবস্থা
করতে পারেন না?

০ রাজনৈতিক আবেগে পড়ে আল হাঙ্গারী জাতিটারই
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার দুখে। আপনারা আল হাঙ্গারী
রাজনৈতিক (অভি) নেতাদের কি আর আল বলুন।
বিলাস কলম এ হ্যাঙ্গারীর আদর্শের কিছু করবার ক্ষমতা
নেই। দুই বাংলার মধ্যেকার সম্পর্কটা বর্তমান না সত্ত্বে
হচ্ছে তবুও পূর্ণাঙ্গ আদর্শের বৈধতা মনে থাকতেই হবে।
জবে মনে হয় সেদিন আর পূর্ব বঙ্গের নেই।

অমল ঝাল—কাটোয়া

বাতীস সাহা। এর আগে কি কোন পরিচালকের সঙ্গে বা চিত্রনির্মাতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

০ শিকানবীণা দিয়েছে চিত্রনির্মাতার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তবে এখানে নয়, ইটালীতে ও প্যারীতে।

গণেশপ্রসাদ ভেটওয়ালী—পরিচিতি। বোম্বে, কলিকাতা।

সেই থেকে হুঃ কি পরিচালনা করেছেন?

০ চিত্রগাথী নামে এক পরিচালক গোষ্ঠী।

অরুণ বসু—পাউণ্ডারি বোম্বে-কলিকাতা।

Crane Shot ও Freeze shot কাকে বলে?

অবস্থিতি বা স্থলে একই বৃত্তির ধরনের?

০ যথা যাক কোন একটি নাতের দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে। আটমেন ছেলেমেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মাচাড়ে ও বুকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি ঘরে গান গাইছে। একটি শটে হঠাৎ প্রয়োজন পড়ল প্রথমে বুকের চারপাশে আটমেন শিল্পী ও সত্যের শিল্পীকে নিয়ে ছবি ফ্রেম Compose করবার, পরে Camera আগে আগে এগিয়ে এসে অগ্রগত শিল্পীদের বাহু দিয়ে বুকের মাঝখানে যে যেখানে গান গাইছে শুধুমাত্র তাকে Frameএ Compose করবে, কেননা তার অভিব্যক্তি ছবিটাই শুধুমাত্র প্রয়োজন। এখন সাধারণ Eye level হতে Cameraকে বেশ এ-টু উঠতে রাখতে হবে কেননা একমুখে ন'জন শিল্পীকে হার ছবি ফ্রেম প্রয়োজন, এবং একটি বিশেষ দৃষ্টান্তে Camera আটমেন শিল্পীকে বাহু দিয়ে হার একজন শিল্পীর মুখের কাছাকাছি এগিয়ে আসবে। তখন Cameraকে ক্রেনে বসিয়ে চোদ পনের ফুট উঠে হঠাৎ শট নিতে শুরু করবে এবং প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্তে বীরে বীরে নেমে এসে একজন শিল্পীর মুখের তিন চার ফুটের মধ্যে দাঁড়াবে। সাধারণতঃ হিন্দী ছবিতে নাতগানের দৃষ্টান্ত এই ধরনের ক্রেন শট দেখতে পাওয়া যায়। কেননা আবার অগ্রগত ভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ধরুন "শান্ত পাকে ধারা"র একটি দৃষ্টান্ত কথা। বিহেবাড়ি। নাতিকা তিনতলা হতে একতলায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। কোনদিকে তার ফ্রেন্স নেই, আপন চিত্রাংগেই

সে বিচারা। এক্ষেত্রে Cameraকে ক্রেনে বসিয়ে তিনতলা হতে একতলা পর্যন্ত শুধুমাত্র নাতিকার অভিব্যক্তি ছবিটুকুই গ্রহণ করা হয়েছিল। ছবির Frame Compose করা হয়েছিল নাতিকার মাথা হতে কাঁধ পর্যন্ত, ক্রেনের দু'পাশ দিয়ে বেধা ব্যাঙ্কিং বিহেবাড়ির লোকজনের বাহু আনাগোনা।

Freeze shot হচ্ছে একেবারে স্তব্ধ ধরনের। চলচ্চিত্রে একটি গতি সব সময়ই আছে, কথা, বলা, হাঁটা, ঘোড়ান, নাচ, গান, ইত্যাদি নানা ধরনের গতি দেখলে খংকেই কিছু বিবচিত্র এবং সম্পূর্ণ বিপরীত। বিবচিত্র সবকিছু স্তব্ধ নয়। চলচ্চিত্রে নাটকের প্রয়োজনে অনেক সময় গতিতে একেবারে দাঁড়িয়ে থাকা হয়। যথা যাক একজন লোক চিংপুর হোটে ঘিরে ঘোড়ছে। তার পাশ পাশ দিয়ে ট্রাম বাস যাচ্ছে, অস্ত্রাঙ্ক লোকজনও হেটে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল সবকিছুর গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে লোকটি ঘোড়ছিল সে ঘোড়নয় স্তব্ধতাই দাঁড়িয়ে আছে। চল ট্রাম বাস যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তার লোকজনও হাটবার স্তব্ধতাই একই ভাঙনায় দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি একটা হাট ট্রামের সামনে থেমে সেখান তুলে ঘোড়ছিল। সেও ট্রামের সামনে থেমে তুলে ঘোড়নয় স্তব্ধতাই দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে স্তব্ধ ছবিটাই বিবচিত্র পদবিগত হয়ে গেছে। এই ধরনের শটকেই সাধারণতঃ Freeze shot বলা হয়ে থাকে। নাটকের বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই এই ধরনের শট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

—এই ছবি প্রদর্শন উদ্দেশ্য Society of Cinematographers India'র পৌরস্বত্ব প্রাপ্ত।

শোভা সিন্ধু—পাউণ্ডারি বোম্বে-কলিকাতা।

টেটোব পরে টেটোব চিত্রনাট্যটি পূর্ণ তাল লাগছে। এই পরিচালকের আর কোন ছবি নেই?

০ আপাততঃ নেই। টেটোবের পরে টেটোই হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের সাততাল মশায়ের জীবনের প্রথম প্রেম। বিভিন্ন ছবি ছাড়াপরের ছটিও সব এখনও শেষ হয়নি।

প্রশ্নঃ চক্রবর্তী—মোহন বা'নারি লেন-কলিকাতা।

কলকাতার বর্তমানে কতি ডিয়গু চালু আছে ?

০ যে কতি ডিয়গু আগে চালু ছিল, সব কটিই ।

গোলাব ঘরীউদ্দিন—পানবাগান লেন-কলিকাতা।

বিলীপসুনার ও উত্তমকুমারকে ছুঁত করে একটা

ছবি করা যায় না ?

০ কোন্ ভাষায় ?

মোতি উদ্ভাষণ—বাগুড় বাগান রো-কলিকাতা।

শমিলা ওবা অয়েবা দেবী আখার কিয়ত গগতে নাকি

ফিরে এসেছেন ? কোন্ ছবিতে এখন অভিনয় করছেন ?

০ সত্যজিৎ বাহ পরিসালিত অরুণোর দিনরাত্রি

ছবিতে । কিয় শমিলা ঠাকুর অভিনয়ে অগত ছেকে

চলে গিয়েছিলেন তবে তাতো জানতে পারলুম না ?

চিত্রলেখা



(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)

দফাল। দাইদারের অভূত।

দাইদার একজন জেলের সঙ্গে কথা বলছে । দুবে
একটা বিশেষ বাখাবির বেকে নিতাই বসে আছে ।

দাইদার জেলটিকে বলে ।

দাইদার—তোর তিন দিনের বোঝ পাওয়া হল,
কু'ছদ ?

জেলটি মাথা নেড়ে চলে যায় । দাইদার নিতাইয়ের
দিকে তাকায়, বলে—

দাইদার—শোন নিতাই, একিকে আর

নিতাই দাইদারের দায়নে এসে নিচে বসে । দাইদার
বলে—

দাইদার—একটা কাজের খোঁজ আমি তোকে দিতে
পারি—গহনার নৌকোর—

নিতাই—গহনার নৌকোর ?

দাইদার—হ্যাঁ । তোকে ভলোবাসি বলছি ।
তোর মত জোয়ান ছেলের এখানে এই গায়ে এই সব ছোট-
খাট কাজ কি মানায় ? শোন, বড় বড় নৌকো নিয়ে
ওয়া সমুদ্র ঘুর পাড়ি যেত । হু-তিন মাস বাইরে বাপিয়া
করে আবার সব ফিরে আসে । মাইনে ভাল, খোয়াকি
দেবে । কতবি এ কাজ ?

বাগে ধরে নিতাই বলে—

নিতাই—কুদি সব বাবুয়া কর—আমি করব দাইদার
দাইদার—বেশ । রোববার ছিন সকালে ওদের
নৌকো আসবে । তুই তোদের থাকিল । এতে তোরা
ভাল হবে নিতাই—আমি বলছি তোরা মফল হবে ।

যাত্রি । নিতাইয়ের শোবার ঘর । মাটিও প্রাণের

মাঝে বসে পদ্ম কাঁথা দেগাই করছে। চেখেচুরে আছে বলে। শিঙনে চৌকীর ওপর দুমক বীকর পাশে বসে নিতাই দাখনা দেহ পদ্মকে—

নিতাই—কোন ভয় করিগনা পদ্ম। কেঁদে বনকে দুর্বল করিগনা। আর কাঁথার কি আছে? আশিতো দুখান পুরেই ফিরে আসছি—

মাথা নত করে পদ্ম একমনে কাঁথা দেগাই করতে থাকে

দুমক বীকর গায়ে হাত বুলিয়ে নিতাই বলে—

নিতাই—আবার বীককে হালুদ করতে হবে।... আর একজন আসছে তাকেওতো হালুদ করতে হবে। (একটু থেমে) ফিরে এসে তোকে কত বেশ গিবেনের গল্প বলবো—

দুখ তুলে পদ্মকে তাকায় নিতাই।

পদ্ম একইভাবে সেগাই করে চলে

নিতাই পদ্মকে বলে—

নিতাই—আরে দুখ কিয়িবে রইলি কেন? আমার দিকে তাকা নকৌটি। একটু আনন্দ করে হাল—আমি যে নতুন কাশে যাচ্ছি—

চৌকী থেকে নিতাই পদ্ম পাশে এসে বসে। ওও অক্ষরতা খুঁটা দুহাতে তুলে ধরে বলে—

নিতাই—হি: পদ্ম! তুই এত দুর্বল! নদুয়ে ভয় কিরে? ভগবানের ওপর ভরসা রাখ। সমস্ত মগৎ তাঁর। আমি যেখানে যাচ্ছি তা যেমন ভগবানের—যে নদু পাকি যেখা তাওতো সেই ভগবানের। পর তাঁর তৈরী, তাঁরই রাক্ষ। কাশিল না—

পদ্ম ঝাঁটলি দিয়ে দুহাতে চোখ চেপে ধরে। বাঁ ভেঙ্গে যায়।

সকাল। নিতাইএই শোবার ঘর। চৌকি থেকে একটা কাপড়ে ধাওয়া পুটুদী তুলে নেয় নিতাই, তারপরে পদ্ম কোলে বীককে একটু আদর করে বীরে বীরে বলে—

নিতাই—চুটু বী কোর না বাবা, কেমন? দুখ তুলে পদ্মকে হিচকায়ে তাকায় নিতাই। বিহারের দুহুটে নিতাইকেও একটু দুর্বল করে দেয়। বীরে পদ্মকে বলে—

নিতাই—আমি

পদ্ম পদ্মর ঝাঁটলি তড়িয়ে নিতাইকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। বীককে একটু আদর করে কপালে দপেতে চুপু দেয় নিতাই। চোখে জল এসে যায় নিতাইয়ের। পদ্মকে লুকিয়ে শাদ কিরে চোখের জল মুছে দরবার দিকে এগোয় নিতাই।

শিঙন ফিরে পদ্ম অক্ষুটবরে বলে—

পদ্ম—দাঁড়াও

নিতাই দাঁড়িয়ে পড়ে। দুখ কিয়িবে তাকায়।

কুপুজিতে তাঁর ঠানুয়ের পুটের কাছ থেকে একটা ছোট কোটো এনে নিতাইয়ের হাতে দেয় পদ্ম। কোটোটা হাতে নিয়ে নিতাই বলে—

নিতাই—কি আছে এতে!

পদ্ম—চৌতপার দুখ ও বেশপাতা। সজে রেখো।

কোটো মাথার ঠেকিবে নিতাই জামার ভিতরেও লকটে রাখে। বীরে মাথা নেড়ে বিহার নিয়ে দরতা দিয়ে বেরিয়ে যায়। পদ্ম বীককে কোলে নিয়ে পিছু পিছু যায়।

বেড়ার কাঁপ তুলে নিতাই বেরিয়ে এসে শিঙন ফিরে তাকায়। পদ্ম বীককে কোলে করে বেড়ার এপাশে এপাশে দাঁড়ায়। দুখনে চেয়ে থাকে দুজনের দিকে। কিছুক্ষণ। অশ্লক বিহারদুখ বুটী। নামলে নিয়ে কোন বকমে নিতাই বলে—

নিতাই—গাবরানে থাকিল

কিবে ক্ষতপায়ে এগিয়ে যায় নিতাই।

পদ্ম তাকিয়ে থাকে নিতাইয়ের গতিপথে। বুটী বেগপাতে হয়ে আসে চোখের জলে—

গমনার নৌকার লাগ।

মানবভেদে কাপড়েও তালি দেওয়া শাল বাতালে তুলে উঠে তুলে তুলে চলতে থাকে।

দিগন্তের দিকে এগিয়ে যায় গমনার নৌকা। শূন্যের আলোর শিকারিক করে ওঠে মাগের রঙ্গ

পট জুড়ে জেলে ওঠে অক্ষরজল একখানা দুখ—

দূরে নিবন্ধ পত্র দৃষ্টি চোখের জলে আপসা হয়ে যায়। পট থেকে মিলিয়ে যায় গহনার নৌকো—ভেলে ওঠে দূরে সমুদ্রপারের কাউন্সিলার, বীজকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম। অশান্ত সমুদ্র গর্জন করতে থাকে—মিলিয়ে যায় পদ্মের মূখ। চেউএর পরে চেউ এলে আছড়ে পড়ে সমুদ্রের পাড়ে। ঝাঁকলে চোখ মুছে পদ্ম ফেরে গ্রামের পথ ধরে।

বীজকে কোলে তুলে নেয় পদ্ম। জুতোধে তার জলের খাড়া।

খাঁড়ির রক্ত বালুচর। নৌপ আকাশে ধলে ধলে যেথ ভেলে বায় বাতাসে এদিক থেকে ওদিক। তপ্ত বালুর ওপর ছায়া পড়ে মেঘের—নয়ে নয়ে যায়,—মিলিয়ে যায় দূরে।



নিভাই, পদ্ম, বীজ ও লেটিন

নিভাইয়ের বাড়ি। দাওয়ার বসে একটা ছেঁড়া জাল মেঝামত করে চলেছে পদ্ম। ঘর থেকে ছোট বীজ কাঁচতে কাঁচতে এনে থাকে জড়িয়ে ধরে জুড়াতো। জাল বেখে

নিভাইয়ের বাড়ী। পদ্ম জাল মেঝামত করছে। সমস্ত শরীর তার ঘামে ভিজে গিয়েছে। আর বেন পারছে না সে। মহনা আছে। নতুন বিয়ে হয়েছে মহনার। বগুড়াবাড়ী থেকে কিংগেই পদ্মর সঙ্গে দেখা করতে এলেছে সে। ওকে ঘেঁষে পদ্ম একটু বিবর্ণ হাদি হালে। মহনা দাওয়ার উঠে বলে। বলে—

মহনা—একি শরীর করেছিগরে!

পদ্ম নীরবে চেরে থাকে। মহনা বলে—
মহনা—দত্তা, নিভাইবাটা কী—ছ মাস ধরে তোকে এ অংহায় রেখে কি বে করছে ভাল লাগে না বাপু—

কোন কথা না বলে পদ্ম আবার জাল মেঝামত করতে থাকে। মহনা আবার বলে—

মহনা—পদ্ম, এত যে খাটিছিল—এ সময়ে এরকম কি ভাল?

মুখ তুলে পদ্ম বলে—

পদ্ম—কি করবো বল,—খোততো হবে।
(একটু থেয়ে) আমি না হয় নাই খেলায়—
কিন্তু ও—(পদ্ম উঠানের ঘিকে তাকায়)

উঠানের এক কোণে বীজ একটা ভাঙ

পুতুল নিয়ে খেলা করে।

পদ্ম কেঁদে বেলে অকোবে। আর কিছু বলতে পারে না সে।

লম্বা। সমুদ্রের বেলাতুমির উপরে বীককে কোলে করে পদ্ম দাড়িয়ে থাকে। সমুদ্র বিপত্তে ওর দৃষ্টি। পূর্বের শেষ বর্ষি অশেষকথা পদ্মর গুণর পড়ে। অত্যন্ত গোকা-চুহ বৈশাখ পদ্মকে। আনত নমনে বীরে গ্রাসের পথে কেরে পদ্ম।

নিভাইয়ের বাড়ী। বীক উঠানে খেলা কছাছে। বেড়া সহরে শাইবার উঠানে প্রবেশ করে। বীককে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে পদ্মকে ডাকে—

শাইবার—পদ্ম, পদ্ম আছিল।

যর থেকে বেড়িয়ে দাঁড়ায় এলে দাঁড়ায় পদ্ম। শাইবার বলে—

শাইন ব—সরীর ভাল তো?

বাধা হেলিয়ে পদ্ম আনার ভাল আছে।

বীককে পদ্মর কোল দিয়ে শাইবার কতৃষ্ণর পক্ষেট থেকে পাঠোঁটা টাক। বের করে পদ্মকে বলে—

শাইবার—এই নে টাকটা রাখ। পরে আরও কটা জাল পাঠিয়ে দেব।

টাক। বাতে নিয়ে পদ্ম দাড়িয়ে থাকে। শাইবার চলে যায়। সেই দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার চোখ নামিয়ে নেয় পদ্ম।

রাত্রি। জালালার ঘরে দাড়িয়ে আছে পদ্ম। ঘুরে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। একসময়ে জানালা থেকে দূরে এসে বীককে কোলের কাছে নিয়ে গুয়ে পড়ে।

পদ্ম বদন বেখে।

অশান্ত সমুদ্রে একটা। কার্টের আশ্রয় আশ্রয় করে নিভাই ভাগছে।

ঘুম ভেঙে যায় পদ্মর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়। জড়বন শাই শাই শখে বেতে উঠেছে। ঘুরে সমুদ্র গর্জন করে চলে।

জড়বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে লোটন ও শাই-বার। লোটন বলে—

লোটন—নানা কালের কামেশ্বর এ কটা খাল গায়ের বাইরেই তো কেটে গেল শাইবার। তা এদিকের খবর কি? বছর ঘুরতে চলল নিভাইয়ের কি কোন খবরই শেলে না?

শাইবার—কি তাৎপাথ—আর কি হোল! গহনার

নৌকোর কাজ বিলাব, দুহাসের মধ্যে কেহায় কথা। এতদিন হয়ে তা কে জানতো? (একটু বেখে) এদিকে পদ্ম জাপটাল মেহামত করে কোনরকমে দিন চালাজিল—কিন্তু ওর ওই মরা ছেলোটা হবার পর থেকে বেচাটী একেবারে ডেতে পড়েছে।

লোটন স্তম্ভ হয়ে দাড়িয়ে পড়ে। চিন্তাসিঁটি বুখে শাইবারের দিকে তাকিয়ে কোন কিছু না বলে বীরে বীরে অগ্র দিকে চলে যায়। বিরহভাবে শাইবার তাকিয়ে থাকে লোটনের দিকে।

রাত্রি। নিভাইয়ের বাড়ি। চাষবিক নিস্তম্ভ। বাড়িতে যেন কেউ নেই মনে হয়। উঠোন পার হয়ে লোটন দাঁড়ায় এনে ওঠে।

দরজার কাছে দাড়িয়ে লোটন একটু ভাবে তাৎপরে বীরখবে ডাকে—

লোটন—পদ্ম; পদ্ম!

বরের হোমলার পাটিতে বসে আছে পদ্ম। পিছনের চৌকীতে বীক নিস্তম্ভ। লোটনের ডাক শুনে পদ্ম স্থানিয়ে কেঁদে ওঠে।

বাইরে লোটন পদ্মর কান্নার শব্দ শুনতে পায়। একটু-ক্ষণ অপেক্ষা করে দরজা ঠেলে লোটন ভিতরে প্রবেশ করে।

ভিতরে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে লোটন তারপর বীরে বীরে পদ্মর পাশে এগা বসে। পদ্ম নীরবে কাঁদতে থাকে। লোটন বলে—

লোটন—পদ্ম

পদ্ম কিছু বলে না। লোটন আবার বলে
লোটন—তোমর কাছে আমি একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি পদ্ম—

পদ্ম লোটনের দিকে ঘিরে তাকায়। তার দুইতে যে কাকুবা ফুটে ওঠে শুভেতে বোকা যায়; একজন নিঃস্ব-ধারিতর কাছে সে কি ভিক্ষা শেতে পারে।

লোটন বলে—

লোটন—আমি তোকে বলতে এসেছি নিভাইয়ের কথা পদ্মর চোখে জিজ্ঞাসা, বাগুভাবে বলে সে

পদ্ম—তোমার সে ?

মাঝা নীচু কণ্ঠে লোটন বলে—

লোটন—সে তোমার জা আমি জানিনা পদ্ম । (একটু খেমে) আমি বলতে এলোছি তার ইচ্ছার কথা । নিতাইকে আমি জানি তুইও ভালভাবে চিনি । তার মত সাধনী, শক্ত হুমিয়ার কইই আছে—

হাঁটুর ওপর দুখ রেখে পদ্ম নীরবে কানতে থাকে

লোটন বলে—

লোটন—অম্বা যুরে বেড়াবার মত লোক সে নয় । তোমের ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক এই ছিল ওর ইচ্ছে । কিরে এসে তোমার এ অম্বার বেথল নিতাই দুঃখ পাবে ।

লোটন পদ্ম বিকে তাকায় । পদ্ম নীরবে কেঁদে চলে ।

লোটন বলে—

লোটন—পদ্ম, ভগবান আমারে অর্থ দিয়েছেন । বীকর লেখাপড়ার ভার তুই আমার ওপর রে । ওহু এই ভিক্ষে-টুকর চলেই তোম কাছ এলো—

একটু ধরে লোটন আবার বলে—

লোটন—হয়ত তারি, তোম এত দুঃখের মধ্যেও আমি কেন এতদিন আশিনি—তোমের খেঁজ নিইনি ? আমি কেবল ভাবতাম সখাভের কথা, গাঁয়ের লোকদের কথা—

পদ্ম ক্রমশঃ তৃপ্ত হুখে ও কৃতজ্ঞতার আগো নীচু হয়ে যায় । সেই মুখে ওপর ভেসে আসে বাসুর স্বড় । পদ্মর অশ্রু-স্রোত দুখ ময় মিলিয়ে । ক্ষুণ্ণময়ী বাসুর স্বড় ছুটে যায় কিংকর বিকে । একদমই স্বড় খেবে যায় । গড় থেকে তরঙ্গসিক্ত শান্ত ত্রিভ বেলাহুহি ।

নিতাইয়ের বাড়ি । বাগার বলে লোটন বীককে পড়ায় । এখন বীকর বয়স আট বছর । একটা প্লেটের ওপর করেকটা অঙ্ক লিখে বীককে দিয়ে লোটন বলে—

লোটন—নে, এগুলো করে ক্যাল ।

বীক প্লেট নিয়ে কত গুণে ঝাঁক কবতে শুরু করে দেয় । লোটন অন্তরঙ্গ ভাবে চেয়ে থাকে ঝাউগনের বিকে । পদ্ম কিছু বাটককি ও শুকনো পাতা নিয়ে রান্না-খরের ভিতরে চলে যায় ।

বাইয়ের পথ দিয়ে একজন লাউএর কাঁকা মাথার

নিরে যায় । লোটন বাগার থেকে দেখে শুকে ডাকে—

লোটন—ও হাক, কেবি তোম লাউ—

হাক উঠোনে আসে । লোটন নেমে কাছে যায় ।

লোটন—হুটা লাউ তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—

লোটন—এ হুটা কতবে ?

হাক—আট আনা পড়বে

লোটন—কি আট আনা ! ছ আনা । যা—বিকেল বেলা বাড়ি থেকে পরলা নিয়ে যাস ।

হাক—বে আসে

লোটন লাউহুটে নিয়ে বাগার নিচে রেখে নিজের আধগায়ে গিয়ে বলে । হাক লাউএর কাঁকা মাথার তুলে নিয়ে চলে যায় । বীক প্লেট এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—

বীক—এটা কি হবে ?

অন্তরঙ্গ লোটন চমকে বীককে বিকে তাকায় । প্লেট হাতে নিয়ে ভুল সংগোধন করে দেয় । তার পরে বলে—

লোটন—যা বীক—ইজুগের বেলা হয়েছে—স্নান করে নে এবার—

বাগার নীচে নেমে লোটন চলে যায় । বীক বই প্লেট ওড়িয়ে নিয়ে উঠে শেড়ে । উঠোনে বড়িতে কোলান গাশছাটা টেনে নে । রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পদ্ম বলে—

পদ্ম—কিরে কাঁকু চলে গেল ?

বীক—হ্যা

পদ্ম—আরে, লাউ হুটা গড়ে হইল যে, বা যা নিয়ে আর—

বীক লাউ হুটা নিয়ে বৌড়ে চলে যায় । পদ্ম রান্নাঘর গোবর গুল নিয়ে উঠোন নিকোতে থাকে ।

লাউ হুটা বীক বিড়িয়ে নিয়ে আসে । পদ্ম জিজ্ঞেস করে—

পদ্ম—কিরে ফিরিয়ে নিয়ে এলি যে ?

বীক—কাঁকু আমার খেতে দিলে যে

মহুশপাড়ে ভাদিনী শিশির চারের থোকান । একজন বৃদ্ধ বলে চা খাচ্ছে । পেগাস হুতে হুতে ভাদিনী শিশী বলে—

ভাদিনী—ওদের দুজনকে ছোটবেলা থেকে দেখছি

যেন ঘরম ভাই। লোটনের মত অমন ছেলে আছে
কখনা—?

বৃদ্ধ ভেলে—জা ঠিক

ভক্তচরণের বাড়ী। গুরুচরণ মারা গেছে। লোটন
সেয়েতার হাতবান্ধের সামনে বলে জাবোবা। মাতার পাখা
উলটিয়ে বেধে। সামনে একটা ছোট টুপে বলে একম্নন
কবক বলে—

কবক—এবারের কিস্তির টাকাটা দিতে পারেনা না।
বড়ই টানটানিতে আছি—

লোটন—ভাখ, এতে তোহই অক্সিয়ে ধবে, একেবারেই
দু কিস্তির টাকা—

কবক—ছোটকর্তা। ফল কাল হলে একেবারেই দিবে
যেব

লোটন—আচ্ছা বা।

সেয়েতা থেকে উঠে লোটন বাইরে আসে। পকাকে
ভেকে বলে—

লোটন—এই পকা, আমি আজ বসন্তপুঃ ছাঙ্কি, কুই
ন পাড়ার হাটে গিয়ে দরকর ভূই এনে রাখবি।

পকা মাথা নেড়ে কতকগুলো বাধাবি হাতে নিয়ে
যেহিরে যায়।

রাহি। ঝাউবনের ভিতর ঘন অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ
ভেকে চলেছে দখান। মাঝে মাঝে নানা ধরনের বুনো
পাখি ভেকে ওঠে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বীক প্রাণপণে
ঝোড়ে একদিকে চলে যায়।

বীক লোটনের বাড়ির কাছে আসতেই পকা বাড়ি
থেকে যেহিরে আসে। হাংগাতে হাংগাতে বীক বলে—

বীক—পকাবা, পকাবা, কাকু কিয়রেছে ?

এত রাত্রে বীককে যেখে পকা পকাব হয়ে য'হ। ঋত
এল বীককে ধবে, বলে—

পকা—কীয়ে বীক, এত রাত্রে ?

বীক—কাকু কিয়রেছে পকাবা ?

পকা—ছোটকর্তা এখুনি ফিরশে, মামা কাপকও—

(নেপথ্যে লোটনের গলা)

নেপথ্যে লোটন—কেবে ?

লোটন বাড়ি থেকে যেহিরে আসে। বীককে বেখে
বলে—

লোটন—কীয়ে ?

বীক লোটনকে জড়িয়ে ধরে কৈশে ফেলে। কাঁধতে
কাঁধতেই বলে—

বীক—কাকু, মা খেন কেমন করছে—

লোটন বীকর মাথার হাত খুলিয়ে দিয়ে বলে—

লোটন—ছিঃ বাবা কীয়েনা—

লোটন পকাকে বলে—

লোটন—পকা, বীককে বাড়ি পৌছে দে। লঠনটা
সঙ্গে নিয়ে যা। জাকাববাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমি এখুনি
আসছি।

বীককে পকাব দিকে এগিয়ে দিয়ে লোটন সেই বেপশেই
যেহিরে যায়।

নিজায়ের বাড়ী। পদ্ম জবে বেইশ হয়ে পড়ে আছে
বিছানায়। মাথার কাছে চুপ করে বসে আছে বীক।
বহজাব বাইরে বাওয়ার বলে পকা গুন চুলছে। নেপথ্যে
লোটনের গলা—

(নেপথ্যে) লোটন—এদিকে আইন জাকাববাবু—
এদিকে

বীক হজজাব দিকে তাকায়।

লোটন জাকাববাবুকে নিয়ে ধবে প্রবেশ করে। পদ্মর
বিছানার পাশে জাকাববাবু এলে বলেন। লোটন জাকাব-
বাবু ব্যাগ বিছানায় ওপর রাখে।

পকেট হতে চমকা বেব করে পবেন জাকাববাবু।
পদ্মর নাড়ী ও চোখ পরীক্ষা করেন। তারপর লোটনের
দিকে তাকিয়ে বলেন—

জাকাববাবু—ভয়ের কোন কারণ নেই। পকাকে
নিয়ে ছাঙ্কি শুকুটা পাঠিয়ে বেব, এখুনি এক কাপ খাইয়ে
দিবি।

জাকাববাবু উঠে বহজাব কাছে গিয়ে বলেন—

জাকাববাবু—কাল সকালে একবার খবর দিদি কেনন
থাকে—

জাকাব পকাকে নিয়ে চলে যান। লোটন ও বীক
চেয়ে থাকে পদ্মর দিকে।

গভীর রাতি। পদ্ম অশ্রুতরয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

বীক ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। জেগে আছে শুধু লোটন।
সজাগ প্রহরীও মত লোটন বলে আছে পদ্ম পাশে। পাশে
বাঁধা ছোট টুলের ওপর তলের বাটিটা থেকে এক টুকরা
কাপড় ভিত্তিতে নিয়ে পদ্মও কখনো লাগিয়ে দেয়।

চিহ্নিত মুখে লোটন একবার বীকর দিকে তাকায়।
মাঝের গারে হাত রেখে নির্ভর মনে ঘুমিয়ে আছে বীক।
বীরে বীরে মুখ ভিড়িয়ে এর লোটন পদ্মর দিকে।

পদ্ম এতইভাবে বেহাশ অবস্থায় পড়ে আছে। খুবই
অসহায় হেথায় পদ্মকে।

লোটন অশ্রুশ্রবণ হতে ধীরে। গালে হাত দিয়ে লোটন
চুপ করে ভাবতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাইরে পাথরের
আওয়াজ হয়। লোটন দরজার দিকে তাকায়।

হঠাৎ দিয়ে পকা প্রবেশ করে। হাতের ওলুধেব
শিশিটা লোটনের দিকে এগিয়ে দেয়। বলে

পকা—ছোট কস্তা, এখনো এক দাগ খাইয়ে দাও—

সকাল। ভাঙারখানা। দু একজন বোগি একটা
থেকে বলে আছে। লোটনকে ভাঙারবানু বলেন—

ভাঙারবানু—চিন্তাও কিছু নেই, ভাগ হয়ে যাবে।

ভাঙার ঘরের কোণে বাঁধা টেবিলের কাছে গিয়ে
একটা বলে মুখ পিছনে পিছনে বলেন—

ভাঙারবানু—আহা, একা বুকেতে বুকেতে মেয়েটা
একবারেই ভোঁত পড়েছে, (একটু খেসে) এ অশ্রুধতো
বেধেব নয়ত লোটন, এ অশ্রু মনেব—

লোটন চিহ্নিতমুখে অল্প আঁচ একটুকে তাকিয়ে
থাকে।

পদ্ম। সূর্যাস্তেও বর্ষাটো ঢেউএব মাঝার মাঝার চিক-
রিক করে। পাড়ের ঝাউবনে বলে বীক তাকিয়ে থাকে এই
বিগলবিস্তৃত উদ্বিগ্নতার দিকে। কিম্বদায়ে বীক কি
চিন্তা করে। এক সময়ে উঠে গ্রামের পথ ধরে।

বাড়ীর ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বালীতে আটকে
আছে। নানা রঙের নিশানে মাঝানো নৌকোগুলো।
পদ্মই থেকে মাঝলের মাঝা পর্যন্ত নিশানের বাহায়ে ছেয়ে
আছে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নৌকোগুলো দেখে বীক। বীর-

তারে পাশ দিয়ে চলে যায়।

নিতাংয়ের বাড়ি। ঝাওয়াত বলে আছে পদ্ম আনমনে।
বীক এনে পাশে দাঁড়ায়। বলে—

বীক—মা, কাল গঙ্গাপুলে, সন্ধ্যুর অনেক নৌকো
জালবে; তোমার বেতে হবে, বাবে তো?

পদ্ম শান্ত চোখে বীককে একবার দেখে। গুরু কাছে
টেনে নেয়। বীক থাকে জড়িয়ে বসে। অনেক দিনের
না-বলা মুখে চোখের পাতা ঝিলে আসে পদ্ম। বীকর
চোখও হুগলু কয়ে ওঠে।

গঙ্গা পুরো। সাগরে আঁচ অনেক নৌকো জেলেছে।
পদ্মইয়ে মূল দিয়ে সামিয়ে, নিশান উড়িয়ে, নানা রঙের পাল
জুলে, সারি সারি চলে কত নৌকো। সন্ধ্যুর সময়
কত ছেলে বেতে, ব্তো ব্তি, ব্তক ব্তবতীর। আঁচ বেলেয়ের
গঙ্গাপুরো, উৎসব।

দরজার শিকল জুড়ে দিয়ে পদ্ম বীককে সঙ্গে নিয়ে
উঠান পেরিয়ে ঝাউবনের দিকে এগিয়ে যায়।

পদ্ম ও বীক দুই ঝাউবনে মিলিয়ে যায়।

একটা বাক ভিত্তিতে ওরা দেখতে পায় লোটনকে।
লোটন এতিকেই আলছে। বীক ও পদ্ম দাঁড়িয়ে পড়ে।
লোটন বিজ্ঞাপা করে—

লোটন—কিবে বীক, এ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছিল?

বীক লোটনের কাছে এসে ওর হাত ধরে বলে—

বীক—গঙ্গাপুরো দেখতে যাচ্ছি যে। জুঁমিও চলনা
কাহ্ন!

লোটন—নাও আমার কাজ আছে—

বীক—চলনা কাহ্ন

পদ্মর দিকে কিংব বীক বলে—

বীক—মা ভাবনাও কাহ্ন যাচ্ছে না—জুঁমি বল মা।

লোটন পদ্মর দিকে চায়

পদ্ম ওর দিকে চেয়ে আছে। পদ্মও বুজিতে একটা
অহবোব দেখতে পায় লোটন। একটু বেধে বলে—

লোটন—আজ্ঞা চল।

ওরা তিনজনে ঝাউবনের ভিতর দিয়ে চলেছে পদ্মের
দিকে।

দূরে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। কাউনন বিয়ে যেতে
যেতে পরিলক্ষিতা পশু একদমথরে বলে—

পশু—একটু বসি, আর পাবছি না—

একটা কাউননকে হুড়ুটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ে
পশু।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল বীক। ফিরে এসে থাকে
বলে—

বীক—মা বসলে যে, চলনা!

পশু—পা ধরে গেছে বাবা, একটু বসি।

বীক—তাহলে আমি চললাম—

লাফাতে লাফাতে বীক চলে যায়। লোটন এসে পশুর
পাশ বসে।

পরিলক্ষিতা পশু বলে আছে। লোটন চেয়ে থাকে অশ্রু-
বিক, অশ্রুমনস্ক সে। একটু পরে বীরভাবে বলে সে—

লোটন—মনে আছে পশু, একদিন এইখানে আমরা
খেলতাম—

পশু উত্তর দেয় না। দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সমুদ্রে ঢেউএর পর ঢেউ এগিয়ে আসে

একসময়ে লোটন বলে—

লোটন—পশু, তুই বড় ক্রান্ত!

পশু কোন কথা বলেনা। হাতের ওপর মাথা রেখে
দৃষ্টি নত করে।

লোটন ওর দিকে চেয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। হঠাৎ
বলে—

লোটন—ভদের নৌকে। হারিয়ে গেছে, ডুবে গেছে
সমুদ্রে—

পশু একবার লোটনের দিকে চায়। এটা বেন তার
অজানি নয়। আবার আগের মতই চেয়ে থাকে মাথা
নত করে।

লোটন বলে—পশু, নিতাই নেই, সে আর ফিরবে না।

কিন্তু তাই বলে তুই এভাবে নিতকে মেরে কেলতে চাচ্ছিল
বেন? কেন বীককে অমাধ করে দাখি—

বিশ্ব লোটন উদ্গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে পশুর দিকে।
পশু নীরব।

ঢেউএর পর ঢেউ এসে সমস্ত বেলাচুনি ভাসিয়ে দেয়।

এই সময়েবনা—মানবিক অহযোগ, এতদিন দুখহুঁজে
যা লয়ে এসেছে পশু, কোনোদিনের তরে একবারও প্রকাশ
পায়নি, এই দুহুর্কের লহরাতুর্কি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
বীরভাবে পশু বলে—

পশু—আমি নিজের কথা ভাবিনি কখনো, কিন্তু, কিন্তু
আমি কি করবো?—নিজেকে একা মনে হয়, বড় একা—
বস বহু—বস বহু—

হ হ করে কেঁদে ফেলে পশু।

লোটন ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কি
করবে বুঝে উঠতে পারেনা। পশুর হৃৎ তাকে আকুল
করে তোলে।

সমুদ্রের ঢেউগুলো জেতে জেতে পড়ে একের পর এক।

পশু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতেই থাকে।

লোটন একদমতরে আবেগে বলে ফেলে হঠাৎ—

লোটন—তুই আমাকে বিয়ে কর পশু—সব ঠিক হয়ে
যাবে—

পশু কেঁদেই চলে। ভীষণ কাঁদে। সমস্ত শরীরটা
কোঁপে কোঁপে ওঠে জার।

লোটন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে

কাউননের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়। দূরে সমুদ্রের
অবিরাম গর্জন। কাউননের আলোছায়ায় মোহনর
লুকাহুঁবি।

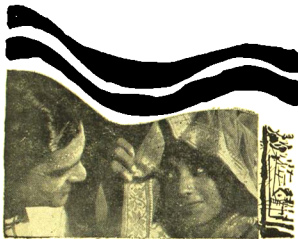
নিভায়ে বাক্তি। উঠোনের বেড়াও কাছে এসে পশু
ও লোটন ধাবে। বীক লাফাতে লাফাতে জিতবে চলে
যায়। অশ্রুথিকে তাকিয়ে বীরভাবে লোটন বলে—

লোটন—পশু দুর্বল দুহুর্কে তোকে যে কথা বলেছি—
ওটা ঠিক নয়। তুই ভেবে দেখি—

পদ্ম দ্বিধা দূরীভূত। একবার পোটনের দিকে তাকিয়ে
চোখ নত করে। পোটন মাথা নীচু করে ঘোরে ঘোরে চলে
যায়। অপরিস্রব পোটনের দিকে চেয়ে পদ্ম অস্বাভাবিক
দিকে চেয়ে আছে।

একটা বিরাট সামুদ্রিক কড়। এ জাতীয় কড় প্রাচীন
বয়স আছে না। অনেক দুগ্না করে আছে। তিন দিন
যাবে সমানে দুই আর কড় চপতেই থাকে। শেষ নেই
যেন এ কোডো হাওয়ায়।

(আগামীবারে সমাপ্ত)



নিভাই ও পদ্ম



সাহিত্য সম্বাদ

অঘটনের পূর্বরাগ : ত্রিদিলাপকুমার রায়

ইংরেজ কবি লিখেছিলেন : Rarely, rarely, comest thou, Spirit of Delight।

দিলীপকুমারের নবপ্রকাশিত উপন্যাস “অঘটনের পূর্বরাগ” পড়তে পড়তে যে কোন পাঠক মুগ্ধ ভাবে শেলির ঐ উক্তি স্মরণ করবেন। ভারতবর্ষ-সম্পাদক রূপে আমার অল্প রচনাটির সঙ্গে পরিচয় কিছু দিন আগের : ১৮৭২-৭৩ সালে যখন এটি বারাবাহিকরূপে প্রথমে “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল : এই রোমান্স বা রমণ্যসংগীত উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বহু স্থম্মুতি জেগে উঠছিল। কেন, তাই বলি।

দিলীপকুমারের নিয়মিত পাঠক ও অমুরাগিবৃন্দ নিশ্চয় জানেন যে, তাঁর সব উপন্যাসের অস্তরালে আত্মকাহিনীর বনেদ আছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘মনের পরশ’-এ “ভারতবর্ষ”-তে প্রথম প্রকাশিত হয় বর্ষদ্বানে তার নাম : “তাবি এক, হয় আব।” এই উপন্যাসে বাংলাদেশের এই অসামান্য লোক-কান্ত গায়কের ইউরোপীয় রোমান্সের সূত্রপাত হয় তাঁর পাশ্চাত্যবেশে ছাত্রজীবনের বিবরণ দিয়ে। তারপর ‘বিধা বা ‘দু-ধারা’, ‘বহুবল্লভ’, ‘রঙের পরশ’, ‘দোলা’, ‘তরঙ্গ বোধিবে কে’—বিভিন্ন উপন্যাসে তাঁর ইউরোপ পর্যটন ও কাসানোভা আর ডন জুয়ানের উপযুক্ত রোমাণ্টিক প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হয়। পাঠকমহলে বিশেষতঃ বিরহসমাজে তাঁর ঔপন্যাসিক খ্যাতি আজ থেকে জিহ্ন বহর আগাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১১-২২ সালে ইউরোপ-প্রবাসের সময়ে যে-রোমাণ্টিক ঘটনা লেখকের অভিজ্ঞতায় এলছিল,

সেগুলি নিয়ে ছ’খানি উপন্যাস লেখার পর দিলীপ কুমার অকস্মাৎ তাঁর বাত্রাপথ পরিবর্তিত করে প্রথমে “আশ্চর্য্য” পরে “অঘটন” বর্গীয় উপন্যাসগুলির অবতারণা করেন। “অঘটন আত্মো ঘটে” উাকে এনে দিল অদ্বুত জনপ্রিয়তা। কিন্তু আমরা ারোমাণ্টিক পাঠকের দল উৎসুক হয়ে ছিলাম তাঁর ভারতীয় রোমাণ্টিক প্রণয় কাহিনীগুলির জন্য। ১৯২২-২৮ সালে তাঁর যে সাপ্তাহিক অভিজ্ঞতা তাৎ প্রথম ভারতবর্ষের পাতার ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকারূপে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে প্রাক্স-সন্ধ্যাস জীবনে রোমাণ্টিক বৈরাগী দিলীপকুমারের কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল যার ঔপন্যাসিক বিবরণলাভের আশায় ধারা ভূবিত ছিলেন, দিলীপ-কুমার “অঘটনের পূর্বরাগ” উপন্যাসে তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন।

অধুনালুপ্ত “উত্তরা” পত্রিকায় “গর কিস্ত গল্প নয়” নামে আশ্চর্য্য-সিঁড়িরের বে দ্বিতীয় উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছিল কিন্তু কোন দিন গ্রন্থাকারে পূর্ণায়ত রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়নি, তাই এখন “অঘটনের পূর্বরাগ” নাম নিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে, অল্প বহু পরিবর্তনের পর। এই উপন্যাসের মতো উচ্চ সরের কোন রোমান্স গল্প কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা কথা সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নি। তত্ত্ব রূপগন সুগায়ক কিন্তু উদাসী গৃহ-বৈরাগী নাগকের আবির্ভাবে বাসন্তীপুত্রের ঘৃণস্ত রাগো যে চাকল্য সৃষ্টি হয় তা এই কাহিনীর উপজীব্য।

এই উপন্যাসের নারক অদিত ও তার অস্ত্রতম সঙ্গীত গুরু শীতবাস নিঃসংশয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক চরিত্র; শীতবাস মদ্রজে আরও জানার ইচ্ছা

পাঠকের মনে থেকে যায়। পীতঙ্গম ও তাঁর গুরু-
তুল্য শ্রীমন্ত গোস্বামীর বিবরণ আমাদের মনে
স্মৃতির অতল থেকে একটি অবিশ্বসনীয় নাব জাগিয়ে
তোলে : রেবতীমোহন মেন!—যাকে লক্ষ্য করে
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তুমি কেমন করে গান
করো হে গুণী'।—ঐক সেই কথাই দিলীপকুমারের
উল্লেখ উচ্চারণ করে এই সাক্ষাতিক উপজ্ঞানের
সমালোচনা শেষ করি যাতে সমিতি বলে এমন
একটি মেয়ের কথা চড়িয়ে আছে বসন্ত বাতাসে
সংকলিত ফুলের গন্ধের মতো। যে দিলীপকুমারের
জীবনসঙ্গিনী হলেও হতে পারত।

প্রকাশক—বঙ্গ বুক হাউস, মহাত্মা গান্ধি রোড,
কলিকাতা। মূল্য ২/-।

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

তপজী (অনুবাদ কাব্য) : শ্রীমুখীর গুপ্ত

এই বিশ্ব-রহস্যকে বুঝিবার জন্য মানুষের আত্ম-
লতার অক্ষ নাই। সেই আত্মলতাটি ধর্মপ্রাণ
ভারতে আরও অধিক। এইজন্যই জ্ঞানমূলক ও
ভক্তিমূলক শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রদান ও প্রচার
এখানে বৈদগ্ধ্যবূহ চুটতেই বরাবর দৃষ্ট হয়। বাহ্য
জ্ঞান যাহ না—বুঝা যাহ না তাহাকে জ্ঞানিবার
ও বুঝিবার জন্য ভারতীয় সাধু সন্তগণ প্রাণপণ
করিয়াছেন, সর্ব-সমর্পণের ভাবে প্রবৃত্ত হইয়া
আত্মা ও বিশ্ব-রহস্য উন্মোচিত করিতে চাহিয়াছেন।
গুরু নানকও এই প্রকার সমণিত-প্রাণ একজন
অসাধারণ মহাপুরুষ। তিনি নিবন্ধের প্রবর্তক।
আবার তিনি একজন ভক্ত-কবি ও সিদ্ধপুরুষ।
তাহার রচিত পরাবলী নিবন্ধাতির পঞ্চমগুরু
অর্জন সংগ্রহ করিয়া এবং নিজেও অনেক পোহা
বা ভক্তিমূলক পদাবলী রচনা করিয়া 'শ্রীশ্রী গ্রন্থ-
সংগ্রহ' সম্পন্ন করেন। এই মহাগ্রন্থে গুরু নানক,
গুরু সঙ্গর, গুরু অনন্দেরাস, গুরুরামদাস, গুরুমুক্তান,
গুরু ভোগবাহাদুর কর্তৃক রচিত পদাবলী ব্যতীত
আরও উনিশজন সাধক কবির এবং সত্তরজন
ডাটকবির রচনা বিদ্যুত হইয়াছে। এই গ্রন্থকে
নিবন্ধনমণ্ডলী পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগ্রন্থসংগ্রহের সর্ব প্রথম, সর্ব প্রধান,
ও সর্বাধিক পরিচিত অংশের নাম 'শ্রীশ্রীতপজী'
এই 'তপজী' গুরুনানকের রচনা এবং ইহাতে
নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি অগ্রেভূতী ভক্তি ও
ব্যাক্ষিবেদনের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার
শ্রীশ্রীভক্তগণের অবিভাবের সামান্য পূর্বে গুরু
নানক আবির্ভূত হন এবং সহজ, সরল, সার্থক,
সুন্দর ভক্তিধারায় মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ
করেন। এই ভক্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি
প্রকাশক যে পরাবলী তিনি রচনা করেন উহাই
'তপজী' নামে অভিহিত। নিরাকার ভগবান
অপময়—অপোব ঘারাই সজ হন স্মৃতরাং যে ভক্ত
অপময় হইবে সেই তাহাকে লাভ করিতে সক্ষম
হইবে—এইজন্য 'তপজী' নামটি সার্থক ও সুন্দর।
গ্রন্থানি গুরুমুখী ভাষায় বিরচিত।

বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত সুব্যাগ্য কবি
অধ্যাপক শ্রীমুখীর গুপ্ত মূল পাঠ্যবী হইতে বাংলা
কবিতায় গ্রন্থানিকে বখাখ অমুখান করিয়া
সকলেইই বঙ্গবাদ্য হইয়াছেন। তিনি নানা
ভাষাবিদ্ব বলিয়া তাহার এই অমুখান গ্রন্থানি
মূলগ্রন্থ হইয়াছে। এই 'তপজী'র বাংলা
অমুখান সহজ, সরল, মাধুর্যমণ্ডিত, সুস্পষ্ট এবং
রসোত্তীর্ণ হওয়ায় বাংলা কাব্যের রসপিপাসু মাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন। গ্রন্থের
আদিতে যে গল্প ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে এবং
যে তিনটি সার্থক পোহাকীর সনেটে কবি শ্রীমুখীর
গুপ্ত তাহার ভক্তি শাস্ত্র জ্ঞানের ও গভীর উপলব্ধির
পরিচয় দিয়াছেন উহা মনোজ্ঞ ও মধুর হইয়াছে।
অমুখান গ্রন্থ মূলগ্রন্থের যান বহন করিয়া সকলকেই
তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। এই
'তপজী' গ্রন্থের শেষে বাংলা অক্ষরে মূল 'তপজী'
গ্রন্থের গুরুমুখী পাঠ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থমূল্য
বিবক্ষিত হইয়াছে।

বর্ধমান ভারতবর্ষকে একীভূত ও এক আদর্শে
অমুখানিত করিতে হইলে উহা বক্তৃতায় হইবে
না; ভারতীয় ভাষায় বিরচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তক
সমূহের অমুখান ও এই সমস্ত ভাষাশাস্ত্রের সর্বোচ্চ
সুন্দর ভাব-বক্তৃতাকীর আহরণের ও আদরের
ঘারাই সম্ভব হইবে। এই দিক হইতে বিচার

করিলে বর্তমান ভারতের ভাবাবিরোধের উচ্চাটনতার মধ্যে এই জ্ঞানীর 'জপজী' গ্রন্থ অনুবাদে অবশ্যকতা ও উপযোগিতা আরও অধিক।

আগামী তান্ত্রিক পুঁজিমাঘ গুরু নানকের পাঁচশত-তম জন্মদিবস একবৎসর ধরিয়া ভারতে উদ্‌যাপিত হইবে, সুতরাং এই সময়ে বাংলার কবি বাংলা ও

পাঞ্জাবের সংযোগ-সেতু রচনা করিয়া সকলেরই অভিনন্দন যোগ্য হইয়াছেন। গ্রন্থবানির ছাপা, বাঁধাই সুকৃতি সম্ভব।

[প্রকাশক :—পুণ্ডিত, ২২ বিধান মণ্ডি, কলিকাতা-৬]

মূল্য :—২০০

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

আগামী তিনটি সংখ্যা একত্রে
“তৃতীয়া সংখ্যা” রূপে বন্ধিত
কলেবরে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০শ/১১, বিধান মন্ডি, (পূর্বতন কর্তৃত্বালিঙ্গ ট্রাষ্ট) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষে প্রিন্টিং ওয়ার্কস চাইতে প্রিন্ট ও প্রকাশিত।

==শৌধিন সমাজে অভিনয়যোগা উচ্চ প্রশংসিত নাটকসমূহ==

শ্রদ্ধাভাজন কানুনী অবলম্বনে

বিরাজ-বো ২১

বিদুর ছেলে ২১

রামের স্মৃতি ১-৫০

প্রিন্সিপাল যোগ এণ্ড

জন্ম ১১, প্রকৃষ্ণ ১১, বিজয়লক্ষ্মী ১১, মল-বসন্তী ২১

বৃদ্ধব-চরিত ২১

গমণ গোবানী এণ্ড

কেশব রায় ১১

অপ্রেমচন্দ্র যোগাধ্যায় এণ্ড

ইন্ডাটেক্স কানুনী ১-৫০

কর্ণাজ্জুন ১১, কুরুরা ২১,

ভূষণা ১-২৫, অজ্ঞান ১-৫০

মঙ্গল মরকার এণ্ড

মঙ্গলমত্রে মোক্ষল ২১

চ্যবত যোগাধ্যায় এণ্ড

ভাস্মপ্রসাদ ১-৫০

গাম্বিয়ারেন কব এণ্ড

মিটমট ১-১৫ প্রবেশিকা ১-১৫

নিমিকান বহুরায় এণ্ড

বহুবর্ণী ১১, পথের শেষে ও

দ্বিভা (একত্রে) ১-৫০

বেবলায়েবী ১১

ননোশোমন রায় এণ্ড

রিত্তিরা ১-৫০

বকিরনারায়ণ কবকার

পতিঘাতিনী সত্তা ১-৫০

কীর্ত্তিপ্রদায় বিভাবিনোব এণ্ড

মঙ্গল-মারায়ণ ১১,

প্রভাপ-আমিত্য ১১,

আলমসীর ১-৫০,

রত্নেশ্বরের মন্দিরে ১-১৫,

ভীষ ১-১৫।

বিত্তেন্দ্রনাথ রায় এণ্ড

তুর্গাভাস ১-৫০, বিরহ ২১

লাজাহান ১১, মেবার-পদ্ম ১১,

পত্রপারে ১-৫০, বহুনারী ২১,

চন্দ্রকান্ত ১১, পুনর্জন্ম ১-৫০

মীতা ২১, সিংহল-বিজয় ১-৫০

ভীষ ১-৫০, কুরুরা-লাজাহান ১-৫০

নিরুপমা বেবীর কানুনী অবলম্বনে

সেননারায়ণ গুপ্ত এণ্ড নাটক

শ্যামলী ১-৫০

নটন সেনগুপ এণ্ড

এই বাবীলতা ১১,

হর-পার্বতী ১-১৫

সিরাভকোলা ১-৫০

সুপ্রিয়ার কীর্তি ১-১৫

নির্মলসিংহ বহোপাধ্যায় এণ্ড

মাতা-গুপ্ত ১-৫০

রাতকর্ণা—বীররাভা এবং দুখের মত

একত্রে।

কানাই বহু এণ্ড

গৃহ-প্রবেশ ২১

খলিলদাস বহোপাধ্যায় এণ্ড

অহস্যাবলী ১১, কাকোর রাণী ২১

মঙ্গল রায় এণ্ড

মরা হাতী লাথ টাকা ১-২৫,

অশোক ২১, লাবিণী ২১

জীবনটাই নাটক ১-৫০, বলা ২১,

কারাগার, মুক্তিযাত্রা ও মঙ্গল

(একত্রে) ১-৫০

মিরকানিশ, বহুভাষ্যী হাসপাতাল

ও মৃত্যুকাল (একত্রে) ১১,

বর্ষাট, পথে বিপথে, চাবীর

শ্রেণ, আশ্রয় ঘোষ (একত্রে) ১১,

একাক্ষিকাকা ১১, মনোপ্রকাশ ১১,

কোটিপতি নিকুদেধ-বিভূষণ

পর্বা—রাজমণী—ভ্রমকথা

(একত্রে) ১১

সাঁওতাল বিজ্ঞান-বসিতা

সেবাস্তুর (একত্রে) ১১

মহাতারতী ১-৫০

মোতি বাচস্পতি এণ্ড

সমাজ ১-২৫

কেন্দ্রাবী যোগ এণ্ড

রোবার জগতিবি ১-২৫

তুঙ্গীধাস গাহিড়ী এণ্ড

হেঁড়া তার ১১, পথিক ১-২৫

মণিয়ার প্রিন্সিপাল নবী এণ্ড

অন্য-প্যামি ২১

নিতানারায়ণ বহোপাধ্যায় এণ্ড

কুল ১১

প্রকাশিত হইয়াছে

প্রফুল্ল রায়ের

নতুন বিরাট উপন্যাস

স্বাধীনতার
স্বপ্ন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে রপনৌ তেলার দুই অত্যন্তর থেকে একটি যুবক জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। তার জীবনের একটিনাইই সত্ত্ব ছিল, 'বাচতে চাই, বাচতে চাই, বাচতে চাই।'

দার্য বাঙলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতা হুড়ে তখন অন্ধকারের সাধনা চলছে। একদিকে বুদ্ধি, মহামারী, কালো-জারি—এবং কলকাতা হিসেবে কিছুকাল আর গণিকা। অল্পদিকে দুর্ভিক্ষের কল্যাণে উদ্যম ভোগবাণে প্রস্তুত উৎসব। তৃতীয় আরেকটি দিক ছিল যেখানে আবারের পর আবারে লবন পুরানো মূল্যবোধ জলে হয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা দাপের মত হাঙ্গামা দিয়ে দাখা এসে গেল—কলকাতার 'গ্রেট কিমিং'। তারও পর খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত মেয়ের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন এল ঘর্ষিয়ে।

যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলাদেশের এই বিশৃঙ্খল অধ্যায়টি ঘিরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে যুবকটি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোলা তার হ'ল না।

এত যে অন্ধকার আর নৈরাশ্য তবু এই অস্ত্রযোঁতে কোথায় যেন আলোর ঝাঁপ একটি দার্যার ঘিরে বইছিল। যুবকটি হঠাৎ তা আবিষ্কার করে বলল। যেসব উনিশ শতকের রামমোহন, বিজ্ঞানপুত্র থেকে আজ অবদি অসংখ্য মানুষ সেই দার্যটিকে ঘরে নিয়ে চলেছেন এবং আশ্চর্য তাঁদের উত্তরাধিকার তার ওপরে এসে পড়েছে।

জীবিকার বোঝে যে যুবক এসেছিল। কলকাতা তাকে জীবনের মহত্তর সন্ধান দিয়েছে।
এই বিশাল ক্রান্তী উপরাস সামাজিক কালের একটি অনন্ত সংঘর্ষন।

দ্বিতীয়—দ্বিতীয় ভাষায়

এই লেখকের আরেকটি উপন্যাস : নোনা জল মিঠে মাটি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৯৮০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-২-২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলকাতা-৩

—প্রকাশিত হয়—

শক্তিগদ রাজশ্রুত বিপুল-কলেবর নৃতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

কেদিকে কালজীবী পুরাতন জমিদারী-ভায়ে পতন—অপরিসীম শিল্প-সমৃদ্ধ নৃতন বাস্তবিক যুগের উত্থান প্রাচীন অংশক পরিবেশের স্বর্গরাজ্যে রূপান্তর! হারানোর বেগনা আর প্রাপ্তির আনন্দে কম্পমান, ভাঙা আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অতিনব বৈচিত্র্যে দোহুলামান একমল নর-নারী। হারেকণ্ঠ আর অটল কান্না, অশোক আর শ্রীতি, জুবন আর কদম-বৌ, গোকুল আর পাহা দাস, ক বিপ্লব আর নিষ্টি, অবিদ্যার আর নিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রশান্ত আর রাশি, সত্য আর চেমেকালী, সনাতন আর গল্পমণি—এ রকম আরো অনেকটাই এই উপন্যাসে ভিড় করে এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রেই নতুন দাগ কাটার মত। কিন্তু ভাষাহীন নারায়ণ ঠাকুর লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের নৃতন মূল্যায়ন।

চনা-জানা পরিবেশে নৃতন ও নৃসৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্যাস অনেকদিন বাঙালি সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

শব্দ—চৌধুরী ঠাকুর

—অন্যতম উপন্যাস—

গৌড়জনবধু

৫-৫০

কাজল গায়ের কাহিনী (২য় সং) ৫,

মণিবেগম (৩য় সং)

৬-২৫

কুমারী মন (২য় সং—ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৩-৫০

জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত)

৪-৫০

প্রকৃদান উত্তোপন্যাস এও সঙ্গ
 ২০০-২-১ সিঙ্গাপুর প্রকাশনীঃ অক্সিডেন্টা - ৬

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়
স্রষ্টিস্থিত



কালে
বিস্কুট, নজেন্স ও টফি
কাল বিস্কুট কোম্পানী
কলিকতা-১০



৫৬-৩৭ বর্ষ
বিভী ৭৬
৪৭-৫২-৬৪ সংখ্যা

—উপহার দিবার উপযোগী ভাল ভাল বই—

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত

মেঘদূত

রোবাইয়াৎ-ই-

ওমর খৈয়াম

নিখিল বিরাট-ভাষ্য-বিহীন প্রতি অসীম সমবেশনা নিয়ে
অন্য কবি কালিদাস তাঁর অল্পম কাব্য "মেঘদূত"-এর
স্নেহে স্নেহে—বিঃস্মৃতি যে কতদিন বর্ণালোক সৃষ্টি করে
গেছেন—ইহা সেই অসীম "মেঘদূত" কাব্যের প্রদর্শিত
বাংলায় বক্তব্য কাব্যরূপে। নরেন্দ্রদেবের চিত্তবলীতে
অনুজিত। দাম—সাত টাকা।

বিশ্বের অন্ততম খ্যেত কবির তিন শতাব্দিক রোবাই বহু বয়ে
ভাষাবাদের মূলগত তথ্যসমূহ এবং ভাষাহারী পাঁচটি বিভিন্ন
অংশে বিভক্ত হইয়া বিরাট কপেববে স্তুতিভাবে প্রকাশিত।
বহু ত্রিধর্ম-ব্রহ্মিত চিত্রের সমাবেশে অনবদ্য।
দাম—সাত টাকা।

। উৎকৃষ্ট মুদ্রণ—চিত্রের প্রাচুর্য প্রত্যেক বইখানির বৈশিষ্ট্য ।

উপহার দিয়া অথবা উপহার পাইয়া

আপনাকে শ্রুতি হইতেই হইবে

বর্তমানের সেরা-সম্পাদিত

কুমার-সম্ভব

ভাষার হাজার বছর পরেও যে মহাকাব্যখানি রসালম
শ্রেণিকগণের নিকট অসীম আনন্দের উৎস-স্বরূপ হইয়া
আছে—ইহা তাহারই বাংলা কাব্যরূপে।
বর্তমানে চিত্রে পরিশোধিত। দাম—পাঁচ টাকা।

বীরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত

ঋতু - সম্ভাব

পৃথিবীর নিত্য-নৃতন রূপ-পরিবর্তনের মাঝে আবেগপ্রবণ
শ্রেণিকগণের বাহ্য আবেশন করিয়া দিবে—এই বলাকাব্যে
আছে তাহারই অপর আশা। দাম—পাঁচ টাকা।

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২১

অনুগ্রহ কবিগণ।

সুরেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

কুল-লক্ষ্মী

বালিকাগণ কিরণে শিক্ষিতা হইলে নিম্নতম সঞ্চালকে শ্রুতি
করিতে পারিবে—তাহাই হুন্দর প্রাণের ভাবের বৃত্তান
হইয়াছে। দাম—দুই টাকা।



একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যাস্তারাইডিন হেয়ার অয়েল



ভেদগ্রস্ত পণ্যের ক্যাস্তারাইডিন বেঙ্গল কেমিক্যালের
 আপনাদের বেশন-কোমল ঘন কাল চুলের কোমলতা ও
 মৃদুগতা অধিক রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য
 করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কাম্বুজ • দিল্লী

প্রবাসী

সৃষ্টিবাস্তবিকী স্মারক গ্রন্থ

পড়েছেন কি ?

বাংলার চিন্তাশীল জনপ্রিয় একশত বাহ্যিক জন লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনা
স্বল্প পরিশ্রমে কোনও ভারতীয় সাহিত্যে এখনকার প্রচেষ্টা হয় নি। লেখকদের প্রদান-গুণে ও মাধুর্যে
প্রত্যেকটি গল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বসোত্তীর্ণ

ব-বানির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট শত
কাল সাইজ ডবল ক্রাউন

প্রতি পেগারে ছাপা, ছবি ও
বঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য মাত্র
বার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

এতে পাবেন

প্রবাসী প্রদত্ত, রবীন্দ্র,
প্রদত্ত, রাষ্ট্র প্রদত্ত, অর্থনীতি,
দর্শন, বিজ্ঞান, লিঙ্গা, সমাজ
সঙ্গীত, ভাষ্য, চিত্রকলা, উদ্ভিদ
চর্চা, উপক্ৰম, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা
ভাষা ও সাহিত্য, মহিলা-বিভাগ, বিবিধ।

আমরা নিঃসন্দেহ যে, সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাই এই গ্রন্থটি পড়ে আনন্দ পাবেন

প্রকাশক—প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৭৭-২-১ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩ (কোন নং—২৪-৪৪২০)

কিরন

যেমন উজ্জ্বল তেমনি দীর্ঘায়ু

কিরন ল্যাম্প পৃথিবীর সেরা
ল্যাম্পগুলির সমতুল্য : ভারত সর্বাধুনিক ব্যবস্থার মধ্যে সেরা কাচামান থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ জিন ৪০০০ ঘণ্টার অভিজ্ঞতাশ্রুত কারিগরী দক্ষতা।

এক্সক্লুসিভ : ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রী লিঃ
১৯, বামেশ্বরনাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

একট : নি ওয়িলিস্টোন মার্কেটবিল কোং লিঃ
কলিকাতা : বেঙ্গলি মার্কেট বিলি কনসু

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সত্যের উদ্ধার

সত্যশব্দটারে সহজে নানা লোকে নানা কথা বলে কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্য অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে আশ্রয়ের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ভাকাত, পরের খন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে তার ক'রতো যেম সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে বেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক বাঁটা-বাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপদের কাছে সত্যশব্দর এক বিপর লক্ষ্য। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে বেশের মধ্যে বেশে খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন খন ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি অবার লক্ষ্যে আস্তভাস্তর হয়ে নিহত হ'ব হ'লেন কেন। এই "কেন" সংকে তাঁর চন্দ্রী তরঙ্গী বিধবা স্ত্রী-ই বা কেন কি? **হাস—পাটচাকা**

—প্রকাশিত হইয়াছে—

অধ্যাপক ডঃ ব্রিহস্পতি সর্গদার, এম. এ., ডি-কিউ,

কর্তৃক সম্পাদিত

বঙ্গিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা ৩,

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪, জনা ৪

বিক্রেন্দ্রনাথের

চন্দ্রগুপ্ত ৪, সাজাহান ৪

মেবার-পতন ৪

দারগত কৃষিকা, চরিত্র-আপোচনা ও চীকাদহ। হাম-
চন্দ্রনাথের লোক মঙ্গলান ও অধিবাসী সংযোগন।

১৯২৫ চন্দ্রনাথের ১৩০ পৃষ্ঠা, ২০০ ১৮, বিধান সংসদ,

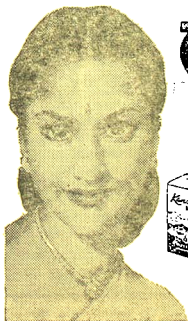
কলিকাতা—৬

‘ভারতবর্ষ’ চুক্তি

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—বিত্তীয় ৪৩-৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৫-৭৬

পঞ্চ-দৃষ্টি		পঞ্চ-দৃষ্টি	
১। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম জীবন (প্রবন্ধ)		৬। আত্মান (কবিতা)	
ঐশ্বর্যচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৭৩	ঐশ্বর্যীয় গুণ	
২। পতিতা ও পতিতগারিন		৭। রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববঙ্গ (প্রবন্ধ)	
ঐশ্বর্যীপকুমার রায়	১৮১	অধ্যাপক মোহনবিহারী রায়	১৯৮
৩। দুঃখভীষি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গাথা (প্রবন্ধ)		৮। রবীন্দ্র চরিত্রে বঙ্গ-সম্রাট অণোক	
অধ্যাপক গোবিন্দলাল বসু	১৮৭	ডাঃ হুগো ভিৎসল বড়ুয়া	
৪। আত্মপ্রকাশ (কবিতা)		৯। গ্রাহের মেঘে (কবিতা)	
ঐশ্বর্যমোহন চক্রবর্তী	১৯৩	ঐশ্বর্যবিশ্বনাথ	২১০
৫। একই ছবি (গল্প)		১০। বঙ্গবৈষ্ণব বন্ধন	
অরুণ দে	১৯৪	অরুণকুমার দত্ত	২১১



রূপচর্চায়
ক. হোড্জার
প্রসাধনী



কলিকাতা-১০

লেখ-সূচী		লেখ-সূচী	
১৭। ছিট্‌কিনিটা (গদ্য)		২৪। জ্যোতিষ তারতী পণ্ডিতজ্ঞানর লক্ষণশাস্ত্রী (কীর্তনী)	
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	২৪০	জয়ন্তী চক্রবর্তী	২৭৭
১৮। বাংলা ভাষা (কবিতা)		২৫। যেরেযের কথা—	
বেলা দেবী	২৪৭	(ক) স্বীকৃত সাহিত্যে নানী	
১৯। স্ব স্বা, ভ্রম ও উৎপাদন		শীলা বিজ্ঞান	
শ্রীনন্দী ভট্টাচার্য স্বাধীনতা, পণ্ডিতমহাশয়	২৪৮	(খ) রূপ চর্চা—	
২০। সংকলন	২৬০	অপর্ণা দেবী	
২১। বহুবিধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবীণত্ব		(গ) শিবদেবের পূজারী কোট	
মহাভারতম্ শাস্ত্রার্থ (বঙ্গাঙ্কন)		শোভনা দেবী	
স্বর্গমঙ্গল ভট্টাচার্য	২৬৩	২৬। খ্যাতিপ্ৰাপ্ত (নাটক)	
২২। সাগর থেকে কবির (জগদগাহিনী)		কুমারেশ্বর খোঁস	
'নাবিক'	২৬৫	২৭। পট ও পট—শ্রী'দ'	
২৩। গ্রন্থগণ			
স্বাভাচার্য	২৮		

উপহার সম্বন্ধে সমস্যা ?



গিফ্ট
চেক

দেখুন না...



বিবাহ, জন্মদিন, নববর্ষ, জুগোপন, দেও-
ঢালি, বড়দিন, ইদ—উপলক্ষ্যে হায়ে হোক,
দেওয়া চলবে। দেখলে পছন্দ হবে
আপনার—সুন্দর চেক, সুন্দর ফোন্টাই।
আর নাই থাকল আকাক্ষিক, আপনাই
চেক লই করবেন।

ব্যাঙ্কের যে-কোন শাখা
অফিসেই কিনতে পারবেন।

ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই

ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট
চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই
গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই গিফ্ট চেক ইউনিয়াই

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস : ১, ব্রাহ্মণ হাট স্ট্রিট, কলিকাতা-৩

দৌড়ে ফাস্ট...



ASPIUCO-1169

ভবিষ্যত জীবনেও শুধু যেন
অপরাজিত থাকে। ওর ভবিষ্যতের
ক্ষেত্রে নিয়মিত সঞ্চয় করুন—যাতে
অর্থাত্ম্য ওর উন্নতির প্রতিবন্ধক
না হয়।

ইউকোব্যাকে সঞ্চয় করুন এখানে
টাকা ক্রমাগতই বেড়ে চলে।
আপনার প্রিয়জনদের ভবিষ্যত
সুখের করুন। আপনি মাত্র
৫০ টাকা দিয়ে ইউকোব্যাকে সেভিংস
এ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।



১০৬ অফিস:
৮ দিকাতা

আপনি সঞ্চয় করতে পারেন—ইউকোব্যাক
আপনাকে সাহায্য করবে



দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ সংখ্যা

ষট্‌পঞ্চাশত্তম বর্ষ

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবন

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

নিখিলবন্ধ লিখক সমিতি কর্তৃক আহৃত রবীন্দ্রনাথের
সভায় কবিশেষক কালিদাস ব্যাসকে বলিতে শোনা গিয়া-
ছিল—“শত বৎসর ধর্ম্মা রবীন্দ্রনাথের বহুদূর প্রতিভা
এবং তাঁহার বিভিন্ন রচনাবলীর সম্যক আলোচনা করিলেও
সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে বুঝা যায় যে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ
আছে।” কবিশেষকের এই বাক্যের মধ্যে যে সত্যের
আভাস দৃষ্টিতে উপস্থিত তাহা এখন আর প্রমাণের অপেক্ষা
হাখে না। বহু বনীবী বহু কাব্যে ও প্রকৃতিতে এবং বিবিধ দৃষ্ট-
কোণ হইতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের নামা দিক আলোচনা
করিয়াছেন মঃ—তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের পূর্ণাঙ্গোচনা
কিন্তু অসম্ভব হইবে না। কখনও কইবে কি না বলা
যায় না। কারণ তাঁহার সমগ্রব্যক্তি ব্যক্তি ব্যতীত অস্ত
কারণও নহে উহা সাধ্যাতীত। বলাগি রবীন্দ্রনাথের
অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার বানী ও রচনা হইতে যতটুকু
পরিসর পাওয়া যায় তাহাতে শায়ে তাহারই দাম্যস্ত আলোচনার
চেষ্টা করিব।



ভারতবর্ষ

কোন ব্যক্তির অধ্যাত্ম জীবন আপোচনা করিবার পূর্বে প্রথমেই দেখা দরকার যত্ন বিশিষ্ট সেই ব্যক্তি কি বুঝেন এবং যত্ন বিহীন তাঁহার দাব্যবাহী বা কিস্তি? ১৯৩৩ সালের ১০ই মার্চ শ্রীযুক্তী নির্মলকুমারী মল্লানবিশকে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“ব্রাহ্ম বলতে বিশেষ কোন বস্তুকে বহি বীকার করতে হয় তবে সেই হলের বস্তুকে আমি মানি নে—আমার বর্ষ আমার একান্ত নিম্নেই যে বর্ণের ঘাটে এসে খেনও আমার জীবন তৎপরা পৌছায় নি—আশা করি মহাবীর আগে কোন একদিন পৌছবে।” রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি কথা হইতে বেশ বুঝা যায়—যেহেতু দাব্য ব্যক্তিগত, উহা জাতিগত বা সম্প্রদায়গত নহে, তাহা তিনি বীকার করিয়াছেন; আশা করিতেন বর্ণসাধনার তিনি একদিন দিছি লাভ করিবেন :

“মাতৃদেব বর্ষ” শব্দক বক্তৃতার পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“আমার ভ্রম যে পরিবাহে, সে পরিবাহের বর্ষসাধনা একটি বিশেষ ভাষায় : উপনিষদ ও শিখ্বেবের অভিজ্ঞতা, হামবোহন রায় ও আর আর সাধকদের সাধনাই আমারে পরিবাহিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। মাতৃকর্ষ থেকে আরম্ভ করে, আমার সব সংস্কারই বৈদিক মহাবাহ্য অঙ্গুষ্ঠিত হইয়াছিল।” ইহাতে প্রায়ঃ হয়—প্রাচীন বৈদিক বর্ষকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার অস্তরের এই স্বীকৃতিই ফলেই বোধ হয় বগীর প্রায়ঃপ্রসাদ যুগোপাধায় প্রবুধ কয়েকজন বেশনেতার আন্তরিক চেষ্টায় বিপুল দাব্য সবেও করিত উচ্চৈরিক ক্রিয়া লম্বান বৈদিক বর্ষসাধনাই হুদঙ্গ হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ আর এক স্থানে উক্ত বক্তৃতাবলীর মধ্যেই বলিয়াছেন—“শালো উ-নিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি দ্বারা কষ্ট হইল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। লজ্জা ছিল, শক্তি ছিল না হয় তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র যেমন হইবে, কেবল মন্ত্র মুখস্থভাবে নয়। বাহ্যিক হুশাট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করব, বৎ পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের গানের অর্থ পৌছাই। তখন আমার বয়স বার বৎসর হবে। এই ১২ চিহ্ন করতে করতে মনে হত হিন্দুদের অস্তিত্ব ও আমার অস্তিত্ব একান্তর। তুচ্ছ বঃ—এই তুচ্ছক, অস্বীকার, আমি তারই সঙ্গে অর্থও।

এই বিশ্বস্তাতির আমি অস্তে যিনি আছেন তিনিই আমার মনে সৈন্তর প্রবেশ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব বাহিরে ও অস্তরে দৃষ্টি এই দুই দাব্য মিলাচ্ছে। এমন করে ধ্যানের দ্বারা দ্বৈত উপলব্ধি করছি তিনি বিশ্বাত্মা, আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আন্দোলন আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতিঃ এনেছিল। এ আমার হুশাট মনে আছে।” ইহাতে প্রতীতি হয় যে উপনয়নের পর হইতেই তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ। তাঁহার পিতার উপদেশ ও নির্দেশক্রমে তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনা শুরু করেন। সেই সাধনার তাঁহার পতীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ছিল, উহাতে তিনি শিখির সম্মানও পাইয়াছিলেন। মহর্ষি বেবেজনাথের আত্মদীপনীতেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

উপনয়নের পর সাত বৎসরের পরেই ঘটনা। “মাতৃদেব বর্ষ” বক্তৃতাবলীর আর এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“তখন প্রত্যয়ে ওঠা প্রথা ছিল। মনে আছে সেই ভাষায় উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসার বাবামোহ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন ওখানে ফ্রি ইন্সুল বলে একটা ইন্সুল ছিল। বাক্সটা পেরিয়েই ইন্সুলের দাঁড়া দেখা যেত। সে যিকে চেয়ে বেবলুর গাছের আড়ালে হুর্বা উঠে। যেদিন হুর্বার আবির্ভাব হল গাছের অস্তরালে থেকে, আমি মনের পথবা খুলে গেল। মনে হল মাতৃদেব আমার একটা আবেগ নিয়ে থাকে। সেইটাই তার মাতৃদেব। মাতৃদেব বেড়া লুপ্ত বলে সাপাদ্যিক প্রয়োজনে অনেক অস্থিবা ক্রিষ্ট সেদিন হুর্বা উঠেই সঙ্গে সঙ্গে আমার আবেগ বলে পড়ল। মনে হল গতাতক দৃষ্টান্তে বেবলুর। গুরুন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হসতে হসতে চলেছে। ভাষের বেবে মনে হল কি অনির্বচনীয় হৃদয় মনে হল বা তাতা মুটে। সে দিন ভাষের অন্ত-রাষ্ট্রকে বেবলুর বেবানে আছে চিরকালের মাতৃদেব, সে দিন আত্মীয় হয়ে গেলুম। বেবলুর সমস্ত সৃষ্টি অপূর্ণ। আমার এক বন্ধু ছিল। সে হৃদয়িত ভ্রম বিশেষ বিখ্যাত ছিল না। সে এলে ভাববুধ বিবর্ত করতে এসেছে। সে দিন তাকেও ভাল লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সে দিন মনে হল তার নিবৃত্তি ডাকলুম, সেটা তার চরম লতা নয়। তখন মনে হল এই সৃষ্টি।”

কবি এই মুক্তির উপলক্ষিণে পিতৃকে যে উপহার
ইচ্ছিত পাওয়া যায় তাহা লাভ্য নহে। প্রতি ভাগে
একপল্লব যাতীত এইমুখ মুক্তির আশা ও আশ্বাসের
অনুভূতি লাভ অনন্তর। ঐকান্তিক চিন্তে গাছগাছী হস্তে
লাহানাই ইহা অমূল্য বস্তু।

১৯২২ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতীমহলানবিশকে
আবেদনখানি পাঠে কবিগুরু নির্ধাতিতেন—“খণ্ডেরমধ্যেই
হত কিছু বস। সেইখানেই পাওয়া হারানোর বিবেচনা,—
অথবের মধ্যে চিরপরাণি, সেইখানে সমস্ত মনকে তুল
করা যায়, তখন তার মনকে তুলে আশ্বাসের কলহোল
থেকে গিয়ে সে অনির্কলসীমার বিশ্বদেহের লাড়া পায়।...
সমুদ্রে স্নেহের আবেগ নদীর যেমন কোন দিনেই শেষ
হয়না—এই পৃথিবীতে শৌচ্যতার প্রার্থনাও হালুকের
কোন দিন থাকবে না।.....অন্তর জানেই হচ্ছে নিখিল
প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে যোগের দ্বারা সন্ধিগত করা।
বিশ্বদেহের মধ্যে নিজেকে সত্যরূপে উপলব্ধি হচ্ছে মনতা
থেকে মতো উজ্জীর্ণ হওয়া—তারই মধ্যে মুগ্ধতার লাগি।”
“অন্যথা বা নৃশংস, তখনো বা দোষাতিগর্ভে, মুক্তো বা
অমৃতত্ব গম্ব—তারতের কবি অরণ্যে বসিয়া যে প্রার্থনা
করিয়াছিলেন তাহা আজ কবিগুরু হালুকের নামে
উপলব্ধি করিলেন। শুধু বুকের কথাই নয়। জীবনে
যে সত্য উপলব্ধি করিয়া বস অথবের বস হইতে মুক্তি-
লাভ করিয়াছিলেন সে সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া
গেলেন। প্রত্যেক হালুই এক প্রার্থনা করিলে পৃথিবী
শান্তি লাভ করিতে পারে।

কেবল হালুকের অর্থের রূপেই লক্ষ্য পাইয়াই লাক-
কবি ক্ষান্ত হইল নাই। তিনি প্রত্যেক দরিদ্র পৃথিবীর
অর্থের সত্যরূপের পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। ক্যালি-
শা-এ দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ সরকারকে তিনি একদিন
কহিয়াছিলেন—“এ বিশ্বের প্রত্যেকের একটি আত্মরূপ
আছে, যা যেখানে থাকলে হৃদয় গিঁথের পরিচয় পাই।
আমি যখন বিবেচনা করি হৃদয় বস্তু হিকে তাকাই, যেখা
তাহা কত ভগ্ন ও ভাব নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমার সামনে।”
অমূল্য বোধের নাম হইলেই হালু প্রত্যেক বস্তু চিরন্তন
সত্যকে দেখিয়া তাহার অর্থের শৌচ্যতা অনুভব করিতে
পারে। বাহিরের বিভিন্ন রূপ দেখিয়া সে বিমিত্ত হয় না।

“জীবো বস্তু নামঃ” বোধাত্মক এই অসীমশক্তি সে মনে
প্রাণে তখন উপলব্ধি করিতে পারে। বিশ্বকবির জীবনে
যে উপলব্ধি বস্তুই আশিরাহিত তাহার লেখনীমুখেই
তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

“হালুকের বর্ণ” বক্তৃতাবলীর মধ্যে হরীশ্চন্দ্রনাথ আদ
একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—“বর্ণার সময় পাগটা
খাওয়া হলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে গোক চলত তার
উপর দিয়ে। এখানে ছিল একটা ঘাট, সেখানে বিভিন্ন
জমতা। ঘোড়ার ঘর থেকে লোকদের লীলা দেখতে
জান লাগত। পশুর আহার জীবনরাজ্য ছিল মনতা
থেকে দূরে। সেই সময়কার একদিনের কথা মনে
আছে। ঘোড়ার আনাগার দাঁড়িয়ে সে দিন দেখছিলাম
সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারানত মেঘ, নিচে
হেলোহের মধ্য দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত চিত্রাঙ্গ। আমার
মন লক্ষ্যে আগল খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল কাছের,
দূরত্রে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অরণ্যে একটা
অনুভূতি এল, সামনে যেখানে পেশুর নিত্যকালব্যাপী
একটি সর্গোদ্ভূতির অনবিক্রির দ্বারা নানা প্রাণের বিভিন্ন
লীলাকে বিশিষ্টে নিয়ে একটি অর্থ লীলা। নিজের
জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চাখিহিকে
হয়ে যাবে মনে মনে দূরত্রে দূরত্রে যা কিছু উপলব্ধি
চলেছে সমস্ত এক হচ্চে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে,
অভিন্ন চলেছে নানা নাটক নিয়ে, হৃদয়বের নানা খণ্ড
প্রকাশ চলেছে ভাবের প্রত্যেকের বস্তু জীবন রাজ্যে,
কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটি নাট্যরূপ প্রকাশ পাচ্ছে
এক পূর্ণ ভাবের মধ্যে যিনি সর্গোদ্ভূত, এতকাল নিজের
জীবনে হৃদয়বের যে সকল অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে
বিচলিত করেছে, তাকে যেখানে পেশুর এক নিত্য-
লাকীর পাশে দাঁড়িয়ে।”

অনুভূতি অনুভূতি একদিন হরীশ্চন্দ্রনাথের বোগপথার
হইয়াছিল। দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ সরকার কবিগুরু দহিত
ক্যালিশা-এ একবার দেখা করেন। নানা কথা প্রসঙ্গে
কবি মহেন্দ্রনাথকে বলেন—“এবার আমার অরণ্যের মধ্যে
একটা অনুভূতি হয়েছিল। একদিন রাতে আমার অঙ্গে
সহসা একটা ঘটনা অনুভব করলাম। কাতিকে আর বিয়ত
করতে ইচ্ছা হল না। লগ্না আমি যেন আমার মধ্যে

বিধা বিভক্ত হইবে আবার কেবলতে লগ্নন। যেন হুগ
বহি ঠাহর ও তার লেণা, পান পাওয়া, সবই যেন আবার
সময়নে আবার হতে ভিন্ন হয়ে পড়েছে। আমি যেন
আলোয় কিছু। যেমন এতদূর দেখা, কোথায় যেন থেঁকনা
চলে গেল। আমি কিছুই অস্বস্তি করব না। যেদ্যোটি
যেন আবার হতে দূরে গেল, আবার সত্যকার সত্যের ভিত্তি
তার যেন স্থান আর থাকল না।" রানী স্মরণে "ওকবেব"
নামক পুস্তকেও এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। অনেক সাহু
মহাপুরুষের জীবনেও এতদূর ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

একজন অস্বাস্থ্যকর বৈদ্যাত্মিক ভাষ্য "সাকী-অবস্থা"
বলে। তখন রাজ্যের বেহা থাকিলেও, সেই বেহের বোধ
থাকে না। সে তখন সাকীভবন সকল জ্বিলিল দেখ
বটে, কিন্তু ভোগ্য করে না। সে ঠাট্টা হয়, ভোক্তা থাকে
না। বৈদ্যক অবস্থানে ও উৎসাহ নিষ্ঠারূপী সাধনায় ফলেই
সাকী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

উপনিষৎ হইয়াছে যে বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি
বলিতেন—“উপনিষদ বা বেদান্ত ত্রয়-বিভাগে বনশ্রুতি।”
শাস্ত্রিকের মতে বক্তৃতাভাগের মধ্যে উৎসাহ বেদান্ত চর্চায়
যাতে নির্ভরন পাওয়া যায়। উপনিষদ সমূহের মধ্য
আলাদা এবং তত্ত্ববিশিষ্ট সত্যের উপলব্ধি চেষ্টাকে বেদান্তী-
সাধনায় বা প্রবৃত্তি সাধন বলে। হইয়াছে একান্তিকভাবে
সেই সাধনায় বক্তৃতা সাকী অবস্থার অস্বাস্থ্যকর উৎসাহ
অন্যায়ালম্ব্য হইয়াছিল এ কথা বলিলে কিছু ভুল বলা
হইবে না।

“বনশ্রুতি” ভূমিকা হইয়াছে—“এই
পাঠ্যগুলি বিশদভাবে একতারা, ওহের মন্তব্য মন্তব্য
সমস্তের কাশন, ওহের ভালে ভালে পাতায় পাতায় এক-
তারা ছাড়াই নাই। বহি নিম্নক হইয়াছে বিধে তিন তাহা
অন্যের মধ্যে মুক্তির স্থানী এল পাগে। মুক্তি সেই বিরাট
প্রাণ সমূহের কুলে, যে সমূহের বলায় স্বর্গের কাশন হতে
হতে বহুভিত্তি, তার পট্টায় তলে শাস্ত্র শিবদ্ অষ্টম।”
বুদ্ধলভ্যবির মধ্যেও কবির এই যে শাস্ত্র মৎ, চিত্তবিন্দন
উপলব্ধির অস্বস্তি করিয়াছিল শাস্ত্র শিবদ্ অষ্টম
—ইহা কেবল কবিকল্পনা নহে, ইহা জীবন ব্যাপী গুণভার
অস্বাস্থ্যকর। সেই গুণভার বলাই তিনি ক্যানিষ্ট এ
সাকীভবন সময়ে অধ্যাপক হইয়াছেন সত্যকারে বলিতে

শাস্ত্রাভিলাষ—“ভাষ্যের চেয়ে দূর দূর জ্বিলিল। ভাষ্য
যেখানে গতি নেই, তথের জ্বিলিল গতিসেখানে আছে। তথের
বহু ভবক আশ্রয়ত মনকে উপরে নিয়ে নিয়ে অপরিসের
সত্যের ভিত্তি আবার প্রকাশ করিয়ে দেয়। এখানে
অপরিসের লক্ষ হয় আশ্রয়ত পরিচয়।” তিনি আর
এক স্থানে বলিয়াছেন—“দুই এম হইবে এককে লাভ
আশ্রয়ত প্রকাশ।” অষ্টমতাহুত্ব এই প্রকাশ দ্বি
বলিয়াই তিনি উৎসাহ জীবনভবনত মর্মে প্রকাশ
যেখাছিল।

মহাপুরুষ বৈদ্যজিন জীবনে অস্বস্তি সাধন্য বাহিরে
প্রতিফলিত হয়। সাহু বলা পড়ে তার প্রতিফলনে
জীবনভাষ্য। চিঠি পত্রের ভিত্তি বিরাট সাহু বলা অকণ্ট
পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয়ে সাহু বলা অস্বস্তি
করাই প্রকাশ পায়। উৎসাহে সত্যের গুণান কিছুই
থাকে না। যেহেতু প্রকাশিত হয় সেহেতু নিছক লভ্য।
মিথ্যার আভাস মাত্র সেখানে থাকে না। থাকে পত্র
লেখা যায় তিনি যদি আবার বিশেষ অস্বস্তি দেন। সেই
সকল কারণে শ্রীমতী মল্লানবিনকে নিখিত পত্রাবলী
যেহে হইয়াছে অধ্যাপনায় ও তাহার সত্যাব
ফলের কথা বিনা আশ্রয়ত প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।
তাহার যথাক্রমে এই স্থানে পঠিকরণে পরিবেশন
করা হইল।

“আবার জীবনে নিরন্তর ভিত্তি হইতে একটি সাধন্য
বলে থাকতে হইবে। সে সাধন্য হতে আশ্রয়ত মোচনের
সাধন্য, আবার আমি থেক ছাড়িয়ে নেওয়ার সাধন্য।”

এই কথা পরিচয় বুঝা যায় হইয়াছে
সকল সময় চেষ্টা দ্বি বেদান্তিক আশ্রয়ত সত্য উপলব্ধি
করা। বেদমর্মে সাহু বলা এক লক্ষ্য হইয়াছে।

“আবার নিজে হইয়াছে বলা আছে যে ঠাট্টা, আবার
নিজে হইয়াছে ছোট হতে, যে ভোক্তা। এই দুটোকে
এক করে কেহে দৃষ্টি আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ
দুটো হয়।”

জীবন্য ও পত্রাবলীর প্রস্তাব জানিতে কবির জীবনে
বিশেষ বিলম্ব হইতে নাই।

“জীবনেও এই মিলনটিই চোখ মুক্তি করায় চিত্তবিন্দন
নবোদয়, আর হুগার চিত্তবিন্দন মনোভবন।”

জান ও কর্ণের সমস্ত সাধনই কবির জীবনে সার্থকত।
আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং সে চেষ্টা যে ফলবতী
হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

“স্বপ্ন ভূমি বেনারস সময়েই আমি চোখের জলের
ভিত্তি দিয়ে আরে। ঝট করে দেখতে পাই সে ভূমিকে
অভিভূত করে যে চিত্রাশোকিত সূক্তির বিগল হয়েচে।”

ভূমি বেনারস ভিত্তি দিয়াই যে শ্রীভগবানের অশ্রু
কল্পা উপরিটা পড়ে তাহা সাধক কবি মধ্যে মধ্যে
উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

“স্বপ্ন নাইরে থেকে আনন্দের খালি হাতে অপর্যায়
কাছে ঘাই তখনই ভিতর থেকে দেই হাত ভরে বেগম
তার পক্ষে সম্বৎ হয়।”

স্ব ভাষা না করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না এ
কথা কবি অন্তরে বুঝিয়াছিলেন। উপনিষদের বাণী
“জ্ঞানেন ভূতীযাঃ” তাঁহার জয়ের গভীর মাগ কাটিয়া
বিয়াছিল।

“আত্মপ্রকাশের পুরুষ পালা এখন শেষ করলেই হয়—
এখন আত্ম স্বর্ণপের সময় এস।”

নিম্নে কবি কহিলে স্থাতি মেনে, কিন্তু শাস্তি
মেনে না। নিম্নে কহিলে তব পাতি পাওয়া
যায়—এ কথা কবির স্মৃতিতে ঘেঁষি হয় নাই।

“স্বপ্ন হৃদয়ে, একথা পায়ে অস্বস্তিবশতঃ ভুলে
ঘাই এই জন্তে স্বপ্নের আবার শরীরটিকে ক’কানি দিয়ে
রাখেন। মোটের উপর ওটাতে উপকারই হয়—প্রস্তুত
হয়ে থাকি।”

স্বা প্রাণকে হারান ভুলে থাকে। শ্রীভগবানের বিকে
কিরেও আসার না। আশাত দিয়ে তিনি স্বপ্নের স্মৃতি
দূর করেন, তার স্বপ্ন ফিরিয়ে নেন। আত্মিক কবি এ
কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন।

“কথা” ও “হৃদয়” মধ্যে সারস্বত বিধার কঠিনে
পারিলেই সাধক জীবনের পরিসরান্বিত ঘটে। ভূমিকে
এড়িয়ে না গিয়া ভূমির ভিতর দিয়া উঠার পায়ে পৌছান
সাধক জীবনের উদ্দেশ্য। অসামান্য সাহসই শ্রীভগবানের
কৃপা লাভ করে। আত্মোপলব্ধির জন্য পুরুষতাবের কাজ
ঘেঁষানে শেষ হয়, আত্মসমর্পণের পালা সেইখানে আরম্ভ।
বৈদ্য সাধনার কথা দি। সাহস স্বপ্ন অধৈর্যের উপনীত

ও তখনই তাহার সাধনার সিদ্ধি; খণ্ডের ঘর থেকে
অখণ্ডের ঘরে প্রবেশ। প্রবর্তকের জীবন শেষ করিয়া
সাহস সাধকের জীবন শুরু করে, তখনই তাহার সত্যাত্মক
আরম্ভ হয়, এবং সে স্মৃতিতে পায়ে “নিম্ন নিম্নে”
ঘাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সে প্রস্তুতি গ্রহণ
নহে, আনন্দের। বহীভ্রমণের জীবনে এই সকল অবস্থাই
উপলব্ধি হইয়াছিল, তাহা তাঁহার উক্ত বাক্যগুলিতেই
প্রকাশ।

সত্য ও স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গী ছিলেন বহীভ্রমণ। তিনি
একদিন ক্যানিফতে দার্শনিক প্রবণ মহেশ্রনাথ পরমাত্মকে
বলি ছিলেন—“আমি গতকালে জীবনের ভিতর
ঘিরে বৃত্তকে চাইছি, এবং তাকে আনন্দতপেই বুঝছি।
এই আনন্দ কোন ভাবের উৎসলতা নয়, এ পাশ্চাত্য
শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলেই এর সত্য হয় সত্যের।” ঐ সময়
তিনি আরও বলেন—“সত্যের ভিতর ঘিরে আনন্দের
অনুভূতি কেবল সাধক স্তরেই হয়ে থাকে। সুপ্ত
আনন্দেরই বিকাশ, এর মধ্যে তিনি নিম্নে এক ভড়িয়ে
বিয়েছেন যে সেইটুকুই উপলব্ধি হলে আনন্দের অধরে
আর বৈদ্য থাকে না। আনন্দ আনন্দে নিম্নীকৃত হই।
এর ভিতর ঘিরেই তাঁর অপরিসর্যের আবার করি।”

সুপ্তের মধ্যে স্তম্ভের আনন্দতপে প্রকাশ বহীভ্রমণ নিম্ন
স্তরে সন্ন্যাস অনুভব করিতেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে
ইহার প্রস্তুত প্রকাশ পাওয়া যায়। তিনি নিম্নেই এক স্থানে
বলিয়াছেন—“স্তম্ভের অপরিসর্যের একটা “নেগেটিভ” কিছু
নয়। উহা পরিপূর্ণতা জাপক। নেতি নেতি নয়—
অন্ত জীন ইতি।” বহীভ্রমণ কোনদিনই পূর্ণাঙ্গী ছিলেন
না। তিনি কায়মনোবাক্যে ছিলেন পূর্ণতার উপাসক।
কি ব্যক্তিভাবন, কি সমাজভাবন, কি অধ্যাত্মভাবন
তিনি ইতিবাচকই অনুভবন করিয়া গিয়াছেন, নেতিবাচক
পক্ষপাতী কখনই ছিলেন না। প্রবণ অশেষ আন্দোলনে
অন্তরের সহিত বোধ বিচার, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ
আন্দোলন সর্বদা কঠিনে পাঠের নাই। ইহার কারণ
বোধ হয় নেতিবাচক বিতর্ক।

সত্যের স্থান নির্দিষ্ট কঠিনে বিধা কবি একস্থানে
বলিয়াছেন—“জান যেখানে কর্তব্যে প্রবেশ পাবে উৎসাহিত
করে সভ্য সেইখানেই।” তবু কবির নহে, কার্যেও তিনি

আজীবন সত্যসুন্দর্য ও সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সত্যের জগৎই তাঁহার জ্ঞান ও প্রেমের সাধনা।

“ইকশোঃকে” কবির মনে প্রেমের উদ্দেশ্য হইয়া যে প্রসঙ্গ রাগে—

“সখি ভালবাসা কারে কর ?

সে কি কোন্‌লি বাতনা মর ?

তবে কেবলি ত খের জল ?

তাহে কেবলি দুঃখের খাম ?

লোকে তবে করে কি হৃদয়ের তরে

এমন দুঃখের আশ ?

“নৈবেদ্যে” গীতা এই প্রশ্নের সমাধান হয় :—

“এত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায় স্বামী,

এক বিশ্বাস রয়ে যেন চিত্তে লিপিয়া,

যে অনল তাপ বখনি সহিব আমি

মের যেন তাহে তা নাহ বৃকে দাগিয়া।”

“সীতারঙ্গিনী”তে দেই প্রেমের ধন পূর্ণতা লাভ হয় তখন কি গাহিয়া উঠেন :—

“যা দেখছি যা শেয়েছি

তুলনা তার নাই।”

এব:

“বিশ্বতপের খোঁষবে

কতই গেলেন খেলে,

অশ্রুপকে বেখে গেলেন

দুটি নহন মেলে।

পরশ ধারে ঘার না করা

সকল বেছে দিলেন ধরা।”

এই ভাবে জ্ঞান ও প্রেমের সাধনার অগ্রসর হওয়ার নববুর মুক্তিহীন প্রাণের বাতনা হইতে অভ্যাচারিতের মৃত্তক (যখন) পর্যন্ত তাঁহার রূপের প্রতিকলিত হইয়া নব নব ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। সকল বস্তুকে দুঃখ যন্ত্রণা, হর্ষ বেদনা তাঁহার কথিত, নাটক ও উপস্তাসগুলিতে মূর্ত হইয়াছে। এক কথা তিনি নিম্নেও বলিয়াছেন—“বাল্লবের বেকারাবোধ তীব্র হলে এ জগতের অন্তরালে রূপ রস সত্যের কত কত না প্রকাশ বেধতে পায়।” “জ্ঞান ও প্রেমের আনিষের প্রণয়”-তাঁহারই কথা।

অধ্যাক্ষেপেতনায় চয়ন কল একাঘাতাবোধ। কবির

দেই একাঘাতাবোধ অস্বাভাবিক বলিয়াই কাহারও কোনরূপ কষ্ট দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। মধ্য মানবসমাজকে তিনি আত্মীয় জ্ঞান করিতেন। কোন দুর্গতির প্রতি অভ্যাচার দেখিলে তাঁহার লেখনী গর্জন করিয়া উঠিত। স্ব-জাতির প্রতি বিখ্যা অশ্রাব্যের তীব্র প্রতিবার করিতেও তিনি পক্ষান্তর হইতেন না। তিনি অনেক সময়ই বলিতেন—“শুষ্টির শাস্ত বাণী জালোষানি।” এই জালোষানীর মধ্যে কিছ তাঁহার কোন মোহ ছিল না। তাই অতি প্রিয়জনকে বৃদ্ধান্তেও কেহ কখনও তাঁহাকে কাতর দেখে নাই। অতঃপর তিনি বৈরাগ্যই ছিলেন। দার্শনিক মহেজ্ঞানায় সরকার কবির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন—“কবির সঙ্গে আলাপে দেখলাম তিনি পরিসরের ভিতর অপরিসরে ক্রমেতে গেলোছেন, এবং পরিবেশের অন্তীত হইতে তাঁর নিজের স্তিত্ব উদ্বোধনতার স্বরূপ ধরা পড়েছে।”

কবি কবির জ্ঞান সাধনার আভাস পাওয়া যায় তাঁহার বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং বিবিধ গল্প রচনায় মধ্যে। সাহস যে এত বিষয়ে এত স্বকম জ্ঞান আহ্ব্যে কবিতা পাঠে তাহা তাবিলে বিশ্বাস হইতে হয়। স্বীকৃত্যনায় যখন যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহা সাহিত্যই হউক, বর্ণনাই হউক, ভাবাত্মক বা বিজ্ঞানই হউক; ইতিহাস, রাজনীতি বা সমাজনীতিই হউক তাহাতেই তাঁহার বিশ্লেষণ শক্তি পূর্ণাঙ্গাৎকর্ষ, অতীত সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এবং মনের অবাধ বিচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চিন্তার বৈশিষ্ট্য সকল স্থলেই পরিস্ফুট। সর্বত্রই তাঁহার ব্যক্তব্যের সহিত ব্যক্তিব্যের অপূর্ণ সংযোগ। সেইখানেই তাঁহার জ্ঞান-সাধনার নিদ্বি।

স্বীকৃত্যনায় স্বয়ং সাধনার পরিবেশেই সাহস হইয়াছিল। স্বয়ং সাধনাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই এই সাধনার প্রণবের অপরিসর শক্তি অস্বত্ব করিয়া অধ্যাপক মহেজ্ঞানায় সরকারকে বলিয়াছিলেন—“প্রণবের অস্বত্ব শক্তি আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত একে ব্রহ্ম প্রতীক বলেছেন। ব্রহ্ম-সাধন রূপে প্রণবের অসীম শক্তি। যদি মনেও এর সঙ্গে ষোণ করিয়ে দেওয়া যায় তবে খুব সহজেই বন অস্বত্বের উক্ত প্রাণে অধিগোষণ করে। আশ্রয়ের মধ্যে স্বাভাবিক একটা প্রেরণা ও বেগ আছে উদ্বোধনতার দিকে অগ্রসর

আলু: চাষের প্রবর্তন করেন। শাস্ত্রমিত্তেও ৩৩১৫খ্রি
বিভিন্ন প্রাচীন ঐহার কথ্য জীবনের আর এক দিক।
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ঐহার অতুল কৌশল। বিশেষ সকল
জাতিক জ্ঞান ও সংস্কৃতির বহনকারী গ্রন্থের ঐহার
অতুলনীয়। ঐহার পর শিক্ষাপাত্র হস্তে সকল দেশের
যে যে ধর্ম পুথি: বেড়াইতেও ঐহার কোন সীমা বোধ হয়
নাই। ভ্রম যন্ত্রা নষ্ট হও বিশ্বভারতীর অর্থ সংগ্রহ
করিতে দুইদশকে ঘাইতেও ঐহারে দেখা গিয়াছিল।
যাহা কর্তব্য মনে করিতে, শত বাধা সত্ত্বেও তাহা সম্পন্ন
করিতে কোনও দিন গণ্ডগোল হইতেন না। পরিশ্রমে
তিনি কখনও কাতর ছিলেন না। শ্রমী মহলমহিলকে
লিখিত ১৮৮৮ তারিখের পত্রে কবি লিখিয়াছিলেন—
“আমার কর্তব্যের সকলে আবদ্ধ হই, শেষ হই অপরাধ
পুঁটায়। আমার বিধাতা বহু বহু আমায় বস
বাড়ার কাজে একদিনেও ক্লান্ত করেন নি, কিন্তু কাজ
কমাবার দিকে অনমনস্বী।” শ্রমীর হৃদয় কাগকে বলে
তিনি জানিতেন না। কিছু না করিয়া চুপচাপ বসিয়া
কাজে জীবনে তিনি অনেকবারই চাহিয়াছিলেন। দুটির
আনন্দ উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল ঐহার প্রবল।
সে বলা তিনি অনেকবারই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু
ঐহার ভাগ্যে দুটি মেলে নাই। অল্প হইয়া পড়ার
অপব্যয় ঐহার আত্মীয় বন্ধন যদি কোন কাজে কখনও
বাধা দিত তিনি বিশেষ বিরক্ত হইতেন। ঐহার সেই
বিরক্ত প্রকাশ পাইত মৌনীর চোখ। কাজে যম থাকায়।
কখনও ঐহার ঈশ্বরী নিষ্ঠা ছিল। মাঝে মাঝে আসক্তি ছিল
না বলিয়াই তিনি এত কাজ করিতে পারিয়াছিলেন।
লেখাও ঐহার একটা কম কাজ ছিল না। পৃথিবীতে

আর একজনও লেখক দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি
বহীজ্ঞানার্থে যত একাধারে কবি, প্রবন্ধ লেখক, মনীষী
৩৩১ ও চিত্রশিল্পী, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক। এত
বিভিন্ন বিষয়ে এতগুলি বিপুল সংখ্যক পুস্তক আর কেহ
লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই, অথবা কাহারও
তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। কণ্ঠস্বরী বাতীত এতগুলি কাজ
আর কে করিতে পারে?

অধ্যাপক শিক্ষাই মানুষের চরম শিক্ষা। ভারতের
প্রাচীন কবিগণের এই সভ্যবাণী বহীজ্ঞানার্থে মনে প্রাণে
বিস্ময় করিতেন। তাই একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—
“দর্শ, বাস, বল, শ্রম, ও বিবেক বিদ্যার চারটি পূর্ব কবিয়া
দেখিতে দেখাই যথার্থ দেখা।” ঐহার সে শিক্ষা সম্পূর্ণ
হইয়াছিল বলিয়াই জীবনে ঐহার জ্ঞান, তত্ত্ব, ও কণ্ঠের
সমগ্র দান করিয়া সমুদ্রের অধিকারী হইয়াছিলেন।
তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

সত্যের পূর্ণপ্রাপ্তিতে

আমার হয়েছে অভিব্যক্তি

অসুখের আমি অধিকারী।”

বিশেষ প্রিয়ঃ—বহীজ্ঞানার্থে, দেশ পরিচয়
প্রকাশিত শ্রমী নির্ধনসুখী মহলাবিশিষ্ট লিখিত
পত্রাবলী, আনন্দবাজার পত্রিকা (পূর্বাংশে), দার্শনিক
বহুভাষী, উৎসাহের প্রভুত পত্র-পত্রিকা এবং যে সকল
পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান লগ্নী হইয়াছে
কহা যাবে লেখক ও প্রকাশকগণের নিকট আমার
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীশ্রী শ্রীশ্রী



পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাণী

প্রখ্যাত বর্ননালা যোহানসন এনে পৌছতেই বন্ধক রাখাল অনিতকে প্রণাম করে সদস্যের নিয়ে গিয়ে তিনতলায় পৌছে দিয়ে চা আনছি বলেই প্রস্থান। ভীম দুটোকে অনিতের ছুটকেন ও বিছানা ঘরে রাখতে বহুদ দিয়ে অনিতকে বলে: "একটু গোল জাই, আমি ডাকি। এ ঘোড়াই নিয়ে এলাব বলে।"

অনিত একটি আবার কেদারা টেনে নিয়ে জানলায়কাছে বলে: নিচে মন্ত্রাস্তকল্লাগিনী ভীলাকণা গলা চলেছেন তেমনিই গান গেয়ে। অনিত ইন্ডিপুরে দুবার যোহানসনে এসে ছিল এই ঘটিতেই—প্রথমেই তিনদিন, দ্বিতীয়বার সাতদিন। রাখাল অনিতের গানের বিষয় ভক্ত বলেই অনিতের পক্ষে এ ঘটি পাওয়া এত সংকল্প হয়েছিল। এ ঘটিতে বসামাত্র তার মন নিটোল শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠত—লজ্জা, দ্বন্দ্বী, অগ্রো লব্ধই গান গেয়ে জাহির করে বিদ্যাসৈধ্যাণ্ডা তার মনকে যেন চেপে ধরত। কেবল হঠাৎ করে গলাতীরে এই ঘটিতে বসতে না বসতে তার মনের প্রাণের যেন পটনবিঘর্জন হ'ত।

অনিত মৃদুনেত্র চেয়ে চেয়ে দেখে—কী অপভ্রম! গলা জাপহাড়িনী, পাগনামিনী একথা শুধ মন ছেলে-বেলাই যেনে নিখোঁদিল স্বতঃই মন্দো হওয়া ঘবেও। বিদ্যাসুরের দৃঢ় ওর ভালো লাগত বৈ কি, কিন্তু বিদ্যাসুরে অনেক বোঝা বহি তপস্বী মূর্তিবার পেয়েছেন একথা আটপনর ভনে রলেও ও মূর্তিবার পেত কেলে গলাতীরে এসে বসলে—কানপুরের গলা, ভাসলপুরের গলা, পাটনার গলা, ব্রীহামপুরের গলা—সর্বোপরি হৃদয়েবধের ও হৃদ-

ঘরের গলা—"নীলগাভা"। গলায় মিকে একটু চেয়ে চেয়ে কেবলই মনে তার যেমন বগাবতী মনে হ'ত—যেন গলাতীরেই ওর ইন্দ্রলীলা দ'ক হ'ত—আর কোথাও না। তীর্থযানে ওর মন খুঁদি হ'ত, কিন্তু নির্ভজাল শান্তি পেত কেবল গলাতীরে—হঠাৎ করে আর হৃদয়েবধের, আর কোথাও না।

আখালি পাখালি তত চিত্তাই যে ভিড় ক'রে আসে... বিশেষ ক'রে মনে তার আলা ভীষণার কথা। সন্তাই ভীষণা বসল গেছে তারপে কেমন যেন একটু মন বাসিয়ে ওঠে, অথচ আশ্চর্য—এই মনে মানসেবও মিশল আছে! ভীষণা গুরুবধ ক'রে সন্তাই কিছু যে পেয়েছে তাহাতে আনন্দ...আবার মঙ্গলও থেকে মূরে ল'বে গেছে তারতে বাবা। দুই হসে নিজেই মনকার 'You can't both eat your cake and have it my boy!—সংসারী হ'রে বাজে ক'রে কাজে কথায় বাজে হই মাঝীদের সঙ্গে বাজে অটব ক'রে চলব অথচ শান্তিদিও হ'ব—এ কেমন আবহাওয়া?" বলতে বলতে একটু অশ্রিত গান ওর মনে স্তব্ধনিরে ওঠে:

মিকে কাজে রেখে জড়াবে

কেন কহো এ-ছলনা বন্ধু, বলোনা—মাঝার খেলার জুগাবে। সন্তাই, এদিকে কর্ম না ক'রে নাকটিনে ব'লে আসন প্রাণাশ্রম যান দারবার মন বসাতেও পারে না, ওদিকে কর্মের মধ্যে সাময়িক খুশখোয়ানী ছুটি পেলেও অসলা শান্তিগে বসির উঠতেও পারে না। ঐ শান্তি, শান্তি, শান্তি:। মন সময়ে সময়ে ভুজিত হ'বে ওঠে শান্তি মনহে ডু দিয়ে তক্তি থাকিবে। বহু পেতে। তক্তি? না মূর্তি? না, তক্তিই পরমধন—একলাভের পথ। কিন্তু হাং রে,

ভক্তা ভক্তি, হারা ভগবৎপ্রেম কি চাটখানি কথা ?
পরমহংসদেবের একটি প্রিয় গান মনে পড়ে :
‘আমি ভক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তা ভক্তি দিতে কাতর বই ।
আমার ভক্তি যেবা পাঠ, তরে কেবা পাঠ ?
সে যে সেবা পাঠ হ’লে ত্রিলোকভরী !

তাই তো ও জানবীণ না চেয়ে ভক্তিরাবী ! কিন্তু
প্রার্থনা করলেই কি সব কিছু পাওয়া যায় ? কখনো
কখনো ঠাঁহুয় সাত্তা ঘেন বটে, কিন্তু প্রায়ই হাতে গুটিয়ে
দুখ ফিরিয়ে থাকেন না কি ? এই নিয়ে ভাগলপুরে
ভীষ্মা ও মাদিয়ায় সঙ্গে কতবারই আলোচনা হয়েছে ।
মাদিয়া বলতেন : “ভক্তি পেতে হ’লে সব আগে চাই
চিন্তাভক্তি, আর চিন্তাভক্তি হয় না কিছুতেই যদি গুরুকরণ
না হয় ।” ভীষ্মা মনস্ত না একথা—অত্যায়ে ব্যবহারী
বেশতারা যোগপুরুষ চাইতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে । সেই
ভীষ্মার আর এক কথা ! ভাষ্যগী বলেছিল কেঁদে :
“গাথা গুরু শেরে শুধু যে আমাদের ভুলে গেছেন তাই না,
ম’কেও ভুলে গেছেন—ঠাঁহুয়া লিখেছেন ।”

একথা যদি সত্যি হয় তবে গুরুশক্তিকে না মনে
উপায় কি ? ভীষ্মা—যে ছিল বৌ-অন্ত-প্রাণ—কেমন
ক’রে তুদিন বঙ্গেরের মধ্যেই ভুলে গেল “আমরিনী
গুরুদ্বীকে” ? ওর মুখে সত্যিই তো বিদ্যায়ের চিহ্ন
নেই আর । অসিতের সাধ আছে ভীষ্মার গুরুদেবকে
বেশবার । অথচ ভ্রম ভ্রমও করে ‘আবার : যদি ধোবা,
মন একেবারে বসলে যায় ? অমনি হালি আসে : হায়
যে হায় ! যে-অশাধ মন নিয়ে ঘর করল এতদিন, তার
এমনই কী মরামহিমা যে, তার বদল হবে তাবতে এত
ভয় ? সব আগে হারা শক্তি, নিচোলা ভক্তি—তার
পথে তো আর সব । যদি গুরুতপাষ মনে ভক্তি জাগে,
প্রাণে শাস্তি নাহে তবে আর চাই কি ? কিন্তু ভীষ্মা কি
শক্তি শাস্তি ভক্তি পেয়েছে ?

এমনি সবর ভীষ্মের প্রবেশ, পিছনে রামলাল উঠরের
হাতে চা গোলাই তাকিয়া... ..

ভীষ্ম বিলম্বোলা তারঘরে বলে...ছেলেবেলায়
পড়েছিলাম—

অ—অমঙ্গল আসছে তেড়ে,

আ—আমি আছি খাব পেড়ে

অথ ভীষ্মেনস্ত ভাব্যম্—

চ—চা-রে হই চাখা বেড়ে !...হা হা হা !

ভেবে

ভীষ্ম চা খেতে খেতে হুক করে : “যৌ যখন
আমাদের যাত্রা কাটিয়ে চ’লে গেল ‘to that undiscovered country from whose bourne no traveller returns’—তখন—” বলতে বলতে চোখ মুছে : “কিন্তু
থাক সে কথা—কারণ হোকে কেমন ক’রে বোঝাব সে
কী ঘটনা—তুই বুঝিই বা কেমন ক’রে, গৃহলক্ষী কী বস
নাঃমেনে ? কোনো গুংগেরই তল পাওয়া যায় না শুধু কল্পনার
লগ্নি দিয়ে । তাই শুধু এইটুকু ব’লেই যাবি—আমার
চোখে পোনার আলোও হ’লে গেল ঘেন মিশ কালো ।
উঠতে বলতে চলতে কিরতে কেবলই তার স্মৃতি পিছু
নেয় কোঁড়ে-ঢলা ছায়ার মতন ।” কঠোর পরিকার ক’রে :
“শেষে দ্বির কলোয় গম্বায় ভূয়ে দরাই ভালো—তাই’লে
আমাদের পাণ কেটে যাবে মা-র কোলের পার্শ্বে ।
এক মন্ত কলনী নিয়ে হাবফরিয়ার গিয়ে পদার ক’রে
ধেঁবে ডিঙি থেকে কাঁপ দিলার মলে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে
সে কী আতঙ্ক রে তাই ! চেঁচিয়ে উঠলাম ভুবতে ভুবতেই :
‘বীচাও বীচাও ঠাঁহুয় ।’ ভাবপর আর কিছু মনে নেই ।
পরে জননাম আমার চাঁৎকার শুনে পানের এক মোটর
ঘোঁটে থেকে এক মুহূর্ত নাগু মলে কাঁপ দিয়ে আমার লম্বা চুল
হ’রে টেনে তুলেছিলেন । কিন্তু আমি তখন অজান । রণ
বঁবে বেঁচে যাওয়া যাকে বলে ।

“জান হ’লে দেখি—আমার জ্ঞাতা বন্ধু হাসিমুখে
আমার মুখের বিকে এক ঘূটে চেয়ে হাসা মগ্ন ক’রে
চলেছেন । অপরূপ কাছ ! আর মুখে সে কী আসো ।
ভাগলপুরে তার এক প্রিয় শিবের সংকট অল্পম ভনে
এলেছিলেন তার হিমাশ্রমে আস্রয় থেকে । শিবটি
কাঁড়া কাটলে পর তাকে নিয়ে হোম সাক্ষদকালে গম্বায়
তার মোটর ঘোঁটে বেরুতেন ।

তার মুখে জননাম মহাআজির নাম শ্রাবী বীনব্রাহ্মণ ।
মুন্ডের ভয় । বাপ বিহাটী, মা বাঙালী । কয়েকই মাতৃ-
ভাষা বাংলা আর পিতৃভাষা হিন্দি দুইয়েই সমানটা—যাকে
বলে । তার উপর কবি—হিন্দি ভজন ও বাংলা কীর্তন
দুট-এই সমান কড়ী—অন্ততঃ অশ্রুতির এলাহারে ।

শিবায়। তাঁকে ডাকে গুরুজি বা গুরুদেব, বা কি নয়ই—
“দয়াল মহারাধ।” জাগলপূরে তাঁর যে শিবাত্মকে বাঁচাতে
তিনি দেবপ্রসাদ থেকে এলেছিলেন তার মূখে শুনলাম
তাঁর অশ্রু কণার কথা—অথো কত কী....

“মাহোৎসব আবারে তিনি তুললেন আবার আটগোলা।
মা তাঁকে দেখেই চমকে চাঁৎকার করে উঠলেন : তাঁকেই
তিনি যথেষ্ট দেখেছিলেন জ্বিনি আগে। ব’লেই চোখের
তলে নদী বয়ে দিয়ে সাঁতার প্রণাম। বললেন ‘আপনি
আমাকে মনঃ মিরেছিলেন গুরুদেব !’

“আবার যেন হঠাৎ মনঃকীট চুকল কোথেকে যে !
আমি একবারে মুখোঁড় হ’য়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করলাম
মায় মন্ত্র সত্য, না মনঃগড়া। দয়াল মহারাধ যুগু হলে
বললেন : ‘কপা। অনেকই গাধ যথেষ্ট—মনঃগড়া হবে
কেন !’ ব’লেই আমাকে ধারির মাকে আশীর্বাদ করে
বললেন : জ্বিনি মূল দেবনি মা। আর আমি তোমাকে
তোমার যথেষ্ট কী হয় মিরেছিলাম—তোমো—ব’লেই
একটা কাগজে খন খন করে কী লিখলেন। তার পরে
গেট মুখে আমার হাতে দিয়ে মা-কে বললেন : এবার
বলো।’ মা বললেন হয়ত, বাতো অক্ষবের। দয়াল মহা-
রাধ আমাকে কাগজের মোড়কটি খুলতে বললেন। খুলেই
আমার চক্ষুর, অবিকল সেই মন্ত্র ! তেউ তেউ করে
কীকো কথা চাইলাম। তিনি বললেন হেনে : ‘এ মন্ত্রই
মনঃকীট মূগ বাবা, তোমার অশ্রুধা কি।’ বলে মাকে
দীক্ষা দিলেন বিধি-মত—জ্বিনি পরে। আমি দীক্ষা
নিমোছিলাম পরে—যে-প্রাণে। দীক্ষা নেওয়ার পরে
শুনলাম তাঁর ঐশ্বৰ্য্যে যে আমায়ের দীক্ষা নেওয়া ছিল
জ্বিতব্য। বলে মা—কপা। কপা। কপা। মূগু !
আমি এক্ষেত্রে শুধু জ্বুকে দিতে চাই—‘জোর কপা।’
কেন ‘জোর’ বিশেষণটিকে শুধর করলাম পরে জ্বিনি—
যে-কে না বুঝিয়ে ছাড়ব জেবেছিল নাকি ?”

অসিত বলল, “বোদনা ভীষণ। আগে বৃষ্টি তোমার
হিন মেয়ের কী ব্যবস্থা হ’ল ? মানে, তাৎপৰ্য্য বিয়ের পর-
কো প্রসাদ হ’ল কেনম করে ? নোক মূখে অবিত্রি
জনেছি কিছু, কিন্তু খোদ তোমার ঐশ্বৰ্য্যে না শুনলে টিক
মুখেতে পারছি না।”

“এতে বোকাবুদ্ধির কী আছে ? যৌ থাকেই সাদলী

ও চামেলীর বিয়ের পাকা কথা হয়ে গিয়েছিল। বৌ-এর
গহনার ছিল মণ-মারা হাজার টাকার, তার উপর আমার
বিস্ময় কাকা আমার অছি হ’য়ে ব’লে আমার জুটি আট-
গোলাই যিনি নিলেন লতা হাজার টাকার—জ্যাংগা জলের
দুইই বৈ কি। আমার বন্ধুতা সবাই আমাকে নই নই
ক’রে মানা করেছিল খুন্সর কাকাতিকে বিদায় না করতে।
কিন্তু সে সময়ে আমার অশ্রু মন কোমলতে ছাড়া পেতে
চাইছিল—যেখানে হোক গিয়ে একটু জ্বুতোবে। তার
শুধর গুরুদেবের টান। তখনো—মানে জাগলপূরে—
মানত’র না অবিত্রি যে পুরোপুরি বৈধিগি হতে চলেছি।
আমার প্রাণ হৃৎকট করছিল শুধু বৌ-এর মৃত্যুর মরণা
থেকে মুক্তি পেতে। জাগলপূরে উঠতে বসতে নাইতে
থেষ্টে মন কিছুই নশেই চোখে তলে উঠত তার মূখ, মানে
হেতে উঠত তার কঠ—আর হেহের প্রতি তত্ত্ব যেন চাইত
তার মেহের হোতা। একবার তার ভীষণমায় মা কিছু
ছিল অজুহত আনন্দের মনঃ, তার বেহাষের পর তার মৃত্যু
হ’য়ে উঠল জ্বলন্ত মৃত্যু—শান্তির চাবুক। লতিাই আর
নইতে পারছিলাম না। তাহাড়া কাকা জ্বলন্ত ও
চামেলীর বিবাহের ভার নিতে বাকী হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে
হ’ল—এইতো মূষণ—আর কেন মৃত্যির বাক্য। মনোবৈ?
অথ, কাকার কথার কনি না মিরে মোতা চ’লে গেলাম কে-
প্রাণে মা-কে নিয়ে। সেখানে পৌছবার পরেই ধারাবি
ভাষিধীতে মান করে নিলাম দীক্ষা। বশেছি, মা দীক্ষা
আগেই নিমোছিলেন—মাগ খানেক আগে। এখন আমি
দীক্ষা নিতে মা-ও ছেলে হ’য়ে দাঁড়াগো গুরুভাইগো।
মন মন্য নয়, কী বলিল ?

বলে জ্বনে-মাতা চায়ের পিঠালের শেষ চুমুক—দিয়ে
ভীম কোর হবে গল্পের হাওয়া। খেই :

তোম

“গুরুদেবের কথা এখন তোকে বলব না কিছুতেই।
নইলে নইলে যে ভাই—জ্বুই যে মাকর অবিশ্বাসী—কনি
বললে ভাববি ভাববি—দি ওলুৎ ওলুৎ টোটি—ভীষণ
বেচারা মলম ভো—তাই বাতাবতি হ’য়ে দাঁড়িয়েছে নই
মনস্তন অতিভক্তির পাণ্ডা। তাই বলি এখন—মা শুনলে
তোর মনঃকীট মন শিরণা জ্বলবে না—তোর মতিগতি

জানি তো হাড়ে হাড়ে। অথ, মেহা বেখে শুধু তব ঘা
বে লবকর্প!

“হরিষ্যের থেকে দেবপ্রাণে প্রায় বাট মাইল। ঐত
হরিষ্যের হৃদয়কেন্দ্রে চেয়ে বেশি কিন্তু মাতান্তক নয়। দুটি
বিখ্যাত নবীর সঙ্গে দেবপ্রাণে টাঙিয়েঃ বসিকের
ভাট্টারী গলা—সে পথ ধরে চললে পৌছবি উত্তরকান্দি
ধরে গম্ভীর—তারপর উত্তরকান্দি থেকে ফের বাঁককে
মেড়ে নিলে পৌছবি বসুনাভারী। এ দুটি ভীষণের হাতী
কম—কাণে পথ দুর্গম। বেশির ভাগ হাতী ভাবিকের
অলকনন্দা নদীর ধারে দিয়ে বাঃ দিয়ে চলে গেলে বিখ্যাত
যোনি ওরফে ভোটিমঠে হ’য়ে পৌছুর বহরীনাভারণ।
আলকনন্দা বহরীনাভারণ ঘাওয়া সহজ হ’লে পড়েছে খোঁচের
বাসের চৌকসে—এত সহজ যে ভুট্টা-স-ভুট্টা—ঐতকাভূতের
পথকাভূতের, ভরকাভূতের—ভুট্টাও অনায়াসে পৌছতে পারবি।
কিন্তু ভীষণের ইতিহাস থাক—কাহিনীতেই ফিরে আসি।

“ওকলেব আমাকে ও হাকেরীকা দিয়ে পরিচয় দিলেন
বহরীনাভারণ তাঁর এক ছোড়ান বিহারী শিখা ওদাদের
সঙ্গে! সে আমাদের পরে অনেক দুঃখ বিবেচিল কিন্তু
বহরীনাভারণ থেকে মুক্তিলাভ না পেলে হুত আমাদের হাক-
পথ খেয়েই ফিরে আসতে হ’ত—বিশেষ করে আমার
নিজের আলোচনায় ভরত। যা এজ্ঞে আমাকে প্রোই
খোঁচা দেন। তাঁর উৎসাহে বেখে আমি যেমন অস্বাক
হতাম, ধমক খেয়ে হতাম তেমনি লজ্জিত। সত্যি,
বহরীনাভারণ চতুর্ভূজ মহাবিগ্রহের দর্শন পাবেন বরতে
না বলতে হাক গোখে চল ত’বে আসত। সে ভক্তিকে
উজ্জ্বল ব’লে নাকচ কথা চলে না যে ভক্তি তাবারাণে পরে
শবে অবাধ্য সাধন করে। ঐতে হতই কাপুনি আত্মক না
কেন, যা অলকানন্দার গর্দন করবেনই করবেন। হাজার
কান্দি হ’লেও ভাতি চড়বেন না—প্রতি চটিতে দুই অশ্বাক
খাওয়া নয় ফলমূলে সুস্বিষ্ণু। শেষের কান্দি, চড়াই
উৎসাহ, মশা, পিঙ্গ, মাছি কোন উপাভাই তাঁকে ধমিয়ে
দিতে পারে নি। কিন্তু এ প্রশ্ন এখন থাক—মার মুখেই
ভসি তাঁর অস্বাক দর্শনের কথা। এখন ফিরে আসি
দেবপ্রাণের কাহিনীতে।

“বহরীতে মার অশ্বাক দর্শন লাভের পরে আদ্যা ফিরলার
প্রসাদলিঙ্গ হকুবে। মার আদ্যা কিছুদিন বহরীতে থাকার

ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হাকিমের হুকুম বরাবর না হ’য়ে উগার
ছিল না ব’লেই ফিরতে হ’ল।

“দেবপ্রাণের ফিরে ওকলেবের আশ্রমে বছর দুই কাটতে
না কাটতে মন আমার একেবারে বরলে গেল ভাই, সত্যি
বলছি। অবিশি একটু একটু করে য় আমি বনলাজিলার
টেব পেতাম মদার লম্বে, কিন্তু তবু একটু শিষ্টান ছিল
—মনে হ’ত বেয়েবের কথা—বিশেষ করে শেকালীব,
হাকের বা বলভের অবলম্বীয়া—আর মন কেনন করত।
কিন্তু আশ্চর্য, মার একভিগও ভাবাবর হ’ত না! সেই যে
দীকা নিয়ে ককবরী নাম নিলেন, াব পর থেকে তিনি
পিছুড়কে একভিবারও কান যেন নি। বস্তাবে সাংসারিক
না হ’লেও তাঁর ছিল নাতুনি—অত প্রাণ, তাই আদ্যা
অস্বাক লাগত। মাহু বরদায় না কে বলে?” ব’লে
হেসেঃ “মাড়ি গজিয়ে বরদালায় আমি, আর বেয়ের সন্তান
চল ছেঁটে বরদালেন মা। একেবারে বোলআন বৈরাগিনী।
মদার মদার আমি তাঁকে ঠাট্টা করে ‘নেড়ী মা’ ব’লে
ডাকতাম, পাগুটী তিনি আমাকে ‘দেড়ে খোকা’ নাম দিয়ে
শোধ তুলতেন।

“ভ্রামলী ও চামেলী মারে মারে চিঠি লিখে জানাত
কাকার মনা পরভানির কথা। আমার দুঃখ হবে বৈকি,
কিন্তু মার কাছে এক কোটাও সহ্যহুতুটি পেতাম না।
তিনি উঠতে বসতে আমাকে ধমকাতেনঃ “ওকচরণ শরণ
নেওয়ার পরে আর তুলেও মদারের পানে ফিরে চাল নে
য়ে অস্বাক—কূপে এসে ভাবাভি হ’লে আপনাদের অত
ধাকবে না মনে রাখিস। মনে নেই সেই ভল্লমটি, আদ্যা
কী চমৎকার!” ব’লেই জীম ব’রে দেয়ঃ

“ওরে ওরামে আদ্যকে কিব আশ ফিলকী

কীজিরে?

বৈঠ গলা কিনারে হু’ সূপকা অল গীজিরে?

“ওকলেব এর বাংলা তর্জমা করেছিলেন মার ভগ্নেঃ

তোমার ভ্রিতরণ শরণ পেয়ে আর দুধারে বলে

কাচ পরভি বহত?

গদাভীরে বেঁধে হুটির কোন, কূপের অলে তথা

মিটব মার?”

অসিত দুখ হ’য়ে বলেঃ চমৎকার তর্জমা, বাবা!
আমি এটি শিখবি শিখব তোমার কাছে। কিন্তু এ কী

যাণ্যব বনো ভো ? নৃপতকও কবি জন তা'হনে ? কেন
একটা প্রহর না ক'বে পাছছি না : চিত্তক্লান্ত হ'লে
কি একটিনিমেষ শুক্ল বসন্ত না কখনেই নয় ? তাগুণে
নেই কি—অবহুতঃ ক'বেও শুক্ল ছিল ?”

ভীম নৃপতক বলে : “কেন শুক্ল হ'ল দেখে দেবা,
দেবা, দেবা, 'ইনকবিশ্ববিশ্ব' কোথাকার ?”

অদিত কখন হ'লে বলে : “হ্যাঁ গো ! জানেই তো
অমর : নতবোঁতেও অগ্নিও ন বৃষ্টিও . আয়ো একটা
উপমা আছে—বৃষ্টিও দেবের বাক্য না সোমা হয় না
কিছুতেই ।

ভীম ওর কাঁধে চাপড় মেরে বলে : “না তৈ : বে ভাই,
শুক্লকলা যদি একবার তোকে চেপে ধরে তো মারতে
মারতে লোভা ক'বে হবে—সকল সন্ধে প্রসন্ন ফেন বুধ
কাটিবে পানি তুফান মল—নির্মল মধুর স্থাপিত ?

অদিত চলে : “ঘাট হয়েছে ছাঁচ, আর দেবা করব
না। তবে বিশ্বাস কোরো, পুরী থেকে ছুটে এসেছি
তোমাকে অনর্থক দেবা করতে নয়, শুধু দেখতে—শুক্ল
চরণপদ্য তোমার চিত্তক্লান্ত কীভাবে মিটল, কেন
ক'রে। কেন একটা কথা, রূপ কোরো না ভাই :
প্রাণলী, চামেলী, মেফালির মতো কি তোমার আর একটুও
নয় কেন করো না ? না, এমন কোনো বৈধী ছিপি
হাতিয়েছ বা কানে ঝাঁটলে শিউড়াক আর মরমে পশপায়
পথ পার না—বাইয়েই হাছাকাং ক'বে হবে ?”

ভীম অকুণ্ঠ ক'রে বলে : “এর নাম কুণ্ঠি দেবা না ?
তোকে নিয়ে স'ভা পেয়ে শুভা গেল না। না, তোমার
এ প্রসন্ন উত্তর এখন হবে না, গরুটা আর একটু এগুগেই
তোমার 'সংসারগ্রন্থি' ছিন্ন শুধা ধ্বংসগ্রন্থি জিন্ন' হবে—শুক-
ধেবেব ভায়ায় ।

অদিত হাসল : “সংসারীরা সংসার কি অত সহজে
কাটে ভীম ?” -

ভীম বলে : “সাপুর রূপালজি মথক হয় করতে
পারে যে ভাই, তাই কঠিনও হ'বে ওঠে লজ্জা। অমৃত :—
ব'লে যেসে—‘আর একটু শুকলে তোকে মানতেই হবে যে
শ্রীল শ্রীমত শুক্লকলাকে কুণ্ঠীল দ্বন্দ্ব লম্বহবানু উপহাস
ক'বে কানু করতে পাবেন না, পাবেন না, পাবেন না।”

“আদি হলল ক'বে বলছি ভীমদা, যে, তোমার মন

সরল বিধানের এতদ্বারা উৎসাহ করার মতন লম্বহ-
বানু আরি নই নই নই। ক'বে এটুকু অমৃত : আমি
মানি মনেপ্রাণেই যে, লম্বহ বিধানের বৈধুর্ভে একটু
সামর্থ্যের ধোঁয়া বিচিত্র মনুভূতি উপলব্ধি হয় তাতে ভায়া
হয় হ'তে পারে। ‘শ্রদ্ধাবান, লম্বহে জানে’ পীতাম্বর এ
মহাবাক্যকেও আমি বরাবরই গুণ ক'বে এসেছি—বিধান
কোয়ো।”

ভীম আল'কে আঁটখানা হ'য়ে বলে : “ক'বে যে ভাই
করি। আর তুমি নিজেতে বটটা চিনি। আমি তোকে
তার চেয়ে অনেক বেশি চিনি ব'লেই তোকে ভাক দিয়েছি,
কারণ আমার মৃত্ত বিধান—তোমার পথের বেড়াটা মৃত্তাম্বর
মরটা না হোক অনেকখানিই কেটে যাবে গুরুধেবের
চারণির পূর্ণময় : হেথ, কী চরণকার উ-মা এসে গেছে
গুরুধেবের ইন্দ্র'স্বপনে। একটা পান শু-বি । গুরুধেবই
বৈধেছিলেন তাঁর গুরুধেবের তর্পণ—“ব'লেই যবে দেব
জাবাংগে :

“এসেছি তোমার দ্বারে হে গুরু, এসেছি ঘাটে
তোমার
অ-মরা অ-বোধ শিত, পিতা তুমি আমারে
স্বাকার ।

আমরা অমৃত অজান, পতি বাব বাব পথে প্রভু,
বাংবাব হাত ধরিয়া উঠাও, কিংবা কিংবা পতি
তবু।

ভক্তের লাজ ভক্তবৎসল যাবে তুমি বাব বাব ।

কেনই হবিঃ লীলা জানি না তো—কেন
লজিত তাঁরে ;
“গুরু চার যে—সে পাত্র পরমেশন”—সাঁট
স্বপ্নকারে ।

সব যায় থাক, শুধু শুক্ল থাক চরণে ঠাই হো-না ।

চবি বিদ্যুৎমিলে শ্রীশুক্ল মিলায়,
শুক্ল বিদ্যুৎমিলে গতি নাই হাচ !

এমনি হবিঃ বিধান—পাল দুনি ক'বে রূপায় ।
গাইতে গাইতে কৌমার চোখে মল ! অদিত অমর
হ'য়ে চেয়ে থাকে : একি সেই ভীমদা যে কখন শিখার কুণ্ঠি

গেয়ে থাকি মাংস করত, জানকী বাইরের “দৌলী” তেরি
অ’বিস্মারের জিহা পনডার” ইজা গেয়ে আসত চমাত; শুধু
তাই নয়, পুত্র যুগে কী এক অনন্য আভাও যেন চকচক
করছে—মাত্র এই তিন বৎসরের সখন’ত! তবে কি যোগ-
শক্তিতে বা গুণের রূপার ম’জুঘের এমন অতিশুভীক বহল
সত্যিই রহ—জনশ্রুতির পথটাই অতিশ্রুতিবৎ বলা নয়?

গান শেষ হলে অসিত তার মস্তকোত্তর আবরণকে
ঢাকিয়ে বলল : “তীর্থদা ভাই, আমাকে হাত কোহো যে,
আমি জানকীর হৃৎথে দায় দিচ্ছি তুমি ঐংগোর ভাব-
বিশলেণ গা ভাসিয়ে ঘেরেঘের ছেড়ে বৈঠগি ঘনেছ ব’লে,
ভাই, গুরুবল আমার হয় ‘নি আদো, তাই গুরুশক্তি
সহজে লনেছ আদো কাটে নি, করুণ করছি। কিন্তু
আমার এই অকৌশলটি তুমি অবিশ্বাস কোহো না যে
তো’মার এ ‘কৃষ্ণচক্রিণজাবিত্তা মতি’-র ছোঁরাতে আমার
তুকনো বুকের বস্তুবোতের অগ্নি ঠিক ভজি না হ’লেও
সদ্য ও প্রকার মোহাব বইয়ে বিশ্লে তুমি। হানিমার
রূপস্থরের বখা পোনার পরেও আমার মনে একটু কিছু
কিন্তু ভাবছিল—কিন্তু তোমার এ অজাবনীক রূপান্তর দেখে

আজ আমার আর বিশ্বাস করতে তেমন বাধে না যে,
গুণের ব’ধে বিধে এমন কোনো অঘটনী শক্তি নামভেও
পারে যে—যে—”

তীর্থ বাধা দিয়ে ঘোম্মালে বলে : “যে নরকে হয়
করবার শক্তি থবে এই না? অগ্নি গুরু’জর! এমনি করেই
সপেরগ্রন্থি কাটবেরে ভাই, কুতুলের গায়ে যেমন বিরাট
গাছের ভাঁড়িও হয় ধূলিমাংস। তাই বলি এমন আলল
খবরটা (হর ক’রে) খবরের মত খবর, বসাল এবং জবাব।”

অসিত লকৌতুহলে বলে : “কটে! ব্যাপার কী?”

“আর কি, গাল বালা ভাই, গাল বালা। চকচকে
আর হুঁতন বিনের মধ্যেই হরিষাও নামছেন। আমি
এখানে একটি কুটির কিনেছি সাড়ে ন’ হাজার টাকায়।
এটি হবে আমাদের মূল আবাসের একটি শাখা মন্ডল।”

“বলো কী, তীর্থদা?”

“বলি আর কী—তোরা জোর বংস। এই শাখা-
ভেগটির ব্যবস্থা করতাই আমি দিন দুই আগে উচ্চভূমি
থেকে শ্রিতৃষ্ণিতে অতীর্ণ হয়েছি। ব্যাপার কী, বলি
শোন্—যাকে বলে বীতিম’ত নাটক, হা হা হা!”

[ক্রমশঃ]



দুঃখজীবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের একটি ধারা

অধ্যাপক গৌরীলাস মল্লিক

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তিনি কবি। কাব্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের কথা প্রকাশ করেছেন ভাবাবেগ সমৃদ্ধ হৃদয়স্থিত ভাষায়। প্রকৃতি জগতের সৌন্দর্য নিয়ে, মানবজীবনের কল্যাণ নিয়ে, অধ্যাত্মবাদের মহিমা নিয়ে তাঁর কাব্য ত্রিধারায় বয়ে চলেছে। প্রকৃতিজগতের যা কিছু বাস্তব, মানবজীবনের যা কিছু সত্য তা তিনি কবির চোখে দিয়েই দেখেছেন, আর কবির মন দিয়ে সেই সব উপলব্ধি করেছেন। তারপর তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন কাব্যের ত্রিধারা। তিনি নিজেই বলে গেছেন—

“আমি পৃথিবীর কবি, যেখা তার বস উঠে ধনি
আমার বাঁশীর সুরে সাজা তার জাগিবে তখন”

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হলেও সর্বজনীন হয়নি, তাঁর কাব্যসাধনার অনেকের কথা ছিল অগুরু, অহুম্মিত। এ কথা স্বীকার করে কবি বলেছেন,

“এই স্বর সাধনার পৌছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।”

কবির কাব্য সাধনার এই অপূর্ণতার জন্তে তাঁকে একসময়ে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমালোচকের অভিযোগ ছিল যে কবি তাঁর কাব্যসাহিত্যে অধ্যবলিত দুঃখজীবীদের—অর্থহীনী কৃষ্টিয়ে ভোলেন নাই। কাব্যজগৎ তিনি বিভিন্ন সুরে যে বাঁশী বাজিয়ে কাব্যরসিকদের মোহিত করেছেন, সে বাঁশীতে বাজেনি এক বিশেষ সুর যে সুরে করে পড়ে দুঃখীদের অর্থহীনতা। কবি অসংকোচে তাঁর এই অক্ষমতার কথা স্বীকার করে গেছেন এই বলে—

“তাই আমি যেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।

আমার কবিতা, জানি আমি,

গেলোও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রপারী।”

কবি অভিজ্ঞাত বংশে জন্মেছিলেন, সেই বংশের ঐশ্বর্য, অভিজাত্য, সংস্কৃতি প্রকৃতি কবিকে আশীশব ঘিরে বেধেছিল, তাই তাঁর জীবনযাত্রার রৌচিনীতি চারি তাঁতি প্রকৃতি দুঃখ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মেশবার বাধা স্বরূপ হয়েছিল। অন্তরের সঙ্গে মিশে তাদের অন্তরের পরিচয় সম্যক জানবার সুযোগ না ঘটলেও তাদের সঙ্গে তিনি কার্যব্যাপদেশে যে মেলামেশা করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ শিলাইদহ প্রকৃতি স্থানে জমিদারী পরিচালনাকালে ও ক্রীমিকতনে পরীক্ষার কালে তাঁকে ঐসব শ্রেণীর বহুলোকের সহিত মেলামেশা করতে হয়েছিল। কিন্তু তাদের শরিক হয়ে অন্তরঙ্গভাবে মেশবার সুযোগ হয়নি তাই তাদের কল্পনাজীবনকথা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি তাঁর কাব্যসাহিত্যে। এই প্রসঙ্গে কবি যেন কৈকিষৎ দিয়ে বলেছেন—

“অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।

পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হয়ে আছে বোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

চাৰি খেতে চালাইছে হাল,

তাঁতি বলে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—

বহুদূর প্রদারিত এদের বিভিন্ন কর্মভার

তারি পরে শুধু দিয়ে চলিতেছে সমস্ত

সংসার।

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে

সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রান্তের
 ঘরে,
 ভিতরে প্রবেশ করি সে নজি ছিল না
 একেবারে।

জীবনে জীবন ধোণ কর।

না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।”
 কবি প্রকাশ করলেন তাঁর অক্ষমতার কারণ,
 আর তার ভেত্রে যে তিনি মনোহত তাও তিনি
 জানালেন। তিনি যে হ্রদিকদম্বনী ও তাদের প্রতি
 সহানুভূতিসম্পন্ন তাও, বেশ বোঝা যায় তাঁর
 কথায়। তিনি তাদের হৃৎকম্প জীবনের করণ
 গান গাইতে পারেন নাই, কিন্তু সেই গান
 শোনবার ভেত্রে উদ্ভূত হয়ে ছিলেন আগামীকালের
 সেই সব গুণীর কাছ থেকে যারা “কবি অধ্যাত-
 জনের নির্বাকমনের।” তাদেরই সম্বোধন করে
 কবি বললেন—

“মুক যারা হৃৎকে স্মরণে,
 নতশির তরু যারা বিধের সন্মুখে
 এগো গুণী,
 কাঁড়ে থেকে মূরে যারা তাহাদের বাণী ঘেন
 তুমি।”

কবি নিজের যা স্বীকার করেছেন, তা অস্বীকার
 করার উপায় নেই। তবে একথাও সত্য যে, সমাজে
 অগ্রহেলিত হৃৎকবীবাদের উপর তাঁর সহানুভূতি
 অজস্রবারার করে পড়েছে। তাঁর বহু কাব্যে গানে
 তাদের প্রতি তাঁর দম্ভীমনের আবেশ উজ্জ্বল হয়ে
 উঠেছে।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে কবি শুধু
 ছিলেন কাব্যরসিক, প্রকৃতির পূজারী, ভাবজগতের
 পথচারী। তখন তাঁর কাব্যে ছিল বৌবনের
 ভাবোজ্জ্বল, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও ভগবৎ-
 প্রেমের জিগারার প্রবাহ, প্রকৃতির অন্তরবাহিরের
 নৌলব্ধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তখন চোখে ছিল
 তাঁর স্বপ্নাবেশ, মনোজগতে ছিল কল্পনার উৎস,
 ক্ষুব্ধে ছিল নানা ভাবহাসের অরণ্যভারা। কবি
 শোনালেন তাঁর সেই জীবনের গান—

“হৃদিধাড়া হৃদিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাণ
 সজ্জীৱন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
 আচীর নূতনতর, তাই মোর চক্রে স্বপ্নাবেশ।”
 তাতপর, ঘটনাক্রমে এসে পড়ে একসময় যখন

কেটে যায় তাঁর সেই স্বপ্নাবেশ, হৃদিধাড়া হৃদি-
 মাঝে আর তাঁর ভাববিলাসী মন আতঙ্ক হয়ে
 থাকতে চায় না। তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায়
 হৃৎকের সংসারের বিকে। সেই বিকে চাইতেই
 তিনি দেখলেন—

“—৭ই যে দাঁড়িয়ে নতশির

মুক সবে—স্নানমুখে লেগা শুধু শতশতাকীর
 বেদনার করণ কাহিনী;.....”

সেইসময় কবির মুখ দিয়ে নিঃসৃত
 হয়েছিল—

“এবার ফিটাও মোরে লগে যাও সংসারের তীরে,
 যে কল্পনে, রঙ্গমন্দি। হুলায়োনো সমীরে সমীরে
 তরঙ্গে তরঙ্গে আর, হুলায়োনো মোহিনী মায়ায়।
 বিজন বিধাবন্দন অন্তরেরে নিকুঞ্জ ছায়ায়
 রেণোনো বসারে আর।...”

কবির কাব্যপ্রেরণার এক অতৃতপূর্ব বিফোৱণ
 ঘটলো। যখন জমিদারীর কাজে এলেন শিলাইদহে
 তখন তাঁর ভাববিলাসী নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে
 সংঘাত ঘটলো হৃৎ-বৈজ্ঞ-ভরা মানব জীবনের।

দরদমাথা দৃষ্টি দিয়ে তখন কবি কঠোর সংসারের
 বিকে চাইলেন, দেখলেন যে করণ দৃষ্ট, তিনি
 মিলেন তাঁর এক মর্মস্পর্শী বিবরণ। যারা ‘শত-
 শতাকীর বেদনার করণকাহিনী’র ‘পাশপাশী’
 তিনি বললেন তাদের করণকাহিনী—

“...কন্ডে যত চাপে তার

বহি হলে মল্লগতি, যতক্ষণ প্রাণ থাকে তার—
 নাহি ভংগে অদৃষ্টের, নাহি নিম্নে দেবতার
 শ্রমি,

মানবের নাহি বেয়মোহ, নাহি জানে অভিমান,
 শুধু দুটি অঙ্গ খুঁটি কোনমতে কষ্ট ক্রিষ্ট প্রাণ
 বেধে রেখে বাঁচাইয়া। সে আর যখন কেহ কাঁড়ে,
 সে প্রাণে পাখাত বেয় গর্বাঙ্ক নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
 নাহি *জানে কার হায়ে দাঁড়াইবে বিচারের
 আশে,—

দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
 মরে সে নীরবে।.....”

হৃৎকের সংসারে ‘ওই যে দাঁড়িয়ে নতশির মুক
 সবে’—তাদের হৃৎকটে কবির ক্ষুব্ধ ভরে যায়
 সমবেদনার। তখন তাঁর মন বিচলিত হয়ে পড়ে,
 অন্তরে তাঁর প্রতিজ্ঞাভিত্ত হয় বেন শিবেকবাণী,

কবির লেখনীর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি হয়ে পড়ে সেই ব্যক্তি—

“কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ

তবে তাই লই সাথে, তবে তাই করে ছাড়া
দান।

বড়ো হুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখতে কঠোর
সংসার,

বড়োই হরিজ, শূত্র, বড়ো ক্ষত্র, বহু অন্ধকার।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবার,

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়,

সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ বৈজ্ঞানিক কবি,

একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।”

কবি এই সব হুঃখতাত্ত্বিক পরিভ্রমের মঙ্গলের জন্য তাদের প্রাণধারোপযোগী শুধু অন্নবস্ত্রের কামনাই করেননি তিনি চেয়েছেন তারা হবে সকল দিক হতেই প্রকৃত মানুষ। তিনি প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, তাদের চাই মেহবল, মনোবল, চরিত্রবল ও মার্জিত আনন্দময় পরিবেশ। কিন্তু এ সবের অভ্যস্ত কবি কি করতে পারেন? বাস্তবায়ন নেতৃত্বের মত নেতৃত্ব করবার আগ্রহ তাঁর নাই। তিনি চেয়েছিলেন তাদের অন্তরকে জাগাতে যাতে তাদের মনে জন্মায় আত্মবিশ্বাস।

কবি জানতেন কেন, এরা ‘বড়োই হরিজ, শূত্র, বড়ো ক্ষত্র’ কেন যে এরা ‘শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি’ কোনমতে কষ্টক্লান্ত প্রাণ রেখে ঘের বাঁচাইয়া।’ কারণ তাদের ‘প্রাণে আঘাত ঘের গর্বাঙ্ক নিষ্ঠুর অত্যাচারে।’ এই ‘নিষ্ঠুর অত্যাচার’ কিন্তু, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা সংক্রান্ত এক সত্য অবিভাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন,—“এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের ঢাকা সাঁওতাল ছেলেরেরা। বনী তাদের কি মানুষ মনে করে? তাদের স্বপ্নহুঃখের কি হিসাব আছে? প্রতিদিন পাওনা গুণে দিয়ে তার কাছে কবে রক্ত শুয়ে কাজ আঁপায় করে নিচ্ছে।……কবে সেখানে তাদের কি ছাড়ে, না ফেলেছে।”

পল্লীবাণী হুঃখী শ্রমিকদের হুঃখ-তুর্দশার হেতু বনীর নিষ্ঠুর অত্যাচার, তার অমানুষিক প্রবঞ্চনা,—এ কথা সত্য কিন্তু তাদেরও আছে যুট্টা, তুর্দশতা, ক্ষুধা যার সূলে আছে অশিক্ষা। এ সম্বন্ধে কবি এক প্রাণে বলেছেন, “অশিক্ষার

জড়তা প্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে ক্রিয়কম প্রবন্ধিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি।”

কিন্তু এর প্রতিকার কি? কবির কথায়, চাই ‘সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।’ আর যা দরকার, তা কবির প্রকাশ করে বলেছেন,—

“...এই সব মৃত মান মূক মুখে

দিতে হবে ভাষা,—এই সব শান্ত শুক ভয়ংক

ধনিতা হুলিতে হবে আশা।”...

কবি মনে করতেন, এইভাবে তাদের পরিচালনা করলে তাদের মনে আত্ম বিশ্বাসের ছবি ফুটে উঠবে, উন্নত জীবন যাপনের আশার আলো বেধা বেধে। তবেই তো তারা অসংকোচে নিজেদের মনের কথা স্পষ্ট করে বলতে পারবে, দৃঢ় ভাষায় নিজেদের জাতি বাণী জানাতে পারবে, অজ্ঞায়ের প্রতিকারের জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করতে পারবে। তাই কবি তাদের মনে আশা সঞ্চারের জন্য তাদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন—

“বুড়ো কুসিদ্ধা মিঃ একত্রে দাঁড়াও বনি সহ,

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অজ্ঞার ভীত তোম।
চেয়ে,

যখন জাগিবে তুমি, তখন সে পলাইবে ধৈর্য;

যখন দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখন সে,

পথক্লেশের মত সংকোচে সত্বে যাবে মিলে;

বেহতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,

মুখে করে আত্মগলন, জানে সে হীনতা।”

আপনার।”

এইভাবে কবি অসহায় দুর্বল হুঃখীদের সহঃসৃষ্টি বোধিয়ে দিলেন উৎসাহ, অজ্ঞানকে উচ্চ শক্তিমানদের হেয়জ্ঞানে তাদের উপরও বর্ষণ করলেন জেষ্ঠ্যমান।

হুঃখীজনের মরমী বহু হয়ে কবি তাদের যেমন সাযুনা দিচ্ছেন, তেমনি তাদের অহুঃখেরও দিচ্ছেন। এইভাবে তিনি এক সময়ে তাদের বলেছেন—

“নিচে বসে আছি সূঁকে রে কাঁদিল কেন।

জন্মভোরে আপনাকরে বাঁধিল কেন।

বনী যে তুই হুঃখবনে, সেই কথাটি রাখিল ঘনে,

পুলার ‘পরে’ স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে।

বিনা অস্ত্রে বিনা সহায় লড়তে হবে।”

অজ্ঞান-ভিমিরে সমাজের নিয়ন্ত্রণে যে সব হতভাগ্য জনসাধারণ অবহেলিত নিপীড়িত হয়ে পড়ে আছে, কবি তাদের মানুষ বলে মর্যাদা দিয়েছেন। তাই তাদের তিনি অংগেলার পাত্র বলে মনে করেন নাই বরং তারা সব রকমের মানবিক অধিকার পায়ার যোগ্য বলে মনে করতেন। কবি যেমন নিজে তাদের অমুগ্ধেরূপে নিয়েছেন, তেমনি তাদের প্রকৃত মানুষ করে তোলবার জন্য তিনি একসময়ে রাষ্ট্রীয় নেতাদের চাপ দেবারও চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য—

“আমি জানি তাদের মতো নিঃসহায় জীব অতি অল্পই আছে : ওরা সমাজের যে তলার তলিয়ে আছে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।……আমার মনে আছে পাবনা কনফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড় একজন রাষ্ট্রীয় নেতাকে বলেছিলাম ‘আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই, তা হলে সব আগে আমাদের এই তলার লোককে মানুষ করতে হবে।’

তারপর কবি অতি দুঃখের সঙ্গে জানালেন তাঁর “সেই কথাটিকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমাদের দেশাঙ্ঘ-বোঝার দেশ বলে একটা তবকে বিশেষের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না।”

রাষ্ট্রনায়কদের এইরূপ প্রবৃত্তিতে কবি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এক প্রসঙ্গে তিনি স্কেভের সঙ্গে একটা কথা বলে ফেলছিলেন “যাদের আমরা ছোট করে রেখেছি মানবতাবাদের কৃপণতা বশতঃ তাদের আমরা অবিচার করে থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থ সংগ্রহ করি ; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থ অংশেবে আমাদের দলের লোকের ভাগেই এসে জোটে।”

কবির এই মন্তব্য যে স্বার্থপর দেশাঙ্ঘবোঝীদের সম্বন্ধে—তা বলাই বাহুল্য। কবি একদিকে দেখলেন দেশের একশ্রেণীর লোকদের (কবির উক্তি) —

“...আত্মতরী প্রাণ।

তুচ্ছ করিগারে পারে মানুষের গভীর সম্মান

গৌরবে মুগ্ধত্বিকার ; নিছির স্পর্শের তরে
বীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় দুর্জি-পরে”
এরূপ যাদের প্রবৃত্তি তাদের পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে কবি তাদের বলেছেন—

“যারে তুমি নীচে ফেলো সে তোমারে বীধবে
যে নীচে, পশ্চাতে বেধেছে। যারে সে তোমায় পশ্চাতে
টানিছে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে

আড়ালে ঢাকিছ যারে

তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।”

কবির এই সতর্কবাণী বহুকাল আগে উচ্চারিত হয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কবির সেই বাণী আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

কবি সাহিত্য-সংগীত-কাব্যচর্চা নিয়েই নিজেস্ব সংসারের বাইরে আবদ্ধ করে রাখেন নি। দেশ-সমাজের অব্যাহিত পরিবেশের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই তাঁর অনেক কিছু তিন্ত অশ্লীলতা হয়েছিল। এক প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক অশ্লীলতা প্রকাশ করলেন—

“যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আর যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলছে, তাকে বলশাণীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে, তার দৃঢ়তার ঘরে চুকতে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্ছে রক্ত করে। কিন্তু বাসল যাকে সবচেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল, সে হচ্ছে দুঃখীর দুঃখ। কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা করছে অত্যন্ত। নিজের মুনাকার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা দুশো-তিনশো হারে মুনাকার ভোগ করতে এদের হ্রৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনাকাকেই এরা শক্তি বলে জানে।”

শক্তিমানদের উদ্ধতের অন্তে দুঃখীরা যে চিরকাল ধরে নতনিরে দুঃখভোগ করে যাবে তা কবি মনে করেন নাই। এদের দুঃখের অন্তরালে যে বিপ্লবের আগুন দিকি দিকি জ্বলছে তা কবি

অনুভূতি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন। সেই কথাই তিনি এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, “যাযা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে, সেই হতভাগ্যরাই দুঃখ-বিষাক্ততার প্রেরিত নৃত্যের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।”

কবি নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে সেই সঞ্চিত প্রলয়ের আগুন বংশাণীসের দান্তিকতা, জাতি-ভিমান সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, হুঃখজীবীদের কোপে উদ্ভূত ধনী শক্তিশালী সম্প্রদায় মানবসমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই সত্য তিনি উদ্ভূত শক্তিমানদের স্বরূপ করিয়ে দিয়ে বলেন,—

“দেখিতে পাওনা তুমি মুহূর্তে দাঁড়ায়েছে ঘারে,
অভিশাপ আঁকি মিল তোমার জাতির
অহংকারে।

সংগরে যদি না ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো
আপনারে বেঁধে রাখো চৌকিরে জড়িয়ে
অভিমান—

মুহূর্তমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।”

মানবদলী কবি হুঃখজীবীদের পক্ষ নিয়ে জাত্যভিমানী শক্তিশালী সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষোধ প্রকাশ করলেন তাদের অমাহুতিকতার জন্য। এর সঙ্গে তিনি তাদের জানালেন তাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ তিনি বুঝেছিলেন হুঃখীর বল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের নিজেদের মানবিক অধিকার নিয়েই অর্জন করবে। তিনিই তো একসময়ে তাদের উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন—

‘খুলার’ পরে স্বর্গ তোমার গড়তে হবে,
বিনা অস্ত্রে, বিনা সহায় লড়তে হবে।”

মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য লড়তে গিয়ে তাদের উদ্ভূত প্রকৃতির শক্তিমানদের অমাহুতিক বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে মনে করেই কবি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—

“বাধা দিলে বাধে লড়াই মরতে হবে।
পথ ছুড়ে কী করবি বড়ই সহজে হবে।
লুপ্ত করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো

এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমার নড়তে হবে।”

কবি এক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন “তাদের (হুঃখীদের) উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন

সঞ্চিত হচ্ছে।” সেই আগুন আগার আভাস লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তিনি এক মন্তব্য করে লিখে গেছেন—“হুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রক্ত-ভূমিতে নাজেঙ্ক পিরাট করে বেধেছে পাচ্ছে, এইটে মন্তব্য করা। আগেকার দিনে নিজেদের বিজিত করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পাননি—অনুষ্ঠের উপর ভর করে সব সন্তুষ্ট করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায় ও অসহ্য সেই বর্গহাঙ্গা করুনা করতে পারছে যে রাঙা পিড়িভের পীড়া ঘায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ হুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।”

সত্যই হুঃখজীবীরা আজ নিজেদের বিরাট স্ব উপলব্ধি করে একত্র সন নড়ে উঠেছে। কবিও তাদের আরও উৎসাহিত করার জন্য বলেছেন—
“ব্রহ্মতে হুসিরা শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অস্ত্রের ভীক তোমা
চেয়ে,”

কবি মানব-প্রেমিক। মানবতাবোধই তাঁকে অমুখোৎসাহ দিয়েছে অমহলিঙ্গ নির্ধাতিত নীর ঘরিত্র হুঃখীদের কর্মজীবনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি জাগ্রত করার জেতে। কবি সেই উদ্দেশ্যে ছান্যোচ্ছ কবিতার মাধ্যমে তাদের গুনিয়েছেন কত গরম-তরা আশা-সাম্রা-উৎসাহবাণী আর মাহুত্বহীন ক্ষমতা-শালী উদ্ভূত ব্যক্তিদের গুনিয়েছেন সতর্কবাণী, দিয়েছেন দিকার ও করেছেন তিরস্কার।

কবি যাদের মানুষ বিবেচনা করে হুঃখজীবীদের মধ্যে সত্যমুহূর্ত দেখিয়েছেন তাদের প্রতি ভগবানেরও যে কল্পনা আছে তা কবি বিশ্বাস করেছেন। কবির এই বিশ্বাসের কথা তাঁর অনেক কবিতায় ও গানে ব্যক্ত হয়েছে। এই বিশ্বাস বলে তিনি তাঁর মনের এক ভাবাবস্থায় লিখলেন—

“অরহারা গৃহহারা চায় উর্জপানে, ডাকে
ভগবানে।

যে দেশে সে ভগবান মানুষের স্তবের স্তবের
সাড়া যেন বীর্যরূপে হৃদয়ে কঠে চড়ে,
সে দেশের বৈজ্ঞ হবে ক্ষয়, হবে তার জয়।”

এককালে কবির এইরূপই বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি ঐ কথা প্রকাশ করেছেন। এই তাৎপর্য তিনি তাঁর এইরূপ ভগবৎ-উপলব্ধির সঙ্গে হুঃখীর

মঙ্গল কামনা মিশিয়ে দিয়ে কাণ্ডে ছুটিয়ে তুলেছেন
এক মহালাসম্পন্ন ভগবৎ-কৃপাধর অবহেলিত
হুঃখভীষের সমাজ। এত সম্পর্ক হুঃখভীষের
উপর তাঁর পক্ষপাতির যে কত গভীর ছিল তা
স্পষ্ট হচ্চে তাঁর এই উক্তি—

“কাণ্ডেরে তুই পুঁজি সাগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, বেবতা নাই
ঘরে।

তিনি গেছেন যেখান মাটি ভেঙ্গে করছে চাষ
চাষ—

পাথর ভেঙে কাটছে যেখান পথ, খাটছে ব্যস্ত
মাস।

যৌত্রে ভলে আছেন সবার সাথে, ধূলো তাঁহার
লেগেছে তুই হাতে।

তাঁর মত ভূমিসম হাড়ি আয়ের ধূলো? পরে।”
চাষা কুলি প্রভৃতি হুঃখভীষী কর্মযোগী।

মাথা ঘাম পায়ে কলে ধূল্য মাটিতে কা
করে যায়। কিন্তু তারা সমাজে অবহেলিত পতিত
হয়ে নীচ নীচ হয়ে আছে। তারা কবির ভাষায়
“নাড়ি ভাঙে অভিমান।

তধু হুঁত অধু হুঁত কোনামতে কষ্টকষ্ট প্রাণ।
হেলে দেয় বাঁজিয়া।”

কবির বিশ্বাস, এদের কর্মভীষনের সাক্ষি হয়ে
(কবিরই কথায়)

“নেমেছে ধূল্যতলে নীচ পতিতের ভগবান।”

কসো কবি ভগবানের এক বিশেষ রূপ ছুটিয়ে
তুলেছেন, সে রূপ নীচপতিতের ভগবান। অনেক
মহাপুরুষ ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন মাহুয়ের
মতো, তাই মাহুয় মাঠেই নরনারায়ণ। কবিও
এককালে ব্যক্তিগত উপলব্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত করে-
ছিলেন, ভগবানের সত্তা মাহুয়ের অস্তুরে লীলা
করে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হয়তো এই সিদ্ধান্ত
প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অচলপ্রায়
মানবসমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, যেখানে (কবির
উক্তিতে)

“কামনার কামনার বেশে বেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিমাকরণ ঘন ঘন দেখি ঘরে ঘরে
প্রাণের প্রাণের; দেখি অন্ধ মোহ হুঃখ প্রাণে
বুজুকার বহি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনাচারে
নিঃসহায় দুর্ভাগ্যের সকল সকল প্রত্যাশা,

ভীষনের সকল সম্বল : হুঃখের আশ্রয়শালা
নিষ্কণ্টে ভাঙিয়া আনে হুঃখের দুঃশাস্ত্রোহমানলে
আহুতি-ইন্ধন জোগাউতে ;”

কবি দেখে দেখে এইরূপ নিমাকরণ অনাচার
অত্যাচার দেখে তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত সন্দেহ সন্নিহান
হয়েছিলেন। তাঁর মনে সৃষ্টি হলো আর এক বিশ্বাস
ভগবান সহায় নীচ পতিতদের, তাদের উপর যারা
অবহেলা করে, অত্যাচার করে তাদের নয়।
শেষোক্ত মাহুয়ের সন্ধে তিনি স্পষ্ট করে বললেন,
“যেহা বিমুখ তাহে, কেহ নাহি সহায় তাহার।”
আর তাদের শাসিয়ে বললেন—

“যুগা করিয়াছ তুমি মাহুয়ের প্রাণের ঠাকুরে।

বিধাতার কস্তুরোষে দুঃখিতের ঘারে কলে

ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।”

এখানে কবির সিদ্ধান্ত—মাহুয়কে যারা যুগা
করে, অপমান করে তাদের উপর বর্ষন হয় ভগ-
বানের কস্তুরোষ। আর অপরপক্ষে কবির মনে
সৃষ্টি হয় যে বিশ্বাস সে বিশ্বাসের কথা গান গেয়ে
গেয়ে তিনি শোনালেন—

“যেখান থাকে সগার অধম নীনের হতে নীচ

সেইখানে যে তোমার চরণ থাকে,

সগার পিছে সবার নিচে

সবহারাদের মাঝে।”

হুঃখীদের প্রতি কবি সহানুভূতি-সম্পন্ন, তাই
তাদের তিনি মঙ্গল দেখতে চান। কিন্তু হুঃখের
সমায়ে তাদের তো হুঃখ ঘোচে না, মঙ্গলও তো
সাধিত হয় না। তারা যে ভিমিরে ছিল সেই
ভিমিরেই পড়ে আছে। ভগবান যাদের সহায়
তাদের অঙ্গল কেন? আর তিনি যাদের প্রতি
কিনরূপ, তাদের মন কলুষিত হলেও তারা সত্ত্বরত
কেন? জীবনময়াক্রে কবির মনে সংশয় জাগে
ভগবানের মঙ্গলকরতা সন্ধে।

হুঃখ-অপমানে যারা ভর্জিত হয়ে আছে
তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট পাবার উপায় কি?
ভীষনের প্রান্তভাগে এসে কবি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন
এই কথা ভেবে। এই চিন্তায় কবি কত যে
ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, তা বোকা যায় তাঁর
ছন্দায়িত কথায়—

“————— চিন্তা মম

নিকৃতি সন্ধানে ঘিরে পিঙ্কিত বিহঙ্গমদম,
মুহুর্তে মুহুর্তে বাজে লুপ্ত-বন্ধন-অপমান
সংসারের —————

কবির নিকৃতিসন্ধানের যে কোন ফল হয়নি,
তা বলাই বাহুল্য। নৈরাশ্র তাঁর মনে এসেছিল।
কিন্তু তিনি আশাবাদী। এক সময়ে তাঁর ধ্যানমননে
বৃত্ত হলো মৈত্রী করণ'র আশার ভগবান বৃদ্ধ,
অন্তরে ধ্বনিত হলো "এমের-প্রেমের মন্ত্র 'বৃদ্ধের
শরণ লইলাম'।" কবি তাঁর উদ্দেশ্যে আকৃতি
জানিয়ে বললেন—

"—————ভগবান বৃদ্ধ হুঁমি,

নির্দর এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রেই তব অক্ষয়ি।
ভরসা হারালো ঘারা, বাহ্যেরে ভেঙ্গেছে বিশ্বাস,
তোমারি কল্পনা বিস্তে ভরক তাহের সর্বনাশ,—
আপনারে তুলে তারা ভুলে হুঁমি হুঁমি। ———"
অজ্ঞানবৃত্ত পীড়িত সর্বস্বহারাদের বিজ্ঞ মনকে
শান্ত করতে ও করণার ভরে তুলতে কবির এই
নিবেদন। কিন্তু এই নিবেদনের কথাতে আগের

মত আর সে উতাপ নেই, আর আবেগের সে
গভীরতাও নেই। এর কারণ হয়তো কবির
নৈরাশ্র।

হুঃখীর হুঃখ অপমান থেকে নিকৃতি লাভের
উপায় সন্ধানে ব্যর্থতায় কবির মনে নৈরাশ্র এসেও,
তিনি তাহের ভোলে ননি। তিনি কাব্যের ছন্দে
তাদের কথা লিখেছেন, তাদের হুঃখের গান
গেয়েছেন, লাখনার বাণী শুনিয়েছেন, অল্পপ্রণো
দিয়েছেন। মনে প্রাণে তাহের হুঃখ অল্পস্তর
করেছিলেন। তাই তাঁর লেখনী দিয়ে নিঃসৃত
হতে পেরেছিল হৃদয়িত আবেগস্তর বাণী—

"বড়ো হুঃখ বড়ো বাণা—সমুখেরে কষ্টের
সংগতি,

বড়োই মতিজ, শূণ্য বড়ো ক্ষুঃ, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্নচাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, মানন্দ-উজ্জল পরমায়ু
সাহস-বিজুত বকপট। —————"

॥ আত্মপ্রকাশ ॥

ঐষ্ট্রমোহন চক্রবর্তী

প্রাণের আবেগে হার! কত কী যে বলি—

যেন আধোকাটা কলি

অপনারে করিতে প্রকাশ

পায় শুষ্ক নিয়ম প্রায়স!

শীতের বাতাস

কেহ না ছুটিতে পারে,

তাই সে যে পারে পারে

বসন্তের রহে প্রতীকার

বানভীর তার।

বসন্তে বেয়ে লাগি হুজি—

মুকা যেন ভেঙে গুজি

কছু হালি, কছু অক্ষয়ল,

চির সমুজ্জল।

যে পবিত্র,

ধিবন পর্বতী

চপেছ বাহিরা পথ লয়ে অর্থাৎখালি,

কেহ বলে, খড়া অধি! কেহ যের গাদি।

কোথা তব রাম

মানবিত্তার!

কহতে শিশুর হাসি,

মন্ত্রপুঙ্খলগানি

ভালি হিতে পারে তার

কছু একবার!।

ওই যে মেঘের পারে তারকার বেলা—

নত অম্পটতা মাঝে স্পষ্টতম লেখা—

দূর হতে বাণীপ্রায়

আলোকের করণায়

আসিছে নাহিরা হিব আবহব হলি

হুটাইতে কলি।।

যে উর্বর,

লতাঝুকে পশি'

যবে কত দিন

পুঙ্করমা হীন।

একই হৃদয়

অরুণ দে

বাহালায় বহুতায় শেঁটবে না টিপে টিপে ধরে যথো
চুকল তেলু। বহুতায় কাছে থরক দাঁড়িয়ে-চাতিবিকে তীক
পুঁটে ডাকল। উল্লেখ্য তার বুক কান্ধটা বহুত
করে কাঁপছে।

হুঁমিহা তখন কানালার কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে
আকাশপাতাল ভাব'ছিল। হুঁমিহা'র ক' হুঁমি তার ঘুম
হয় নি। চোখের কাপায় কানি পড়েছে। কি করতে
সে কিছুই ভাবে পার'ছিল না। একটা চিঠি লিখবে
কিনা তা কিছুতেই সে স্থির করতে পার'ছিল না।

ভেলু চাতিবিকে দেখে নিয়ে কি বনে করে এক পা
এক পা বয়ে হুঁমিহা'র কাছে এসে বসল। মূখ তুলে
কিছুক্ষণ হুঁমিহা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বইল। তারপর
ডাকল—“বেটী...বেটী, বেটী।”

ডাক শুনে হুঁমিহা'র চিন্তাপুরে হিঁচক হল। ডুক ঝুঁক
সে ভেলুর দিকে ডাকল। তেলু তার বক্ত আঁহের
হুঁহু। তার আঁহের মাথা। কিন্তু আঁহ এই ভেলুর
অন্তই তার দর্শন্য হতে বসেছে। ভেলুই বক্ত নাঠের
দল।

“মু' হ। বা এখন থেকে।”—হঠাৎ বেগে গেল
হুঁমিহা।

তেলু কেমন উত্তর দিল না, অন্তরিনের বক্ত থরক শুনে
চলে বাহার জন্ত পা বাড়াল না। সে তার মূখ হুঁমিহা'র
মুখের কাছে নিয়ে লাগ্ন নাড়তে লাগিল।

“কি চাই—আমি?”—বলল হুঁমিহা।

গলা এগিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল তেলু।

“তুই আমার একজনই আমার থেকে বক্তিত করেছিস-
তা কানিস?”

“কিউ...ম-ম-ম”—তেলু হুঁমিহা'র হাতের উপর
চাপ দিল।

“ই: কয়ডবি নাকি? বা এখন থেকে।”

লাফনের পা হুঁমি হুঁমিহা'র হাঁটুর উপর তুলে
দাঁড়াল তেলু।

“হুঁমিহা'র পাখী কোথাকার,”—বলে অন্তরিনার
উঠে গেল হুঁমিহা।

মূখ থেকে বেলল তেলু চোখ পিট পিট করে তার দিকে
তা করে মাটি আঁচড়ালে।

দৈনিক থেকে মূখ ফিরিয়ে হুঁমিহা'র মাথা বোনকে
নিষ্টি লিখতে বলল। কি লিখবে প্রথমে কিছুই স্থির
করতে পারল না। কয়েকটা কাগজ নষ্ট হল। তারপর
অনেক করে মাত্র একটা লাইন লিখল—

“ওগো হুঁমিহা, আমাকে না নিতে এল আমি দার না।”

লাইনটা লিখেই তার বুক কাঁপতে লাগল। একবার
ভাবল সে বড়বাকীতে কিরে গিয়া বনিনের কাছে
ক্ষমা চাখিবে। পরেক্ষণে বনে হল না, সে তো কোন
অন্যায় করে নি। একটা অন্তরিন প্রাণী কিনা চিন্তিন্যায়
বহতে বসে'ছিল তাকে বাঁচবার জন্ত যেটুকু বক্তাব
সেটুকুই করেছে। শুধু বাকসে তেলু বাঁচত না।

সামান্স অপরাধের জন্ত তেলুকে ওয়া কদ নাকি বের
নি। ওয়া তো তেলুকে ভাল করে খেতেও দিত না।
পাতকী তো কথার কথার তেলুকে মূখ কান্ধটা দিতেই।
এখন ভাব দেখাতেন যেন একটা নোংরা কীর তার
বৈদ্যের পবিত্রতা নষ্ট করে দিচ্ছে। হবীনক কম দৈত
না। প্রথম থেকেই সে তেলুকে খারাপ চোখে দেখেছে।
তেলু যেন তার শত্রু, মনোবের এক অব্যাহিত আপদ,
দলপ্রহ। নোংরা হুঁমিহা'র আপনজন বলেই সে তেলুকে
দখ করত। তার দলপ্রহ নয়। বিয়ের পর হুঁমিহা
যখন তার চিরকালের মাথা তেলুকে দখে নিয়ে বক্ত-
বাকী গেল তখন থেকেই বনিনের বিরক্তি।

সেই অলঙ্ঘ্যে দিনটোর কথা মনে পড়ল হুমিতার। সেদিন তেলু হুমিতার শাওড়ীর পূজার ঘরে চুপি চুপি ঢুকে চুড়া-কথা ঠাণ্ডার নৈবেদ্য খেয়ে ফেলেন। না খেতে গেলেন সবাই অমন অপরূপ করতে পারে। অথচ তাতেই বাঁড়তে আশ্রয় ছাড়া উঠল। শাওড়ী কোলে কপাল চুকে কাপাকাপি আরম্ভ করলেন। আর ববীন কোথা থেকে একটা মাটি মিরে এসে রাগে ভেলুকে নাড়তে নাড়তে আরম্ভ করে ফেলল। তার পরদিন ভেলুও গরু এল। অনেক অহুঁয়ত করেও হুমিতা ববীনকে কোন পত্র-চিকিৎসালয়ে ভেলুকে নিয়ে বাবার জন্য রাণী করতে পারল না। আর ভেলু হয়ে যাচ্ছে যেখান ববীন একবারও ডাকারের কাছে গেল না। বৎ হুমিতার উৎকর্ষ। দেখে তাকে ঠাট্টা করল “ভেলু নিজর আগের মতো ডোমার বানী ছিল”—বলে ছো ছো করে হাসল।

শেষ পর্যন্ত হুমিতা বাগ করে বাশের বাড়ী চলে এগেলেন। ভেলুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এখানে এসে ভেলুকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষু খায়ে দ্রুত করে সুস্থ।

হুমিতা ডেবে গেল না সেই চলে আসার পর থেকে ববীন একবারও তার ঘোঁড় নিল না কেন? ববীন কি তবে তাকে ভালবাসে না? না হঠাৎ রাগ করে না বলে কয়ে সে চলেই এগেছে তা বলে নিজের স্ত্রীর একটা বোঝাপড়া নিতে নেই। ডাক্তার-ঘরে যে বৈশিষ্ট্য হয় নি এতেই বুঝেই কি ভালবাসা বুঝিয়ে গেল। যে ভালবাসা কোন অস্তর কমা করতে পারে না সে আবার কেমন ভাষাওয়ালা! আচ্ছ ক’দিন ধরে হুমিতার মন যে কেমন-কেমন হয়েছে, কৃষ্ণের স্তবের যে মকতুমির হাওয়া বইছে তা কি ববীন একটুও বোঝে না?

চিঠিটা খান্নে পুরে জঠে রাখাল হুমিতা।

বাবার হাতে না দিয়ে চিঠিটা সে নিজেই পোষ্ট করবে স্থির করল। বাড়ীটা পাশে ঘর থেকে বেলল।

মেয়ের পারের শব্দ শুনে বাবার ঘর থেকে হুমিতার মা উকি দিয়ে বললেন, “কোথায় থাকিল?” হুমিতা ভাড়া-ভাড়ি চিঠিটা ঝাঁড়লের তলায় ঢালা দিয়ে বলল, “একটু ঘুবে আসি। পাশের বাড়ী বেড়াতে থাকি।”

মা মুচকি ঘেসে বললেন, “ভাড়াভাড়ি আসিল। রামা

হয়ে গেছে। ক’দিন ধরে তো ভাল করে কিছু খাচ্ছিল না।”

রামার পা বাড়াল হুমিতা। ভাব মনে হল যা বোঝার সব বুদ্ধিতে শেখায়েছেন। অথচ সে হাতে কিছুই বলে নি। হঠাৎ সে বাশের বাড়ী চলে আসার মত প্রথমে লক্ষ্যে রাখেন। তিনি মিজালা করেছিলেন সে একা কেন এসেছে! আমাই কোথায়? সে প্রশ্ন হুমিতা ঘেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, “ভাব নেই মা, তোমার কামাই ক’দিন পরেই আসবে। তোমাদের পুর দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই হঠাৎ চলে এলাম। অহুঁয়তি নিয়েই এসেছি।”

শ্রেক মিথো কথা। শুধু কথটা মিথো হবে না বলেই হুমিতার মনে হয়েছিল। সে ভেবেছিল ববীন তার অস্তর সঙ্গ করতে না পেয়ে ক’দিন ধরে নিশ্চয় ছুটে আসবে—তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় ববীন! তার কোন সন্ধানই নেই। সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল।

রাত্তি দিয়ে চলতে চলতে হুমিতা কি একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখল ভেলু তার পেছন পেছন আসছে। ওর দুখটা কেমন শুকনো শুকনো। দৃষ্টি উত্ত-। অপরাধীর মত চলার ভঙ্গি।

...চিঠিটা পাঠাবার পর অমীর উদ্দাহার অশেষকর করতে লাগল হুমিতা। কিন্তু দিন কয়েক পরেও ববীন কোন উত্তর এল না তখন সে বনমধ্য হয়ে পড়ল। সে ভাবে নি যে তার রাগ করে চলে আসার পরোপিত এত তরফর হবে। কি যে করবে কিছুই চেয়ে গেল না।

সে দিন বুঝায়।

হুমিতা হুহু আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে কি যেন তারছিল। তখন লক্ষ্য হয় হয়। পৃথিবীর সঙ্গে আশ্রয় বিচ্ছেদ বাধার স্তরের চোখ লাগল। পানীর জানার আঁধার মধ্যে নীচে ফিরে চলেছে।

এমন সময় “বেট...বেট” করতে করতে ছুটে এল ভেলু। বাব বাব সে চাঁচকার করতে লাগল। বিবর হয়ে তার দিকে তাকাল হুমিতা।

ভেলু তার কাপড় ধরে টানতে লাগল।

“ছাড়। হতভাগা ছাড় বলছি।”—কাপড়টা টেনে নিল হুমিতা।

ভেলু আবার বাইরে গিরে কিছুকাল পরে ফিরে এসে আবার হুমিতার কাপড় ধরে টানতে লাগল।

“কি হয়েছে?”

“খেউ”

ভেলুর আচরণ দেখে হুমিতার লম্বোৎসাহ হল কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারল না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে ভেলু বার বার চীংকার করতে লাগল।

উঠে পড়ল হুমিতা। ভেলুর সঙ্গে বাইরে গেল। তার পরে দহিয়ারে ফেরল—রবীন দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠোঁটে হুদ হাসি ফোলা করছে। গৃহশাসিত স্রোতালিত স্বাধীন মতই তাকান্ধে।

হুমিতার চোখে অভিমান ভেসে উঠল। সে কি একটা বলতে বাচ্ছিল কিন্তু তার আগেরই তার মা কোথা থেকে এসে পড়ে বললেন, “ওমা রবী! তুমি কখন এসে বাবা! বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বঃ ঘাও।”

শান্তভাবে প্রণাম করে হুমিতার ঘরে ঢুকল রবীন।... পরদিন যাতে এক গুণটন ঘটল।

সকাল থেকেই রবীনের সঙ্গে পত্তরবাড়ীতে ফিরে যাবার ভর প্রস্তুত হচ্ছিল হুমিতা। সারাদিন তিনিবশত গোছাচ্ছিল। ভেলু সবদিকের তার পেছন পেছন ঘুরে সব কিছু নীরবে লক্ষ্য করল।

রাতে ক্রান্ত হয়ে বিছানার তল হুমিতা। ঘরের সংলগ্ন বাস্তবায়ন ভেলুকে থাকতে দিল। রবীন স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারার আনন্দে বশভগ্ন ছিল।

বাড়ীটা ঘুরিয়ে কাটাতে সে কিছুতেই রাজী হল না। স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় অস্থির আনন্দে ঘেঁষে রইল। বর অঙ্ককার। বাইরে শুধু ভেলুর চোখদুটো জলছিল। বার বাব নানা রকম শেষ সে সন্তোষিত হয়ে উঠেছিল।

কি একটা প্রয়োজনে হুমিতা বলল, “এই রুই ছাড়। আমি এখনই একবার নিচেও শেক আসছি।”

রবীন উত্তর দিল, “না ছাড়ব না। চিবকাল তোমার এখন করেই বুকের মধ্যে ধরে রাখব।”

“লক্ষ্যটি ছাড়। এখনই আসছি।”—বলে ঘরমা খুলে

বাইরে বেরিয়ে গেল হুমিতা।

রবীন অঙ্ককার ঘরে একা উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ ভেলু সংবেগে ঘরে ঢুকে রবীনের উপর আশ্রয়ে পড়ল। দাঁত দিয়ে তার টুটি চেপে ধরার চেষ্টা করল।

আর্ত চীংকার করে ছিটকে পড়ল রবীন। কিন্তু সে কেবল অরক্ষণের জন্য। তারপর উঠে হাতের কাছে যা গেল তাই ভেলুর দিকে ছুড়তে লাগল।

একটা তীক্ষ্ণ আঙুরাক করে হঠাৎ ভেলু মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ভেলুর গলার আঙুরাক শুনে হুমিতা তাত্ত্বাত্তি করে ফিরে এসে আলো জালাল। ফেরল—ভেলু হুঁকছে। তার চোখের ভেতর কি যেন ঢুকে গেছে। রক্ত পড়ছে। মাথারও আঘাত লেগেছে।

ভেলুকে বুকে তুলে নিয়ে হুমিতা রবীনকে বলল, “তুমি একি সঙ্গীর্ণ করলে। আমার ভেলু...ও ভেলু...কি হয়েছে? বুঝ কই হচ্ছে?”

ভেলু হুমিতার কোলের উপর মাথা রাখল।

একটু পরে ভেলুকে মাটিতে শুইয়ে রবীনের কাছে এগিয়ে গেল হুমিতা। রবীনের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। ভেলুর চোখা বার্ষ হয়েছে। রবীনের গায়ে কয়েকটা খাঁড় লেগেছে। লক্ষ্য বার্ষ হওয়ার ভেলু রবীনের মাথা কাছেরে ধরেছিল। মাথা ফিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেই একজন পত্তর ভাঙারের কাছে ভেলুকে নিয়ে গেল হুমিতা। সঙ্গে রবীনও গেল। পত্তর ভাঙার জানালেন যে ভেলু সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে। মাথারও আঘাত লেগেছে। তাকে পত্তরের হাসপাতালে রাখা দরকার।

সেদিন সন্ধ্যায় পত্তরবাড়ী যাবার জন্য হুমিতা রবীনের সঙ্গে ট্যাঙ্কিতে উঠে বসল।

অন্ধ ভেলুকে তখন পত্তর-হাসপাতালের গাড়ী নিতে এসেছে। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

হুমিতা আর রবীনকে নিয়ে তাদের গাড়ী টাট দিতেই অন্ধ ভেলু চীংকার করে উঠল, “খেউ—খেউ-উ-উ-উ।”

তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত সে চীংকার চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে তুলল।

আস্থান

শ্রীমদ্বীর গুণ

আহ না বে-আহ, আহ না বে-আহ,
আহ না বে-আহ পাশে ।

দ্বিবিধ পেশের পোনার আকাপ
নিবিড় হ'য়ে আসে ;

শূন্য—স্বল্প টাটকা সবুজ
বরলো কোমল আসে ।

চপল নবী দ্বিটিয়ে সলিল
উপল-পথে যায় ;

উঠে ঘাটের পাখী না 'পরে
স্বর্ঘ্য চুপা যায় ;

ভালেব তপেয় গাছের ছায়ায়
নাচয়ে কেবল যায় ;

আহ না বে-আহ, আহ না বে-আহ,
আহ না বে-আহ, আহ !

পথ গিয়েছে হৃদয়-কি-কি
নিড়কি-গুহা-বিরে ;

অন্ধ সবুজের অন্ধুর ডাকে
যায় ছিনিয়ে নিয়ে

মনটাবে মোর ; কেমনে বুঝাই
আবেগ-ভূতান কী এ !

এগিয়ে গিয়ে দেখতে হবে ;
চল এগিয়ে যাই ।

মজুন আঁধার ডাক বিতেড়ে,—
বকে যে টের পাই ।

ডাক দিয়েছে, ঠাক দিয়েছে
ধাধার সময় নাই ।

আহ না বে-আহ, আহ না বে-আহ—
আহ না পথে যাই !

পথ অস্থান হ'ব না পুথান,—
কেবল গুপ্ত যাই ।

পথকে গেলে পথেই পথান
কেবল যেতে চাই ।

বস 'তা'র পথ্য 'তা'র
পথকে ঘাঁটা পাই ।

আহ না বে-আহ, আহ না বে-আহ,
আহ না-ও আহ-আহ !

পথ চপলেতে চতুর খেলা
কেবলেত সবই পাবে ;

হাতিয়ে বাকি বাই পে-পথে,
হারিয়ে না হ'ব যাবে ।

পথের পথিক পথ না চেয়ে
কী আর ঘোরা চাইবে ।

কোনটা বে পথের সানিল,—
চল না পথে যাইবে !

পথ অজানা,—কি আসে তার !
অজানা পথ থাকে ;

চমক দিয়ে চপল—চপল
কেবল থাকে বাঁচে ।

যদি কি জাহার মাঝে বে 'পথে'
পথ হাটের ডাকে !

আহ না বে-আহ, আকাপ ডাকে
কী তো গাছের কঁকে ;

চপল বায়ে চপল আসে
চলু-চপল পথে ;

ডাকুকে পথে কুখর মূখর
বিরগ লাগে পথে ;

আহ না বে-আহ, আহ না বে-আহ,
পথের জীহনটাকে

হাতাই কেবল মচল মচল
পথের পাকে পাকে ।

শৈশব কৈশোর থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। শিশু কবির সঙ্গে প্রকৃতি বোধহয় ষাঁ ঘনিষ্ঠ হতে চায়নি। কিশোর কবির সঙ্গে প্রকৃতির দেখা হত কাকতালিক দ্বারা—আড়াল আবডালে। তুপুর বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, লোহার শিকণ্ডালোর ভিতর দিয়ে উত্তরের সরঞ্জাম মিলন সম্ভব হত। এ সব কথা কবি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন।

আধাত্তির কয়েকটা দিন তখন কেটে গেছে একদিন পুরো ছুটির আনন্দলাভ ঘটল। শিতার সঙ্গে কবি তিমালয় ভ্রমণে বের হলেন। কবি ভাবলেন, বাড়ীর কাছে গুলি তোলা, পালক সাজকরা হাঁসগুলোর অকার্য আনন্দের ভিতর, মাথায় প্রচণ্ড জট নিয়ে ঠাড়িয়ে থাক। বটগাছটার যে প্রকৃতির অংশমাত্র দেখেছেন—তাকে প্রাণ ভরে দেখবেন হিমালয়ে। প্রকৃতির অব্যবহৃত সৃষ্টি মুক্তি কবি প্রাণ ভরে পান করবেন। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন শৈশবের বড় আশ্চর্যজনক, বড় অসুখের। কবি আহত হলেন অতিথিপরোপিতার ক্রটিতে। নগাধিরাজ তার অতুলবৈভব ও মহিমা সত্ত্বেও দুহাত ভরে কবিকে কিছুই দিতে পারল না।

তারপর কবিজীবনের এক আধটা পালা সাজ হয়ে গেছে। সুখস্বপ্ন জীবনমরণে ‘তুফান’ তোলা ‘ব্যাঙ্কল বিহঙ্গ’ জীবনের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সোপান অতিক্রম করেছে। কবি এলেন পূর্ববঙ্গে। শিলাইদহ, সাজাবপুর, পতিসরে।

অতিথি হিসেবে নয় পরিবারের একজন হয়ে। ঘরচাড়া প্রবাসী ঘরের টানে সাড়া দিল। কবি-জীবনে এ অবস্থাটা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপনের কাল। গ্রহজীবনের হাসিকারু। বিরহ মিলনের স্রোত উচ্ছলিত হয়ে উঠছে। শুধু বঙ্গবীর প্রসারিত নরনরী, ধানের ক্ষেত, পদ্মার খেয়ালী কিশোরী সৃষ্টি নয়—সমস্ত বঙ্গপ্রকৃতির কাছে কবি পরমাত্মীয় হয়ে উঠলেন। গঠন তুলে বঙ্গ-প্রকৃতির কবির সঙ্গে তথ্যবর্তী। অন্ধর-মহলের গোপনতম প্রকোষ্ঠে কবির নিমগ্ন। অস্বপ্নের ভিতর কবি খুব নিজের হয়ে উঠলেন। কবিরও অস্তরের পর্দা উঠে গেল। আনাহার তুলে গেলেন। দিনরাত শুধু মধুর আলাপ—গভীর আনন্দের এক একটি সুর সূঁচনা স্রীতির আবেগে কৈপে কৈপে উঠছে রবীন্দ্র সৌন্দর্য ভেতন বাহ্যিক গতি রূপ লাভ করল।

পূর্ববঙ্গে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বাংলা দেশের পরিচর পেলেন। কোরলে মধুর কুমীরে স্থাপনে সন্ন্যাসের ভরা বাংলাদেশ। মাদুর্যের সঙ্গে আধিম হিংস্রতার প্রাবন তার সঙ্গে সঙ্গে। কবি সব কিছু দেখলেন। গ্রাম, হাটবাজার, গজ, চিত্রের ছাদ-ওড়ালা বাড়ী, খড়োচাল সবই তাঁর চোখের সামনে। প্রতিদিনের কাজকরা সাজু, চাবী, জেলে, মাখি, মুটে মজুর সকলেই কবির সামনে উপস্থিত। কবির একান্ত কাছাকাছি হয়ে তারা দেখা দিল। আবার অজ্ঞানের সঙ্ক্যা সত্যীকৃত্য গ্রহবন্দ সৃষ্টি করে এলো। কখনও

গৌরবের হস্তিঃ শস্ত্র সম্ভার বোঝাট বরেন্দ্রকর্তার
শোনার তরী এগিয়ে চলিতে : পদ্মার একটানা
শ্রোত জীবনের নানা কথা মনে আসেন। যতদূর
চোখ যায় শুধু মাঠ আর মাঠ—কখনো গৈরিক
কখনও সবুজে ভরা। বাঁধান ভলের রেখায়
রেখায় বক, সারস, বেলেছাঁস। যত দেখা যায়—
নারকেল সুপুত্রি পাতার পাতার বিকালের সূর্যের
আলো। বিসের আবেশে এগ ভরে ওঠে।

পূর্ববঙ্গ বাসের অনেকগুলি দিন কবি বাটে
কাটিয়েছেন। জেলে চলার আনন্দ অসুভব
করতেন। অধৈর্য ভলে কার আত্মনা বাজে।
যে পথের বেহতা কবিতা বর ছাড়িয়ে এনেছেন,
তিনি কত ভীকে ছুঁয়ে দেখাবেন। কবি সেই
পথ চলার আশ্বাসে বিভোর। বসে বসে ছবি
দেখছেন, অসুভব করছেন—দেশ বিদেশের নানা
কবির কথা মনে আসে। নিজের অসুভব এবং
উপলব্ধি কবি ছড়িয়ে মিছেন আত্মীয় স্বজনদের
কাছে লেখা নানা চিঠিপত্র। এ অসুভব যেন
ধরে রাখা যাচ্ছে না। কাছের মানুষকে ডেকে
মেথাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রূপময়ী বাংলাকে দেখে কবি তন্দ্রা হইতেছেন।
তার অতুল ঐশ্বর্যের ডাঙা থেকে কত মনোমগ্নতা
তিনি তার পাঠক পরিচিতদের উপহার দিতেছেন
তার অধি নেই। দর্শনমাঠের ঘর আড়িকরে
ভালোবেসেছেন। আরও বেশি করে ভালো-
বেসেছেন। কবি নিজে বলেছেন—তার দেশের
ঐতিহ্যবাহী কবিতাগুলি তিনি যেতে পারেননি।
কবির পূর্ববঙ্গবাসের অভিজ্ঞতা এ মস্তবোত
ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার করেন। নিরীক্ষণ
নির্দোষস্বাভাব্য মনোভাব। তখন কবির প্রিয় প্রকৃতির
পাশাপাশি এসে মলিনমুখে দাঁড়িয়েছে। ভাবতে
আনন্দ লাগে—পূর্ববঙ্গের গাছ পালা, তৃণ তরুলতা
পল্লবাবরা কবির কবির সঙ্গী হয়ে বইল, আত্মিক

ভাষা কাকলি তুলল—তার কথাবলে উল্লস;
তারের সঙ্গে মিলেমিলে যে মাছুষেরা এলো—
তার কবির স্মৃতিসমুদ্র হইতে উঠল না। তার
হারিয়ে গেল অভাবের কোন 'অগমতীরে'। অবা-
জীর্ণ, হোগলত্র, প্রতিদিনের আঘাতে অভিহিত
কিংবা নিরুপজ্ঞ পাত্ৰিয়ারিক জীবনের চাপে-দীর্ঘ
মাছুষেরা ক্রমশঃ মূরে মূরে গেল। কবির
সমানুভূতির পরিধিতে তারা রেখাপাত
করল না।

বহীশ্রুতাব্যবহার স্মরণে পবিত্রের কত বর্ণের
চিত্রচিত্রের মালা গাঁথা চলছে। পূর্ববঙ্গ বাস-
কালে কবি উভয়ের নিকটতম সাহচর্য এসেছেন।
প্রকৃতির কবি মস্তীর অস্থান্যানে অগণ্যগতকে
কথা বলতে শুনছেন। কত নিভাচ্চ সাধারণ
মাছুষের স্বভাবের হাওয়া এসে কবির গায়ে
লাগছে। তাদের মুক মুখ মূর হয়েছ। কবির
নৈকটা লাভে তারা বদ্ধ। কাছারি বাড়ীর পরিত্যক্ত
প্রাসাদকে কান পাড়লে নূর কালের কবি-
ভবিষ্যৎ আর বহিঃ প্রকার দুঃখবেদনা বসন্তের
কথাপকথনের ধ্বনি শোনা যায় :

পূর্ববঙ্গ কবি জীবনের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত।
কতগুলি লেখার সমসাময়িক অভিজ্ঞতার চাপ
পড়েছে। পংখ্যটি কবিতাগুলিতে তার স্মৃতি হয়ে
দেখা দিতেছে। অথচ এর প্রায় সংশ্লিষ্টই
কবির প্রকৃতি ভাবুকতার প্রাধান্য। শুধু চিত্র
আর চিত্র। চিত্রগুলি না আসছে সমসাময়িক-
ভাষা—না আসছে স্মৃতিতে : প্রথমশ্রেণীর
রচনায় যে 'হু' একটি চিত্র এলো—তারও যেন
চিত্রের ভিত্তি হারিয়ে যেতে চায়। লেখা পড়লে
মনে হয় এখনকার চিত্রেরা কথা বলেন।
মাছুষগুলি এক একটি ছবি। তাদের জীবনব্যাপার
বলগুণন, মধুর কল্পন কানে আসেন। কবিও
শুনতে পাননি। এ দেখার—চোখ, কান দুইই

পর্যটকের। কোড়াল আছে—কিন্তু চলমান তরঙ্গীর ছুঁপারের মাছুষ মাছুষের বেদনার জ্ঞান কবির সহানুভূতি করে পড়ছেন। লেখার তাদের সুখ-দুঃখ আন্দোলিত হয়ে উঠছেন।

কবি তাঁর চিত্তচরিত্রের সূক্ষ্ম স্তরকে চিত্রগুলি নিয়েছেন পূর্ববঙ্গ বাসের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি থেকে। চিত্রগুলি নিয়েছেন কলকাতা বাস ও তাঁর স্মৃতি থেকে। মনে হয়, উভয়ের প্রেরণাভর, গ্রন্থন ও বিজ্ঞাস বিষয়েও কবি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছেন।

রবীন্দ্র চরিত্র শালায় ছ'একটি আছে—যারা পূর্ববঙ্গ থেকে আসছেন। এরা অল্প হলেও কথা বলে। এরা প্রায়ই অপরিণত বয়স্ক। পূর্ববঙ্গ জীবন পরিবেশের বহুতর সমাজের কথা রবীন্দ্র শিল্পে প্রায় উপেক্ষিত অথবা স্বল্প উল্লিখিত। অথচ চিত্রের ক্ষেত্রে কত স্মরণ এবং বিস্তীর্ণ পরিধি। কবির বরদ সহানুভূতি ও স্বানুভবের মদিকাকন যোগে তারা কত জীবন্ত।

আমাদের মনে হয়—চিত্রিত রূপায়ণে কবির বাল্য অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘ দ্বারা সম্প্রতি। তারা কবির মনে চূর্ণর স্মৃতি হয়ে গেছে। বাল্যের

প্রকৃতি ও চরিত্রগুলিও অবচেতনায় পূর্ণতা লাভ করে ছিল। প্রথম অভিজ্ঞতার কিছুই যেন মুছে যায়নি। পূর্ববঙ্গ পরিবেশে কবি সন্ধ্যার সৌন্দর্য-পুণীতে, রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করেছেন। কবি নিজে রাজকুমার। সেখানে সৌন্দর্যের মদিরিহ্নল লীলার প্রাধান্য। নির্দুঃ বস্তুজগতের কিছু যেন কিছুতেই কবিকে ভোলাতে পারেননি।

রবীন্দ্র কাব্যের সুবীণাটক কবির প্রকৃতি-গুণ-ভাষা মুক্ত হন। রসতীর্থ পথের পথিক রোমাটিক কবির কল্পনা ও ধ্যানের বিশাল পরিধির দিকে বিশ্বরে গুণিয়ে থাকেন। উগ্র দেশপ্রেমিকতা উমা প্রকাশ করেন। নিম্নুকেরা কবিকে নানা অপবাদ দেন—কবির বিকণ্ডে নানা ন্যায় অস্তায় অভিযোগ তোলেন। রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিপক্ষে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের রবীন্দ্রমানসের অবহেলিত মাছুষদের দীর্ঘনিঃশ্বাস মর্মব্রিত হয়ে ওঠে। আমরা, রবীন্দ্রানুগামীরা আহত হই। কিন্তু কবির স্বপ্নক বলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ছ' একটি গল্প, ও এক আধখানা চিঠিপত্র ছাড়া সামান্য উপদান আমাদের হাতে আছে।



রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মহাসম্রাট অশোক

ডঃ স্ত্যামতবিনয় বড়ুয়া, এম. এ, ডি, ফিল,

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধদৃষ্টি অশোকের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বৌদ্ধধর্মের সাহায্যাত্মক তিনি বেশ বেশাঙ্করে পরিচালিত করেছেন। বস্তুত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একমাত্র বুদ্ধধর্মকে বার বিলে দেশপ্রিয় অশোকের গুরুত্ব দর্শ্যপেচ্ছা বেশি। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধধর্মকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে স্রষ্টা জানিয়েছেন। আর তৎকালীন বুদ্ধের বাণীকে ভাবনে গ্রহণ করে তিনি তাঁর রাজসম্রাজ্যকে মঙ্গলের হাতিয়ে নিযুক্ত করেছেন, ভারত—ইতিহাসের সেই মহান নামক অশোককে তিনি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথবিরুদ্ধে বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধদৃষ্টি অশোকের আলোচনা অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক প্রমুখ ও সংস্কৃতধর্মের বুদ্ধধর্মের চরিত্রবাহিনী উল্লেখ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, একমাত্র প্রবন্ধসাহিত্য বাস্তব রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক ও গানে কোথাও অশোকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'কথা' (১৯০০) কাব্যখানি ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এখানে উপনিষদের মূল থেকে আহৃত করে শিব-মাতাঠার মূল পর্বত বিভিন্নকালের দৃশ্য-ওপলম্বন ক্ষমিত হয়েছে। ভারতবর্ষের পৌর-ঐর্ষ, জাগ ও মদ্যের আশ্রয় এত অপরূপ গাথাবিত্তান্ত'লর মধ্য দিয়ে এক অপরূপ দোষের প্রকাশিত। ভারতবর্ষের অপরূপ শ্রেষ্ঠ গল্প তার বিশ্বপ্রমদগুরু বৌদ্ধধর্ম। 'কথা' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ মালকায়ের পুণ্ডরিকের জায় বৌদ্ধধর্মের উপাখ্যান থেকেও কয়েকটি গাথাকবিতার উপাখ্যান লক্ষ্য করেছে। এর অপরূপ শ্রেষ্ঠত্বকা, 'নন্দবনস্থ', পূর্ণাবিনী, অতিগার প্রভৃতি কবিতায়

বৌদ্ধধর্মের জাগ, বৈজী ও মানবতার বালী অতি মনন্যভাবে মুটে উঠেছে। দৃষ্টান্ত কবিতায় বহু বুদ্ধধর্মের চরিত্রবাহিনী উল্লেখ্যভাবে রচিত। আর যে রাজত্বকে অশোক অপরূপ বুদ্ধের 'বহুমান বিজ্ঞান বহুমান মথার লোকাঙ্কন্যায়' বালীকে জীবনের মূল তত বিশাখ্যগ্রন্থ করেছেন, তিনি বুদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রমের বালীকে পৃথিবীর মূল মূর্ত্যের প্রেরণ করেছেন, বুদ্ধধর্মের সেই শ্রেষ্ঠতর উত্তরমথার মথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ্যভাবে পাওয়া যায় না। 'কথা' কাব্যগ্রন্থে পবেও রবীন্দ্রনাথ যে মূল কাব্য নাটকটির রচনা করেছেন সেখানেও অশোকের উল্লেখ নেই। একদিক থেকে দেখতে গেলে আশাযের মেনে বৌদ্ধকাহিনী ও বৌদ্ধ ভাবার্থের পরিচয়মথানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকটির প্রত্যয় অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে মালিনী, নটীপুত্র, চতালিকা ও স্রামা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অশোকের জীবনের কাহিনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথ নাটকটির রচনা করতে পারতেন। অস্তুত অশোকের জীবনে নাটকীয় উপাখ্যানের অত্যন্ত নেই। ইতিপূর্বে অরোহণপ্রদায় ও সিংহিনী--প্রমুখ নাট্যকাব্যগণ অশোকচরিত্র অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছেন। 'বিশর্জন' নাটকে বেণা মায়, স্ত্যামতবিনয় ক.জরক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উজ্জ্বল করে নাটক রচনায়ে প্রস্তুত করেছে। আর কলিকাতা মূল্য চতালিকা রক্তের বস্তু বহুয়ে দিয়ে একদিন যে মধ্যস্থিত অগ্রশ্রেষ্ঠতার এই অগ্রবিনয়ের পথ পরিহার করে মধ্যস্থিতের আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন, এই ভাবার্থাত্মক রবীন্দ্রনাথকে নাটক রচনার প্রেরণা দান করেনি। কাজেই এমনও হতে পারে যে, অশোকচরিত্র অবলম্বন করে ইতিপূর্বে নাটক রচিত

D. R. Bhandarkar, Asok (3rd ed.), P, 217

হচ্ছে কেন তিনি আর না ক'রেন প্রভৃৎ প্রশ্ন হইল। সে হাই হুক না কেন, আসল কথা হল রবীন্দ্রনাথ অশোকের জীবন নিয়ে কোন নাটক কিংবা কবিতা রচনা করেন নি। অশোক প্রত্যেক্ষে পেন মহাপুত্র বহাবই লক্ষ্য করেছেন,—

রবীন্দ্রনাথ মহাবাই ঐতিহাসিক উপকথা অবলম্বনেই গাথানটিকারি রচনা করেছেন, ইতিহাসের প্রধান চরিত্র বা মূল আখ্যানকে কখনও অবলম্বন করেন নি। ... ইতিহাসের মূলধারা বা প্রধান চরিত্র তাঁর চিত্রকে উল্লিখ করেছেন এবং সম্বন্ধবিশেষে প্রবন্ধ— রচনার উপস্থান স্থগিত করে, কিন্তু কাব্য নাট্যাধি রচনার প্রবৃত্ত করে নি। (১)

অশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ভিত্তি অঙ্গুলন করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার আলোকেই অশোক চরিত্রের মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন। এখানে কবিকল্পনাও চরিত্র ঐতিহাসিক চেতনা অধিক সক্রিয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অশোকচরিত্রের প্রতি ঐতিহাসিকদের আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু অনেক কাল ধরে অশোকের ঐতিহাসিক পরিচয় গল্প ও কিংবদন্তী কুটিলতার আচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ও সিংহলী সাহিত্যে অশোকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অনেকক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধম্পর্কিত অশোককে দৌরবয়ান করার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধসমাজ অশোকের সম্বন্ধে কল্পকণ্ডলি অবতার কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে একটি বহুপ্রচলিত কাহিনী হল প্রথম জীবনে অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন এবং নিরানন্দেরাজন জাইকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। তারপর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর এই 'চতানোক' হলেন 'ধর্মশোক'। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ সকল কাহিনীর সমস্তা বীকার করেন না। (২) তবে আবারের বেশে মহাপুত্রবর্ষের সম্বন্ধে এরকম অশীক কাহিনীর অভাব নেই। এ সকল অপ্রাকৃত কাহিনী আদিকবি বাস্তবিককে বহুতে পরিণত করেছে, মহাকবি কালিদাসকে মহাবীর

সামিহেছে। শুধু আবারের বেশে বেন, সকল বেশেই মহাপুত্রবর্ষের সম্বন্ধে এরকম কাহিনী অল্পবিত্তর প্রচলিত আছে। এর স্রষ্টা দৃষ্টান্ত মনে হয় ঐষ্ট্রের জীবনকাহিনী। ঐষ্ট্রকে অত্যধিক মারাত্মক হান করতে গিয়ে ঐষ্ট্রমহার্য তাঁর উপর অনেক অশৌচিক কাহিনী আরোপ করেছেন।

একদিক থেকে বাস্তবিক, কালিদাস ও ঐষ্ট্রের চেয়ে অশোক বেশি ভাগ্যবান। কেননা তিনি নিজের পরিচয়কে অক্ষর পাথরের গায়ে লিখে রেখে গেছেন। অশোকের উৎকীর্ণ এই শিলালিপিকলি ঐতিহাসিকদের পক্ষে অশোকচরিত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হলিল। কিন্তু অশোক-লিপির ভাষা বহুকাল ধরে বাহুবের আচ্ছন্ন রাইয়ে ছিল। সেজন্য অশোকের বাণী শত শত বৎসর ধরে মানবহৃদয়কে কেবল কোথার মত ইশারায় আহ্বান করেছে। অশোকলিপি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

অগস্ত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা, অশোক আশ্রয় যে কথাগুলিকে চিরকালেই প্রতিপোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুঁজিয়া বিদ্যাছিলেন। তাহা বিদ্যাছিলেন, পাহাড় কোনকালে সরিষে না, সরিষে না, অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন বিদ্যা আনুষ্ঠিত করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।

পাহাড় কালকালের কোনো বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মগুরুভ্য ভারতবর্ষের সেই পৌরুষে দিন! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা-কটি বিশ্বস্ত অক্ষরের অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অশোক জীবন করিয়াছে! অশোকের সেই মহাবাহীও কত শত বৎসর মানবহৃদয়কে কোথার মতো কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে! পথ দিও রাজপুত্র পেল, পাঠান পেল, বেগল পেল, বর্ষির তরুণি বিদ্যাজ্ঞে মতো কিপ্রমেণে দ্বিগুণিত গ্রন্থের কণাভাত করিয়া পেল—কেহ তাঁহার ইশারায় রাজা দিল না। সন্ত-পারের যে স্তম্ভ যৌগের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই, তাঁহার শিরীষা পাহাৰলকে বহন তাঁহার

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ ৭০-৭১

(২) V. A. Smith, Asoka, the Buddhist Emperor of India (2nd ed.) p. 23

অশ্বাশ্বিন উৎসর্গ করিতেছিল তখন যে বীপের অরণ্যচাষী 'জয়ি' গণ আপনাদের পূজার আসনে তাহারীন প্রস্তরমূলে তত্ত্বিত করিয়া তুলিতেছিল, বর নক্ষত্র বৎসর পরে সেই বীপ হইতে একটি বিশেষী আসিয়া কালাভয়ে সেই বৃক্ষ ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাবকে উদ্ধার করিয়া নষ্টলেন। বাহ্যক্রমবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত নভাখী-পরে একটি বিশেষীও গাহাঘো সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি বড় বড়ো পত্রাটাই হউন, তিনি কী চান কী না চান, তাঁহার কাছে কোন্টো ভালো কোন্টো মন্দ, তাহা পূর্বের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত দূর ধরিয়া লকল রাজবের মনের আশ্রয় চাহিয়া পবপ্রাণে দাঁড়াইয়া আছে। বাহ্যক্রমবর্তী সেই একাধ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পূর্বের লোক কেহ চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। (১)

অশোকলিপি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিও যথো কায়োব বাস্তব ও ইতিহাসের সত্য একদমে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশটুকু পড়বার পর রবীন্দ্রনাথ অশোকের উপর কবিতা রচনা করেন নি বলে আর অশোক থাকে না। আর রবীন্দ্রনাথ অশোক-ইতিহাসের মূল উপাধান অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধারের বিরোধ সম্বন্ধেও যে আগ্রহ পোষণ করতেন তা এখানে দৃষ্ট।

সদুপাসনের ক্ষুদ্র বীপের যে একজন বিশেষী এসে কালাভয়ের বৃক্ষ ইঙ্গিতপাশ হতে অশোকলিপির ভাবকে উদ্ধার করেছেন, তিনি বলেন ইংরেজ মন্ত্রী জেমস প্রিন্সেপ (১৭২২-১৮০০)। অশোকলিপি প্রসঙ্গে এই মন্ত্রীই নাম চিত্রবর্তী হইয়া থাকবে। তিনি ১৮০৪ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত বিশেষ পথিক্রম করে এই প্রাচীন স্মৃতিলিপির পাঠোদ্ধারে সফলকাম হয়েছেন। এর পর থেকে অশোকলিপিকে অধ্যয়ন করে বড় মন্ত্রী অশোকের জীবনের উপর নানা দৃষ্টি থেকে আলোকপাত করেছেন। বস্তুত ভাবতবার্ষিক ইতিহাসের মধ্যে অশোক সম্বন্ধে বেশিরভাগের স্বীকৃতি কর্তৃক স্বীকৃত্যল ঘটে যে

আলোচনা ও সংবেদন হয়েছিল এমন আর কিছু সম্ভবে হয় নি। বাংলাদেশে অশোক সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা পরিমাণে কম হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। রক্ষবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' (১৮২২) বাংলা ভাষার রচিত অশোক সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এছাড়া চারুচন্দ্র বসু 'অশোক বা প্রায়শ্চী' (১৮১১), হরেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক' (১৮৪০) এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধর্মবিহারী অশোক' (১৮৭১) গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। সত্যজ্ঞানাব ঠাকুরের 'মৌলবী' গ্রন্থের শেষভাগেও অশোক সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক আলোচনা দেখা যায়।

২

রবীন্দ্রনাথের অশোকের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'বাক্যকৌতুক' গ্রন্থের 'সাহসান সাহিত্য' (১৮২১) নামক প্রবন্ধে। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাস প্রসঙ্গে কবি এখানে পরিচালন করে বলেছেন,—

কল শিল্প ও বাস্তবতার মধ্যে দৃষ্টি কুহক ও বিলাতি কুহক যথো কোনো প্রভেদ আছে কিনা, অশোক এবং ধর্মবর্তনীর মধ্যে কে আগে কে পরে—আমাদের অগণ্য কাব্যনাটকের মধ্যে এ—সকল সারগত বিশ্বাসিতর প্রশংসার কোনো মীমাংসা পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, এই উক্তি থেকে অশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কিছুই বুঝতে পারা যায় না। অশোক সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্ট মনোভাব প্রকাশ পায় আরো অনেক-কাল পরে বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক থেকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সময়ে ভিন্সেন্ট স্মিথ এবং বিস্ ডেভিডসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুখানিও প্রকাশিত হয়। এই সময়ে থেকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে অশোকের সম্বন্ধ উল্লেখ করেন। ভাবতবার্ষিক ইতিহাসের মধ্যে একবার বুদ্ধের বাতীল আর কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অশোকের মত রবীন্দ্রনাথের এমন অনুর্ত্ত প্রভা ও প্রশংসা লাভ করতে পারেন নি।

তান সময়ে বেশে এমন দিন আসে যখন একজন মহাপুরুষের কথা দিয়ে সমগ্রদেশ প্রকাশলাভ করে। বাহ্যক্রমবর্তী অশোকের কথা দিয়ে তেমনি একবার ভাবত-

১ সাহিত্যের সাহসী, সাহিত্য

২ প্রবোধচন্দ্র সেন, ভাবতবার্ষিক রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৭৪

বৈষ্ণৱ বৰ্ণ ও সমাজ জীবনৰ সংকট প্ৰকাশ দেখেছিল।
এ প্ৰশ্নকে বৰীক্ষণাব বগোছেন,—

বেশে এক একটা বড়োদিম আছে, সেই দিন বড়ো
লোকের স্তলবে বেশেব সমস্ত লালতামাৰি নিকাল
বড়ো খাতাৰ প্ৰস্তুত হইব দেখা দেব। সামন্তৰূপতী
অশোকের সময়ে একথাও বৌদ্ধসমাজের হিলাব তৈরি
হইয়াছিল।

সামন্তৰূপতী অশোকের সময়ে ভাৰতবৰ্ষে সম্ভাই একটা
'বড়োদিম' এসেছিল। আর 'বড়োখাতা'র তাঁর হিলাবও
তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে হিলাব শুধু বৌদ্ধসমাজের
নয়, সমগ্র সামন্তীয় সমাজের। কেননা বাক্সোৰ মধ্যে
তিনি সকল সম্প্ৰদায়ের প্ৰতিভূষণে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
সম্প্ৰদায় নিৰিণেবে তাকোৱ সকল মাতৃঃৰ মঙ্গলসাধনই
ছিল তাঁৰ প্ৰত। অশোকের বংশৰ শিলাস্থাপনে উক্ত
হয়েছে,—

বেবগণের প্ৰিয় প্ৰিয়বৰ্ণী বাবা প্ৰত্ৰজিত ও গৃহ্য
মৰ্গসম্প্ৰদায়কেই পূজা কৰেন, বানৰে বাবা ও অত
বিবিধ উপায়েই পূজা কৰেন। কিন্তু ধন বা
পুত্ৰকে বেবগণের প্ৰিয় নেত্ৰল মনে কৰেন না
বেত্ৰণ মনে কৰেন মৰ্গসম্প্ৰদায়ের সাহচৰ্যসাধনকে।

অশোকের অসুস্থত পত্ৰিৰ উপাৰ বৰ্ণনীতিতে এই
শিলাস্থাপন মাতৃঃৰ বৰ্ণী ইতিহাসে এক মহাস্থাপন
হলিল।^১ আর অশোকের এই বৰ্ণী নীতিৰ মধ্যেই
বক্তৃগন ভাৰতঃৰ ধৰ্মনিবেশকতাৰ বীৰ নিহিত।

মহাসম্ভাট অশোক তাঁৰ সামন্তিকক পৰবাকপ্ৰাণে
কিংবা আপন বাৰ্ধবিত্ত্বঃৰে নিৰোদ্ধিত কৰেন নি, সকল
মাতৃঃৰে কল্যাণসাধনেই নিযুক্ত কৰেছিলেন। শুভু তই
নয়, পত্ৰঃৰ কল্যাণেৰ মন্তও তিনি সচেত ছিলেন।
সামন্তৰূপতীৰ মধ্যে এই মঙ্গলপত্ৰিৰ প্ৰকাশ দেখে বৰীক্ষ-
নাৰ তাঁকে অসুস্থঃৰ অকৃত প্ৰজ্ঞা নিবেশন কৰে বগোছেন,—

এই ভাৰতবৰ্ষে একদিন মহাসম্ভাট অশোক তাঁহার

সামন্তিককে ধৰ্মবিভাৰকাৰে মঙ্গল সাধনকাৰে নিযুক্ত
কৰিয়াছিলেন। সামন্তপত্ৰিৰ মাহকতা যে কী সূতীত
তাঃ আপনঃ মকশেই জানি; সেই পত্ৰি কৃত্তিত
অপ্ৰিৰ মতো গৃহ হইতে গৃহান্তৰে, প্ৰাণ হইতে প্ৰাণা-
ন্তৰে, বেশ হইতে বেশান্তৰে আপনঃৰ জ্ঞানাবনী
লোপুণ বসনঃকে প্ৰেৰণ কৰিবাৰ মন্ত বাঞ্ছ। সেই
বিৰ্গন্ত সামন্তিককে মহাবাক অশোক মঙ্গলঃৰ দাসত্বে
নিযুক্ত কৰিয়াছিলেন, ভূপ্ৰিহীন ভোগকে বিসৰ্জন
বিজ্ঞা তিনি প্ৰাতিহীন সেবাকে প্ৰবণ কৰিয়াছিলেন।
সামন্তঃৰ পক্ষে ইহা প্ৰয়োজন ছিল না—ইহা মঙ্গল।
নহে, বেশমন্ত নহে, বাণিজ্যবিপ্ৰাৰ নহে; ইহা মঙ্গল
পত্ৰিৰ অপৰীপ্ত প্ৰাচুৰ্য, ইহা সম্ভাট সামন্তী সামন্তকে
আশ্ৰয় কৰিবা তাঁহার সমস্ত সাম্যভূষণকে এক পুৰুষে
হীনপ্ৰত কৰিবা বিজ্ঞা সমস্ত মহাবাককে মঙ্গলক কৰিবা
ভুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো সামন্ত বড়ো বড়ো
সামন্তাৰ বিপ্ৰত বিপ্ৰত পুৰুষাৎ ইহা বিজ্ঞাছে, কিন্তু
অশোকঃৰ মধ্যে এই মঙ্গলপত্ৰিৰ মধ্যে আবিৰ্ভাৰ, ইহা
আমঃৰে গোঃৰেৰ ধন ইহা আমঃ আমঃৰেৰ মধ্যে
পত্ৰি মঙ্গল কৰিতেছে। মাতৃঃৰ মধ্যে বাবা কিছু
মতা ইহা উত্তিঃছে তাঃৰ গোঃব হইতে, তাঃৰ
মহাঃতা হইতে, মাতৃঃৰ আৰ কোমোদিন বকিত হইবে
না। আমঃ মাতৃঃৰ মধ্যে সমস্ত-বাৰ্ধবী এই অকৃত
মঙ্গলপত্ৰিৰ মহিমা যুগে কৰিবা আমঃৰ পৰিচিত
অপৰিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব কৰিতে প্ৰস্তুত
হইয়াছি।^(১)

যে সামন্তিকঃ আলাবনী লোপুণ বসনঃ সম্ভাট অশোককে
পাতঃতঃ প্ৰবৰ্তনা বান কৰেছিল তা কলিবিপ্ৰঃৰেৰ পথ
পৰ্শা একেবাঃে তত হইয়া যায়। বহুতো তিনি শিলাবৰ
চত্ৰপ্ৰঃৰেৰ মত বিগমিকতা বীৰঃপেই পৰিচিত হতে
পাঃতেন। কিন্তু কলিঃ পুত্ৰঃৰ পথ অশোক পথ বেবনাঃ
বৃত্ততে পাঃতেন যে, এই অত্ৰবিপ্ৰঃ প্ৰেঃৰেৰ পথ নয়। তখন
থেকে মহাঃম অশোক তাঁঃ সামন্তিককে সেবাঃ ব্ৰতে
মঙ্গলঃৰ দাসত্বে নিযুক্ত কৰলেন। সম্ভাটঃৰ মধ্যে এই
মঙ্গলপত্ৰিৰ আবিৰ্ভাৰে তাঁকে আর কুঃৰ শিলাস্থাপনটুকুৰ
মধ্যে ধৰে চাঃতে পাঃল না, মত্ৰঃৰেৰ অজ্ঞান মহিমাঃ
তিনি মঙ্গ্ৰঃপাতিত হয়ে উঠলেন। সমস্ত সাম্যভূষণঃৰ উপে

১ বদেষ্টী সমাজ (১২০৪), অধ্যায়কিত

২ অম্বলাচক্ৰ সেন, অশোকশিল্পি, পৃ ৮১

৩ B. M. Barua, Asoka and his Inscriptions, Parts I & II (2nd ed.) P. 223

বহুবাঞ্ছিত এই সমুদ্রগল প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের
সৌভাগ্যবশত ধন বলে অঙ্গীকৃত করেছেন।

হাজরতের আশ্রয় নেওয়া যে স্থান শক্তি
আধিপত্য হইবে তা একমুখে যেমন তাঁর রাজনৈতিক
মঙ্গলের হাণ্ডে নিষ্কৃত করে প্রাচীনতার সেবার প্রত্যেক মন
করে নিচ্ছে আবার অজস্র এই মঙ্গলপত্র তাঁকে
সৌন্দর্যপ্ৰসূত অলংকারিত করেছে। বুদ্ধদেবের শিষ্য-
সৌন্দর্য প্রকাশ করে বৌদ্ধধর্ম যে উজ্জ্বল করেছেন তার
হাণ্ডে প্রাচীন আশ্রয় ভবনের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি
উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পেয়েছে।—

সৌন্দর্য দেখানই পরিণতি লাভ করিয়াছে সেখানেই
শেখাশনার প্রগলভতা দৃশ্য করিয়া দিয়াছে। সেখানেই
মূল আগমনের বর্ণ-গুচ্ছে বহুলাংশে ফলের গুণের
মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই
সৌন্দর্যের সবিত্ত হলা একান্ত বইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য ও মনোভাৱ এই সম্বন্ধে যে বোধিগ্ৰাহে
সে ভোগবিলাসের সূত্রে সৌন্দর্যকে কখনোই অগ্রাহ্য
রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ
সাধ্যানুসায়ে ইচ্ছা থাকে; সেটা সৌন্দর্য-বোধের অভাব
হইতে হয় না, প্রকৃত হইতেই হয়। অপেক্ষক
প্ৰমোদ-উত্তাপ কোথায় ছিল? তাহার ত্যাগবাতির
ভিত্তি কোনো চিন্তুও তো বেধিত পাই না। কিন্তু
অশোকের রচিত লুপ্ত ও ক্ষয় হৃৎকণ্ঠ্য বাঁধিবট-
লুপ্ত কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাংব শিল্পকলাও
দামান্ত নহে। যে পৃথিবীতে ভগবান্ হৃৎ মানবের
জন্মনিষ্ঠিত। পথ আবিষ্কার করিয়াছেন স্বাক্ষরগুণী
অশোক সেইখানেই, সেই পরমেশ্বরের সংক্ষেপেই,
কলামৌল্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিবেশ ভোগকে
এই পুরাতন অর্থা তিনি এখন করিয়া ধেন নাই। ১

বলা বাহুল্য, আপেক্ষিক সত্ত্ব বুদ্ধগম্যের নয়, বুদ্ধবোধের বৃত্তিগত প্রতিটি ভাবনেই কণ্যাদৌর্ভেদ্যের প্রতিষ্ঠা করবেই। এমতাবস্থায় তিনি পরমবুদ্ধের স্বাধিকৃত্যে আপনাব্য গ্রন্থা-কে দেখে নিচ্ছেন। আর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে জ্ঞান-বিলাপকে বর্জন করে অনাত্মত্বের জীবনব্যতীকে বরণ করে

নিহেছিলেন, দেখণা বলবাহ অপেক্ষা বাধে না। এখি-
 থেকে তিনি প্রকৃত বাসিন্দা। বরেন্দ্রনাথিত্য যে ভাবতী
 আদর্শ নৃপতির মহিমা বর্ণিত হয়েছে তা'তেও দেখা যায়
 বাসবকণ্যাকে নিরোত্তম সর্বাঙ্গীণা রাজমহাদারী জিজ্ঞা—

হে আতত্ত, নৃপতিবৈ শিখায়েছ তুমি
তাজিতে মুকুট মণ্ড সিংহাসন তুমি,
ধরিতে দরিত্রবেশ :......

ভোগেতে বেঁচেছে তুমি সংসারের সাথে,
নির্ভল বৈরাগ্যে। বৈদ্য কবেছ উচ্ছল,
সম্মুখেরে পূর্বকমে' কহেছ নির্ভল ।১১

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপর সুপরিচিত হিসাবে গোবিন্দ-
দাসিকতা, বিজ্ঞানভিত্তিক, ভোপনস্বয়ং ও শিবাজির উল্লেখ
করা যেতে পারে। বরং 'গারবি' উপন্যাসে গোবিন্দ-
দাসিকের উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বস্তরস্তর লড়াই
বাক্য হয়েছে।—

বাত্যা পাইতে তাই তো। নহয় লোকের ক্রোধকে
 আপনাব ক্রোধ বলিয়া গ্রহণ করো, নহয় লোকের
 বিপদকে আপনাব বিপদ বলিয়া বরণ করো, নহয়
 লোকের দ্বিহিতাকে আপনাব দ্বিহিতা বলিয়া গণ্য
 করো—এ যে কবে সেই। বাত্যা, সে পূর্ণহৃদয়েই
 থাক আর প্রাসাবেই থাক। যে ব্যক্তি মুক্তলোককে
 আপনাব বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো
 তাহারই। পৃথিবীর ক্রোধহরণ যে কবে সেই পৃথিবীর
 বাত্যা। পৃথিবীর রক্ত ও অৰ্ণ শোষণ যৎ কবে সে তো
 দত্তা।

এবিধ থেকে নিজস্ব কবিতা গুলো ভাষ্যতঃ পৰে ইতিহাসে
অশোকের চোখে স্ৰেষ্ঠ রূপটি আৰু কে আছে! তিনি
যথার্থই মহান মহান শোকের জুখকে আপনার কবিতা
নির্ভেদে, বাহ্যিক কলাগান্ধনৰ সুস্বাদু ব্রুকেই
জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছেন। 'রূপটি' উপভোগ রচনাৰ
সব্বৰ বীজনাথৰ মনে অশোকের আধৰ্ণ জাগ্রত বাক্য
অসম্ভব নয়।

৩

১২১২ সালে ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে বসীজ্ঞান 'যাত্রার পূর্বপত্র' গ্রন্থে ইউরোপের দুঃখগ্রস্তীর্ণ সেবাগণের প্রেমের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ-ভূগণ উল্লেখ করে বলেছেন,—

বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগবর্মক বরণ করিয়া লইয়াছিল তখন লম্বাঘে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা যুরোপে লক্ষ্যিত দেখিতেছি। বৌদ্ধদের মস্ত ওৎসবগণের ব্যবস্থা, এমন-কি পতকের মস্ত ও চিকিৎসার এখানে স্থাপিত হইয়াছিল এবং জীবের দুঃখনিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা মিলাছিল; তখন নিজের শ্রাব ও আহার তুচ্ছ করিয়া ধর্মার্থার্থগণ দুর্বার পথ উন্মোচন হইয়া; পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সঙ্গতির মত বলে বলে এক অস্বাভাবিক দুঃখ বহন করিগাছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভরুগণকে বোধমান রাখি, সুখস্বাভাবের স্বীকা হান করিয়াছিল। সেইমতই ভারতবর্ষে সেদিন ধর্মের ব্যাধি কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে মর কবিতোপরিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্রে সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন যুরোপের পুটান লভ্যতা আগের অসীম ছিল। ভারতবর্ষের সেই দুঃখরূপ আত্মত্যাগগণের প্রেমের উজ্জল সৌন্দর্য সক্রিয়তা ও ভাবসামর্থ্যের ব্যাধি আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাণিত হইয়াছে? (১)

এখানে অশোকের নাম উল্লেখ করা না হলেও ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগ বলতে যে অশোকের রাজত্বকালকেই বলা হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। উদ্ধৃত অংশটুকু পড়লে মনে হয় যেন বসীজ্ঞানের যথা বিধে অশোকসিপিথ বাবীই নবরূপে প্রকাশপাণ্ড করেছেন। অশোকের দ্বিতীয় শিলালিপিগণে বলা হয়েছে,—

বেগপণের প্রিয় প্রিয়বর্গী রাজার রাজ্যে সর্বত্র এবং প্রত্যন্ত ভূমে যেখানে গোলাগণ পাণ্ডগণ লতাপুত্রগণ কেবলপুত্রগণ, ভাস্কর্য্যী পুত্র, অস্তিত্ব যোন রাজ্য

(১) নৈবেদ্য, ২৪ সংখ্যক কবিতা

(২) যাত্রার পূর্বপত্র (১২১২), পৃথক লক্ষ্য

এবং অস্তিত্বের সর্বোপরি যে রাজ্যের আচ্ছন্ন—সর্বত্র বাহু ও পতন মস্ত বিবিধ চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাহু ও পতন উপযোগী ওষধি যেখানে যেখানে নেই, সেখানে তা আহরণ ও রোগণ করা হয়েছে। পত ও বাহুরের পরিচালণের মস্ত পথিমধ্যে স্থপনন ও বুদ্ধযোগণ করা হয়েছে। (১)

সর্বমানবের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিসাধনকে যে তিনি জীবনের স্রেষ্ঠ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সে কথাও তাঁর একাধিক শিলালিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থ ও দ্বিতীয় পৃথক কলিক শিলালিপিগণে তিনি বলেছেন,—

সর্ব সুখাগণ আমার সন্তান। যেমন সন্তান সখ্যে আমি ইচ্ছা করি যে তাহা আমার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব হিতহুখে বৃত্ত বউক, নকল বাহু সখ্যেও আমার সেইমতই ইচ্ছা। (২)

দেবপ্রিয় অশোক ধর্মবিষয়কে যে স্রেষ্ঠ বিষয় মনে করতেন সে কথাও তাঁর শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (৩) তাঁর প্রেরিত ধর্মার্থার্থগণ একদিন দুঃখগ্রস্তীর্ণ অনাচারজনকেও 'আচার্য্য অমৃত-অম' হান করার মস্ত বিদে বিদে অভিমান করেছিলেন। আর এঁদের আত্ম-ত্যাগ ও দুঃখবহনের কলে বর্বর জাতীয়দেরও যে সঙ্গতি সাধিত হয়েছিল সে কথা ইংরেজ ঐতিহাসিক এল. জে. স্টোয়ার্ট-এর উক্তি থেকেও স্পষ্টিত হয়ে।—

The mission of king Asoka are amongst the greatest civilizing influences in the world's history; far they entered countries for the most part barbarous and full of superstitions and amongst these animistic peoples Buddhism spread as a wholesome leaven.

অর্থাৎ, পৃথিবীর ইতিহাসে মানবসভ্যতার অগ্রগতির

(১) অমৃত্যস্র পেন, অশোকসিপি, পৃ ৪৮-৪৯

(২) অশোকসিপি, পৃ ২০, ২১

(৩) অশোক শিলালিপিগণ, অশোকসিপি, পৃ ৮৪

(৪) The Story of Buddhism (1916), P. 76; প্রবোধ চন্দ্র পেন রচনাযে 'ভারতগণিক বসীজ্ঞান' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৮৪

মূলে অশোকের ধর্মপ্রচার অসম্ভব প্রচলিত কীৰ্ত্তি। তাঁর প্রেরিত ধর্মমুদ্রণ বেলকল দেশে অভিযান করেছিলেন তাঁর অধিকাংশই ছিল বর্বর ও মূল্যহীন। এদিক দৃষ্টিতে জীবনে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ কল্যাণপ্রদ হয়েছিল।

আর অশোকের সময়ে ভারতবর্ষ প্রেমের ত্যাগধর্মকে বরণ করে নেওয়ার ফলে যে সামাজিক বিকাশ হয়েছিল তা সম্ভ্রান্তি ইউরোপের খ্রীষ্টীয় বসন্তকাল ও মেঘনগরধর্মের মধ্যে বহুপ্রকার লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এখানে আর একটা কথা বলবার অপেক্ষা রাখে। খ্রীষ্টীয় ধর্মোদ্বোধন সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক স্থানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-শক্তি ও বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও সক্রিয় ছিল। বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মূলে এই পার্থক্য সাধারণ নয়। বহুপ্রকার অন্তর বলেছেন—

ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের অধীনে গিয়েছে আপন ধর্ম প্রেরণ করিবার, আপন ধর্ম বিস্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিনাশপ্রাধান্যের বেগ কোনো-কালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বাধিকার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে। ১

এখানেও বৌদ্ধসাম্রাজ্য বলতে প্রচলিত অশোকের কথাই বলা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ সম্রাট অশোকের সময়ে ও তৎপরবর্তীকালে ভারতবর্ষ প্রেমের ত্যাগধর্মকে গ্রহণ করে মানবকল্যাণের জন্য অসামান্য প্রচেষ্টা করেছেন, সেই বীৰ্যবান প্রেমের আবেগে জীবনের সকলক্ষেত্রে পরিশুদ্ধভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। এই প্রলম্বিত বহুপ্রকার বলেছেন—

বৌদ্ধধর্ম বিশ্বজগতের ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার্য করিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তীকালে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য-শক্তি যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো-কালে হয় নাই।

ভাষার কাণ্ড এই, মানুষের আত্মা যখন জড়বস্তুর বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে ভাসার সকল দিকই পূর্ণ বিকাশের দিকে উন্নত লাভ করে।

আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু, কেননা ভাষা আত্মারই শক্তি। পরিশুদ্ধতাই ভাষার বসন্ত। ভাষা অস্তর বাহির কোনোদিকেই মানুষকে ধর্ম করিবার বাপনাকে আশ্রয় করিতে চায়ে না। ২

এর অনেককাল পরে ১২০৫ সালে কলকাতার খ্রীষ্টধর্মীয় চৈত্রবিহারে বৈশাখীপূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দান করেন, তাতেও বুদ্ধধর্ম ও অশোকের ধর্মপ্রচারের প্রভাব দৃষ্ট করিবার এই মনোভাব আরো উজ্জলীকৃত প্রকাশ পেয়েছে।—

ভগবান বুদ্ধ উপস্থিত আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সভ্যজগতের প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিত্রনাম আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তাঁর হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ যেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। ...তিনি এগিয়েছিলেন সকল মানুষের জন্যে, সকল কালের জন্যে। তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা হৃদয়, যা চিত্তজগৎ, যা সংগ্রামের, যা বন্ধন-ক্ষেত্র। তাই যেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গম দুর্ভাগ্যে বীৰ্যবান পুত্রের আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জগৎ, বৈশ্বজগৎ, মহাজগৎ, নির্জন জগৎ। এর চেয়ে বহুতর অর্থাৎ এগিয়ে বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপি প্রকাশ করলেন তাঁর পাশ, অর্থাৎ ধর্মের বহিরাগত ধোঁয়া কলসে, তাঁর প্রকাশকে চিত্তজগতের প্রকাশে রূপে গেলেন শিলালিপি। এত বড়ো রাজা কি অগতঃ আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে। ২

ভগবান বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে যিনি দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত করেছিলেন তিনি তো রাজাধিরাজ অশোক। আর বুদ্ধধর্মের বাণীতে ভারতবর্ষ যে সকল মানুষকে স্বীকার করেছে তাতেও তিনি বাস্তবে উপস্থিত করেছেন। বস্তুত নিজের দর্শন ত্যাগ

করে সড়াই অশোক যে দুঃসাধ্য কল্যাণক্রমে আশ্ব'নিয়োগ করেছিলেন, তিংশাও পরিহার্য যে অধিংশা ও যৈত্রীর আশ্ব'কে বহন করে নিয়েছিলেন, এর ব্যতী তি নি তগবান যুধের পদমূল শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ হান করেছেন। শৈল'শিখরে বক্রপ্রাচীরে ও নিচিন গুহায় যুধেরবের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে যে কর্তব্যক্রম প্রতীষ্টা হয়েছে তার চেয়ে সর্বলোকের কল্যাণচিন্তার নিরোপিত অশোকের নিচ'ধ শেখর আশ' ও চিত্তবর্তনায় ব্রত আরো দুঃসাধ্য ও মহত্তর। মহত্তর পূজারী হইব্রাহ্মণ তাই অশোককে ভগবতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বাস্তবিক ভগবতের এত বড় প্রজ্ঞা আর কোন দিন বেধা যায় নি। পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় করতে যিরে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এইচ. ডি. ওয়েলস্ বলেছেন,—

Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star. From the Valga to Japan his name is still honoured. China, Tibet preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than have ever heard the names of Constantine or Charlemagne. (১)

অর্থাৎ, যে সহস্র সহস্র নৃপতিবৃন্দের নাম পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভাঙাফাঙ করেছে, তাঁদের মধ্যে অশোকের নাম প্রায় একক মহিমা'র উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্কের জায় লীপ্টিমান। ভূপৃষ্ঠা থেকে জাপান পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের সংস্কারভীত নরনারী অশোকের নাম আশ্রয় প্রার্থনার সহিত শ্রবণ করে। চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁর মহান ঐতিহ্যের নিদর্শন এখানে বিরাট। তাঁর পূণ্যস্মরণ নাম অজ্ঞান বৃত্ত লোকের হৃদে কীভিত্তি হয়ে থাকে, ততলোক কনুটাস্ট্যান্টাইন্ বা সাগারমেনের নামও শোনে নি।

৪

৪মায় উদাহরণ ও স্থাপনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাসে

১ H. G. Wells, The Outline of History (vol. 1), p. 269

যোগলসদ্রাট আকবরের একটি বিশেষ স্থান আছে। হইব্রাহ্মণ দেগত আকবরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অশোক ও আকবরকে একত্রে উল্লেখ করে হইব্রাহ্মণ বলেছেন,—

বৌদ্ধগণের অশোকের মধ্যে যোগলসদ্রাট, আকবরও কেবল বস্তুশাস্ত্রাভ্যাস নয়, একটি বর্ণনাস্বাদ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই দে সময়ের পরে পরে কত বিন্দু সাধু ও মূলমান স্মৃতির অতীত হইয়াছিল ষাঃ হিন্দু ও মূলমান বর্ণের অন্তরায় মিলনক্ষেত্রে এক মহোৎসবের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি তির্য্যাই বা'বিরেব সঙ্গোবের দিকে যেখানে অষ্টনকা ছিল, অন্তরায়ের দিকে পরম সত্যের আলোকে দেখানে সত্য অবিষ্টান আবিষ্কৃত হইতেছিল (১)

আকবরের প্রলম্ব এখানে হইব্রাহ্মণের মনে অশোকের ধর্মবিষয়ের ওয়াই উদ্ভিত হয়েছে। বস্তুত এদিক থেকে অশোক ও আকবরের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বর্ম্মীর উদাহরণের ক্ষেত্রে এই দুই মহান নৃপতির কথা দিয়ে যেন ভারতবর্ষের চিরন্তন সভ্যসভ্যর অভিব্যক্তি হয়েছে। (২) প্রিয়দর্শী অশোক যেমন রাজ্যের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সার্বভূমি কাখনা করতেন আকবরও তেমনি হিন্দু-মূলমান নির্বিশেষে সকলকে সমলুপ্তিতে দেখতেন। পূর্বে হিন্দুদের উপর যে নিষিদ্ধি অব্যাহত রাখা হয়েছিল আকবরই তা উঠিয়ে দেন। তা ছাড়া তিনি হিন্দুদের উচ্চ রাজ-কার্যে নিযুক্ত করেন। তিনি যে ইংল্যান্ডখানা বা উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল সকল সম্প্রদায়ের এক উদার ও প্রগতি মিলনক্ষেত্র। সর্বধর্মের সার অমলমনে রচিত আকবরের যৌন ইলাহি ধর্মের আদর্শও তাঁর বর্ম্মীর উদাহরণ ও সমগ্র সাধনার পরিচায়ক। এর ফলে বেধা যায়, আমায়ের দেশে তখন বহু হিন্দু সাধক ও মূলমান স্মৃতির আবির্ভাব হয়েছে যাদের সমগ্র সাধনার কথা দিয়ে আমায়ের জাতীয় চিন্তে এক পরম প্রেক্ষার সফল হয়েছিল। কিন্তু অ'র'ব যে বর্ণনাস্বাদ্যের কথা চিন্তা করেছিলেন সে

(১) 'দিকারপ্রমত্ত' (১৯১৮), কালান্তর

(২) Jawaharlal Nehru, Glimpses of World His tory (4th ed.), P 306

ওঁর বাট্টপায়াজোর মধ্যেই পৌঁছান ছিল। আর অশোকের ধর্মসাম্রাজ্য ওঁর বাট্টপায়াজোর পীঠা অতিক্রম করে এক দিকে তাম্রপর্ণী এবং অপরদিকে এশিয়াস—সাইবিরিয়া পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তারিত করে। বস্তুত পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মবিজয়ের দৃষ্টান্ত বিরল। পৃথিবীতে শিকার, চেষ্টা, আন্দোলন, বৈশাখ্যন ও বিটপারের মত দূরপ্রান্ত প্রদেশগুলি অধিকৃত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু ধর্মবিজয়ী বীর একমাত্র অশোক। অশোকের এই ধর্মবিজয় জগতব্যপ্তির চিরন্তন গৌরবের সাক্ষ্য (১)

ধর্মীয় উদারতার দৃষ্টি থেকে ভারতবর্ষে ইতিহাসে অশোক ও আকবরের মতো শিবাজীর নামও উল্লেখযোগ্য। অশোক ও আকবরের মত শিবাজীও এক ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রনাথ বলেছেন,—
আমাদের দেশে যোগল শাসনকালে শিবাজীকে অস্ত্রের কথিত্বা বধন হাট্টোটা মাথা তুলিয়াছিল তখন সে চোরা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজীর ধর্মতত্ত্ব বাহ্যিক এই চোরা প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, হাট্টোটা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অসীমতা করিয়াছিল। ২

আর বর্ধগত উদার ঐক্যই ছিল শিবাজীর ধর্মসাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হলেও রাজা হিসাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রজাতিকে সম্বলিত করেছিলেন। সম্ভ্রম্য-নিরপেক্ষ উদার ধর্মীয় নীতির জন্য শিবাজী হরিশ্চন্দ্রনাথের এমন প্রশংসা আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন।

অশোক ও আকবরকে হরিশ্চন্দ্রনাথ আরো একবার একপক্ষে উল্লেখ করেছেন।—

বিবাক্তার বচা ইতিহাস আর হাঙ্গুরের বচা কাহিনী এই দুই কথার মিলে মিলে মিলে মিলে। হাঙ্গুরের পক্ষে কেবল যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই নয় তা নয়, যে হাঙ্গুর মাত-মুসলমানের মাত রাজার ধর্ম মাদিকের সন্ধানে গেল সেও সত্য। ৩

‘মাদিকারপ্রসঙ্গ’ (১২৮) প্রথম চরিত্রের অন্তর্ভুক্তকালে

মগোই এই গল্পটি বর্ণিত। বিবাক্তার বচা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তকালে উদারবর্ধন হরিশ্চন্দ্রনাথ এখানে ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্রাট অশোক ও আকবরের নাম উল্লেখ করেছেন। অশোক ও আকবরকে এভাবে একাধিকবার এক পক্ষে উল্লেখ করার মূল বস্তুতে তাঁদের আদর্শগত ঐক্য। এই আদর্শ হল সম্ভ্রম্য-নিরপেক্ষ উদার ধর্মীয় দৃষ্টি। বলা বাহুল্য, হরিশ্চন্দ্রনাথ আরোও এটো আদর্শের পূজারী।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও হরিশ্চন্দ্রনাথের অশ্বমেধ অশোকের মতই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত ছিল। ১৯৩০ সালে স্ত্রীমতী চিন্তা দেবগুপ্তান মৌর্যবংশের কাহিনী নিয়ে When Peacocks Called নামক এক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। হরিশ্চন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে যেন। এই ভূমিকাতে তিনি বলেছেন,—

In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in the large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realization of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book to reveal the organization side of a great humanism which came with king Asoka of India. My good thoughts go with the author in her venture to present ancient India through its message which has a perennially modern significance. ১

অর্থাৎ, হাঙ্গুরের বৃদ্ধগত অমায়িকতাবোধের ফলে পৃথিবীর বৃহৎ অংশে দুঃখ অধুনা এক ভ্রাতৃঘাতী নীতির বৃণ চলেছে। উক্ততব মানবীর আদর্শ উপলব্ধির জন্য যে শান্ত মাদিকিক অবস্থা বিশেষ প্রয়োজন-এমতাবস্থা তা কিরিত্রে আনা অত্যন্ত কঠিন। ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের সময়ে যে মানবিকতার বিকাশ হয়েছিল, এই

১ প্রবোধ চন্দ্র সেন, ধর্মবিজয়ী অশোক, পৃ. ১৭

২ ধর্মপথ (১৯০৪), প্রাচীন দাবিত্য

৩ গল্প (১৯২০), লিঙ্গিক

১ Foreword (1940), when Peacocks called; প্রবোধচন্দ্র সেন মহাপ্রবোধের ‘ভারতবর্ষিক হরিশ্চন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে উক্ত, পৃ. ২১

এঁকে বিশুদ্ধ সেন্সিগজান তার গঠনবলক বিকৃতির উপর
অ্যালোচনাত করেছেন। প্রাচীন ভারতের দর্শনগৌন
আধুনিক আদর্শটি তুলে ধরার জন্য দেখিকা যে সাম্প্রদায়িক
কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তার সঙ্গে মূলত কবি আমার আনুভূতিক
সংযুক্ত।

অশোক যে মহৎ মানবীর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে-
ছিলেন তা অশোকের দিনের সম্বন্ধে লেখকের মধ্যেও
দরল করার বিশেষ সার্থকতা আছে। অশোকের সেই

মানবীর আদর্শ বাস্তবকে চিরদিন ভাগে, প্রেমে ও
মানবসেবার স্বার্থপরতার সহঃ সংকল্পে প্রেরণা জোগাবে।
এবং থেকে অশোকের আদর্শ চিরকালের আধুনিক বা
দর্শনগৌন। তাই মহৎ আদর্শের পুজারী রবীন্দ্রনাথ
অশোককে এমন আনুভূতিক প্রাণে নিবেদন করেছেন।
ভারতবর্ষের ইতিহাসে একমাত্র বুদ্ধদেব বাতীত আর কেউ
রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এমন প্রাণান্তিক সত্য করতে
পারেন নি।

গ্রামের মেয়ে

শ্রীরাঙ্গীধর মণ্ডল

যদিও সে ছিল সেই মেয়ে

এই দেশে—

কোনো দিন দেখি নাই চেয়ে

ছিল যেতো এ গ্রামের মেয়ে

অনেক দিনের কথা।

তবু আজ মনে হয়

সেই দিন পরে যেতে যেতে

শাল বনে আশুদের ক্ষেতে

কৈশা হোত তবু কলবার

আর আর শুধালেতো লোক বলে

‘জানিনা’ক নাহী যে তার।’

যেলা শেষ হয়ে গেলে পর

সে’দুসির ছায়া নাহে

পানিরন্ত গলে যায় দূর

আখিরের ঠার ওঠে মাঝ রাত্রে

মাঝার উপর।

কেনো এসে বলেছিলো কি যে

ভাকি নাই তাকে আমি

তবু কাছে এসেছিল নিজে

তার পর কত মিছে দিন

পার হয়ে গিয়েছে তো

বলত লেগে গেছে

কত হয়ে গেছে মূলবন

বুজি নাই ওগো মেয়ে

বুজি নাই সে তোমার ঘন।

সোনার কপালে তার হৃদয় দিলুও

মুখে গেছে অগোচরে

তার সোনার ধান হবে গেছে

আকাশ বিধুর

হয়েছে তো বারে বারে

আর কিছু বাকী তার আছে ?

এখন অনেক রাত ঘুম নাই চোখে

জীব জেগে আছে

ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি যন্ত্রের আলোকে

সেতো বুজি দাঁড়িয়ে যে হয়েছে

কাজলি মেঘের মত মূল তার

হুটি চোখে নিচু নিচু আলো

যে মেরেকে একদিন

খপে আমি

বেশেছিহু ভালো।

বন্দরের বন্ধন

অরুণকুমার দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তিন

আর্ডেন হোটেল। এর নথ্য রয়েল টেম্পল। চারদিকে একটা আভিমান্যের হোয়াচ। ক্রিশ্চিয়ান ট্রিটের ইট-এর এর খুব কাছেই জায়গাটা।

লম্বা তুফি থেকে একটা মস্ত পিচ ধারণা বাতাস। ওপরের পাখাডের খাড়াইয়ে উঠে গেছে। পাখাডটার নাম কার্লটন ছিল। তার দাঁ বেয়ে বেয়ে সাপের মত পাক খেয়ে খেয়ে গাভা ওপরে চলে গেছে। চান্ দ্বিখছারি রাখাটাও একদিকে বড় বড় বাড়ী। বেশীর ভাগটাই হোটেল। আর একদিকে প্রায় শকাব্দ দুটো মীচ দিয়ে আবার সমস্তের গাভা।

সেখানে আবার একলাই মনুষ্যল ভাবে সাধান বাড়ীর দাঁহি। আর্ডেন হোটেল বলে দেখা যায় একদিকের উৎসাহেরে বাতায় লম্বা, লাল রঙের বাল চলেছে। ইউজন্ড: বিকল্প পথচারীর দল। আর একদিকের ডোয়াইয়ে কার্লটন হিসের ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের দাঁহ, লগেরে মাথা তুলে রয়েছে।

আর্ডেন হোটেলটা সাধারণ পুরোপুরি হোটেল হয়ে যায়। তখন এখানকার ভাড়া বেশী। সাধারণে তাই এখানে নিয়মিত আবাসিকদের বাসা হয়না। লক্ষ্যকে চলে যেতে অল্পবয়স্ক করা হয়। তখন আসে বাইরে থেকে টুইটসের দল। একতাক প্রমাণিতের মত। চারিদিকে বলাবল্যের বেলা। বসে যায়।

ক্রিটেনেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই দাঁহি যে ছেলেমেয়েরা আসে তা নয়। আসে জাপ, হুইটল্যান্ডাও, ক্যান্টনেক্সি। মস্তুর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে। অল্পপনভাবে তারা পলগা খস্ক করে। দুধিন থেকে চলে যায়।

দামারে ওলম্যাণ্ডের লেকঅফলেশ নরনাতিবায় দৃশ্য,

আকর্ষণ করে তাৎপের; এস্তিনবগার 'ট্যাটু' গাভহানি বেশ অনেককে। ক্যান্সে তখন ব্রুক হাও জলদা, পান, নাচ, কুচকাণ্ডেরেব মন্থতা; তার নাম ট্যাটু। তাই আর্ডেন হোটেলের মনোময় পরিবেশেরে অনেক সাধারণে তার দাঁহ চড়া।

শীতকালে কিছু উঠে। শীতের শীতের নিরানন্দ পন্থিবল বিকর্ষণ করে সবাইকে। কার্লটন ছিল থেকে ভখন মেয়ে আসে হাড়কাপানো ঠাণ্ডা হাওরা। দামনের উৎসাহেরে লম্বা গাছগুলো তখন পাতা করে বিবর্ভ হয়ে যায়। গাণমাওরা বসিন, নাইটেংল সাধীও ওতন হয়ে যায় নিরুদ্দেশ।

শীতের ব্রুক থেকে আর্ডেন হোটেলের মালিক কাম-রোডেরে মন্থেব হাদি মিনোতে থাকে। তার দামী খন্দেবেরে কেউ আসেনা তখন। তাই হোটেলের দরজা তখন খুলে যায় ছাত্রদেরে অনেক। যাদের বেশীর ভাগই ইন্ডিয়ান কি পাতিস্থানী।

কামরোক্তিকি রাতে শোলিশ। হিটলারের সৈন্য-বাহিনী যখন লোন্সু অগ্রহে শোল্যাণ্ডের ওপর ও'লিশে পড়েছিল তখন অনেক শোলিশ বেশ বেড়ে ক্রিটেনে পালিয়ে আসে। কামরোক্তিকি তাইয়ের একজন। তার কিছু মনে মনে আশা একদিন তারা আবার কিংয়ে যাবে মূল শোল্যাণ্ডে। তাইয়ের বেশে বাতীন দরকার হবে প্রতিষ্ঠিত।

কামরোক্তিকির বয়স লক্ষ্য দুই দুই। সে বিয়ে করে এক ছোট্ট ভবনবিলিকে। তাইয়ের তিন ছেলে। তারাও কামরোক্তিকি সাহায্য করে হোটেল পরিচালনার ব্যাপারে।

আর্ডেন হোটেল—চারতলায় পাশাপাশি দুটো বাড়ী

নিষে বৈবী। বাড়ী দুটো ভেতরের দরজা দিয়ে না-দুখ।
চাষতলা না বলে, তিনতলাই একে বলা উচিত।
মাস্তির নীচের দরজাগুলোকে বলে বেসমেন্ট। দেখানে
সম্মতিবাবে কামবোতাক্তি থাকেন ও তাঁতাবের জিনিষপত্র
থাকে।

শব্দর এসে জায়গা পেল বোতালার একটা ভল লীচের
করে। ঘরের অন্তর কমেই ২। আগাতে একটু হাত পা
ছড়িয়ে শব্দর সোকা টেনে বদল।

শাশাশি দুটো বিছানা। বিছানার পাশে ছোট
টেবিল। তার ওপর টেবল-ল্যাম্প। ঘরের কোণে গ্যাস
হীটার। একটা শিলিং ফেনলে শ্রায় বস্তুবানেক চলে।

এককোণে সান্দী আটা একটা বড় জানালা। জানা
পথে দিয়ে সেটা ঢাকা। শরদার কাপড়ে হাত বিলেই
বোকা দায় সেটা বেশ দায়ী। হুড়ি টেনে পর্গটা শরালে
কালটন ছিল চেয়ে পড়ে।

ঘরের আর এক কোণে একটা ছোট এটিকম। আমা-
কাপড় ছাড়ার জন্যে সেটা ব্যবহার করা হয়। তার
দরজার পান্নাটা আসল ঘরের দিকে ভেদান।

যেহেতে পুত কাপেট বিছানো। ঘরের বেওয়ারে
রকুন কাগজ আটা। তাতে বস্তুবানো সব নক্সা কাটা।

শব্দর ভাল করে সব লক্ষ্য করতে লাগল। নিল
ভেদলিনের ঘরের শ্রায় আড়াইগুন বড় হবে এই ধরটা,
আরওনে। বড় আলমারীর পান্না খুলে শব্দর তার ভ্যাকুইট
ও ট্রাইজার হ্যাণ্ডারে সুলিয়ে রাখল। ম্যাকিনটশটা
রাখল দরজার হকে। পঙ্কো পাড়টা বেছেছে। ড্রেসিং-
গাউন পায়ে চাপিয়ে দোকাঃ উপর বদল শব্দর।

চকোতিবানারের দরজা পানের বাড়ীটার তিনতলায়।
সেখানে আবার এখন যেতে ইচ্ছে করল না।

একটু বায়েই লরজা নক করে ঘরে ঢুকলেন তার অন্ত
কমেন্টে ভাঃ গ্রেভাল।

—চ্যামো, আপনি এসে গেছেন। আপনায় কথা
আমাকে মিঃ কামবোতাক্তি বলছিলেন আমা সকালে। বলে
হাত বাড়িয়ে বলেন ভাঃ গ্রেভাল। করমর্দন করে বখা-
বীতি পরিচয়ের পান্না শেষ হল।

ভাঃ গ্রেভাল এম, আর, সি, সি পতীকার মধ্যে এখানে
এসেছেন। এখন ইনটারনাল মেডিসিনের তিন মাসের

কোর্স করবেন এডিনবরা বয়াল ইনফরমারিতে, তারপর
লণ্ডন চলে যাবেন।

গ্রেভালের বাড়ী দ্বিরাতে। নিখুঁতভাবে গৌরবান্বিত
কামানো হুট পরিহিত গ্রেভালকে দেখে শব্দরের ইউ, শির
লোক বলে মনে হল। বয়াল চরিত্রের কাছাকাছি হবে।

ভাক্তারির বইগুলো কোলে নিয়ে ভাঃ গ্রেভাল বলে
উঠলেন—ভাঃ মিঃ, আমায়ের এখন পড়তে হবে। এই
সব খোটা খোটা বইগুলো তিন মাসের মধ্যে শেষ করে
পতীকার বসতে হবে। ভাক্তারিরের জীবন 'বেড. অব
বোজেন' নয়। আমায়ের এখন মেনিনের মত হতে হবে।
রিড, রিড, এও রিড।

শুনতে শুনতে শব্দরের মুখচাপ একটু বিকৃত হয়ে
গেল।

—জানেন আমি এই হোটেল কালকে ছেড়ে দিচ্ছি।
বইটা হঠাৎ বন্ধ করে ভাঃ গ্রেভাল বলে ওঠে। দেখি।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এর ল্যাণ্ডলর্ড কামবোতাক্তি হতে ময়।
হারামজাদা লোক। আমাকে বলেছিলেন একটা প্যাচা-
কিনের হীটার বেবে, কিছুই দিলেনা। ঠাণ্ডায় মারা
যাচ্ছি। এই গ্যাস হীটারের স্টারের একটা শিলিং ফেনলে
তিনতলা চলা উচিত। একবটীতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।
কি বস্তু চিটিকি-কী চালাচ্ছে দেখেছেন।

পড়ন্তোনা আর হলনা। গরমই চলতে লাগল। একথা
দেখা হতে হতে শিবেদের কথা উঠল। শব্দর মল করে
বলে বদল—জানেন শিবেদের মধ্যে অনেক হাসির গল্প
প্রচলিত আছে। বলে কলকাতার পাইখানীদের গল্প
বলতে লাগল।

হঠাৎ শব্দর লক্ষ্য করল ভাঃ গ্রেভাল গভীর হয়ে উঠে
পড়ার বইটা খুলে ফের পড়তে শুরু করেছেন। তারপর
একসময় উঠে পড়লেন। আশির হয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি
করলেন। তারপর চারফার বড় হুটেকলটা খুললেন।
একটা হালকা নীল রায়ের জোড়ালে বাব করে সেটা
পায়ড়ীর মত রাখার লক্ষ্যলেন। তারপর একটা বই বাব
করে পড়তে শুরু করলেন। আর মল কোন বর্ষগ্রহ।
বইটার ভাষা কিন্তু ইংরাজী নয়।

শব্দরও বেশ দরকটিয়ে গেল।
হাত ধপটা বাজতেই পাশায় খাবার জন্যে সবাই নীচের

ভাইনিং হলে জড় হ'ল। সেখানে চকোস্তিমশাখের সঙ্গে দেখা হল।

সব শুনে হাশতে হাশতে চকোস্তিমশাখ বললেন—আরে জাঃ গ্রেভাল দেখিবে। ওর ব্যাপার জানেন না।

আহা! কে বলে এখন ইংল্যাণ্ডে আসছেন তখন দবাই বলল এত বাড়ি, গৌক, পাণ্ডি থাকলে আপনার কপালে আর ইংলিশ গার্ল-ফ্রেন্ড জুটবে না।

ভাই শুনে জাঃ গ্রেভাল আহা! ছল, গৌক, বাড়ি সব কামিয়ে ফেললেন। আহা! থেকে এখন নামেন তখন এক বিশ্রুতি। পাশপোটে'র চেহারাও সজ্ঞে ওর গৌক, বাড়ি কামান চেহারাও কোন দাবুত নেই। চেকিংপোটে'র লোকেরা ছাড়েনা। শেষকালে আহা! ক্যান্টেনে নিজে এসে দমক করতে গেল ইংল্যাণ্ডে চুক্তিতে কেওরা হয়।

সাপার টেবিলে আলো হ'ল আরও জনকহরেকের সঙ্গে। তার মধ্যে আগানের হেন দল—এসেছে সোভাল দাংল পড়তে। দেব মজ কিত পুরোপুরি অবসীয়া। বাসালী নয়।

আর আলো হ'ল শব্দ চৌহরীও সঙ্গে। পটিনা থেকে ভেটেরনাতী পাশ করে পোষ্ট-গ্রাফুয়েট ঠাণ্ডিও জন্ম এসেছে। তার বাবা পটিনা হাইকোর্টের জন্ম।

শব্দর লক্ষ্য কলম শুধু যে একগাছা ইতিহাস, পাকিস্থানো ছাত্রই সেখানে রয়েছে তা নয় বেশ কিছু বেংক গৃহক-স্বভাবও সেখানে রয়েছে।

শব্দ আরও অসহ্য করতে লাগল অনেকে তাকে তীব্র চোখে পর্যবেক্ষণ করছে।

কিছু একটা গভীরতা হয়েছে। কিন্তু সেটা যে কি তা শব্দর বুঝতে পারল না। একটু নার্ভাস হয়ে চকোস্তিমশাখকে রিজেক্ট করল—কি ব্যাপার, আহা! তাকে সকলে এভাবে ভাবছে কেন?

—মিস্ট্র, এখনও অনেক শিখতে হবে আপনাকে। ড্রেনিং পাউন্ড গায়ে নিয়ে কখনও পাবলিকের মধ্যে আসবেন না।

এর পর থেকে ভাইনিং হলে দলই আসবেন একেবারে টিপটাপ হয়ে হুট, হুট পরে আসবেন।

পঞ্চম দফালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গুজরানি আনিয়োর বদল বদল খেতে হল, তখন দেখতে পেল সোনালী চুলওয়ালা একজন মেয়ে কোণের টেবিলে বলে তাকে থেকে থেকে লক্ষ্য করছে।

শব্দরই অবশিষ্ট লাগলেও সে কিন্তু আর মুখ তুলল না। কে জানে কোথায় কি গণ্ডগোল হবে? পান থেকে চুন খসলেই হুজি। অভ্যস্ত, কড়, আনকালগরভ ইত্যাদি বলে দেখে।

শব্দরই সেকিন শার্জেনস হলে বাবার বরফার ছিল। রয়াল টেরনের জল বাস্তাটা ফিরে নেমে নীচের বাসপথে এসে দাঁড়াল।

সে এখন নিকিট বাসে উঠল তখন দেখে তার সঙ্গে সেই সোনালী চুলের মেয়েটিও বাসে উঠল।

বাসের সামনের দীট-বুটো খালি ছিল। শব্দও সেই মেয়েটি, দুজনে সেখানে বসল।

গরনে থাকতেই শব্দর মনেছিল এখানে মেয়েদের কোন আল'রা দীট থাকেনা।

বাসের কণ্ডাক্টাররা বেশী ভাগই মেয়েদায়। স্ত্রী বায়োনতার বেশ এটা।

মেয়েটিই প্রথম আলোপ করল, আপনি নিকিট ছাত্র ও ইতিহাস? কিন্তু কি পড়তে এসেছেন? মেয়েটির পরিচয়ও শব্দর পেল। নাম শালি ম্যাকডোনাল্ড। তার বাড়ী এখান থেকে তিরিশ হাইল দূরে গ্যাগামিন বলে এক জায়গায়। সে ডেকিট হতে চায়। এইবার ইউনিকাসিটিতে চুকেছে।

শালিও এই বিনককে হ'ল রয়াল টেরনে এসেছে।

শার্জেনস হলের পাথরে বাস দাঁড়াতেই নেমে পড়ল শব্দর। শালিও দেখানেই নেমে গেল। বিশ্রুতি বিকে কিছুদূরেই ভেঙাল বলল।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে বিদেশী

কবিদের তুলনা

ত্রিগঙ্গাবিহারী ভট্টাচার্য্য

জীবনের প্রাসঙ্গ্যসীমায় উপনীত ৮৩ বছরের বৃদ্ধ কবি গেটে তাঁর 'ফাউস্ট' (Faust) কাব্যের শেষ খণ্ডে বড়ির বহুর ওয়ার্ডার Lyncacus এর মুখে নীচের কথাগুলি বলিয়েছেন। দ্বিগঙ্গাব্যাপী অঙ্ককারের মাঝে বড়ির মধ্যে বলে রক্ষা আপন মনে গেয়েছিলেন :

"Zum schen geboren,

Zum schauen bestellt...

জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ কবির এই কথাগুলি কি আর একটি জীবনকে মনে করিয়ে দেয়না যে, জীবন সম্পূর্ণভাবে দৌলখের সৃষ্টিধর্মী চিন্তায় উৎসর্গীকৃত হয়েছিলো : সেই জীবন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের : Zum schen geboren, যিনি বিশ্বপ্রেমিক ঋষি ; তিনি দেখানে ঐক্য, জ্যোতি এবং অনন্ত আনন্দ আধিকার করেছেন, দেখানে আমরা সাধারণতঃ বিশৃঙ্খলা, রাত্রির অন্ধকার ও বৈনন্দিন জীবনের বীভৎসতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনে। যিনি অস্বস্ত্যভাবে সুপ্তের চিন্তা করেছেন এবং তাঁর চতুর্পার্শ্বে সব কিছুই অমৃত ঐশ্বর্যের দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। "Es war doch so schon" : কী সুন্দর এই পৃথিবী ! তিনি যা দেখেছিলেন ও তাঁর নিজস্ব আদর্শ এক হয়ে তাঁর জীবনব্যাপী চিন্তার অঙ্গীকৃত হয়ে গিয়েছিলো।

বুদ্ধিভাবীনের অখণ্ড মনোযোগ এবং আনন্দ অকস্মাৎ রবীন্দ্র সাহিত্যের হোঁচক লেগে অগ্ন ও দৌলখের এক বিচিত্র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহৎ ফরাসী রোমান্টিক কবিদের তুলনা করতে চাই। যথা Musset, Lamartine বা Hugo 'কড়ি ও কোমল' এবং

'মানসীতে' আমি দেখি musset-এর সেই অন্তরের সুস্বপ্নময় আবেগ, ও সৌন্দর্য ও জীবনানন্দ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে টেক্সিগাতীত ত্তরে পৌঁছেতে যা এক আদর্শ নৈর্বাণিক ও সুপ্তপ্রসারী সৌন্দর্য্য সূতৃত্তির পূজায় নিবেদিত। যেন Namouna-এর musset আদর্শ হয়ে প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়েছেন আবার কখন কখন Nights-এর musset-এর মতো চিন্তামগ্ন দ্বঃখবোধের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন। কিন্তু musset-এর যা শ্রেষ্ঠ তা একটি পর্যায়সার আর তা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বিষয়নের ভগ্নাংশেই। 'সোনার তরী', 'চিত্রা' এবং 'জীবন-দেবতা' শীর্ষক কবিতাগুলি, 'বেয়া' ও গীতাঞ্জলিতে Lamartine-এর কথাই মনে পড়ে যেন। দেখানে বৈশ্ববোধ Be lae-এর স্বপ্নাঙ্গ মোহাজ্জরতা সমস্ত পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়েছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে শুধু জীবনের উপরিভাগ হাফাভাবে দেখার যে ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি তাকে অতিক্রম করে আরো গভীর দর্শনের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। সেই গভীর দার্শনিক মতবাদ অন্তরীণ মানবিক অতীন্দ্রিয় গভীরতম আত্মার বহুখণ্ডকে উন্মোচিত করেছে। কিন্তু Lamartine-এর সমগ্র কবিত্বভিত্তে একটি মাত্র রাগ বর্তমান, অগ্নবদিকে রবীন্দ্রনাথ এমনই এক সঙ্গীতকার যিনি সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীতের ছয় রাগ ও ছত্রিণ রাগিনীকে করেছেন ব্যবহার। তার ওপর তাঁর নিজস্ব সঙ্গীত তো আছেই। আর একজন হলেন হুগো। হুগো ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। তিনি শব্দের বাহুরকর, তাঁর কাব্য অনন্ত গীতিময়তার মুখর। হুগো সমস্ত জাতির অস্পষ্ট দ্বঃখাবগকে অত্যন্ত

দক্ষতার রূপায়িত করতে পারতেন। তিনি অসংখ্য ধনি ও কাব্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথের মতোই। তাঁর কল্পনা ছিলো অনন্ত, অভাব ছিলো 'কখনো'। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি ছিল সৌন্দর্য তাঁর দর্শন ছিল আবেগপ্রধান বহুসঙ্গীত। তাঁর যা অভাব ছিল তা পুরোবাজার বর্তমান রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অর্থাৎ রূচি ও সৃষ্টিভাষণ।

বেলীর প্রভাব যুবক রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ে ছাড়া কেলেছে। যৌবনে কীটদের কাব্য থেকে তিনি সৌন্দর্য্যভূতীর আদর্শ গ্রহণ করেছেন। 'চিহ্ন'তে সুইনবার্নের মতোই ইঙ্গিত সচেতনধর্মির বিস্তার দেখা যায়। এছাড়া ওয়াল্ডেনওয়ার্থের প্রকৃতি-পুঞ্জী দার্শনিক কবিতাবলী, টেলিংহের Ballads ও Idylls-এর পরিপূর্ণ হৃদয়গূঢ় 'কথা ও কাহিনী'র মধ্যেও দেখতে পাই। তাঁর রচনা বর্তমান বৈদেশিক প্রভাবযুক্ত ভারতেরও বেশি বাংলা ও সংস্কৃত ঐতিহ্যের অঙ্গগামী। তাঁর রচনা তাঁর নিজস্ব প্রতিভার স্বতন্ত্রসৃষ্টি। যা হোক এই সমস্ত তুলনা কেবল স্মৃতি-সহায়িতা মাত্র, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিকের ওপর আলোকপাত করে, তার বেশি কিছু নয়। তাঁর কাব্য-পরিমণ্ডলের সমগ্র পরিধি বোঝাতে 'The Faery Queen' টি এস এলিয়ট্ ইয়েট্ স, আইরিশ লিথলিট্ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক কবিদের তুলনা করা প্রয়োজন।

"Freund voll und bidvoll

Gedon kenvoli sein..."

(অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ আর চিন্তার সমন্বয়)। এই কথাকটির মাধ্যমেই জার্মানীর জ্যেষ্ঠ গীতিকবি গেটে নিজেকে বর্ণনা করেছেন। আনন্দের প্রাচুর্য, গভীরতা ও বহুস্বীকৃতি, চিন্তার মহৎ—এই ছিলো

তাঁর কাব্যের মূলমন্ত্র। এ ছাড়া তিনি নাট্যকার, বিরাট ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী। গীতিকাব্যে যন্ত্রপ্রকার হৃদয় সত্ত্ব তার সব কটাতেই তাঁর সমান দক্ষতা ছিলো। তিনি ছিলেন চিন্তাধর্মী, সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক কবি। তাঁর কাব্য শুধু বিদগ্ধ সমাজের জগতেই নয়, সমগ্র জার্মানীর তিনি জাতীয় কবি। তিনি ছিলেন ধর্মবোধ দ্বারা সূক্ষ্মরসিত। নিজেকে তিনি বিশ্বপ্রেমিক বলে বর্ণনা করেছেন। আমরা তাঁর রচনার সেই 'Ding frendli Kait'-এর সাক্ষ্য পাই যা হলো সৃষ্টি দর্শন সেই আনন্দবোধ জীবনের সহস্রতম বাস্তবতার পরিবর্তিত রূপ ও তারই সঙ্গে গভীর প্রসঙ্গি :

"Usber allen gipfeln

Ist Ruh..."

(অর্থাৎ সমস্ত পর্বতচূড়ায় নেমেছে প্রশান্তি, বৃক্ষশীর্ষে শান্ত ছায়া, পক্ষীকুল নিভ্রাচ্ছ। অপেক্ষা করো, ভূমিও এদের মতো শান্তিলাভ করবে।) আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত কথা গেটে সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করলাম তা রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আমার মনে হয় এই দুই কবির মধ্যে একটি গভীর ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে। এই দুই মহাকবির জীবন ও ব্যক্তিত্বও সমপর্যায়ের। বিদেশীরা জানেন গেটেকে ফাউন্টের ও রবীন্দ্রনাথকে গীতাঞ্জলির কবি হিসাবেই।

গীতাঞ্জলি রবীন্দ্র কবিশ্রুতিভার জ্যেষ্ঠ প্রভীক। রবীন্দ্রনাথ মিত্রিক কবি, তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গীতাঞ্জলিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। 'সেট জন অব দি ক্রস' এক বিরাট স্প্যানিশ কবি। গীতাঞ্জলিতে আরোই John of the cross-এর spiritual coticule-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।



রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ মানুষ

সমীরণ চক্রবর্তী

জীবনের সহিত সাহিত্যের যোগ অপরিচ্ছেদ্য। যেসকল সাহিত্যিক বাণীর অর্চনাতে নিজ জীবন ও দেশকে ধ্বংস করিয়াছেন তাঁহাদের বাণীর উপজীব্য মানুষের জীবন ও নানা বিচিত্র দিক্। মানুষের জীবনপ্রবাহ তাঁহাদের প্রাণে যে স্পন্দন জাগাইয়াছে লেখনীর মুখে তাহারই ঘটনাদেবির প্রকাশ।

প্রাচীনকালের সাহিত্যে কিন্তু সর্বশ্রেণীর মানুষের স্থান ছিল না। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষকে আশ্রয় করিয়াই তৎকালীন সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-রচনাতে ত্রুটি ছিলেন। সাধারণ মানুষের সহিত প্রকৃত যোগ তাঁহাদের ছিল খুব কম। একথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহাকবি কালিদাস ও সেন্সপীয়েরের কাব্যে সাধারণ মানুষের জীবন, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাই বাণীমূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। সেক্ষেত্রে বড়োবড়ো এই প্রশ্ন উঠিতে পারে রবীন্দ্রনাথও কি এই দলের কবি? সাধারণ মানুষের সহিত বিপ্লবের যোগ সত্যিই ছিল কিনা এই বিতর্কের সমাধান করিতে পারে তাঁহার অমর রচনাবলী। কেহ কেহ অজ্ঞাপি এই ধারণা পোষণ করেন যে ধর্মীর মন্ডন রবীন্দ্রনাথেরও সাধারণের মধ্যে প্রকৃত কোন যোগসূত্র ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথ দ্বিতল হইতে নামেন নাই।—এই প্রশ্নের অভিযোগও বিরল নহে। কিন্তু এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। সাধারণ মানুষদের সহিত সম্পর্ক তাঁহার নানা রচনার মধ্যে সুপ্রকট;—তাই বিশেষ বিশেষ স্থান উল্লেখ করিয়া তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের আলোচনা করা যাইতে পারে।

সাধারণ মানুষের সহিত বনিকসমাজের যোগ যে অল্প ইহা অনস্বীকার্য। তাই বাল্যকালে কবিরও সাধারণের সহিত যোগ বিশেষ ঘটে নাই। তখন-

তিনি থাকিতেন গৃহকোণে অবরুদ্ধ। ষোড়াসাঁকোর বাড়ীর বাহিরের জগৎকে চিনিবার সুযোগ ছিল না। তাঁহার নিজের কথা—

‘বাড়ীর বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি বাড়ীর ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমনখুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। (জীবনস্মৃতি)

তার পর স্কুলের জীবনেও এই বাধা অপসারিত হয় নাই। কলিকাতায় একবার ডেপুটিম্যেজিস্ট্রেটের উপজ্যেষ্ঠ কবিপরিবারের একাংশ পেনেটিতে ছাত্রাবাসের বাগানে আশ্রয় নেন। রবীন্দ্রনাথ সেই দলে ছিলেন। সেই প্রথম বাড়ীর বাহির হইলেন। তখন সাধারণ প্রাণী জীবনের সহিত পরিচিত হইবার জগৎ কবির উৎসাহ ছিল প্রচুর—

“—বাংলাদেশের পাড়ারগাঁটকে ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টা অনেকদিন হইতে মনে আমার উৎসুক ছিল। গ্রামের ঘর বস্তি চতৌরদণ্ড রাস্তাবাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার জন্মরক্ত অত্যন্ত টানিত।” (জীবনস্মৃতি) কিন্তু তাহার সহিত পরিচয়ের সুবিধা না পাইয়া ব্যাক্পন করিয়া বলিয়াছেন—

‘সেই পাড়ারগাঁট এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল—কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম বাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।”

(জীবনস্মৃতি)

পরবর্তী জীবনে কবি স্বাধীনতা পাইয়া সাধারণের সহিত যথাসাধ্য সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সাধারণ জীবনের বহু ঘটনাকে তাঁহার কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁহাকে পলায়নী মনোভূতির কবি বলা অসঙ্গত। এককালে তিনি বিচ্ছিন্ন

থাকিলেও পরবর্তী কালে সাধারণের দিকে
কিরিচায়েম এবং এই পরিবর্তন স্বীকার করিয়া
বলিয়াছেন—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম রত,
তুই শুধু ছিন্নবাণী পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষম তরুণ্যে
সুবহনপঙ্কজ মলমলি ত্রাণতপ্ত বায়ে
সামান্য বাক্যইলি বাণী।—ওরে তুই ওঠ আজি।”
...এবার কিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। কল্যাণে সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলানো মোহিনী মায়ায়...”

(এবার কিরাও মোরে)

যদিও নিপীড়িত সাধারণ মানুষের দুঃখের
আর্জনাভ তাঁহার ক্ষয় কল্পের আঘাত করিয়াছে,
অপরিসীম সহানুভূতির সহিত উৎসারিত
হইয়াছে—

“এই সব মৃত্যুনিম্নতমুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব আত্ম গুণ ভগ্ন বৃক
ধনিত্য তুলিতে হবে আশা; ভাষিয়া বলিতে হবে—
মুহুর্ত তুলিয়া শির একত ডাড়াও দেখি সবে...”

তাঁহার কাব্যে সাধারণ ও অভিজাত উভয়-
শ্রেণীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেখানেই
তাঁহার বিশ্বকবি। শেব জীবনে তিনি নিজেও
বলিয়াছেন—

“আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত গুণে ধনি
আমার বাণীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—”
কিন্তু নিজেই আগার অমৃত্যব করিয়াছেন যে

‘এই সুবাসনার পৌছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে কাঁক (জন্মদিনে-একতান)

এই কাঁকের জন্ত দায়ী কে তাহাও দেখিতে
হইবে। উল্লেখ্য জন্ম ও সামাজিক বাধার গভী
কবির প্রকৃতির গতিকে ব্যাহত করিয়াছিল। তাই
ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জীবনের সহিত একান্ত
নিকট সম্পর্ক তিনি স্থাপন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ
হন নাই। তাই জীবনের অপভ্রান্তে বলিয়াছেন—

“পাইনে মর্যাদা তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন

যাত্রার।

চাবী ক্ষেতে চালাইতে হাল,

তাঁতী বসে তাঁত বোনে, জেলে জেলে হাল;—

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মপ্রায়,
তারি’ পরে তার দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিত্রনির্মাণনে
সমাজের উক্ত মঞ্চে বসেছি সুকৌশল ব্যাধানে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রান্তরের দ্বারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে ক্ষতি ছিল না একবারে।
(ঐকতান)

ইহা ছাড়া বহুবলত কবি ছিলেন কর্মগত।
অনলস ভাবে তিনি নিত্য তাঁহার সাহিত্যচর্চাতে
ব্যাপ্ত থাকিতেন। ফলতঃ কর্মহীন বা স্বল্পকর্মী
মানুষের মত আত্মা চমাইয়া সময় কাটাইবার
অবকাশ তাঁহার ছিল না। আমের সাধারণ মানুষের
সহিত যাইটা সময় কাটাইতে পারি তাহা কবির
পক্ষে সম্ভবও নহে, অপ্রাপ্তও নহে। সেইরূপ
জনপ্রিয়তার জন্ত কবিকে মোটারকম ঘাম দিতে
হইত, অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাহত হইত। তাঁহার
পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটুকু যোগাযোগ রাখিতে
তিনি চেষ্টা করেন নাই। জরিমানা পরিশোধন কালে
এই সমাজের সহিত তাঁহার বেশ পরিচয়ও
ঘটিয়াছে। পরিচয়ের বন্ধতা কোথাও তাঁহার
সহানুভূতিকে প্রভাবিত করে নাই। সাধারণের
জীবনের অতিসাধারণ সুখদুঃখের কথা কবির
লেখনীতে যেভাবে বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে তাহাতে
এই সমাজের সহিতকবির গভীর যোগই সূচিত হয়।

প্রথম জীবনে প্রভাতসংগীতের যুগেই কবির
দ্বয় সকলের জন্ত উন্মুক্ত হইয়াছিল—

‘জগৎ আজি মোর কেমনে গেল খুলি।

জগৎ আসি বেধা করিছে কোলাকুলি।

(প্রভাতউৎসব)

কবি কেবল অভিজাতের গভীতে নিজেকে না
বাঁধিয়া রাখিয়া সকলের মধ্যেই বাঁচিতে
চাহিয়াছেন।—

‘মানবের মুখেহুখে গাঁথিয়া সঙ্গীত

যেন গো রহিতে পারি অমর আলয়।...

...তোমাদের মাঝখানে লভি যেন টাই।”

(প্রাণ)

আনন্দময়ীর আগমনে দেশের আনন্দোচ্ছাস তাঁহার
দ্বয়ে যে সাড়া জাগাইয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী
আবেগন আনিরাছে দ্বারে দণ্ডায়মান কাঙালিনী
বালিকা।

গ্রাম্যবধূর দ্বন্দ্বগুহের কারাভালা জীবনের
দুঃখও তাঁহার হাতে 'বধু' কবিতাতে রূপ লাভ
করিয়াছে।

'হার রে রাজধানী পাখান কারা।

বিহাট মুঠিভল চাপিছে দূর বলে,

ব্যাকুল বালিকায়ে নাহি কো মাথা।' (বধু)

'সোনার তরীর' কৃমিকার কবির উক্তি এবিধের
কল্পতরু—

"এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলছিল
আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে
মাছুষের জীবন ধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছিল
আমার হৃদয়ে। মাছুষের পরিচয় খুব কাছে এসে
আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাঁদের উজ্জ
চিন্তা করেছি, কাঁচ করেছি, কর্তব্যের নানা সম্ভ্র
বোধে তুলেছি, সেট সংকল্পের সূত্র আঁকও বিছিন্ন
হয়নি আমার চিন্তায়। সেট মাছুষের সংস্পর্শে ই
সাক্ষিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পান্যপানি
প্রসারিত হতে আরম্ভ হ'ল আমার জীবনে।"

পন্নীগ্রামে—সামান্ত মাটিকটা মজুরদের কথাও
তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই—

"নদীতীরে মাটি কাটে সাজাতে পাণ্ডা

পশ্চিমিমজুর। তাহাদেরি চোটে মেয়ে

ঘাটে করে আনাগোনা... (চৈতালি)

আবার পসারিনীর ক্রোশ ব্যক্তি হইয়া বলিয়াছেন—

"ওগো পসারিনী,

মধ্যদিনে কল্লবের সবাই বিজ্রাম করে

দুগ পথে ডাঙ তপ্ত বালি—

দাঁড়াও, যেয়ো না আর, নামাও পসরাতার

মোর হাতে দাও তব ভালি।"

(পসারিনী)

যেবীর পূজামণ্ডপ হইতে অপমানিত হইয়া যে
সাধারণ মাছুষ কিরিয়া আসিয়াছে—তাহাদের
অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

"না না, এরা সব কিরিছে নীরবে

দীন প্রতিবেশীবৃন্দে

সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,

এরা এলে হবে নিশে।"

(উন্নতিলাভ)

কবির রচনার প্রকৃত স্থান কোথায়।—অন্তিমাত-
সমাজে নহে—

'ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে

যর পুরা মাজা—

ওরে আমার হোসোময়ী,

সেবার করবি মাজা ?

গান তা তনি কর্ণমূল

মর্মবিদ্ধা কহে—

নহে, নহে, নহে,।"

(যথাস্থান)

তাঁহার প্রকৃত দরদী সাধারণের জন্তই রচনা। গৃহের
অন্তরালে যে কল্যাণী গৃহকর্ম ব্যাপ্তা, তাহার
প্রতিও কবির সহানুভূতির অভাব নাই—

'বিরল তোমার ভবন খানি

পুষ্প ফলন মাঝে

হে কল্যাণী, নিত্য আছে

আপন গৃহ কাছে।

বাইরে তোমার আশ্রয়ধা

স্নিগ্ধ রবে কোকিল ডাকে,

ঘরেশিশুর কলধনি আকুল হ'ব ভরে।

সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।"

(কল্যাণী)

ঐমিকসমাজের প্রতি বনিকোচিত বিবেচ্য তাঁহার
মধ্যে কখনো ছিল না। যে ঐমিকবৃন্দ জলে-
ভিক্ষিয়া বোত্রে পুড়িয়া কাজ করিতেছে, তাহাদের
মধ্যে তিনি পরমেশ্বরকে প্রত্যাক করিয়াছেন—

'তিনি গেছেন যেবার মাটি ভেঙ্গে

করচে চাষা চাষ—

পাখর ভেঙে কাটচে যেবার পথ,

খাটচে বারো মাস, ...

(ধূলামন্দির)

'ওরা কাজ করে' কবিতাতেও এই সমাজের প্রতি
তিনি অর্ধারচনা করিয়াছেন এবং বেশগঠনে ইহাদের
অতুলনীয় অবস্থানকে সঙ্গমানে শীকার করিয়াছেন।
সাধারণের উপর অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধেও
কবিকণ্ঠ বহুবার নিনাদিত হইয়াছে। হে মোর
পূর্ভাগা যেন—ইত্যাদি কবিতাতে উল্লেখ।

ছোট গল্পগুলির মধ্যে এই সাধারণের সহিত
যোগের প্রভাব অনেক বেশী পাওয়া যায়। ছোট-
গল্প রচনার পর্ধ্যয়ে কবি পন্নীগ্রামের নিকট-
সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। প্রথমদাখ বিশির ভাষার
'অধ্যাত অজাত মাছুষের সাক্ষাৎ নব্যবালা

সাহিত্যে এই প্রথম পাইলাম রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প—'। কবি নিজেও বলিষাছেন—

‘আমি বলবো আমার গল্পে বাস্তবের অভাব ঘটেনি। ব্যক্তিগত লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি, তার মূল আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা।……তেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।’

(রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪শ খণ্ড-গ্রন্থপরিচয়)

অতি সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের বিভিন্ন অনুভূতি—পূর্ণপ্রাণী ডিক কক্সার্ডা ও বালিকাধর্ম, মেহার্ভ কাম্বলিওয়ালা, সাধীহারার রতন, ইত্যাদির কথা এইগুলির মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাদের সকলের আশা আশংগেও সমভাগীকরণেই এখানে কবি পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

মোর নাম এই কল খাত হোক

আমি তোমাদের লোক

অন্য কিছু নয়—

এই মোর শেষ পরিচয়।

—এই পরিচয় মানুষ পাইয়াছে কি না সে প্রশ্নও করির মনে কখনো কখনো উদিত হইয়াছে। কর্মজীবনেও কবি সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন। জালিগান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যে সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়াছিল তাহাদের ব্যাখ্যায় ব্যথিত কবি ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করিয়া আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। হিজলীর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেও কবিকণ্ঠ নিনাদিত হইয়াছে। কৃষকজীবীদের উন্নতির জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের কৃষিবিভাগ স্থাপন করেন।

বাহির হইতে যাহারা কবিকে দেখিয়াছেন তাঁহারা কেহ কেহ কবির স্বভাবসুলভ পাণ্ডুর্যের জন্য তাঁহাকে দার্ভিক ও অসম্মুখ মনে করিতেন।

কিন্তু যাহারা তাঁহার সাহিত্যের সুযোগ পাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও অনেক রহিয়াছে। তাহাদের স্বীকৃতিতেই প্রকাশ যে কবি তাহাদের সহিত যথেষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সহিত ব্যবহার করিতেন। কবির কথাতেই বলা যায়—

‘বাহির আমার শুক্তি ঘন

কঠিন আবরণ;

অন্তরে মোর তোমার লাগি’

একটি কল্পাধন।’

অতএব রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে তাহার নিমূল্যর তাঁহার জীবনে ও বাণী হইতেই প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু কবি নিজে সাধারণের সহিত সর্বাত্মক যোগের একটি অভাব বোধ করিতেন। সাধারণের হৃদয়ের অন্ততলে প্রবেশ করাটী ছিল তাঁর কামনা। কোন কোন ক্ষেত্রে তাগ সম্ভব হয় নাই। উপনীত কালে অনেক কবি সাধারণ মানুষের কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারাও কি সকলে মানুষের হৃদয়ের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিয়াছেন? তাহা না পারিয়াও যাহারা পারিবার ভাণ করেন, তাঁহারা নিন্দার্হ। সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ প্রভাবের আশ্রয় নিতে রবীন্দ্রনাথ রাজী ছিলেন না। তিনি জানিতেন—

হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা

না হ’লে কৃজিম পণ্যে ব্যর্থ হয় মানের পসরা।……

……তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা

আমার সুবের অপর্যতা—’—ইত্যাদি।

কবি নিজে যেটুকু বলিয়াছেন তাহা অনুভব করিয়া বলিয়াছেন, তাই জাতিধর্ম-উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকলের নিকটই তাঁহার রচনার আবেগন রহিয়াছে। সাধারণ মানুষও যে তাঁহার কাব্যকে লাবের গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কাহণ, তাঁহার কাব্যে কবির প্রদীপ মনের সম্মান লাভ করিয়াছে, পাইয়াছে নিজেদেরই জীবনের বিশ্বস্ত আলোকে।

ইংরাজি কাব্যকার মনোমোহন ঘোষ

ঐমলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বরাবরই নিজ নিজ পার্বত্য
বজায় রেখে চলবে, মিলনের কোনো সীমানা-
বিশ্মুতে এসে কোনোদিনই যুগোদ্গমি আলিঙ্গনে
আবদ্ধ হবে না—এই মর্মে যে আপ্রণাতি প্রচলিত,
তা হৃদতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
অনুভূতি ও মননের সুবিস্মারিত জগৎপারাধারের
উদার-গম্ভীর উপকূলে ঝড়িয়ে দিগন্তনিলো নিকৃচ্ছ-
বাল রেখার মতো প্রাচ্য-প্রাত্যঃের একাধিক সঙ্গম-
রেখা দেখতে পাওয়া কখনো কখনো অসম্ভব নয়।
তেমনি একটি রেখার প্রকাশ-আধার রবীন্দ্রনাথ;
আরেকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে কবি মনো-
মোহনের মধ্যে।

জাত-কবি আমরা গড়ে-পিটে তৈরি করতে
পারিমে, সে ক্ষমতা মানুষের নেই; উত্তরজীবনে
যিনি প্রকৃত কবি হইলেন তিনি সেই বিশেষ ক্ষমতাটি
সঙ্গে নিয়েই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। মনোমোহন
ঘোষ এমনট একজন জাত-কবি, একথা বললে
বোধহয় ভুল হয় না। এবং জাত-কবি বলেই
উৎসে প্রাচীর মানুষ হয়েও প্রাচীর ভাষায় নির্মল
রেখে গিয়েছেন উজ্জল সাহিত্যকৃতির। কুলের
চারটিকে দশবছর বয়সে মূলসম্মত ভারতবর্ষ থেকে
তুলে নিয়ে গিয়ে রোপণ করা হয়েছিল সুদূর
বিলেতের মাটিতে; সেখানকার আকাশের নীচে
বহুদল মেলে মিলে যে কুসুমকলিকা, ধাত্তীকুমির
মাতৃরসেই সে পতিপুষ্ট ও বিকশিত সন্মেল নেই,
কিন্তু রসাহরণের মাধ্যম তার যে মূলটি, সেটি
আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয়। এই দুইয়ের ফলশ্রুতি
যে কাব্যসম্ভার, তা ভারতীয় কমনীয়তার ও
ইয়োরাপীয় রমণীয়তার অল্পময়।

১৯শে জামুয়ারী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জাতক
মনোমোহন অগ্রজ বিনয়কৃষ্ণ ও অল্পময় অরবিন্দ
(উত্তরজীবনে সত্যজ্ঞা) সাধক ঐশ্বরবিন্দ-সঙ্গে

প্রখ্যাত) সমভিবাধারে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন
ইংলেণ্ডে পদার্পণ করলেন তখন সেখানকার সাহিত্য-
যুগেতিহাসে ভিক্টোরিয়ান পর্ব বৃদ্ধির উপনীত।
তিনি শতকেরও অধিক কালের সুবিশাল ঐতিহ্যের
বাহক ঐ বৃদ্ধির আর্থিক অমুপ্রবেশ যে নিত
মনোমোহনের মানসলোকের রক্তে রক্তে কোষে
কোষে ঘটবে, সেটা বৃদ্ধি আগে থেকেই অব্যাহত
ছিল। তাই একান্তই সহজেই সংস্থাপিত হয়েছিল
ওই সন্ধিকালের ওয়াশটার ডি লা মোয়ারলহেল
বিনোয়ন-টিফেন ফিলিপ্‌স্—আর্থার কপ্‌স্ প্রমুখ
সমসাময়িকদের সঙ্গে।

ইংলণ্ড পালিকা জননীর স্থান অধিকার করলে।
দশ বছরের ছেলে ভক্তি হল ম্যাককোন্টারের আশ্রয়
স্থলে। পালয়িত্রীর মুখের ভাষাই পালিতের মুখের
ভাষা হতে শুরু করল। শুধু মুখের ভাষা নয়,
কালক্রমে দাঁড়াল মনের ও প্রাণের ভাষার।
ইতোমধ্যে লণ্ডনের সেট পলস্‌ স্থলে ভক্তি হলেন
মনোমোহন। তারপর যথাক্রমে অক্সফোর্ড
ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে। প্রতিযোগিতার জয়ী হয়ে
শান্ত করলেন ক্লাসিক্যাল স্কলারশিপ। রমণিপাশু
একাগ্র মন অবিজ্ঞান হান্না দিতে লাগল প্রাচীন ও
অর্ধপ্রাচীন ইংরেজি, গ্রীক ও রোমান সাহিত্যভাণ্ডারে।
সর্বাঙ্গেক্ষা মোহময় হস্ততানি পেলেন কাব্যলক্ষীর
কাছ থেকে। সাজাও দিলেন তৎক্ষণাৎ—কলম ধর-
লেন ইংরেজিতে। ইংরেজিই যে তাঁর সহজ পরিবেশ
গড়ে তুলেছে, মানসলোকে দিয়েছে অমুপ্রবেশ,
দখল দিয়েছে ভাষায়—এক্ষেত্রে, উপলব্ধির সংহতি
যদি ভারতীয়-বিশেষত্ব-সম্প্রদ, অভিব্যক্তি আসবে
ইংরেজির হাত ধরে, এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। অক্সফোর্ডের চার কবি-বন্ধু
কপ্‌স্, বিনোয়ন, ফিলিপ্‌স্ ও মনোমোহন প্রকাশ
করলেন একখানি যৌথ কবিতাসংকলন গ্রন্থ—

“প্রাইমা ভেরা”। সংকলনে মোট কবিতাসংখ্যা বোল, তার মধ্যে মনোমোহনের অবদান পাঁচটি। সেই পাঁচটি কবিতাই যেন পঞ্চাশের মত লক্ষ্যার্থ করলে। তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় বিদগ্ধমহাশ বিশিষ্ট, চমকিত ও আনন্দিত : এই নতুন কবি ভারতের মানুষ ! একে একে ভেসে এল নানামুখী প্রশংসা। বহু সাহিত্য-পত্রিকা জানালেন স্বাগত। অস্তর ওয়াইল্ড ঐ বছরেই ‘পলম্প গেরেটে’ মন্তব্য রাখলেন—

“প্রাচ্যমানসের যুগ্ম সংবেদন, বহিঃপ্রাণিতা এবং সমমমিতার উজ্জল নিবর্ণন তাঁর এই কবিতা-গুলি। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের আত্মার আত্মীয়তা কত ঘনিষ্ঠ, তার অভিজ্ঞানও এগুলি। ইংরেজি সাহিত্যে ত্রিভুক্ত যোষ একটি উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে থাকবেন, এমনটাই গাশা করি।” এসময়ে মনোমোহনের বয়স একুশ বছর মাত্র।

লংহল বিনোয়ন ছিলেন বিনেশী বহুটির প্রভিতার সম্যক গুণগ্রাহী, মনোমোহনের বিকাশ-পরে তিনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী। মনোমোহনের “পঞ্চম অবলম্বিত র্যাণ্ড ডেথ” (এই গ্রন্থে কথার আদর্য পরে আসছি)-এর ভূমিকাংশে তিনি বলেছেন : “ইতঃপূর্বে অল্প কোন ভারতবাসী আমাদের মাতৃভাষাকে কাব্যস্থমার মণ্ডিত ক’রে ব্যবহার করেননি ... আমার মতে, ইংরেজ কবি-বর্গের অল্পতম হিসাবে একে চিহ্নিত করা উচিত।” বিনোয়ন আরো বলেছেন : এলিজাবেথান ও তৎপূর্ববর্তী যুগের ইংরেজি কাব্যধারার সঙ্গে এর পরিচয় আমার চাইতেও বেশি বৈ কম নয়। কিন্তু যে জিনিষটি সবচাইতে আমাকে আকৃষ্ট করেছে তা হল এই যে, গ্রীক কাব্যসাহিত্যে মনোমোহন প্রাণট অল্পহাণী ও রসবস্তা। ... থিওক্রিটাস, মেলিয়াপার, বিশেষতঃ সাইমোনাইডিস, তাঁর সমধিক প্রিয় লেখক। আমার আগে ধারণা ছিল, প্রোচোর মাছুষরা সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের পুষ্টিত ও সালস্বার রচনাগুলির প্রতিই আকর্ষণশীল, পরে দেখে আশ্চর্য হয়েছি, ত্রিভোষের মত লোকও আছে যারা কঠিনতর সাহিত্যেরও প্রেমিক।”

দেখে ঘিরে এলেন বেশের ছেলে, ধাতুভূমির কোল ছেড়ে জম্ভুমির আলো। প্রবেশ করলেন সরকারী শিক্ষাবিভাগে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি

কলেজ তাঁকে দেখল অধ্যাপকের ভূমিকায়, শুনল তাঁর প্রাণময় পাঠন। ইউরোপীয় সাহিত্য বার করতলে, কবিতা বার রক্তধারায়, অধ্যাপনা বার তদুপ সাধনাবিশেষ, তাঁর জনপ্রিয়তা কি অস্বাভাবিক ? সাহিত্যস্থমার অন্তরাগত বহুস্থায়ী বিশ্লেষণ তাঁর ক্লাসগুলিকে মধুসূক্তে পরিণত করত, বক্তৃতাগুলি হয়ে উঠত অবিচ্ছিন্নীয় অতৃতপূর্ব অভিজ্ঞতার বস্ত্র। কী এক অসুখ অথচ ইন্দিয়গ্রাহ্য মধুসূক্ত যেন ভেসে বেড়াত বাতালে, বয়ে যেত আনন্দের লহরী, যার মোহনমাত্রায় নির্বিক নিম্পক হয়ে থাকতেন শ্রোতার দল। আলোচ্য বিষয় এবং শ্রোতৃগণ—উভয়ের মর্মসূত্রে অল্পপ্রবৃষ্টি হয়ে যাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর : অধ্যাপনা তো নয়, সে যেন উজ্জ্বল পুনঃসৃজন।

ওদিকে অধ্যাপনার ক’কে ক’কে চলে নব নব সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি নিচয়ের মধ্য দিয়ে সংবেদনশীল কবিসত্তার বিচিত্র প্রতিভা। কখনো তা আশ্চর্য স্বপ্নময়ির, কখনো মোজার চিত্রকলা, কোথাও অনিনীত বিধাক-বেরন, কোথাও মৈবাক্তিক মহাবিশ্ব-জনীনতা। “দি গারল্যান্ড” নামীয় এক কবিতাসংকলনের অন্তর্গত হয়ে তাঁর কিছু কবিতা দীর্ঘদিন পরে আশ্চর্যপ্রকাশ করল। তা’পর দেখা দিল “পদ মগ্ন র্যাণ্ড এলিজা” পুরোপুরি তাঁরই কবিতাবলী নিয়ে। বাকি রচনাগুলি—অধিকাংশই গীতিকবিতা, কিছু দীর্ঘ কবিতাও আছে—তাঁর জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে আর প্রকাশিত হয় নীকী কারণে, সে রহস্য আমাদের অজানা।

ভাগ্য সফলের ক্ষেত্র সুখবিধান করেন। দশ বছর বয়স থেকে বিলেতে অনুপ্রাণিত অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হয়েছিল মনোমোহনকে। বিশেষ বিভূঁই, বিনোয়নের মতো ছ’গারজন মাত্র অল্পবয়সে ছাড় সর্বাঙ্গ অবিচ্ছিন্ন অপরিস্রুত, অনাখ্য। এর মধ্যে তাঁকে স্বচ্ছ ও অগ্রসরশীল রেখেছিল যা, তা নিশ্চয়ই তাঁর অদম্য কবিতামন। কবি প্রতিভার যৌক্তিক যখন পেতে শুরু করেছেন ইংরেজ সাহিত্যিক সমাজের কাছ থেকে,—এলো স্বদেশ কোরার পালা। কিন্তু ভারতের চেয়ে ইংলণ্ডের প্রতিই ছবয়ের আকর্ষণটি যেন বেশি, তাই বিদায়কালে সে-দেশের উদ্দেশে তাঁর উক্তি : “মধুসূক্ত হে দেশ, বিদায়।”

হয়ত বা এই কারণেই—উত্তরজীবনে যদিও শৈশববিশ্রুত মাতৃভাষার পুনঃ চর্চা করেছিলেন—মাতৃভূমির সঙ্গে তিনি সবাত্বক নাড়ির যোগ অক্ষুণ্ণ করতে পারেননি, একধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর এবেশস্থ জীবনকে বিড়্ধিত করেছিল। হয়ত বা এই মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বিনোদনকে পথে লিখেছিলেন : “ভারতবর্ষের প্রকৃতির ভ্রামলিমা সত্যই অস্বাভাবিক, কিন্তু হঠাৎকৈ পাটল বস্ত্রগুলি (লবঙ্গ ও এধানকার মাছ) আমার প্রতি কোনো সহনমিতা পোষণ করে না, অন্তত সামাজিকভাবে।”

তবু কবিরন ভো—বিদেশী টিউলিপ-ড্যাঙ্কোডিল যেমন ভালবাসতেন তেমনি ভালবেসেছিলেন এদেশীরা। মালতীকে, জীবনসঙ্গিনী করে বুকে তুলে নিয়েছিলেন পরম মাদরে। কিন্তু চিরস্থায়ী হল না সে-মুখও : অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলেন মালতী দেবী, হারিয়ে ফেললেন কথা কইবার এবং উঠে বসার ক্ষমতাও—সেই পঙ্খের মধ্য দিয়েই স্বামীসোহাগিনী ইহলোক থেকে নিলেন বিদায়। পরিত্যক্তা কবিকে দিয়ে গেল অপরিচীত বেদনা। সেই বেদনা থেকে জন্ম নিল “ইন্সট্যাল ইড”—যাকে কেলা যায় চন্দ্রশেখরের “উদ্ভাস্ত প্রেম,” অক্ষর বড়ালের “এবা,” রবীন্দ্রনাথের “স্বরণ” ও দ্বিজেন্দ্রনাথের “মন্ত্র” কাব্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে। শোক এখানে যুত্বার মধ্য দিয়ে পরিমলিত ও উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেছে কবির প্রেমকে, প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য শিব সুল্লারের পূর্ণতায়।

কবির অ-সুখের আধা কারণ ছিল। রাজ-নৈতিক জটিলতার মধ্যে কোনোদিন পা না বাড়ালেও শাসনকর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁকে এক-কালে বিব্রত রেখেছিল। স্বাস্থ্যও ক্রমশ ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল—বেহে ও মনে। জীবনের শেষ অব্যাহত দৃষ্টিশক্তি অতিক্রম হয়ে নিজে লেখনীচালনা করতে পারতেন না—সে সময়ে সুখে গ্রুপে কাব্যরচনা করে যেতেন, অল্প কেউ প্রতিলিখনে তা কাগজে ধরে রাখত। এ যেম ছিটার একজন অল্প মহাকাবি মিল্টন। সাধ ছিল, অধ্যাপনান্তে অবসর নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবেন। কিন্তু তা আর হ’ল না—১২২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিনা প্রযাত্রার সমস্ত ঠিকঠাক, তার আগেই পড়লেন অসুস্থ—এবং ৪ঠা জানুয়ারি (১২২৪) মাত্র ৪২

বছর বয়সে মনোমোহনের জীবনদীপ নির্ধাপিত হয়ে গেল।

১২২৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে ব্র্যাকওয়েল প্রতিষ্ঠান কবির পরিপত্তর অনেকগুলি কবিতার সংগ্রহন করে সংকলনগ্রন্থ বার করলেন “সঙ্গম অব লভ ব্র্যাণ্ড ডেথ” : সম্পাদনার এবং মুদ্রণ লেখার তার ছিল বাধ্যবদ্ধ বিমিষ্টনের গুপ্ত। তিনিও বই নিয়ে গঠিত “লভ ব্র্যাণ্ড ডেথ”—আফিক মিস্ট্রিজ “ইন্সট্যাল ইড” এবং “লেটার পোয়েম্‌স্‌ ব্র্যাণ্ড লিরিক্‌স্‌”। “ইন্সট্যাল ইড” এর কথা আগেই বলা হয়েছে। শেক্সপেয়ার বইখানি একগুচ্ছ গীতিকবিতা ও কবিতার আহরণ। “আফিক মিস্ট্রিজ”—এর কবিতাসমূহ কবির যুগভীর মনন ও আন্তর ধর্মনের ফসল।

“সঙ্গম অব লভ ব্র্যাণ্ড ডেথ” সম্পর্কে মুকবি ডব্লিউ. বি. হেইটম্যান্সন করেছেন, “পৃথিবীর অশ্রুতম সূচক কাব্যকৃষ্টি।” ওয়ার্ল্ডের ডি লা মেয়ার বলেছেন, “এতে আছে কল্পনার সঙ্গীততা, উচ্চারণের লালিত্য ও গভীরতা। বিশেষ ভাবে যেটা আমার মুখ করেছে তা হল গীতিকর্মী শব্দগুচ্ছ, শব্দেই আড়াল থেকে ধ্বনি ভেসে আসে আপনা থেকে—মাতৃভাষা বীর ইংরেজি নয়, তাঁর পক্ষে এ এক মূলভ কৃতিত্ব।” স্টার্লিং মুরের উক্তি : “ইংরেজি ছন্দ লোকের এবং শব্দভাণ্ডারের সাহায্যে একমুখপূর্ণ সৌন্দর্য রচনা করেছেন তিনি; সেই রূপপূর্ণিতে কবি নিজে যেন এক গ্যাব্রী বুদ্ধজিত্র মতো স্থির অচঞ্চল, থাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না অথচ যিনি বহুতময়, যুরের বস্তু। তাঁর আন্তরিকতা যেমন নির্ভেজাল, তাঁর প্রযোজ্য তেমনি আনন্দদায়ক।”

মনোমোহনের অস্বাভাবিক রচনার মধ্যে পাই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আকারে এইগুলি :—
(ক) “আলি পোয়েম্‌স্‌ ব্র্যাণ্ড লেটার্‌স্‌”—প্রথম দিকে লেখা কবিতায় ও কিছু পত্রমাহিতা ;
(খ) “পাসিফিক দি পর্গন প্রেরার” (খণ্ড ১—৭) —অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা একখানি অসমাপ্ত মহাকাব্য ;
(গ) “নলদমরুতী”—একটি কাব্য-নাট্য, এবং এটিও কবি শেষ করে যেতে পারেন নি ;
(ঘ) “অ্যাডাম গ্যালার্ম্‌ ইন প্যারাজাইস্‌”—কতিপয় চৌপদীর সম্বন্ধে রচিত একখানি

অসমাপ্ত কাব্যগাথা, এতে আমরা পাই কবির প্রথম বিশ্বমহাবুদ্ধ সম্প্রতি প্রতিক্রিয়া।

ব্যক্তিগত জীবনে মনোমোহন ছিলেন সমাশ্রয় ও অমায়িক, সুমাজিত, দম্ভানীল, ঘোর ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির মাল্লব। কোমলবধুর ছিল তাঁর মন, ঝাড়াই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর প্রতি ঈর্ষি ও অত্যা নিবেদন না করে পারেন নি। অশ্রুতবাবিতী উপলক্ষে বিম্বতপ্রায় এই কবির

প্রতিভার সম্যক প্রচার করবার মাহেশ্বর্য্যক আর সমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়ে মনোমোহন-স্বত্বত্বপূর্ণ শেষ করি—

“এই কবি মনোমোহন নিগূঢ় নিকেন্তন থেকে যা বের করেছেন তা আজও ঢাকা রয়েছে। এ যখন প্রকাশ পাবে তখন বাংলা দেশের একটি মহিমা সর্বত্র প্রকাশিত হবে।”

—

অক্ষয়সূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, প্রতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রত্যেক পদ্যমূল্যঃ

২ ১২৭

নবর কন কিছুই না বুঝে আসলি যারা করে
জালো করে যেন স্রুতি গ্রন্থেই মনোযোগ দিয়ে পড়ে
স্রুতির মাঝেতে লেখা বেধা যায়
অংশতঃ অংশতে বয়
ভিন্নভাগ তার অমৃত ভগ্নেতে বরণের হারে আছে
শুট করিয়া এই কথা মেনো রচনে স্রুতির মাঝে।

কেহ কেহ বলে স্রুতি বাক্যে দুবার দু'কথা বলে
অংশ পূর্ণ গ্রন্থও নয় অংশও নয় বলে
দুধের বিকার রবি মেনো হয়
বজ্রতে লাল জল নিচর
তেমনি জানিও বিবর্ত ইহা বিকার কখন নয়
অংশের হারে অংশ ভগ্নেতে গ্রন্থ মহিমা বয়।
আখ্যানি ও এবং বিচিহ্না দি

২ ১২৮

কন শব্দর বপনের হারে নিছের মনের থেকে
কত বিচিত্র রথ শব্দ নদী কত কি মাছুে বেধে
মাছুে তাহাতে লীন নাহি হয়
বপন তাকিলে তাহারাই হয়
তেমনি জানিও গ্রন্থ হইতে শুট লুকলি হয়
গ্রন্থের মাঝে উদয় হইয়া অংশে পায় লয়।

বপক ঘোষাক (২ ১২৮)

নিছের পক্ষে এই ঘোষ আছে এই কথা হেথা কয়
প্রতিবাহী তাই এই ঘোষ ধরে অস্ত্র কি কথা কয়
মাংসা বলেন প্রধান হইতে
অংশ স্রুতি হন তাহা হইতে
নিরবধে গ্রন্থ অংশ ইহাতে স্রুতি জানিও হন
লয় রক ও তমোত্তর হারে লম্বা হইয়া হন
কেহ কেহ বলে দুটি পদ্যাপু হইয়া লয় হয়
পদ্যাপু শুকু কণ্ঠের মত প্রবাহন নয়।

[অংশঃ

অসংসারী [উপভাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এস্থ

হায়ে সন্ধ্যাবিরে পালে ভয়ে গৌরী সন্ধ্যাবিরকে আদর
কালে প্রচুর; এতখানি আদর, বা এতটা প্রেমাদির
সন্ধ্যাবিরের কাছে দম্পতি অকৃত্যাপিত। এপৰ্য্যক জীবনের
প্রথমদিকের সে এতখানি বড় গৌরীর কাছে থেকে কোন
দিন পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। নিরীহ সন্ধ্যাবিরের
সমস্ত মানসিক জ্ঞান এই আদরের সুপের মধ্যে কোথায়
যেন ঢাকা পড়ে গেল, সে বেচারা অগাধে সুস্থিরে পড়লো।

তিত গৌরীর ঘুম আজ নেই। কে যে তার এই
ক হংসদাম্পত্য করেছে তা সে হঠাৎ বা একটু একটু
অজ্ঞান হতে পারছে, কিংবা পারছে না। সন্ধ্যাবিরের
মনকে সন্দেহ করে তুলতে পারে কে? নীরবে বাবুর
পুষ্প ছাড়া আর কেউই তাকে হাতে নাতে হরতে পারে
নি। কিন্তু সন্দেহ তবু তিন দিন হোল হিল্লীর বাইরে
চলে গেছে। যোগ্যতার আগে যদি সে কাকের মতকত
শিবস্বামীর কানে এই বড়ব পৌছে দিত তাহলে যে শিবস্বামী
জ্বলি অপেক্ষা করে পনিবার দিন এই অজ্ঞানমান হুক
করতো, তা কিছুতেই বিদ্যায় করা যায় না। সন্ধ্যাবির
নিজস্বই আজ সকালে কি হুশেরে অফিসে এই খবর
পেয়েছে। নিজস্বই সকালে, মতের অফিসে যাওয়ার সময়
কেন সে বলে গেল যে চাবটে লাভে-চাবটে নাগায় কিংবে।
অর্থাৎ লম্বা সময় দিয়ে অপরাধীকে হাতে নাতে বড়ব
ভট্ট সে এই প্রত্যাহা করেছিল। তবে কি নীরবেবাবুর
পুষ্প বাইরে গিয়ে দেখান থেকে চিঠি লিখে শিবস্বামীকে
এই সব জানিয়েছে? কিন্তু চিঠি কোথায়? কই, কোন

চিঠি ত কিছুকালের মধ্যে বাড়ীতে আসে নি। তবে কি
নীরবেবাবু এ সব কথা জানিয়েছে? হঠাৎ মনে হোল,
তবে কি সন্ধ্যাবিরের কাহিনী? সেই যে সেদিন দুপুরবেলা
কে একজন জুতা-পতা লোক আমাঘের বোথাক থেকে
লাগিয়ে পড়ে চলে গিয়েছিল, সে কি সন্ধ্যাবির? পূর্ব সম্ভব
সেই হবে। কিন্তু যেই হোক, বা যেবার থেকেই হোক,
সন্ধ্যাবির এখন একবার সন্ধ্যাবির মনের মধ্যে এসেছে তখন
আজকের মতো এটাকে চাপা দেওয়া সম্ভব হলেও বড়বের
জন্ত চাপা দেওয়া যাবে না। আর রামতপটাই বা কি?
যেহা না খেলে কি তার চলে না? বিভ্রিতে আপত্তি
করতে সুখপোড়া দিগবৈষ্ণবী কিনে আনলে। যা বাবা যা
খুলি করগে যা, কিন্তু সেই দিগবৈষ্ণবীর টুকরো কেলেই ত
বড় বিপদ। তবে গরিতকার বেড়া টপকে লোকটা পূর্ব
পালিয়েছিল কিন্তু। আর শুকনল যে ওর জামাটা আমায়
নয়বে পড়েছিল বড়বা খোলায় আগেই, নইলে আমার ঘরে
ওর জামাটা পড়ে থাকলে আর রকম ছিল না। কিন্তু
রামতপকে নিয়ে খঁর কোনরকম সন্দেহ হয় নি, উনি
সন্দেহ করেছেন সন্ধ্যাবিরকে নিয়ে। সন্ধ্যাবির—ও, সেই ত
সব নষ্টের মূল। আমার মধ্যে এই অসাড়ি লাগিয়ে তুলে
কে, সে সন্ধ্যাবির। এই অবেলার আমাকে নতুন করে স্ফূর্ত
করে তুলে কে, সে সন্ধ্যাবির। বহল আমার পুরা পত্রিশ,
এখন, এই সময়,—কিন্তু কেন, হুশিয়ার লংলংখি আনবে
দিন কাটতে পাবে, তাহলে কেবলমাত্র কৃত্রিম এক
সামাজিক বন্ধনের জন্ত এই পুতুল আমি নিয়ে আমাকে তুল
হয়ে সংসার করতে হবে? এ অভ্যাসের, এ সামাজিক

অশ্রু, এ হচ্ছে কতগুলি হৃদয়বাহী লোকের মনগড়া
খবর। এর একমাত্র উদ্দেশ্য পৃথিবীর আশ্রয়স্থল বন্ধ
করা। এর মধ্যে বর্ণ নেই, ভগবান নেই, এর মধ্যে উদ্-
দেশ্য নেই। ইহলীনের বৈধের ক্ষমা পরলীনের অবি-
ধাওয়া করতে পারে না। আর এই যা কি মহাজ্ঞা!
নারীরে নির্ধাতন করে সামাজিক শৃঙ্খলা বন্ধ! পুরুষ
বত হচ্ছে বিধে করতে পারে, নারী পারে না। নারীর
বিবাহ হওয়া বানো তার জীবন একেবারেই শেষ, নারীর
চরিত্রে সম্বন্ধ হওয়া বানো তার সমাজচ্যুতি, আর পুরুষ
পরের নারীর বিবাহ ক্রিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে সংসার
বঁধে, লজ্জাকারী অধিন্দু সেই ক্রিকে হুবে হাংসার গুপ্ত
কোয়ার্টার'বেগ, বড় বড় লোকেরা তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ
করে আসে। উৎকট উত্তেজনার পৌরী নিষেধ বিদ্ভাষ
ওপরে খাড়া হয়ে উঠে বসে। তাইই নারীর অস্তিত্ব
বর্জন, কৃত্রিম বিকলকো ক্রিয়ের কাছে তার পরাজয়।
নারীর গুহ বিকে চোরেও বেধে না। এর শাস্তি চাই।
উত্তেজিত পৌরী বিদ্বান লোক নেমে বহের মেঝের
পাখারী করে বেড়াতে লাগলো, দেখে হরত ধুলে বাইরে
উঠেনে বেরিয়ে এল। নিশ্চিন্তি রাত। নির্ধন নীল
আকাশে অসংখ্য তারা। তার মধ্যে এককালি বীতা
চাঁদ। বাড়ীর শিঁদনে বড় পাছটার মাথার কোণের তেতর
অসংখ্য জোনাকী। অন্ন অন্ন গাওয়া বইছে। কোথাও
কোন শব্দ নেই। পৃথিবী পথম নির্ভয়ে প্রস্থ, কেনল
স্বাধীন হস্তাঙ্গিনী বিধিবিধি জ্ঞানমূল হয়ে কি একটা
অদভব সমস্তার সমাধান করতে আকাশ পাতাল আবেল
আবেল চিন্তা করে বেন প্রায় উদ্বাহ হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে পৌরী কলহের পেল,
ঠান্ডা জল গুলু গুলু নিয়ে মুখে শাখার খাড়ে খেদ করে
দিয়ে, কাপড়ের খাঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে কোঁপে
সমাধিবের ঘরে ঢুকলো। এখনও গুহ কান দিয়ে মাথা
দিয়ে আশ্রন বেকছে কিন্তু খেচারা সমাধিবের পথম নিশ্চিন্তে
নিশ্চিন্ত। অন্ন অন্ন নাসিকালনি। সেদিকে চেয়ে চেয়ে
পৌরীর বনে তেমন একটা অস্বস্তি লাগলো। আহা,
উদ্বাহ পশ্চিম করে, হস্তাঙ্গের মরণ কাপড় জায়া পথে,
গোড়াগী বীতা ছুতোটা বতবিন চলে তার চেয়েও বেশী
দিন চালিয়ে বিকেলের ক্ষিপ্র চেপে সমাধিব সংসার

করছে, টিক যেমন আর পাঁচজন সেবস্তর সংসার করে।
ভাড়াটে বাড়ীর বোড়া! এর চেয়ে ব্যাখ্যা কতকগুলো
হুকা, তাদের বাড়ীতে হুকা না, অপর তাদের বাড় পথে বাড়ী
মর্দমার ভাটবিনে লব সমস্ত ছড়ানো আছে। তাদের বন্ধু
ও বাস্তবীতা তাদেরই মত পথে বাড়ী গুরে বেড়াই। মেঝের
মাঝের ক্ষমা মিটিয়ে পূর্ব দৃষ্টিতে পথের কুলুঙ্গি সমাধিবের
অন্ন দেয় আর আশ্রুপথে পথের ধারেই শেষ নিঃশ্বাস
ভাগ করে। অপর সাহস, মতা সাহস, সামাজিক সাহস,
সমাধিবনে চির অবেদ সাহস, গুস্তিপোকার স্তায় নিষেধ
নীড়ক কুতাবার আবদ্ধ হয়ে অলদায়ভাবে মরে,—যেমন
মরছে গৌরী।

বিদ্বানরা বনে বনে গৌরী কেবলই ভাবতে লাগলো,
সমাধিব তাকে সম্বন্ধ করতে হুক করেছে। সে ধরা
পড়ে গেছে। পাড়ার লোক টের পেয়ে গেছে। সংসারের
সাথে পাঁচে থাকে না যে সমাধিব, তার কানেও বন্দন এই
কলহকাহিনী সেদে পৌঁছেতে, তখন এই কলহ অ'ব
কেবলমাত্র শাশের বাড়ীর বউটির কাছেরই নিবদ্ধ নেই,
অতি লক্ষ্যশনে এই কলহ বিস্তারলাভ করে দুই কূল
প্রাণিত করে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। তবে এই
জীবনে আর কি প্রয়োজন? এবার হুত। সেতে শাপ,
শাপে মৃত্যু, কথটা নিত্যস্থই পুরাতন, কিন্তু সেই পুরাতন
ক্রিষ্টিই নতুন করে গৌরীর জীবন মতা হতে চলেছে।
কিন্তু মরতেই যদি হয়, কলহের খেঁচাই যদি বইতে হয়,
তাহলে নীরবে মরে কোন লাভ নেই। লোকে যদি
মাতাগই বলে, তাহলে আকর্ষণ পান করে মাতাল মাখা
লাভ করাই ভালো। আর সংসারে তার কিই বা আছে।
একটা ছেলে নেই, একটা মেয়ে নেই, যে তাদের জীবনের
মধ্য দিয়ে মাঝের কলহকাহিনী পৌরীর জীবনাবসানের
পরেও চলে থাকবে। এক সমাধিব? আজ যদি পৌরী
সমাধিবের লকে সমস্ত সমস্ত কৃষ্টিয়ে দিয়ে পথে বেড়িয়ে
পড়ে, তাহলে সমাধিবেরই ভালো। এখনও মরতে নেই,
সংসারের জ্বলন্তা নেই। একটা যেসে গিঃ খাটিয়া
পেতে শাখে, যেমন চাকরী দে করছে, তেমন চাকরীই
দে করবে, তাৎপর্য পেলস নিয়ে হৃদিকেশ কি কৃষ্ণাবন কি
নিধন লকে বেগে গিয়ে তাইপোথের সংসারে উঠবে।
বেগে হয়ত এই বলে খবর যাবে যে, পৌরী খেলো হয়ে

একদিনের যোগে যাত্রা গেছে। বাণেশ বাড়ীতেও ভাই রাজা গৌরীও অ'ছে এক বাসীয়া, সে যত্নে তুমি কাঁধে, তা কাঁধে, গৌরী যদি বা খুঁশ করে, তাহলে কোথাও কোন বিশ্রামই ঘটবে না। তবু তার নিজের জীবন! সে জীবন ত খেতেই এসেছে। চুটি সে করেছে, অবশ্যই করেছে, কিন্তু বহা পড়ার পর চোর নাম নিয়ে বেঁচে থাকা, আর লুকিয়ে লুকিয়ে চুটি করা, এর মধ্যে যে আকাশ পাতাল উত্থাৎ। বেগুই একটা কথা মনে পড়ে গেল। তার বিবিসি বৃদ্ধি বলতে 'ভুংগি না ভুংগে আছি, বেশি পাতাল ভর মুখ।' কালানুযায়ী কানী সেই পাতাল বেগেতে বেহিয়েছে, যত্ন পাতালের কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে।

ঈ, করে গৌরীর বাথার নতুন একটা বৃদ্ধি এসে গেল। নেভল নাটক সে অনেক পড়েছে। সে জানে কামত মোহের কোন এক বিশেষ পারমিত অকাজ্জব অবদান হয় পূর্ণ ভোগের মাধ্যমে। একথা সে পড়েছিল কোন এক কামশাস্ত্র দল্লীর্ষ বালা। বই থেকে এবং সেই সঙ্গে এটাও সে জানে যে কামকেন্দ্র দীর্ঘতাই হচ্ছে এই যে, এ তিনিষের নিয়ম। অতীতলেন মাছের মনের চাপবৃত্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলে, কিন্তু দল্লীর্ষ সময়েই শাস্ত্র বদ্ব্যন্যের জন্ত হ'ল্লীর মনে একটা অত্যাশ্রিত চেষ্টা চলতে থাকে। সমীচিতে সে ভেদন করে শাস্ত্র নি, অপর সমীচি হেতুকে এতদিনে নিশ্চয়ই মিড়ে ভোগ করে নিচ্ছে। এখন যদি সে একটু চেষ্টা করে, তাহলে সমীচি নিশ্চয়ই ঐ নিয়ম, কানী এবং নিয়মকর্মসূচি তিটকে বন্ধন করে গৌরীর জন্তই লাভান্বিত হয়ে উঠবে। আর সমীচি ত লক্ষ্যনিব নয়। চাকরীর মাত্রা তাকে আটকাতে পারবে না। সামাজিক ভা বা আটকাবে বিন্দু তাকে পল্লী করতে কখনও পারে নি আজও পারবে না। গৌরী যদি অপরায় চেষ্টা করে, তাহলে অতি দল্লীর্ষ সে সমীচকে নিয়ে বেশ কিছুদিন হয়ে উদ্যম দল্লীর্ষ জীবন বাশন করতে পারবে। তাবপর ? তারপর আর কি ? সমীচের লক্ষ্যিণো তার জীবন বাশন যদি দ্বায়ী নাও হয় তাহলেও তুমিই বহুদায় জীবন দুশো। বহুদায় একবেগে জীবনের চেয়ে অনেক বেশী প্রার্থনীয়। সে কল্লী, কিন্তু দল্লীর্ষ হোগ সেতে যাবে দল্লীর্ষের লক্ষ্যিণো। সে কল্লী লক্ষ'করতে পারে না, কিন্তু দল্লীর্ষ পাশে থাকলে কোন কল্লী তার কল্লী বলে মনে হবে না। অতএব দল্লীর্ষকে তার

চাই। তিলে তিলে পলে পলে হিলেন কল্লী ওজন মেলেন বাধা বহা জীবনে যে চলছিল, সেই জীবনের গুণাব আবার নতুন করে লক্ষ্যেই বোকা চাপিয়ে লক্ষ্যিণের মন জুগিয়ে তাগব্যাগ অস্তিনের করে বাধি এবং আধি পত বকবের অতুল অহর্নিশ লজ করে গৌরী আর পাবে না, পাবেই না। কাল রবিবারেই এ উপলক্ষ্য ব্যবস্থা করতে হবে, তাবপর বলাতে বা বাবে—ভাই হবে।

পরদিন সকাল থেকেই গৌরী তার দল্লীর্ষা বৃদ্ধিকে কাধীকল্লী করতে লজ করে হিলে। লজা কথা বলতে কি, মাকে মাকে লুগেই ইচ্ছে হয়, তল্লীর্ষ গৌরীকে কি দ্বায়িণিয়ে তৈরী করেছিলেন। বাধ হয় যেম দল্লীর্ষ ভাকাত বলের লক্ষ্য কি নাথক। কুটনৈতিক লক্ষ্যপুত্র তৈরী করার মাত্রা দ্বিগুণে বিধাতা গৌরীকে গঠন করেছিলেন, আবার অপরপক্ষে গতিতদ্ব্যই বলতেই বৃদ্ধিক্রিঃ কিং ম কল্লীতি পাশম্। মনস্তাত্ত্বিক বলবেন, ঐ বৃদ্ধি এবং তল্লীর্ষি লক্ষ্যেই লক্ষ্য অদ্ব্যন'ই গৌরীকে তার অত্যাশ্রিত বদ্ব্য থেকে বিচ্যুর করে বানাব মধ্যে টেনে এনে ফেলেছে। কেউ যত্নে একথাও বলতে পারে যে, গৌরীর জীবন-লাইনের কিল্লিগ্রেট থেকে খেলাজলে বলট খুলে পালিয়েছে ঐ ছেলেমাছের দল্লীর্ষ, কিন্তু লুগে লুগে বদ্ব্যন'ই ঐ পাব্যাগ-গুণাশ্রিত লুগে সে বেগেতে গেয়েছে, লক্ষ্য লক্ষ্য তাকে খুঁশি করে খুঁশি দিতে গিয়ে তারই লক্ষ্য উৎসাহ হয়েছে; বলটুগুলো পুনরায় এ'টে বেগবায় লম্বা সে আর পায় নি। ওহ মানসিক অল্লীর্ষকে কি যে অল্লীর্ষন খেতে ছা আনি না কিন্তু লম্বের যোট কল্লী দ্বায়িণো এই যে, লক্ষ্যে লক্ষ্যিণি বদ্ব্য নিয়মত চা পান করে বাজারে গেল ওজন কীবা দ্বায়ী পেয়ে গৌরী লক্ষ্য বদ্ব্য করে বাজারের লক্ষ্যিণো এসে লক্ষ্যপক্ষে খুঁশি দিতে ভাক হিলে। দ্বায়ি দ্বায়ি লুগে লক্ষ্যপক্ষে কল্লী নাথিয়ে যত্নের বাইরে বেরিয়ে এল।

গৌরী বললে, লক্ষ্যপক্ষে, একটা কল্লী করতে পারবে ?

লক্ষ্য, লক্ষ্যপক্ষে একেবারে গৌরীর পায়ের গুণাব এলে দ্বায়িগেছে।

লক্ষ্যপেয় পালটা টিপে দিয়ে গৌরী বললে, বেশ লক্ষ্যপক্ষে, আক রবিবার, বাবু আজ লক্ষ্যিণি বাড়ীতেই থাকবে। তুমি সেই অবলম্বনে লক্ষ্যিণো ঐ দল্লীর্ষ বাবুদের বাড়ীতে যাবে, লুগে।

সে বললে, সখীর বাবুদের বাড়ী, যে বাবু ঐ কানী
ঝিকে নিয়ে থাকে ?

হ্যাঁ। ঐ কৃষি দেখছি সবই জানো !

একমুখ হেসে রামচন্দ্র বলে, জানিখোনা যেমনশ্য, বাঙালী-
বাবুদের কেউনা কে না জানে ? খাঁচু করে গোদীর মনটা
যেন কেমন বিপড়ে গেল। সেটা ভাবুনি মন থেকে বেরে
কেন্দ্রে দিয়ে গোদী বলে, হ্যাঁ ঐ বাড়ী। শুধানে গিয়ে
চুপি চুপি আঁড়াল থেকে দেখবে শুভা কি করে। তারপর
একমুখ সখীরবাবুকে বলবে, যে যেন কাপ মোমবাতির
দুপুর বেলা আমার সঙ্গে দেখা করে, বুকে।

কাঁইই যেমনশ্য, রামচন্দ্রের মুখেও সন্দেহের ছায়া।

টোক গিলে চটু করে গোদী বলে, ঐ বাবু আমার
কাছে টাকা দার নিয়েছিল লুকিয়ে, এই টাকা আমার
চাই। বাবুকে জানালে বাবু দেই টাকা নিজেই নিয়ে
নেবে, তাই বাবুকে না জানিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা
আমায় করবো এবং ঐ টাকা আবার হলে তাই থেকে
তোমার ভালো জামা কাপড় কি তোমার বিছানাপত্র
গড়িয়ে দেব, বুকে। কিন্তু দেখো, অস্ত্রে যেন কেউ না
জানতে পারে যে, আমি সখীর বাবুকে ডেকেছি। মনে-
বেশো, যে কোনো প্রকারেই হোক, ঐ বাবুর সঙ্গে আমার
দেখা করানো অসম্ভব চাই, বুকে।

বিছানাপত্র প্রাপ্তি আশায় রামচন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে বলে
হো বাঙালী যেমনশ্য। বাবুকে আমি জরুর আপনায়
কাছে পৌঁছে দেব। একই খেমে বস, কত টাকা পাওনা
আছে যেমনশ্য ?

অনেক টাকা, এই কথা বলেই গোদী বিব্রতিনীর
পর্শ নিয়ে বাইরের দর এনে বরজাটা খুলে বেধে দেই
ঘরেই বলে বলে বেতগোলের ঘোধানটার সাইকেলের ঘরা
দেগে বালির ওপোর ঐতড় পাঁচড় দাগ হয়েছিল সেই
দাগগুলো আনমনে দেখতে লাগলো। ঐ দাগ কি
চিরস্বামী ?

সেদিন দুপুরে ঘরের কাজ শেষ করে রামচন্দ্র সখীরের
বাড়ীর পাশের সেই সড় গাছ-টাকা গলিগলির বেকিতে
অস্ত্রাস্ত্র বাড়ীর দুতিনজন চাকরের সঙ্গে এমিক ওমিক গল্প
করতে করতে বিড়ি দু'কতে লাগলো। গোলাপী বিড়িটাই
তাঁর ভালো লাগে, কিন্তু চাল দেখানোর অস্ত্রে এ

যেমনশ্যেরকে বুদিকবাবু জন্তে মতো মতো আত্মকোণ তাকে
গিগারেট খেতে হতে, কিন্তু গিগারেটে তেমন মৌজা
হবেনা। এই চাকরেরের মধ্যে সে তার আত্মকের
অভিমানের কথা প্রকাশ করবে কি না অনেক মেবে
সেবকালে ঠিক করলে ও বাড়ীর সংবান্ড নেওয়া থাক
তারপর যা হয় করা যাবে।

সখীরের বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই যে বাঙালী ভ্র-
লোক থাকেন তার অনেকগুলি ছেলেকে, তার বাড়ীতে
কাজ করে একটা প্রায় উড়িয়া গোছের চাকর। শেঠকে
বাবু নিজের বেশে ঘেঁকিনীপুর থেকেই নিয়ে এয়েছেন।
শেঠটা এখানে বছর দুইখেক থেকে দ্বিনীটদিগন্তে যেন
নিখে নিয়েছে। প্রসঙ্গটা উঠেই যে বলে সখীরবাবুর
কথা বাপ দাদা, কারও সঙ্গে যেমনো কিছু না, একটা
কানী নিয়ে ওর লগোয়। কিন্তু বিটাব কি বয়স,
কেমন সুন্দর বয়স, কি সুন্দর মিনিপদর, ওইট পর্শপর্শ।
সুখাতিটেটেটে বাবু যা কিছু আর সবই ঐ এক কিয়ের
পেটেই দার।

চাকরমহলে এগাড়াটার নাম সুখাতিটেটেটে পাড়া,
কাংগ বিভিন্ন সড়কাও অলিগের বিভাগীয় সুখাতি-
টেটেটে বা লেইজল পদ্য লোকদেরই এ পাড়ার
কোমটিপড়লো দেওয়া হয়। অতএব চাকরেরের দৃষ্টিতে
এ পাড়ার বাবুর সবাই সুখাতিটেটেটে। উড়টা বলে
বাবুদের কথা আর কি বলবো, সব লম্বা তেতর থেকে
বরজা বহু, এমন কি বাচ্চা ছেলেদেও পদ্য ওবাড়ীর তেতরে
চুকতে চার না। রাতদিন কি যে করে, তা ওয়াই জানে।
রামচন্দ্র বলে, ঐ কানীটাকে বাবু খুব ভালোবাসে,
না যে,

খুব। রামচন্দ্রের মনে হোল, যেমনশ্যও তাকে
ভালবাসে, আবার বিছানাপত্র ঘেবে বগেছে। বিছানাপত্র
কত লাগবে ? একপ বেড়প টাকার কম নিশ্চয়ই হবে না,
কিন্তু সখীরবাবুর কাছ থেকে যেমনশ্যেরের টাকাটা কি
করেই বা আবার করা যাবে।

বিড়িতে ছোরে ছোরে চান দিয়ে রামচন্দ্র বলে, আমার
বাবু কাছ থেকে সখীরবাবু অনেক টাকা দার করবে,
কি করে আবার করা যাবে বলত।

এমন লম্বা নীচের বাড়ীর চাকর লম্বা এসে হাঁসি

কে হে, কে তুমি? সন্ধ্যা পূর্ব কড়াভায়ে প্রস্থ করলে।
নেই বাবু, নাম্বা হিচা বৈঠগা অস্টভানে ভড়িয়ে
ছাড়িয়ে বামরপ কণাগুলো বসতে বসতে ডাঁড়িয়ে উঠে
বোথাক থেকে নেমে পড়লো।

সন্ধ্যা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, তোমার নাম কি?
কোথার থাক তুমি? সন্ধ্যা স্পষ্ট স্বপ্নে পেরেছে এ
ছোঁকরা বা বস্তু, তা সত্য নয়।

বামরপ আত্মতা আত্মতা করে পালাবার চেষ্টা করলেই
সন্ধ্যা এগিয়ে এসে গরু কড়াইর ফলাটটা চেপে ধরলে,
ধমক দিয়ে বলে, কোথার থাকিস, কি করতে এখানে
আমার জানামার লুকিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলি? বল,
ভোকে বলতে হবে।

নিরুপায় বামরপ সন্ধ্যাবির বাড়ীর দিকে আব্দুল
দিয়ে দেখিয়ে বলে ও বাড়ীর মেলাব আপনাতর কাছে
আমাকে পাঠিয়েছে তার কি টাকা পাওনা আছে সেইটের
জন্তে তারিফ দিতে, তাই আমি আপনাতর কাছে এসেছিলুম।
ও বাড়ীর মেলাব? টাকা? সে আমার কি কথা।
তা বেশ, ও বাড়ীর লোক তোমার কি লবধ?।

আমি এখানে কাজ করি।

ওহু ঘর থেকে উকি মেয়ে বেয়ে বাল, মাকসে ঢাকা
ছেড়ে দিন, ওলব নিয়ে আর কেন স্বস্তা করা, থাকে—

—যাক: কিসের, কখনও না, এ ব্যাটার বয় হলব
আছে। আচ্ছা ওহু, তুমি বহাটা বিয়ে যে ত,
আমি একবার সবাকে ভোকে মিলেগল করে দেখতে চাই,
সত্য নিখা কি ব্যাপার। কারও মাতে পাতে আমি
থাকি না, আর আমার বাড়ীতে কেবলই সব লোকে উকি
স্বস্তে আসে, বসতে বসতে সন্ধ্যা চটি পায়েই বামরপকে
জোর করে ধরে নিয়ে যেন পূর্বাঙ্গের চিত্রাঙ্গ হুইয়ে
সন্ধ্যাবির বাড়ীর দিকে এগিয়ে পড়লো। ওহু বহাটা
অল জেজিয়ে ওব ফাঁক বিয়ে ওবের দিকে সত্যতনে
চেষ্টে হইল। সে যেন যেন প্রসার পড়েছে।

সন্ধ্যাবির বাড়ীর বায়ামার এসে সন্ধ্যার চৈতন্ত
হোল, যে, তার পক্ষে এতটা বাতাবাতি করা শোভন
হলে না, কারও লোককে সে অপসার। কেবাকার
লল কোথায় গাড়ার? দুব হোক সে চাই, কিন্তু এতটা
এসতে চেব ও যায় না। বিশেষ করে লক্ষ্য, ঐ উকিটা

এবং আরও দু'একটা ছেঁড়া সন্ধ্যার পাশের বাড়ীর
পলিপথ থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দিকে দেখছিল।
কাছেই এখান থেকে কিবে বাতাবা নিত্যই অপমান-
জনক।

বহুদিন পরে আজ সন্ধ্যাবির বহাভার এসে সন্ধ্যা যা
মিলে। সন্ধ্যাবির লগাবান্তিক নিভার বিস্তার ছিল।
সৌরী উঠে এবেও এলই অবাক। সৌরীকে বেবেই
বামরপ বাউমাউ করে প্রাণ কঁপে কঁপে, বলে, মারিছো,
আপনি বশেছিলেন বাবুকে ভাক্তে কিন্তু বাবু জানামার
কাছে যেতেই বাবু আমার বাড় পাকড়কে ইতালি।
বিশবে লড়ে এখন আর মেলাব বসতে ওর যেনই
হোল না।

সৌরী একটু থমকে দাঁড়িয়েই বলে, একে ছেড়ে দিন,
ওর ওপরে লুপ্ত করছেন কেন। এতদিন পরে সৌরীও
সন্ধ্যাকে আপনি বলে ফেলে।

সন্ধ্যা বলে, এ আপনাতর বাড়ীর দোক।
হ্যা, কখনোই সৌরী উত্তর বলে।

একে বাধে করে বেবেন, এ যেন আমার বাড়ীর
বহাভার গিরে চোরেব বস বলে না থাকে।

চোরেব কপোথ বাটপাকি করতে সকলেরই ইচ্ছে হয়।
ও আমার বাধে জননে কেন? সৌরী পূর্বের স্তায়
কক্ষবহেই উত্তর বলে।

বাইরে কে, কি হয়েছে? সন্ধ্যাবির কর্তব্য মেশা
থেকে পোনা পেল, এবং লক্ষবহেই সন্ধ্যাবির সন্ধ্যাবে এবে
এসে দাঁড়িল। একি, সন্ধ্যা যে, কি খবর? বামরপ
এখন কোথা থেকে রে, সন্ধ্যাবির বিদ্যুতের স্তায় লক্ষকেই
প্রাণ করতে লাগলো।

সন্ধ্যা বলে, তেরে বাড়ীর এই চাকর আমার বহাভার
হুপের চুপি চুপি উকি মেয়ে দেখছে। বহাটা খুলতেই
হেঁচি, চোরেব বস ভড়ি মেয়ে পাগিয়ে থাকে। আমার
বলে কিনা আমার কাছে এ বাড়ীর মেলাবের
টাকা পাওনা আছে, এ লব কি ব্যাপার তাই তোমার
কাছে বহাপাণা করতে এক ধরে এনেছি।

সন্ধ্যাবির বলে, টাকা? তা ত জানি না—

সৌরী লক্ষ্যে বলে উঠলো, আমার টাকা আপনি
নেব নি? সে টাকা কেবল দেখেন কবে? আমার

কিটকে মিরে পাগিয়ে এই বিবেশ বিজুঁয়ে খুঁত বাতান্বীত
যুখ পেড়ালে, আবার ঢাকাটাও কি মেবে বেধেন ?

সে কি কথা, আপনাতর ঢাকা আমি তবে নির্যেজি ?
এক পরসান আমি নিই নি ।

নির্যেজেন, নিশ্চয় নির্যেজেন, আমার অনেক ঢাকা
আপনি নির্যেজেন, গোবী সবেগে বখাওগুলো বলে জেলে
আতুলভাবে হাঁপাতে লাগলো ।

পাশের বাড়ী থেকে নীরোধবাবুর গলাব আওয়াজ
পাকড়া গেল, লক্ষণ—লক্ষণ ।

লক্ষণ এবং আরও হুতিনজনে এ বাড়ীর হাতাব একটু
দূরে দাঁড়িয়ে সামরপের বাগাণটা দেখছিল । বাবুর ডাক
তনে লক্ষণ ওদের বাড়ীর দিকে চলে গেল । এর দু'মিনিট
পরেই দূরত বা লক্ষণের কণ্ঠ থেকে কিছুটা শুনে কিবা এ
বাড়ীর হাংকাটাকিতে আকুই হয়ে নীরোধবাবু গলাব এ বাড়ীর
কাছাকাছি এসে খুব বেঁকে ডাক দিলে জিজ্ঞাসা করলেন,
বাগাণ কি শিবাবু, কি, হয়েছে কি ? কাছাকাছি এসে
সমীরকে বেয়েই বললেন, বা বে, এতদিন বিল বিহতের,
আজ বে দেখছি মিত্রপ্রাপ্তি ।

কিন্তু নীরোধবাবুর পরিচালনে এটা কেউই কান দিলে
না । শিবাবু বললেন, ঢাকাকড়ির বাগাণ ত আমি
কিছুই জানি না, কিন্তু কই, এর আগে ত তুমি আবার
কিছুই বলনি ।

একটু থেমে বললে, সমীর—

একবার শিখো কথা, সমীর সত্যের কথাগুলো উজারণ
করলে । সামরপ বললে, নেহি বাবুজী, মাঝে মাঝে
সকলেই আমাকে বলেছে সমীর বাবুকে ভেঁকে আবার
ভক্ত । তবে বাড়ীটা বলেছিল সোমবার দুপুরে ডাকবার
অজ্ঞ, তা বাবুই আমাধাকে জোর করে বলে আনলে—

অতদিন চলে সন্ধ্যার এই ভাঙাভাঙির ব্যাপারে
কোন রকম কানই দিত না, কিন্তু আজ তার খ্যাচ করে
মনে গোল, সোমবার দুপুরে দেখা করতে চেষ্টা করার
কারণ কি ? একটু থেমে গভীর হয়ে সকলের সামনেই
সন্ধ্যার সমীরকে বললে, সমীর, তুমি মাঝে মাঝে দুপুর
বেলা আমার বাড়ী আস কেন বলত ?

সন্ধ্যারের প্রানে সমীর অবাক হয়ে গেল । সত্যও
এভাবে কথা কইতে জানে ! কিন্তু ইতস্ততঃ না করে

সমীর সত্যের উত্তর দিলে একদম নাগে কথা । তোমার
এখন থেকে জিনিষ নিতে চলে বাতাবার পর আমি আর
একদিনও এ বাড়ীর হাতাব মধ্যে ঢুকি নি ।

তবে কে আসে ? কার সিগারেটের টুকুয়া আমি খেয়ে
মধ্যে দেখতে পাই ? নিত্যন্ত খোকার হত রাগের কণ
সন্ধ্যার সকলের সামনেই এই প্রশ্নটা করে এলো ।

বাগাণটা নিত্যন্ত শুকনব আকাব ধারণ করছে দেখে
নীরোধবাবু শিবাবুকে ধমক দিয়ে এলেন, আপনি কি
পাগল হয়ে গেছেন শিবাবু, কি বলছেন একটু জেবে
হলুন । আপনাতর বুদ্ধি-ভক্তি সব লোপ পেয়ে গেছে ।

গোবী মনে মনে প্রাধব গুন্ডে । হালফিল নীরোধ-
বাবুকে দেখে সে হরম্মার আড়ালে চলে গেছে বটে, কিন্তু
উৎকণ্ঠ হয়ে গুন্ডে, বাঁধে রাগের আধার কে কি বলে
বলে ।

সন্ধ্যার হাতদুখ নেড়ে বললে, আপনাতা পাচমানে
আবার বুদ্ধিভক্তি সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছেন, তাই লোপ
পেয়ে যাচ্ছে । এইত কাল মকালে আমি বাগাণ করে
ফোঁস সময় আপনাতর ছেলে প্রবোধও আমাকে আমার
বাড়ীর কত কুন্সো খোঁসালে, বললে, এ সব কথা সবাই
জানেন—

প্রবোধ ? নীরোধবাবু গর্জন করে উঠলেন, তার
এতদূর সন্দেহ যে, এইটুকু বলেই নীরোধবাবু চুপ করে
গেলেন । শেষে অসুট কর্তে বললেন, ছিঃ

সমীরেরও মাথা আজ বিকৃতপ্রায় । সে বললে,
প্রবোধ, প্রবোধ এই কথা বলছে তোমাকে ? আর
সেদিন দুপুরে আমি বসকে দেখছি প্রবোধকে এই বাড়ী
থেকে বেড়াতে ।

এই বাড়ী থেকে ? দুপুরে ? নীরোধবাবু গর্জন
করে প্রশ্ন করলেন ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমীর সঙ্গে উত্তর দিলে । একটু
পেয়ে বললে, কেন আপনাতর ডাকব লক্ষণকে জিজ্ঞাসা
করুন, সেও জানে । সে সময় তাকেও আমি হাতাব
দেখেছি ।

নীরোধবাবু ঝাড় হেঁট করে নিজেব বাসাব দিকে পা
বাড়ালেন । একটু দূরেই লক্ষণ দাঁড়িয়েছিল । সে এবেব
সময়ই গুন্ডে । নীরোধবাবু তাকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা

না করে সংগে পা বাড়ালেন। তাঁর কোন সংস্কারই আর নেই। প্রবোধ কেন যথো যথো ভগ্নের অঙ্গিন কামাট করে পালায়।

হঠাৎ প্রবোধ এতকম নিজের জানালা থেকে লম্বাই উঠল। গেলি গারে আলি পায়ে ভ্রুতগতি ঘেরিয়ে এসে বললে, 'আপনি শুধু না বাবা, আমারই নাম যখন—'

তোমার যুবধর্ষন করতে চাই না, তুমি কৃপাকার, তুমি আমার ভক্তাপুত্র, তুমি এতদিন আমার বাড়ী থেকে দূর হও, নীতোরবাসু চাপা পলার কথা এখানে উচ্চারণ করলেন। তাঁর চোখে দুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

কিন্তু এতকম প্রবোধের ভর পেলে না। আর সে হঠাৎ হঠে গেল। বললে, 'আপনি আমার যা ইচ্ছে পাতি হবে, কিন্তু আমার কথাটা শুনে নেন—'

যা শুনেছি, তাই বলেছি, এর ভগ্নের আর কিছু শুনে চাই না, নীতোরবাসু পূর্ববৎ বাড়ীর বিকে এগোতে লাগলেন।

প্রবোধ শিতার সঙ্গে গেল না। বৎ সন্ধ্যার বিকে এগিয়ে এসে অস্বাভাবিক ভাবে দিয়ে প্রশ্ন করলে, 'আপনি কি আমার দেখেছেন, এই বাড়ীর ভেতর থেকে বেরুতে, না বাইরে জানালার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন?'

সন্ধ্যা দেখে গেল, বললে, 'হ্যাঁ, বাইরে জানালার দেখেছি।'

তাই বলুন, বাড়িয়ে বলবেন না। নীতোরবাসু বম্বে দাঁড়ালেন। প্রবোধ বললে, 'পাড়ার মধ্যে একটা বাড়ীতে অশাস্ত্র চুকলে সব বাড়ীতেই অশাস্ত্র আসতে পারে। আপনি সন্ধ্যার বাবু একটা কি নিয়ে ঘর করছেন। সেই দেখাযেছি এ বাড়ীর গিরা, যানে শিবগানু খ্রী ঐ চাকর বাহনকে নিয়ে প্রত্যেক ভগ্নের যা কাও করে, তা আর কতব্য নয়। বাবার বিকে দুখ ক্রিয়ের প্রবোধ বললে 'আপনার বটমাকে হিজালা করুন সে আর তাঁর ভরি চুকলে এ বাড়ীতে ভগ্নের বেড়াতে এসে তাৎপর্য করতে তারা কি দেখে গেছে তাই বলুক। তারা আরই দকালে হরিদ্বার থেকে ফিরেছে, তাদের বাবার এখনও হরিদ্বারের বল রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলবে না।'

নীতোরবাসু এগিয়ে এসে বললেন, 'তের বাড়ীতে যাব যা ইচ্ছে সে তাই করবে, তা বলে তুমি ভগ্নের অঙ্গিন কামাই করে এ বাড়ীর জানালার আঁড়ি লাগতে আগ কেন?'

আমার অপসার হয়েছি বীকার কতি, কিন্তু আমি আপনায় বটমার কাছে সব কথা শুনে খটকে দেখতে

এসেছিলাম কথাটা কতখান সত্য। এ ছাড়া আর কোন অলম্বের আশার ছিল না।

কপাল পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে ঢেকে অস্ত্রের গভীর মৃত্যুতে বটমার কাছে যেভাবে এসে গৌরী। বৃদ্ধ বিপর্যস্ত হতভম্ব সন্ধ্যারিকে ডেকে মূলকর্তে গৌরী বেশ চীৎকার করেই বললে, 'তুমি চলে এস। তোমার বন্ধু সন্ধ্যার একটা কি নিয়ে যে কাও করেছে, দেখে লক্ষ্য দেখে অসমর্থ চাপা দেওয়ায় বটমার লক্ষ্যে মিলে যখন পাতিয়ে আমারের সূচনা ঘটনা করতে এসেছে। ওটা কতখান মত খেউ খেউ করুক, তুমি চলে এসো।'

যেই আমার বোনের মতন, ভগ্নগান মাকো, তাঁর সঙ্গে অস্ত্র কোন লম্বাই আমার নেই, কথাগুলো সন্ধ্যার সন্ধ্যার উচ্চারণ করলে।

ওপর বোনের গল্প অস্ত্র বললেন, যখন গৌরী হাঁপা এগিয়ে এসে সন্ধ্যারিকে হাত ধরে মোর করে টেনে নিয়ে গেল। নীতোরবাসু প্রবোধকে ডেকে নিয়ে নিজের বাড়ীর বিকে চলেতে বুক করে 'বলেন। সন্ধ্যার প্রবোধ উত্তেজিত হ'য় গৌরীর টপকনে চীৎকার করে বললে, 'পাতানো ভাই-বোনের লম্বাই কত গম্ভীর হয়ে পারে, তা যেখান পারের তলার বলে তোমরা শিখে আসতে পারো, এইটুকু বলছি যে হন হন করে নিজের বাবার বিকে বটমার মিলে: 'আর যেচোটা বাহন চূর্ণ করে দাঁড়িয়ে বইলো।' আশ-পাশের সমস্ত বাড়ীর জানালার অসংখ্য কৌতুকলা চোখ। হরিদ্বারের বামারে পাড়ার ছেলেবাবা সব ধরে কাছেই ছিল, তারা এতকম বিকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। এ সকলের প্রাণ অধিকার বাড়ীতেই চাকর আছে, তারা বৃদ্ধ বৃদ্ধে মটলা পাড়াছিল। বটমারের দুখ নাচকরা যে ঘর বাড়ীতে চলে গেলে ঐ চাকরদেরই যথো হ'য় করন এগিয়ে এসে বাহনকে ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু কিন্তু করে লম্বাই তার কানে কানে হিজালা করতে লাগলো, 'কি হয়েছে যে, কি ব্যাপার, বাবুদের বাড়ীর লম্বা ব্যাপার কি? ওপাশের গুলমটী বাড়ীর গিরা বাংলা ভাষায় বিলুপিত যাকো না, সেও তাঁর কর্তব্য হিজালা করলে, কি হয়েছে, ব্যাপার কি?'

কর্তা বললেন, ও সব বাক্যলো লোকদের বিলুপী। চাকরগুলো ততক্ষণে নিবোধের আজ্ঞায় বলে দিচ্ছি 'কতক কতক বলতে লাগলো, বাক্যলো লোক এইগাই যায়।

(তৃত্বনঃ)

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্রীমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাগৈতিহাসিক কালেই বাংলা দেশে পূর্ব পূর্ব সভ্যতার চিহ্ন ভিন্ন নগণ্যঃঃ আবির্ভাব হয়, ঐতিহাসিক কালে অল্পত আবার তিনটি নগণ্যঃঃ আবির্ভাব তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্বাভাবিক কাল থেকে নৈগোলিক বাংলা দেশে আবির্ভূত এই গোটগুলির মধ্যে সামান্য নামোল্লখ-মাত্র করা হবে। আবারের ওজন্য বিধর সহজবোধ্য করার জন্যে এই বঙ্গোত্তর আগোল্লখ প্রয়োজন হবে।

কত হাজার বছর আগে তা কেউ জানে না, সম্ভবত কোন দিন জানতে পারবেও না, বাংলা দেশে অতি প্রাচীন কালে সূর্য্যকর এক যোগ কক্ষণ জাতির বসতি ছিল ধারা একেবারে বর্ষ ও অসম্ভা বঙ্গল অসুজিত হবে না। নৃত্যবিক পতিভাষা অসুগার এবং সূর্য্যকর নিগ্ৰো বা নিগ্ৰোয়টু অর্থাৎ বাজা নিগ্ৰো কিংবা নেগ্রিটো বা নেগ্রিটো বলা যায়। এদের নিগ্ৰোদের মতো ঘন কালো শরীর হয়, কৌকড়ানো কালো চুল, বঁধা নাক, পুচ্ছ উলটোনো ঠোঁট, সবই ছিল। এরা বঙ্গ বেঁচে বন-বাঘাড়ে, পাখাড়-জঙ্গলে, গিড়িগুহার কিংবা সমতলভূমিতে মাচা বেঁচে বাস করত। গ্রামীণ বা নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে এদের কোন বন্ধন পরিচয় ছিল না। এই জাতি আদিম নামঃঃ গোল্লির চেয়ে অতি সামান্তভাবে উন্নত ছিল। এদের বর্তমান যুগেররা সিংহলে ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে অতি অল্প লংঘার আজও টিকে আছে বলে অসুমান করা হয়। কিন্তু বাংলা দেশে এদের বস্ত্র অস্ত্রের কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তবে অল্প জাতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর এদের মিল অস্ত্র কোন কোন প্রেই বা স্তরের বাঙালির দেহদর্শনে এখনও টের পাওয়া যায়, এই পর্যন্ত। বাঙালিদের মধ্যে কৃত্তিকেশ লোক যেখা যায় বলেই

যে বাঙালির মধ্যে নিগ্ৰো জাতির রক্ত আছে মনে করা হয়, তা নয়। অল্প সব বংশধর দেখেই তা সাব্যস্ত করা হয়। প্রথমক্রমে বলা যেতে পারে যে বাঙালি নগন্যঃঃ কৃত্তিক সূর্য্যকর কিংবা নিগ্ৰোদের পশ্চ-কৃত্তিক কেশ ঘোটেই এক জাতের নয়।

নেগ্রিটোদের পূর্ব এদেশে প্রকৃত্তিক জাতির অঙ্গমন ঘটে। একটি মাত্র পক্ষ ছাড়া নেগ্রিটোরা তাগেও ভাষার কোন বস্ত্র অস্ত্র দেখে যায় নি। নিগ্ৰোয়টু এবং অস্ত্রিকদের পূর্ব-আগা আর্থেইয়েড জাতিগুলির কোন ভাষাগত অস্ত্র আও-আও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল বাঙালির দেহদর্শন এবং সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পরিণমিত ভারতীয় জনগোষ্ঠির সাধারণ বিন্ধবের দ্বারা থেকে ধরে নেওয়া হয় যে, এদেশে অস্ত্রিকরা আসার পরে আর্থেইয়েড জাতির লোকেরা বাস করেছিল।

প্রকৃত্তিক বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা প্রাচীন যে অস্ত্রিক জাতি বাংলা দেশে এগেছিল, তারা যেমন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এগে থাকতে পারে, তেমনই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পার হয়েও এগে থাকা সম্ভবপর। খানিগ্ৰোদের মধ্যে মনে হয়, বাংলা দেশে অস্ত্রিক বা তার শাখা অস্ট্রো-এশীয়দের উত্তরপূর্ব দিক থেকে প্রবেশ করা অসম্ভব নয়। পলিনেশিয়া থেকে খানিগ্ৰোদের ও স্যামবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত অস্ত্রিক ভাষাগোষ্ঠির লোকদের ভাষ্যভবে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পূর্বে প্রবেশ না করে বং প্রবেশ। থেকে আগা বেশ সম্ভবপর।

নেগ্রিটোরা পূর্বে কিংবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পূর্বে ভারতবর্ষে তথা বাংলা দেশে প্রবেশ করে থাকবে।

আর্যেন্দ্রোত্তর ও বঙ্গদেশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দ্বিধে
ভাষিত ও বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

নিগ্রোবট বা নেগ্রোভা জাতির লোকেরা কৃষিকার্য
বা পশুপালনও জানিত না। তারা শিকার করে, বনজ
ফলমূল খেয়ে জীবন যাপন করত। সম্ভবত তারা প্রা-
কৃত্তর যুগে বাংলা দেশে বাস করত এবং সংস্কার পূর্ব
কর ছিল। অস্তিকর্য বাংলা দেশের প্রথম সভ্য জাতি
বলা যায়। এরা বাংলা দেশে প্রথম গ্রামীণ সভ্যতার
পত্তন করে। এরা কৃষ্টির নির্মাণ করে বনবস্ত্রভাবে গ্রামে
বাস করত; কৃষিকার্য ও পশুপালন, ঘুটোই এরা বাংলাদেশে
মুদ্রাভিহিত করে। এরা আর্যের হতে গো-পালক জাতি
না হলেও মোবগ, বৃহুণ, হাতী ইত্যাদি ক্রম পুণ্ডে
এদের ভালো লাগত। এরা বিশ্বাস করত যে, রাজহ
মারা বাঘের পর তার স্বাস্থ্য কেবল নিকট আত্মীয়দের
মধ্যে নয়, পুণ্ডপালিত জীবন্তদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়।
হুনীতিবাহুর মতে, নেগ্রোভা ভাষা থেকে একসময় “বাহু”
শব্দটি বাংলা ভাষা এসেছে। কিন্তু অস্তিক ভাষার বহু
শব্দ আজও বাংলা ভাষায় তে বটেই, বাংলা দেশের
হানুমানের নামের মধ্যে নিগ্রোভের অস্তিক অক্ষর রাখতে
পেয়েছে। “বৃহুণি,” “বল্লি,” “বল্লুই,” “পল্লি,”
“বল্লু” ইত্যাদি গ্রামের নামে অস্তিক ভাষার চিহ্ন এখনও
বর্তমান। বাঙালি জাতির একটি বহু উপাধান যে অস্তিক,
একথা অস্বীকার করা যায় না। সেই উপাধান তার
বহিরসে শৌনিক বাহার হতে, সম্ভবত অস্তিক ভাষা-
জীবনে তার চেয়েও বেশি প্রকট। কেবল হানুনের
নামকরণে, গ্রামীণ সভ্যতার পত্তনে ও বৈদগ্ধ্যে নয়,
বাঙালির হানুজীবনে তার ও সংস্কাররূপেও অস্তিক বাঙালি
প্রভাব রেখে গেছে।

পরবর্তী কালে অস্তিক জাতির আক্রমণে এরা
বাঙ্গালি-আর্যেরা পাহাড় পূর্ব দিকে এবং সীমান্ত
পরগণা ও ছোটনাগপুরের পাহাড়-জঙ্গলে পশ্চিম দিকে
লুপ্ত হলেও এদের প্রভাব অনেক দূর ও শ্রেণীর বাঙালির
দেহে ও মনে অক্ষর হয়ে বর্তমান আছে। বাংলা দেশের
আত্মিকতা হবার পর এরা বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যমে অনেককেই
বিশাল হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে যায় বটে, কিন্তু
উৎসাহিত ও পল্লিভুক্ত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কিছু

অস্তিক শোণিত বিস্তারন বাক্য খুব সম্ভব। অস্তিক
ও পল্লি হিন্দু লোকের অনাধা, এবং কল্পনা করা কোন
আধৌনিক, দৈ-কথা আগে অসংগত করা হয়েছে।
কিন্তু কিছু লোককে যে অসংগত করে ও পল্লিভুক্ত
হতে বাধ্য করা হয়েছিল তার কারণ, তাদের মধ্যে
পুণ্ডিত অনাধার শোণিত ছিল, এমন সম্ভব করা হয়।
যেহে হাই হোক, অস্তিকভাবী এলাকার পরিচিত আধৌনিক
অস্তিকের উৎসাহিত নিম্ন বর্ণের লোকদের মনে অস্তিক
সমাজের প্রাধান্য বিশ্বাসোদ্ভূত।

অস্তিক ও নেগ্রোভা বা নেগ্রোভা মিশে গিয়ে অস্তিক-
বর্ণ কিছু সীমান্তের সীমান্ত জাতির উদ্ভব, এমন মনে
করা যায়। নেগ্রোভাদের হতে অস্তিক না হলেও
অস্তিকরা ক্রমশঃ ছিল, একবার ঠিক। ক্রম নিগ্রোভের
চুল ছিল বেড়ার লোকের হতে, ক্রমশঃ, কিন্তু
অস্তিকের চুল লোকদের ক্রমশঃ নয়। নেগ্রো-
ভাদের কপাল অস্তিকের কপাল ছিল; অস্তিকের কপাল
দীর্ঘ, যদিও নাক চ্যাপট; অস্তিকের ঠোঁট পুরু নয়;
মোটের ওপর অস্তিকরা নিগ্রোভাদের চেয়ে অনেক বেশি
মুগ্ধ ছিল।

অস্তিকের চাপে নেগ্রোভা হতে-পাহাড় গিয়ে
আর্যের মত এবং ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে অস্তিক হয়। এর পরে
আর্যেন্দ্রোত্তর ও ব্রাহ্মণের আগমন লক্ষ্য করা যায়।
হুনীতিবাহুর মতে, ও-হুটি জাতি মিশিত হবার পর এক মিশ্র
জাতিরূপে তার প্রবেশ করে। আর্যেন্দ্রোত্তর পশ্চিম
দেশে হাইনদের ব্রহ্ম-কপাল জাতি; ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-কপাল-
উপকুলের ব্রহ্ম-কপাল জাতি; এই দুটি জাতিই আর্যের
হতে উদ্ভব, ব্রহ্ম বা দৌরকাতি ছিল না, ব্রহ্ম কালো
ছিল বলতে হয়। ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিহিন্দু আর্যেন্দ্রোত্তর
বাংলাদেশে অস্তিকের হাটের দের বটে, কিন্তু পরে
নিগ্রোভাও বিভিন্ন আধৌনিকের চাপে পশ্চিমে রাজহল
পাহাড় ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলের দিকে সরে যায়।
বাংলাদেশে রাজহল পাহাড়সমিহিত এলাকার হানুজ
জাতি ছাড়া ব্রাহ্মি জাতির কোন অস্তিক নেই। এতক
বেশে অস্তিকের চেয়েও ব্রাহ্মিহিন্দুর অবস্থা বেশি
শোচনীয়। ব্রাহ্মিহিন্দু বেশি ভাগ হিন্দু-পশ্চিমে উদ্ভিয়ার
পরগণায় অস্তিক হয়ে যায়। এক পরবে উদ্ভিয়ার ও বাংলার

ভাষা এক ছিল; সেই এক আদিভাষা ও আদিভাষীদের চাপে প্রাবৃত্তা উদ্ভিগার হৃদয়ে ও নৃত্যেই রয়ে যায়।

প্রাবৃত্তা ভাষ্যের অন্তর যেরূপ, বাংলাদেশেও তেমনি সামগ্রিক সভ্যতা প্রচুর। ক'রে থাকতে পারে। প্রাবৃত্তা অগ্রিকবেগ চেয়েও বেশি সভ্য, স্থানিত ও সাহিত্যাত্মক জাতি ছিল। ভক্তিবর্ষের উদ্ভাবক এরা বাংলাদেশের জনমানসে একটা স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। উত্তরকালে ঐতিহাসিক যুগেও প্রবৃত্তি ভাষ্যগোষ্ঠীর অঙ্গভূক্ত অঙ্গ থেকে আসন্ন কান্নাঝি রাজবংশ ও তাদের নৈমজ্জারিনী বাংলাদেশে সভ্যতাব্যাপী প্রভু ক'রে গেছে। বাংলা ভাষায় প্রাবৃত্তি প্রভাব হুশি।

নেত্রিটা, অগ্রিক, অর্ধেন্দ্র ও প্রাবৃত্তি পর বাংলা দেশে অন্তঃস্থ দুই দ্বারের অন্তর দুই দ্বারের ভাষ্য-ইউরোপীয় ভাষ্যগোষ্ঠীর লোক বা দুই আদি-বঙ্গের আগমন লক্ষ্য করা যায়। দুই-প্রাণী আদিদের মধ্যে নৃত্তিক আদি বাংলাদেশে বৈশিষ্ট্যবাহ্য আদেশ, তিন্ত একগারেই আসেনি, তা নয়। ঐতিহাসিক কালেও বাংলাদেশে কান্নকৃত থেকে যে পাঁচজন। প্রাণ্য এসেছিলেন, ওয়া নৃত্তিক আদিদের কণেশকৃত হওয়া অনন্তব নয়।

প্রাণিকৃত্যাসিক কালে ভাষ্যের উদ্ভাবন নৃত্তিক আদিরা বসতি স্থান করলেও বাংলা দেশে তারা বেশি সংখ্যক হয় নি তার প্রমাণ আছে। সিদ্ধ নয় থেকে পণ্ডক, শোন ও পণ্য-ভাণ্ডারীরা পণ্ডক পণ্ডক এবং হিমালয় থেকে বিজ্ঞা পণ্ডকমানা পণ্ডক বিজ্ঞা এলাকার নৃত্তিক আদিরা মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের আগেই প্রাণ্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। বর্তমানের আক্ষণানিমান পাণ্ডুকনিমান ও বাসুঁতিমানের ইরানীয় আদিদের কথা বাদ দিলেও কান্না, পাণ্ডা, রাজস্থান, দিল্লি বা হিন্দিস্থান—এই অঙ্গলগণিতে বিশেষভাবে এবং সিদ্ধ, কোপল, মগর ও মিথিলার কিছু পরিমাণে নৃত্তিক বা উত্তরদেশীয় আদিদের বসতি স্থাপিত হয়। এই আদিরা বহাবর বিশেষভাবে জাত্যতিমান। বাংলাদেশে যাওয়া এরা পছন্দ করতেন না। তার কারণ ভারতের বৈদিক আদিদের একটি শাখা সেখানে গিয়ে আদি আচার থেকে দূরে হয়ে তাদের ধারণা অঙ্গলগণে বিশেষগামী হয়ে একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। তার

পর থেকে কোন কারণে বাংলা দেশে গেলে উত্তরদেশীয় আদিদের জাতি নাম হবার ভয় থাকত।

অন্ত যে একটি আদিবঙ্গ ভাষ্যতে আদির পর বাংলা দেশে প্রবেশ করে, তারা আঙ্গুণীয় আদি ব'লে অভিহিত। এরা উত্তরদেশীয় আদিদের আগেও ভারতে এল থাকতে পারে। ভারতে আগের আগেই আদিদেরও প্রাবৃত্তিদের যতো উত্তরদেশীয় আদি ও আঙ্গুণীয় আদি পরাম্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক পরিমাণে মিশ্রিত হতেও থাকতে পারে, উত্তর দেশীয় আদিদের সঙ্গে এইমুখামুখিভাবে আঙ্গুণীয় আদিদের আকৃতিতে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। ভারতে গুজরাত, মহারাষ্ট্র, বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম ও মিজোরে বিশেষভাবে এক সিদ্ধ, কোপল, মগর ও মিথিলার অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে আঙ্গুণীয় আদিদের বসতি বিস্তৃত হয়। প্রকৃত্তি প্রাণ্যের বৈশিষ্ট্যগুণ পণ্ডকনি তার মহাভাষ্যে নির্দেশ করেছেন, তা অঙ্গাঙ্গভাবে উত্তরদেশীয় আদিদের চিনিতে হয়। দীর্ঘকায়, শেতর্ণ বা কথিত-কাজনকাজি, বর্ণকেশ, নীল বা হরিবর্ণ চক্ষুভাংকা, কল্প-কল্যাণা, উচ্চ ললাটবিশিষ্ট এই আদিদের দলল জাতি-নেত্রী আদিগোষ্ঠী বা ইন্দ-জাতি জাতিদের জাতিভায়ে, তাতে লক্ষ্য নেই। আঙ্গুণীয় পণ্ডকমানার সমিহিত এলাকার আদিরা মহাভাষ্যে, ককতাও চক্ষুবিশিষ্ট, কককেশ, কককপাল ও অপেক্ষাকৃত মিকপাল, ইন্দ-ককাক বা হালকা বাহানি চকোর জাতি ছিল। এরা যুগতঃ আদিভাষী নয় ব'লে যাদের লক্ষ্য হয়, তাদের মনে রাখা উচিত যে, আঙ্গুণীয় আদিরা ইউরোপে এই আকৃতির লোকদের সংখ্যা-পরিষ্ঠতা অব্যাহত। উত্তর ইউরোপ ও দক্ষিণ ইউরোপে যথাক্রমে উত্তরদেশীয় ও আঙ্গুণীয় আদিদের দুইটি নৃত্তাত্মিক জাতি বিভাগ আঙ্গুণীয় ল্পি চোখে পড়ে। ভাষ্যের বিচারে আঙ্গুণীয় আদিরা নৃত্তিক আদিদের চেয়ে উন্নত বললে ভুল হবে না।

উত্তরদেশীয় আদিদের আগে বা পরে আঙ্গুণীয় আদিরা বহু সংখ্যক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। প্রাণ্যদের প্রচুরিত উপপত্তি সভ্য হলে মানতে হয় যে, আসে আঙ্গুণীয় আদিরা ভারতে অঙ্গাঙ্গিক হবার পর "মহাভারত" ভারতীয়-আদিভাষী নৃত্তিক আদিরা ভারতে এসে "মহাভারত" ভারতীয়-আদিভাষী আঙ্গুণীয় আদিদের বিভিন্ন প্রাঙ্গণ্যের

যেতে বাধা করে। গ্রিয়ার্সনের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলে একথাও ঠিক যে, হুগ্‌ল্যান্ডের যত্নপাতার কাল থেকে ইতিমধ্যেই পূর্বপুরুষদের সঙ্গে অধিনী সার্বভৌম-আধিপত্যীয় পূর্ব-পুরুষের অতি উৎকট জড়িতের চ'লে আশঙ্কিত হ'লে অথবা তাতেও একটি মাত্র ভাতি ন'ড়ে ওঠার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই।

আলপীয়া আধিপত্যের চৌর্য প্রাণিত্যাদিত পৌরাণিক কালেই বাংলাদেশে আধিপত্যীয় ভাতি আধিপত্যসহ হুগ্‌ল্যান্ডিত হ'য়ে যায়। এখানে আসার পর আলপাইন আধিপত্য নিগ্রোবটু, হাফিগ বা নিগ্রো বা অষ্ট্রিক, আয়ান-আফ্রিতি বা আর্দেনয়েড, ব্রিটিজ বা হান এবং বৈদিক-আধিপত্যীয় বজ্রাধিপত্যের অধিকৃত উত্তরদেশীয় আধিপত্যের সঙ্গে খোলাসুনিভাবে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত হয়। তারা তাদের ব্যবস্থা ভাবতীয়-আধিপত্যের বৈদিক উচ্চারণ পদ্ধতি ও পদবিন্যাস প্রকরণ আনুল ব'লে ফেলে নিজস্ব ভাতি উচ্চারণপদ্ধতি ও পদবিন্যাস প্রকরণ প্রদর্শিত করে। একথাও যেনে করা চলে যে, তারা বৈদিক আচার ত'গি ক'রে উত্তরবর্ষ বা উদ্ভাচার গ্রহণ করেছিল। এর ফলে বৈদিক কথিত্য অত্যন্ত বিকৃত হ'ন এবং যেন-নব ভাতি তাঁদের কথা না শুনে চলার ভুলে আগে তাদের থাকলেও পরে নষ্ট হয়ে গেছে ব'লে যেনে করতেন, তাদের ভাষিকার বাঙালি আধিপত্যের নাম জুড়ে যেন।

ঐতরেয় আরণ্যকে আমরা প্রথম বাঙালি ভাতির নাম উল্লিখিত দেখছি। বিজ্ঞানবিধির মতে, এই গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব ঊনবিংশ শতকের রচনা। কপিল মূনি, সপ্তম যজ্ঞের সজ্ঞানসম্মত এবং ভগীরথের কাদিনী থেকে যোঝা যায় যে, বাংলাদেশে আধিপত্যীয় প্রচুর না হোক, আধিপত্যীয় পূর্বপুরুষ-বড়বিয়ে শতকের দিকে নিশ্চয় ছিল। কপিল মূনি যে নাস্তিক ছিলেন, সেও লক্ষ্য করা য'ব'। তিনি বাঙালি আধিপত্য এবং নাস্তিক শিরোনাম ব'লে বজ্রাচার্য বৈদিক আধিপত্যের বিগ্রাস্তাঙ্গন হ'বেন, এটা বাঙালিক। বাঙালি ভাতি নষ্ট হ'য়ে পাখিগণব্যাধ হ'য়ে গেছে—একবার অর্ধ এই যে, আগে তারা নষ্ট ছিল না এবং একথা তারা বিতর্কিত আধিপত্য আধিপত্যীয় ছিল।

*গ্রন্থ দ্বা তিস্রঃ অন্ত্যায়বীম্বিতি বা বৈ ত্রা ইয়াঃ প্রমাজিয়াঃ অন্ত্যায়মারজোমীমানি যজ্ঞানি বজ্রা বগপাশ্চৈত-

পাঠাঃ। ঐতরেয় আরণ্যকেও এই আলোচ্য উক্তি থেকে আচরণের মূল্যবান মেনে এটো দৃষ্টিপূর্ণ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন :—

(১) তিনটি ভাতি—বল, বগ্ন এবং চৈত্রপাথ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল; বৈ অর্ধ এই যোগ্যেণ এয়া অর্ধগণব্যাধেণ অন্ত্যুক্ত এবং বৈদিক আচারের অধুগত আধিপত্যিতরূপে বিতর্কিত অধিবসনশর ছিল, কিন্তু পরে ঐ বিতর্কিত নষ্ট হ'য়ে যায়। এটা প্রথমবারের অনার্য ভাতি হ'য়ে থাকলে এতদ্বারা নষ্ট হ'য়ে যাওয়াই প্রায় উচিত নয় এবং তা নিয়ে আধিপত্য বৈদিক ভাতি হ'য়ে যাবে না। “নষ্ট” হ'লে অর্ধে বিলুপ্তি ধরা চলে না, কারণ, বনীয়তা বিলুপ্ত হ'য়ে নি। “নষ্ট” অর্থে মিল বা ক'লুপিত ধরা সম্ভব।

(২) এই ভাতি তিনটি “পক্ষী” অর্থাৎ পান্ডিত্য মতো যাবাবর বা অবাক্তারী বা পক্ষিগণের চিত্রধারী; আধিপত্য অনার্য বিভিন্ন ভাতিতে মনুষ্যত্বের ক্ষীণতায় রূপনা করতেন; তাঁদের সে-প্রবণতার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। বাঙালি ভাতি একে তো “নষ্ট,” তার ওপর আবার “পক্ষী”! এ থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক আধিপত্যের মতে এটা মিল ভাতি এবং পান্ডিত্য মতো অনাক্তারী হ'য়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ বাঙালি আধিপত্য ভাতির বিতর্কিত এবং আধিপত্যের উচ্চারণপদ্ধতি সূক্ষ্ম ও বিধিবিধান লক্ষ্য করে বৈদিক আধিপত্যের অত্মস্বত্ব হার্য থেকে ভিন্ন পথে চলেছিলেন। বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ধতি উত্তরাধিপত্যের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এটা লক্ষ্যীয়, উত্তরাধিপত্যের ভাবতীয়-আধিপত্যীয় বাঙালির আধিপত্যের পদ্ধতি ও কথাবারত'গি ব'লে বজ্রাচার্য পান্ডিত্য মতো কলকাকলি করা ব'লে উপহাসের গোখে দেখে থাকে। এটাও লক্ষ্য করা গেছে, যানগিহে যোগ্যে বাঙালি জু'ই'হ'কে ব্যক্ত ক'রে যে-চরমপন্থা দিয়েছিলেন তাতেও “ত্রিপুর-বগ্ন-বত'গ্নী”-র ভাষাকে “কাংকুলিগাকালী” ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। ইত্যং “পক্ষী” অর্থে বৈদিক ভাতির উচ্চারণ পদ্ধতি লক্ষ্যন ক'রে বাংলাদেশের নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি অবলম্বনকারী পান্ডিত্য মতো কলকাকলি করা অবাক্তারী মিল বাঙালি ভাতিতে কটাক্ষ করার সময়ে ঐতরেয় আরণ্যকের বৈদিক ভাতি বাঙালি “টোটেটু” বা যাবাবরকে উত্তরা লক্ষ্য করেন নি, বরং করেছেন

তার পাবির মতে: কিতিং-বিচির ক'রে কথা বলাকে, এটা বলা ব্যাখ্যাসম্মত। বাহ্যিক ছিল প্রতিটি আর্থবঙ্গই, একা বঙ্গ বা মতে ভিন্নটি নই জাতি নয়। হুতরাং পক্ষী অর্থে পাবির মতো বলাস্তত্ব বী হুতাই ঠিক। অবশ্যই বঙ্গজাতি ভৌগোলিক বাসোপেক্ষে উপনিবর্তি হবার আগে পৃথক বাহ্যিক ছিল; তাহা পাবির "ওয়েটেম্" বা পাবি পুঙ্খবল্লভে কবিত: কোম পাবির চিহ্ন ধারণ করত, এটোও সে-ধৃং খুব সদৃশপর। কিন্তু এই-জনটি নই জাতিতে মিশ্রণভাত উচ্চারণ বিস্তৃতিে জ-ই যে মুখ্যত "পাবি" ব'লে ঘেহ করা হুতাহে, তাতে সন্দেহ নেই।

হুতাহাবাবু মতে, বাহ্যিক বঙ্গ জাতি ক্রমশ হুটে গিয়ে পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে। কিন্তু আর্থবঙ্গপণের ক্রমশত অভিন্নপ্রাণে ব'লে পূর্ব ভারতের দিকে আর্থভাষীয়েই যে প্রদান, তাকে অগ্রপতি বলাই সম্মত। বাঙালি আর্থবা উৎকৃষ্ট কৃষির মধ্যমে পূর্ব দিকে অগ্রগত হতে হুতে সম্মত-ব্রহ্ম ও ভারত-চীন দীর্ঘজীবের দুর্গম পর্বত ও অকল পর্বত অগম্যতির পর নিম্নত হয়। এই প্রাণগম্যীর বিস্তার-প্রদানকে "ওয়ে-বাওয়া" মনে করা বাঙালির প্রতি হুবিচার হবে না।

জাতির নামই জাতির বাদমানের নাম হয়ে থাকে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বঙ্গ জাতির বঙ্গকৃষি হিঙ্গনে বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিস্তারদুটো নাম হল বঙ্গ। এখন বঙ্গ অর্থে সমস্ত ভৌগোলিক বাসোপেক্ষে গোশালেও প্রাচীন ও বঙ্গা ধূগে বঙ্গ পূর্ববঙ্গ বা ঐবিভাগ দুটিকে গোহাত। বঙ্গ জাতি ঐ অকলে বসতি স্থাপনের পর বা পরামর্শিক কালে ভৌগোলিক বাসোপেক্ষে অজ্ঞাত বিস্তারে অত্র নব জাতির অবস্থিতির মঙ্গল পাওয়া যায়। ঐতবেই ব্রাহ্মণে রাহণাধি বিভাগ বা বহুপ্র-কৃষি অধিবাসী পুণ্ড্রের নামোচ্চের পাওয়া থাকে। বিভানিধির মতে, ঐতবেই ব্রাহ্মণের কাল-নির্ধার অসম্ভব; তবে, ঐ ব্রহ্ম ঈষ্টপূর্ব উনিশ শতকেও হওয়া সম্ভবপর। পুণ্ড্রজাতি অনার্থ ছিল অদ্ভু-পুলিন্দ-শব্দবহুর মতো। বর্তমানের মাদ্রাস জেলায় মালভোবা জেলের বংশের হুতেও পারে। তা হয়ে থাকলে পুণ্ড্রা ব্রাহ্মিক জাতিগোষ্ঠির লোক ছিল বলতে হয়। অথও বঙ্গের বা ইংরেজ আমলের বঙ্গ প্রেসিডেন্সির বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে ঢাক

ও ব্রহ্ম জাতির বসতি ছিল। অঙ্গ বা পূর্ব বিধায়ে অঙ্গ নামে আর এক জাতির বঙ্গ ছিল। উড়িষ্যার কলিঙ্গজাতির বঙ্গ ছিল। তাহের নামে বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের কিয়ৎপণের নাম ছিল কলিঙ্গ রাজ্য বা পরে অশোকের বাংলা বিদিত হয়। অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হুতাহ, কলিঙ্গ ও চাক জাতির বিলিত বঙ্গকৃষি মতে প্রাচীন বাসোভাষী জাতির উপস্থিতি হয় বহু নিশ্চয়ের ফলে। বাদশ শতাব্দীর পর এই বিলিত বঙ্গকৃষি থেকে ওড়িশা এবং শতাব্দী শতাব্দীর পর অলবিহা এলাকা বিচ্ছিন্ন হলে ভৌগোলিক বাসোপেক্ষের বর্তমান চৌহদ্দি ব্যাপ্ত করে একমাত্র বাসোভাষী জাতির অস্থি থাকে। বহুপ্র বা উত্তর-বঙ্গ এলাকার প্রথম আর্থগভাতা বিস্তারলাভ করে। এই এলাকাকে পৌড় বলা হত; পূর্ব বঙ্গ বাবে অবশিষ্ট সমস্ত পশ্চিম বঙ্গকে সাধারণভাবে পৌড় রাজ্য বলা হত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। বর্তমানের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যকে পৌড় বলা যেতে পারে।

বাঙালি জাতির বিস্তৃত আর্থ থেকে বিদ্যুতির সংবাহ ঈষ্টপূর্ব উনিশ শতকে পাওয়া গেল। তা হলে তখন নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, আর্নেমেড ও ব্রাহ্মিক, এই অনার্থ জাতিচক্রেয়ের সঙ্গে আল্পাইন ও নভিক দুই শ্রেণীর উপনিধি বাঙালি আর্থ বিস্ত্রিত হয়ে গেছে। একথা ভুলেও চলবে না যে, আমকের দশ কোটি বাঙালি বঙ্গ আর্থগো, তখন তাহা হুতু বর্গদত্ত সংঘেও হোটোমুটি আর্থজাতিই বটে। প্রকৃত অনার্থ জাতিগুলি আজও নিজেদের তাহা ও গোণিতের ব্যতন্ত্রা নিয়ে পুঙ্খ হয়ে আছে। পূর্ববীর কোথাও একটা প্রবল এবং বঙ্গব্যাংক লোকবিশিষ্ট জাতি পরতাবী হয়ে বাওয়ায় দৃষ্টান্ত নেই। বঙ্গব্যাংক নিকোবানি, সাওতাল, মালভো ইত্যাদি অস্ট্রিক ও ব্রাহ্মিক জাতিগুলি এই ক্রিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাক্ষেও নিজেদের তাহাপত্ত বাহুতা ও গোণিতবিশিষ্ট হোটোমুটি বঙ্গের ঘেধে চলছে অথচ প্রাচীনতাত্ত্বিক কালে অস্ট্রিক-ব্রাহ্মিকজাতি এই অনার্থ-অদ্বায়িত বাংলা বেশ দৃষ্টবোধ বিহা-গত উত্তরবঙ্গীয় ও আল্পাইন আর্থের কাছে কয়েকটা সাংঘরিক শব্দবহুর পর নিজেদের তাহা পরিভাগ ক'রে বিদ্যায় শত্রু। হুতুতাহা শব্দবলে প্রথম ক'রে বঙ্গ, একথা বহুপ্রজাতি ও হুতাহিধেরী আঙ্গলমান জানবীন

নব্যবেষে বিদ্যমান, এর অল্পকালে কোন বৃত্তি বা প্রমাণ নেই। আমেরিকার দাল হাউসেও একাধিক করেনি, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাও নয়। কেবল বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত লক্ষ্য হয়েছিল, তার কোন তাৎপাত প্রমাণ নেই।

বাংলা দেশের বোম্ব ভাগ আদিবাসীকে আর্ধ্য হলে কহা সম্ভব, তবে তারা বিতর্ক আর্ধ্য নয়। একটু মালিতি, কয়েক পুরুষ ন'রে কত, তথাকথিত উচ্চ শ্রেণী (দনী নয়) বা "বড় বংশ" বা খানদানি হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান বাকাদিরাজেই ততটা আর্ধ্য, একজন আধুনিক গ্রিক বা বুলগার বতটা। অন্যতই এদেশ প্রকৃত শোণিত-মিশ্রণ ঘটেছে। আমেরিকার মতো এখানেও অনেক মূল্যভো, মেজিনো ও লামিনো বহনের বর্ণনকর সন্ধ্যাছে এবং বংশবৃদ্ধি করেছে। কিন্তু প্রাচ্যভাষালী নবগোষ্ঠী সর্ববাই আর্ধ্যবংশোদ্ভূত ছিল, একথা ভুলসে বাস্তবজ্ঞানের শোচনীয় অভাব। পরিচয় বেওয়া হবে। বাংলাভাষীরাও বেশির ভাগ আগে অনাৰ্ধ্যভাষী ছিল, তারা মাঝের চোটে বা টাকার সোতে আর্ধ্যভাষা গ্রহণ করেছে, এখন কোন ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। হুতায়্য বহি কেউ মনে করে যে, ঐ দুই কাণের স্রষ্টা ক'রে বাস্তবিক হিম্মি বা উচ্ছ্রাভাষী কহা যাবে, তা হলে সেই নির্বোধের প্রাতি অপনোমনে বেরি হবে না।

খিনি বাঙালী হয়ে পোলিশ মহিলা বিবাহ কবে-
ছিলেন সেই ভট্টর স্বিকার বোঝাল সিধেছেন :—

"আমার কোনো দেশ আছে কি না জানি না। ভারতীয় সংস্কৃতিক আমি প্রভা কহি, যদিও তার কোনো বিশব লজা আমার মনে এখনো রূপ গ্রহণ কবে নি। বাংলা ভাষাকে আমি ভালবাসি। কারও, তার আর্থ ও আত্মরিকতা আমার আবামা হুত করেছে। যদিও বন-বাসীজনের জাতীয় সম্মিশ্রণ এবং কাজি হতে ব্যক্তিগ বর্ণ ও বৃত্তিভাবির পার্থক্য আমার মনে অস্বাভি স্রষ্টা করে। একটি মিলিন আছে যার মাংসভো আমি বিশাল কহি তা এই বাংলা ভাষা। একথা হিন্দু বা মুসলমানের, এতে কতখানি সংস্কৃত আর ক হুটাক ক কাজা আরবি জানি মন বিশেষ আছে তার বিরূপ আমি কোনো দিন কহি নি। শুধু এইটুকু জানি, এই ভাষার দরদ,

দৃষ্টতা ও লাভ আমার মূহ করে। আমার কাছে সমস্ত ভাষার গ্রন্থ এই বাংলা ভাষা।"

(ক্লটটক'ম্প'ক.—পৃষ্ঠা—২২০।)

বহুদাসী জনের মধ্যে একাদিকবার যৌথবর্ণ ও তন্ত্র-চারেই প্রভায়ে বহুজাতিক সম্মিশ্রণ দাখিত হয়েছে, একথা ঠিক। কিন্তু তা হয়েছে সেই অল্পপাতে বে-অল্পপাতে হাফিন মুকুটাই নবাগত যেতকার ঔপ-নিবেশিকদের সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসী ব্রহ্মকার এবং বাস-রূপবহিঃগত কলকারণের সম্মিশ্রণ ঘটেছে। আমেরিকার যেতকারদের চাপে ব্রহ্মকাররা পাংড়ে-মললে যেমন ক্রমশ ন'রে গেছে ও থাকে, বাংলাদেশেও ঠিক সেই কাহে আর্ধ্যভাষীদের চাপে অস্ট্রিক ও হাবিড জাতিগুলি ন'রে গেছে, তার প্রমাণ এখনও পাওয়া থাকে।

বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর আর্ধ্য-উভয়ের পরেও তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক কালে খ্রীষ্টপূর্ব শেষে আর একটি নগণ্যগৌর আগমন বেঝা যায়। এরা চীন-তিব্বতীয়ভাষাগোষ্ঠীর লোক। এই শ্রেণীর বোড়ো উপভাষার লোকেরা ভারতের উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং তিব্বতি উপভাষার লোকেরা হুসু, লুংলু ও লামাথে উপনিবিষ্ট হত, একথা আগে বলা হয়েছে। নৃত্বের বিচারে এরা কোলয়েড বা মকোলাকার মানবগৌ, যদিও ভাষার এরা বোটেই মকোনীয়েব জাতি নয়। এরা ভারতীয়-আর্ধ্যভাষী মলে প্রাগ্রাচীন কাল থেকে কিম্বাত আখ্যার অভিহিত ছিল। এদের পীতাত বর্ণ ও খর্ব নামা সুপরিচিত। বাংলাদেশে প্রবেশের আগে এরা ভারতের হিমাচল-লম্বিহিত পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘকাল ব'রে উপনিবিষ্ট ছিল।

বাংলাদেশে বোড়োভাষী মকোলাভেতা সমতলভূমিতে পূব বেশি প্রসাধ লাভ ক:তে পারে নি কিন্তু হুচীন থেকে উত্তর-পূর্ব বক ও পন্ডিহ আলান সীমায় বরাবর একেবারে চট্টগ্রাম-ব্রহ্মবীয়ার পর্বত বিস্তৃত এলাকার সর্ববোড়োপোলিক বাংলাদেশের পূর্বসীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা ও ভূমণিহিত সমতলভূমিতে বোড়োভাষীরা খানিকটা প্রসাধলাভ করেছিল। এখনও হাফিদিং, কুচবিহার, ত্রিপুরা বা পার্বত্য ত্রিপুরা, কাছাড়, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম মকোলাভিতে বাংলাভাষী জনগণের পাশাপাশি বোড়ো

জাতীয় লোকসংস্পর্গে লেখা যায়। তা ছাড়া, গায়ে, লুপই বা মিঠো প্রভৃতি জাতিরা তো আছেই। চট্টগ্রাম-ব্রহ্মপুত্রসঙ্গমস্থিত আবাকান এলাকা থেকে বগ, জাতীয় বাব একথা ঐতিহাসিক কালেই হিন্দু ও হিন্দু-পূর্ব বকে উপস্থিত করে গেছে, সেই আভ্যন্তরীণ ও চীন-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর বর্মী উপশাখার লোক। নানা কারণে পূর্বতম বকের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বোড়ো উপশাখার লোক বর্মী উপশাখারও কিছু শোণিত মিশ্রণ হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে আর্মেনীয় বাঙালি বঙ্গোষ্ঠীর মধ্যে খুব বেশি বঙ্গোপসংস্পর্গে শোণিত প্রবেশ করেনি। বাংলাদেশের সমস্ত লুপইতে বাঙালি আর্মেনীয় প্রাচ্যত বহাবর অঙ্গুর ছিল বসতি স্থাপন ও তাবাসিত্যের দিক থেকে। অসমিয়া আর্মেনীয়ীরা আসামের সমস্ত লুপই বাবের পূর্ব দিকে অগ্রসর হবার সময়ে বোড়োজাতীয় অসামাজিকতার দিকে মিশে যাওয়ায় তাদের বসতি অসামাজিক হয়েছিল, বাঙালি আর্মেনীয় কোন সময়ে তা করেনি।

বাঙালি আর্মেনীয়দের মধ্যে ও মনে বর্ণবৈষম্যের প্রভাবের পশ্চিম দিকে অগ্রিক ও ত্রাবিক প্রভাব এবং পূর্ব দিকে বোড়ো ও বগ প্রভাব বেশ কিছু দেখা যায়। বিশেষতঃ বাংলা দেশের চট্টগ্রামের সমস্ত বর্মী অনাধ এলাকাজুতির পাশে যে-সব বাঙালি আর্মেনীয় বাস করে, তাদের কৃতিপ্রবৃত্তি ও জীবনসংগ্রামে সাপ্তাঙ্গালি, মাল, পুঁড়, কোচ, খাসিয়া, বগ প্রভৃতি অগ্রিক-ত্রাবিক-বোড়ো-বর্মী প্রভাব কিছু-কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, বাঙালি আর্মেনীয় বন কোটি জনসাধারণ দ্বারা অনাধমূল জাতি।

পাঁচটি অনাধ ও দুটি আর্মেনীয় জাতি বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করার পর আর্মেনীয় অনাধমূল বাঙালি জাতি বঙ্গোপসংস্পর্গে বৈষ্ণব-বিশ্বব্রাহ্ম জাতি বর্মে পরিণত হয়। এই বাঙালি জাতির গঠন বঙ্গোপসংস্পর্গে বৃদ্ধির আগেই হয়ে গেলেও এবং বঙ্গোপসংস্পর্গে লে-সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বর্মী। কিন্তু বাংলা ভাষার পূর্বপুরুষ ভারতীয়-আর্মেনীয় সেই প্রাচ্য উপশাখার আঞ্চলিক উদ্ভব তখন হয়ে গেছে যে-উপশাখা বৈষ্ণব আর্মেনীয় কাছে খাসিয়া ভাষার মতো অন্তত ও মিল প্রত্যক্ষমান হয়। ঐষ্টপূর্ব উনিশ থেকে গননো পাতকের

মধ্যে কিরাত বা বঙ্গোপসংস্পর্গে বাংলাদেশের চৌদ্দদিক মধ্য ও ধার-কাছে এসে গেছে বলে মনে করা চলে এই ক্ষেত্রে যে, বঙ্গোপসংস্পর্গে কিরাতদের পূর্ব উল্লেখ আছে।

প্রাচ্যঐতিহাসিক কালের ঐ পাতটি নংগোষ্ঠীকে আশ্চর্য করে আর্মেনীয় বাঙালি জাতির উদ্ভব হবার পর বাঙালিরা বেহের চেয়ে তাদের বেশি অগ্রগত ছিল বলে মনে হয়। বেশ থেকে দীর্ঘ পর্বত পর্বত বর্ষা-রোগে নিম্ন দেখা যায়। কিন্তু বাঙালির বৈষ্ণব বহাবর ঐ মিশ্রণের দিকে। কনি মতোপ্রমাণ হস্তের বচনায় দেখা যায় : পুঁড়-সামনে মনান আসনে চলে নিতে হয় হাড়িরও মতো। কনি জনসমাজের মধ্যে শোনা যায়, তিনি কোন হাড়ির মতোই প্রতি আলক ছিলেন। তাঁর নিজের বচনায় আছে :—

পূর্ব পাড়তে মন। ভোমের হাড়ি।

মন মন আইলে যায় ত্রাশ্ব বহু।

আর এ-সবের মূল চরিত্রের পাওয়া যায় দুটি স্ট্রী ইতি : এক, নগরের বাইরে ভোমের হাড়ি বৃদ্ধি করে ত্রাশ্ব ও মৃত্যুসময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দামোদা আশা-বাগ্য ছিল ; দুই, বাঙালিদের বহাব ছিল চতালী বা নবমজাতীয়া অর্থাৎ অগ্রিক কস্তারের গুণিহীন প্রবেশ করা। এর সঙ্গে আঞ্চলিক বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের সাপ্তাঙ্গালি বর্মী-প্রীতির ব্যাপারটা জুলাই করা যেতে পারে। এই ভাবেই ঐষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্বত বাংলাদেশে আর্মেনীয় বাঙালি জাতি অনাধ উপশাখা-গুণিকে আশ্চর্য করে আসছে। বর্ণবৈষ্ণব ধর্মের প্রাচ্যত বহুবিভাগে বাবা উপসংস্পর্গে বহুবিধ বাঙালি বৌদ্ধ বা ইন্দুসাম ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে তখনই ঐ আর্মেনীয় শোণিতমিশ্রণ তো হয়েছিল, বাবা বর্ণবৈষ্ণব, ভাষা ও বৈষ্ণব ধর্মজাতের মতো প্রাচ্যত বহুবিভাগে বাবা উপসংস্পর্গে বহুবিধ বাঙালি আর্মেনীয়ের মধ্যে উদ্ভব-সাধিকা। কস্তার জাতিক স্ত্রীবর্ষী মিলন, কস্তার বৈষ্ণব বোম্বা প্রভৃৎ পৌরবর্ষী বৈষ্ণবী নাগবর্ষী—এ-সব প্রাক্তে লোকসমাজে সংঘটিত।

উদ্ভবসংগ্রামের ভারতীয় আর্মেনীয় জাতির দিকে বাংলা দেশের আর্মেনীয় জাতির একটা বৈষ্ণব পার্থক্য প্রায় চার হাজার বছর হ'লে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বৈষ্ণব পার্থক্য

যথা বাঙালিরা যাহে যাহে বিধি৩২ উত্তরাপথবাসী আৰ্ঘ্য জাতিয় যথা পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও বাংলাদেশ বর্ষাকাল উত্তরাপথের আৰ্ঘ্য অধিকারে থাকে নি। বিশেষত পূর্ববঙ্গ বা প্রকৃত বঙ্গদেশ বা পদ্মা নদীঃ পূর্বতীরবর্তী স্থলও বা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগদ্বিটি প্রায়ই আৰ্ঘ্য অধিকারে বাইরে রয়েছে। তার ফলে দেশের আৰ্ঘ্যভাষার বিস্তৃতি ক্ষুদ্র হয় নি বটে, কিন্তু অসংখ্য ভারতের লক্ষ আয় পার্থক্য পূর্তীকৃত হয়েছে। যাকে উত্তর ভারতীয় আৰ্ঘ্য সংকৃতি বলা হয় তা পূর্ণরূপে তেমন বিচার লাভ করে নি।

মহাভাষ্যের যুগ থেকে ভারতীয় আৰ্ঘ্য নৃপতিদের কয়েকবার বিধিব্যবস্থাপন বঙ্গবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে বাঙালিদের বৃদ্ধসামর্থ্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অসংখ্যবের নয়। পক্ষান্তরে বাঙালিরাও বিধিব্যবস্থাপন কৃত এবং বাংলাদেশ থেকে বেগিয়ে এসে তারা কামরূপ, বর্ণিলাপথ ও উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হত। ঐতিহাসিক কালে বাঙালিদের উত্তরাপথ-বিভাগের অধুত একটি প্রাচীন পাওয়া যায়। সেই সময়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়ে গেছে। তখন ঐতিহ্য নবম শতাব্দী, বর্ষশাল ও বেংগালের আদল। তা ছাড়াও বাঙালি রাজ্যের পূর্বে কামরূপ থেকে পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত অধিকার করার বিবরণ উল্লিখিত হয়।

বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে বাংলাদেশে ভারতীয়-আৰ্ঘ্যভাষার প্রাচীন ও মধ্যবর্তী স্তরের বিবর্তনের ইতিহাস আগে লিখা হয়ভাবে ভারতীয়-আৰ্ঘ্যভাষাপ্রদেশকে আলোচিত হয়েছে। এখন বিশেষভাবে বাংলা ভাষার উদ্ভবের কথা বলা প্রয়োজন যাতে বাঙালি জাতির আধুনিক উদ্ভবের সূত্র বোঝা যায়।

ঐতিহ্যের অধিকাংশ ও মহাভাষ্যতে যে ২৪ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই জাতিতে "বিশ্ববাসী" আৰ্ঘ্য জাতি বলে ব'য়ে নিলেও জানতে হবে যে শুধুমাত্র হাড়-ভাষা ছিল প্রাচীন ভারতীয়-আৰ্ঘ্যভাষা জন্মের একটি পূর্বকালীন উপভাষা—আজকের দিনের হুনিমিষ্ট বাংলা ভাষা বা তার কোন প্রব-রূপের উদ্ভব তখনও হয় নি; তার উচ্চারিত রূপ বৈদিক ভাষার উচ্চারিত রূপ থেকে পৃথক হলেও সম্ভবত তার কোন মতের নিমিত্ত রূপ ছিল না, অতএব আজ পর্যন্ত তার কোন নিদর্শন কোথাও অগ্রসর পাওয়া যায় নি। হতবাক বর্তমান বাংলা ভাষার

তৎকালীন পূর্বপুরুষ বলতে আবারও বৈদিক ভাষাকেই ধরতে হবে। এখন ভারতীয়-আৰ্ঘ্যভাষা প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম করে নবীনতায় গুণে উত্তীর্ণ হল, কেবল তখন থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভবের হিসেব-নিকেশ করা যেতে পারে। আর জাতি বেহেতু ভাষার গুণের নির্ভর কথ্যে, সেহেতু মধ্য ভারতীয়-আৰ্ঘ্যভাষার নানা উপভাষার একটি ব্যবহার-কারী বঙ্গদেশের জনসমষ্টিতে আধারা তখনই আধুনিক আৰ্ঘ্য জাতি বলে গণনা করণা, এখন বাংলা ভাষা অপভ্রংশ-স্তর তেজ ক'রে নিজেই স্বকীয়তার স্বপ্রতিষ্ঠিত হল। এই সমস্যা কখন, আপাতত তাই নিরূপণ করা যাক।

ঐতিহাসিক কালে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য বিস্ত্রিত হবার পর থেকে, খেড়ের বাঙালি রাজা নন্দকমলেরে বৃদ্ধার কিছু দিন পর থেকে পাল রাজ্যের অধীনস্থের আগে পর্যন্ত যে-স্থানে বাংলাদেশের যুগ বলা হয়, সেই সময়ে পূর্ব ভারতের এক প্রচলিত অ'লোড়নের মতো মালগুণী অপভ্রংশ স্তর ভেদ ক'রে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় এবং কামরূপ থেকে পুরীধার পর্যন্ত বিস্তৃত লোকায় মগধ রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে বাঙালি জাতির আবির্ভাব ঘটে। এর আগে মগধ সাম্রাজ্যের যে-প্রাচীন, তাতে বাঙালি অস্তিত্ব উপাধীনরূপে কিছু অংশ নিয়ে থাকলেও সে তখন একটি উপজাতি মাত্র ছিল এবং সামান্যতক উপাধীন হিক থেকে তার সত্তা ছিল অসচেতন। কিন্তু অষ্টম শতক থেকে বাঙালি একটি নির্দিষ্ট জাতি এবং বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা; ত্রয়োদশ শতকে উড়িষ্যা এবং পঞ্চদশ শতকের শেষে আসার বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির অধিকার বাহির্গত হয়েছে বটে, কিন্তু অধরা থেকে ভৌগোলিক বাংলাদেশ বলায়, সেই অঙ্গল থেকে অষ্টম শতকে প্রথম উদ্ভবের পর আর কখনও বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার সঙ্কটিত হয় নি। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আর পর্যন্ত এই এলাকা পরাধীন হয়ে আছে বটে, কিন্তু পরাধীনতা ভৌগোলিক বাংলাদেশ থেকে বাঙালি জাতি ও তার হাড়ভাষাকে উচ্ছেদ করতে পারে নি।

বাংলা ভাষার আর যুগ সত্তার আধুনিক ভারতীয়-আৰ্ঘ্যভাষার মতো দশম শতক থেকে বলা হয় বটে, কিন্তু

এ হিসেবে খ্রি. শ্রু. এবং সভ্যতাত্ত্বিকভাবে ব্যাপক।
 দ্বিতীয় বিচার করলে জানতে হয় যে, বিশাল পথ-সাহিত্যের
 প্রথম উৎপত্তির সময়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়ে গেছে।
 দ্বিতীয় চর্চাপত্রগুলির উৎপত্তি অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর
 মধ্যে বললে বাংলা ভাষার উদ্ভব অষ্টম শতাব্দী
 থেকে বলা উচিত। আচার্য হুম্মতিউল্লাহ চট্টোপাধ্যায়ের
 মতে, ১০০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষার গঠনকাল;
 আচার্য শরীফুল্লাহ সাহেবের অভিমতে, বাংলা ভাষার
 প্রথম উৎপত্তি পূর্ণশীমা আনুমানিক ৬৫০ সাল হতে
 পারে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিকের যুগের প্রথম আলোড়নের
 মধ্যেই বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির বিশিষ্ট প্রকাশ।

সাম্প্রতিকের যুগ থেকে আর পূর্ব গত প্রায় তেতাল্লিশ
 শত বৎসরের মধ্যে বাংলা যেসে অভিব্যক্তিরূপে তিনটি
 জাতির আগমন ঘটে। তা ছাড়া ত্র্যবিড় জাতিগুলির
 ক্রমাগত অভিব্যক্তি ও যাকে যাকে আর্য জনবসতির আগমন
 বোঝাচ্ছে। আগেই আর্দ্র-ত্র্যবিড় সাম্রাজ্য ও পৌণ্ডিক-
 বিজয় এসেছে হয়ে গেছে বলে আমরা ৬০৭ সালের
 পরবর্তী ত্র্যবিড়-অভিযান ও আর্দ্র-দ্রাঘদর্মিকের সচরাচর
 কোন সন্দেহ দিই না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়; অসম্ভব
 একটি ত্র্যবিড়-অভিযান ও একটি আর্দ্র-দ্রাঘদর্মিকের সন্দেহ
 দিচ্ছেই হবে। সে-বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলার আগে
 বাংলা ভাষার ইতিহাসের একটি যুগবিভাগ করা যেতে
 পারে:—

(১) আদিযুগ: সপ্তম থেকে দশম শতক; প্রথম
 পর্ব: ভাষা-গঠনের যুগ—সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী;
 দ্বিতীয় পর্ব: চর্চাপত্র-সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ—নবম থেকে
 দশম শতাব্দী। সালের সংখ্যা দিতে গেলে বলতে হয়,
 ৬০৭-১২০০ সাল হল এই যুগের সীমা।

(২) ১ম যুগ: ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক;
 প্রথম পর্ব: সন্ধি-যুগ—ত্রয়োদশ শতক; দ্বিতীয় পর্ব:
 প্রাক-চৈতন্য যুগ—চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক; তৃতীয় পর্ব:
 চৈতন্য-পরবর্তী যুগ বা বেঙ্গল-বিজয়ের যুগ—ষোড়শ-
 সপ্তদশ শতক; চতুর্থ পর্ব: বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণ
 বা দ্বিতীয় সন্ধি-যুগ—ষোড়শ-সপ্তদশ শতক; চতুর্থ পর্ব:
 ৬ বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণ বা দ্বিতীয় সন্ধি-যুগ বা
 বাংলা ভাষার শাস্ত্রাত্মক প্রভাব বিস্তারের উদ্ভব—অষ্টাদশ

শতক। সালের সংখ্যাবিচারে বলা যায়, ১২০০-১৮০০
 সাল।

(৩) আধুনিক যুগ: ঊনবিংশ-বিংশ শতক; প্রথম
 পর্ব: বাংলা গদ্য গঠনের যুগ—১৮০১—১৮১০ সাল;
 দ্বিতীয় পর্ব: আধুনিক বাংলা কথাভাষার সার্বভৌম
 প্রভাব বিস্তারের সাল ১৮০০ সালের পরবর্তী সময়।

বাংলা ভাষার এই ঐতিহাসিক যুগ-বিভাগের কার্য-
 কারণ পরস্পর অপ্রযোজ্য করলে তার রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের
 ইতিহাসও যেমন পূর্ণাঙ্গোচিত হবে, তেমনি বাংলাদেশ ও
 বাঙালি জাতির রাষ্ট্রীয় পরিণতিরও সহজে বোঝা যাবে।

প্রথমে অ-ভাষাতত্ত্ব অভিব্যক্তি জাতি তিনটির কথা
 সংক্ষেপে বলা যাক। এদের মধ্যে প্রথম দুটি জাতির
 আগমনকে ঐতিহাসিকেরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।
 একটির আগমনের কালে উদ্ভিদ্ধা, অপরটির আগমনের কালে
 আশ্রয় উপভোগ্য। বাংলাভাষার অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়;
 তৃতীয় জাতিটি ভৌগোলিক বাংলাদেশকেও ছাড়া ও চূড়ান্ত
 ভাবে দুর্ভাগ্যে ভাগ করতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি; কিন্তু
 অসম্ভব এ-ব্যবস্থা ভাষার ক্ষেত্রে সে-চেষ্টা মোটেই সফল
 হয় নি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে তুর্ক-ভাষার গোঞ্জির উন্নয়ন
 জাতির সৌকর্য্য বর্ধ-বিষয় সম্পন্ন করে। ১২৫৫ সালে
 গিলাসউদ্দিন উরবেক প্রথম বিজয়ী জাতির শাসনের
 নিদর্শনবস্তুর ভাবে নারাজিত মুদ্রা প্রকাশ করেন। এই
 মুদ্রার ধর্মাবলম্বী বিভক্তীদের এখনকার শিক্ত লোকে
 তুর্কি এবং সার্বভৌম লোকে তুর্কি বলে শঠান বলে উল্লেখ
 করে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল বর্তমান সৌভাগ্যে বধা
 এনিয়া বা তুর্কিস্তানের লোক। অবশ্য মুসলিম ধর্মবিষয়
 বা জেহাদের অকৃত্যে এদের সঙ্গে এদের চলার পথে বহু
 ঐতিহাসিক, আকস্মিক বা কাব্যগীতাদি, শঠান বা পেনোয়াগি
 প্রকৃতি জাতের প্রতিনিবি হয়ে বাংলা ভাষা করতে থাকে
 নি, এসেছিল মুসলিম ধর্মোচ্ছাসে। এরা বর্তমান তুর্কি
 বা আকস্মিকতার লোক নয় বলে এদের তুর্কি বা শঠান
 না বলে উল্লেখ করা তুর্কিস্তানি বলা শঠান। এরা যে
 ধর্মীয় দল নিয়ে বাংলা অভিযান করেছিল, তাতে চলার
 পথে সামনে-পড়া সব মুসলমান ধর্মাবলম্বীই যোগ
 দিয়েছিল।

বাঙালি এই অভিমতীয়ে। অল্প দিনে ভুল করে নি। 'উজ্জ্বল' শব্দটিই তার প্রমাণ; উজ্জ্বল তখন যোদ্ধা-রূপে বাঙালীয়েদের চেয়ে উন্নত বলেও সমাজ্য ও সংস্কৃতির বাণকায়িত্তে অধিক পোষ্যমীর বাংলায় চোখে উজ্জ্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

মাতৃভাষার দুর্গাবলানে গোপালদেবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলার গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে রামপাল দেবের আমল পর্বত বাকালী স্বাধীন জাতি ছিল বলা যায়। কিন্তু স্বাধীন শতাব্দীর প্রথমে কানাকড়িওয়া কণ্ঠকবাসী বা কণ্ঠকেশ্যপত্ত সেন রূপে জয়ন সমস্ত বাংলাদেশ অধিকার করে নেয়। সুতরাং সেন আমলে বাঙালি স্বাধীন ছিল না। উজ্জ্বল বা ভুক্তিভাষ্যিমা সংখ্যায় বেশি হবার কথা নয়। কিন্তু ভোগদেব আজ্ঞানে তাঁদের অভিমতীকসলে বহু জাতির মূলদমান দৈবের যোগ দেবার কথা। সুতরাং বাংলাদেশের তৎকালীন বিদেশী স্বাধীন লক্ষণসেন তাঁদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত পেয়ে উঠেন না।

লক্ষণসেনের পরামর্শ হিন্দুদের হৃৎ ও লক্ষ্যের কারণ হলেও বাঙালিদের ভাঙে অঙ্গৌরবের বিশেষ কিছু ছিল না; প্রথমত, লক্ষণ সেন বাঙালি ছিলেন না বলে তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর দিতে উৎসাহবোধ করার কোন কারণ বাঙালিদের দিকে ছিল না; দ্বিতীয়ত, তিনি বা সেনবংশ বোটেই বাঙালী-বর্গী ছিলেন না বা বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের কোন প্রভাব ছিল না; তৃতীয়ত, সন না হলেও বহুসংখ্যক, হস্ত-বা বেশি সংখ্যক, বাঙালি তখন বিচ্ছিন্ন ছিল না; তারা ছিল বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ পাল রাজ্যের পালনের গৌরবাক্তক সংস্কৃতি তাঁদের ভুলে যাওয়ার কথা নয়; পাল রাজ্যের উজ্জ্বলকবাসী বিদেশি সেন রাজ্যের বহু বাঙালি অ-হিন্দুদের 'খেদের কোন কারণ ছিল না; চতুর্থত, বঙ্গাল সেন বাংলাদেশে কৌলীভপ্রমা প্রবর্তনের দ্বারা ভেদবৃদ্ধি বে-বিবরূপ গোপন করেন, তাতে জাতীয় উৎসাহ লক্ষণ সেনার কোন সম্ভাবনা ছিল না; পঞ্চমত এবং বিবেচ্য, যুদ্ধ বসলে লক্ষণসেন দুর্লভিত্ত ত্রৈণ সু-শাসকে পত্তন হতেছিলেন বলে তাঁর হয়ে যুদ্ধ করার গমন লাটগেনের বংশবহন ছিল না। এক বিদেশি রাজবংশকে উজ্জ্বল

করে যদি আর এক বিদেশি রাজবংশ আসে, তবে তাতে এমন কি এসে যায়? এই ছিল বেশির ভাগ লোকের মনোভাব।

সুতরাং এ-কথা ঠিক যে, ভুক্তিভাষ্যিমা উজ্জ্বলদেব প্রভিষেক না করে দে-বিনের অ-মূলদমান বাঙালি বিচ্ছিন্ন-বৌদ্ধ-মৌলিকত্ব সম্প্রদায়ের জনসাধারণ বিচ্যুত হুল করেছিল। কিন্তু সেন-লক্ষ্য সেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত এলাকার অসংখ্য জাতির, এটা বাঙালির নয়; বাঙালি যদি ভালো করে যুদ্ধ না করে থাকে, তবে তার কারণ কাপুরুষ মনোবৃত্তি নয়, তাঁর কারণ অনীহা, ঈদানীন্ত অথবা বাস্তব বাজেনৈতিক জ্ঞানের অভাব। নবায়ত্ত ভুক্তিভাষ্যিমা বাংলাদেশের গুরুতর সাম্প্রতিক ক্ষতি দাখন করে। আগে রাস্ত্র-ভাষ্যের মূল ও পূর্বে ভুক্তি অংশ, এই দুই দুগুণ কোন স্পষ্ট সাম্প্রতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে একটা কথা বোঝা যায়, মল্লিকদেবের দুর্ভাগ্য পথ সম্রাট-দুর্ভাগ্য ও তাঁর পরবর্তীরা বাংলা বেশ বেশিদিন বহুপে রাখতে পারেন নি। বিভিন্ন ভুক্তিভাষ্যিমা হুলতানোও অল্পদিন পরে বাংলাদেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বাংলার স্বাধীন মূলদমান-রাজ স্থাপিত হয়।

নবায়ত্ত উজ্জ্বল ও অস্ত্রাত্ত অবাঙালি মূলদমান অতি-স্বাধীন্য হু মূলপটের পর চলে যায় নয় ধর্মাত্মবিত্ত বাঙালি মূলদমানদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রে মিলে যায়। অর্থাৎ বাঙালি মূলদমানদের কাঠো কাঠো পরীয়ে হুক বিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল বা ভুক্তি পোষিত থাকে সম্ভবপর। উজ্জ্বলদেবের সঙ্গে অঙ্গা অঙ্গগান-পাঠান-পাঠান মূলদমানরা ইরানি বা ভারতীয় অর্থে ছিল। সুতরাং একমাত্র ভুক্তিভাষ্যিদের সাম্প্রদায়িক ছাড়া অন্যরকম বাঙালিদের বেহে অতঃপর প্রবেশ করার কথা নয়। নবায়ত্ত বিজয়ী ধর্মাত্মবিত্ত বাঙালি মূলদমানদের সম্বন্ধে ভাবত, এমন কথা কেবে বাঙালি মূলদমানদের আশ্রয়দাতা লাভের কোন অধিকার নেই। নবায়ত্তবা বে-বস্ত্র অতিথ বজায় রেখেছিল পূর্বে তা "পাঠান" এই অর্থজ্ঞা-সূত্রে বিশেষণে বাঙালি মূলদমানদের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ইংরেজ রাজত্বে বাঙালি ঈদানীন্ত হাও ইংরেজের সম্বন্ধাধা লাভ করতে পারেন নি। আর এখানে-

ইতিহাস সম্বন্ধেই যথেষ্ট পার্থক্য বা মোগলের চেয়ে আরও বেশি বাংলায় বেশি নয়।

বাংলা ভাষায় ও বাঙালি জাতির শোণিতে উজবেকরা বিশেষ কিছু চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি। জাতিগত ও ভাষাগত দ্বন্দ্ব কিছু না থাকলেও যৎ-ভাষা কিছু করতে না পারলেও তারা অনেক দূরী কৃতি ক'বে গেছে। বর্ধিতভাষনত পুণিগত ও অজ্ঞাত সাংস্কৃতিক উপস্থান নষ্ট করা ছাড়াও সব চেয়ে বড় কৃতি তারা যা করেছে তা এই যে, বর্ধিতভাষনের ফলে আর বাঙালি আর্দ্রভাবী মন-কোটি হাচ বৃষ্টি বড় ভাণ্ডে বিস্তৃত : মুসলমান আর অ-মুসলমান। এর আগে সাতটা নগরগৌরী মিলে মিলে এক বাঙালি জাতি গঠন করেছিল যারা ব্রাহ্মণ হোক, পাখি হোক, বাঙালিই বটে। কিন্তু কৃতি-বিজয়ের পর থেকে বাংলাদেশে শোনা যেতে লাগল এক হল বাঙালিই হচ্ছে : ঐ ওরা হল বাঙালি, আর আমরা?—আমরা মুসলমান। এদের মধ্যে তারা বাংলাই থাকল, বর্ধিতভাষনের জন্তে কৃতি বা কাসি হল না। কিন্তু তারা যে আগে বাঙালি এ-বোধ স্পষ্ট হয়ে তাদের কাছে অস্তিত্ব দীর্ঘ কালের মতো মুসলমান বর্ধিতভাষী হওয়াটাই বড় হয়ে বেঁধে ছিল।

বর্ধিতভাষনের চাপেও বাঙালি মুসলমান কারি বা উদ্ধৃত্যবী হয়ে ওঠে নি। স্তব্ধতা প্রাচীনতর দুগ্ন মাত্র করেই শো বহুয়ের মধ্যে বাংলাদেশের শতকরা একশো জন অনাধিচ্চ চাবলন আর্দ্রভাবীরা সাহিত্যে এসে বাস্তবত্যা ফলে আর্দ্রভাবী হয়ে গেল, এমন কথা সূত্র ভাষাতাত্ত্বিক ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারে না।

কৃতিজ্ঞানিদের বর্ধ-বিজয়ের আগেও বাংলাদেশে বর্ধ নিয়ে অনেক বহর বিস্তার ছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ, শাক্ত-বৈষ্ণব বহু সন্দেশই জানেন। কিন্তু সে-সব বিস্তারের ভিত্তিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর যাত্রী দিক থেকে দৃষ্টি বহর জাতিতে পরিণত হওয়ার গুণ ছিল না। এই কৃতি প্রকৃতির ফলে এক বাস্তবত্যা মধ্যে বাঙালি দ্বারা ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তার জন্তে উজবেক জাতির বৈদেশিকতার চেয়ে মূল্যবান বর্ধনই বেশি লাগে। ঐ নবগত উজবেকরা যদি মূল্যবান হতো কোন অ-মৌর্য বর্ধিতভাষনীর হত, তা হলে বর্ধিত ভিত্তিতে জাতীয় তথা

জাতীয় বিভাজনের প্রদ্র উঠত না। বাঙালি বাঙালি জাতি ও বর্ধিতভাষী রাষ্ট্রের মধ্যে বর্ধনী বর্ধিতভাষে এই কারণেই লেখ্যে বলেছিলেন :—

“বাংলা চাই, তাহা মিলাইল কই? বহুবার মিলিল কই? একজাতীয় বর্ধিতভাষ মিলিল কই? মনের কথাতেই বাঙালির অধিকার নাই।”

১২০০-১২০১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বর্ধ কেন্দ্রে বর্ধ প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু এমন এক জনকে পাওয়া যায়নি যিনি বাঙালি জাতির এই বর্ধিতভাষিত্ত্ব দ্বিধাবিস্তৃত ভাব দূর করতে পারেন। তার কারণ পরে ব্যাখ্যা করা হবে।

বোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুর্ক-জাতীয় শোণীর কুর্কোমান জাতির লোকেরা বর্ধবিজয় সম্পন্ন করে। এরা সাধারণতঃ মোগল নামে পরিচিত। তাদের দিক থেকে এরা উজবেকদের নিওট প্রতিবেশী। কিন্তু উজবেকদের মতোই মোগলরাও বাংলাদেশে কৃতিজ্ঞানি ভাষার বর্ধনে কারি ভাষায় যারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। কুর্কোমানরাও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিমৌর্য জাতি-রূপে “মোগল” নামে এক বহর অস্তিত্ব বহা রেখেছিল। আর বাঙালি মুসলমানদের চোখে তাদের অবস্থা “পাঠান” বা উজবেকদের মতোই অজ্ঞাত।

মোগল-অধিকারে বাংলায় মুসলিমদের লংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষার অধিকারদীর্ঘা দূর হয় নি। বাঙালি মুসলমানরা উজবেক বা কুর্কোমান, পাঠান বা মোগল, কারো মাঝেতে কারি ভাষা দূরে থাক, উদ্ধৃত্য ভাষাও গ্রহণ করেনি। বাংলা দেশের রাজকার্য প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে কারি ভাষা ব্যবহার করিতেও কৃতিজ্ঞানিরা বাঙালি মুসলমানকে ভাষার অ-বাঙালি করতে পারে নি। হিন্দুদের কথা দূরে থাক, মুসলমানদের এক কুর্ক জগতায়ণও কারি বা উদ্ধৃত্যবী হয়ে ওঠেনি, এটা সামান্য লক্ষ্য করার বিষয়।

আমাদের মেওরা মূল-বিভাগ অস্থানেই মধ্য মূল্যের প্রথম পর্ব যে দর্শিত্ব মূল, বা মুনীতিমুখ্যবোধ মন্তেও দর্শিত্ব, সেই মূল্য বা অর্থোমণ শতকে বাংলা ভাষার কারি, আর্থিক ও কৃতি বা ইলুমিনি মন্তমূল্য প্রদর্শন করতে পারত করে। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ প্রাক-চৈতন্য মূল্যেই

বিজ্ঞানতির যতো সংস্কৃতবিৎ সুপণ্ডিত বৈদিশি ব্রাহ্মণ
কবির রচনাতেও কানি পদ গ্রহণ করছে। কিন্তু
বাংলা ভাষার কানি প্রকার বসন চরণে উঠেছিল, সেই
অতীতম সভ্যতাতেও আড়াই হাজারের বেশি কানি পদ
বাংলা ভাষায় গ্রহণ-অধিকার পাৰ নি। তুর্কি আমলের
চেয়ে যোগল আমলে কানি পদেব প্রস্তাব বৃদ্ধি পাৰ।

কিন্তু প্রথমে তুর্কি পদে যোগল অধিকারেব ফলে
বাঙালিদের একাংশ ও বড়দানে সুদূতর অংশ বাতুভাষার
নাম রাখাব দনন্তর ও স্বাভাবিক নীতি ভাগ ক'রে
যায় বর্ষাক্তভাব খাতিরে বিজাতীয় আধবি ভাষার নাম
গ্রহণ করতে লাগল। সুতরাং উক্তবেক তুর্কোমান অধিকারেব
প্রকৃত ভাষাবর্ষ দেখা দিল বহীর পার্শ্বকোষ ভাষে বিজাতীয়
সুবোধা নাম গ্রহণের ক্ষেত্রে। বেলব ভোলা, কালু,
শাহজাদ বা শাহনৌল বাংলাদেশের লৌকিক ধর্ম, বৌদ্ধ
ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম ভাগ ক'রে ইসলাম কবুল কইল,
তারা বাংলাদেশে অসংখ্য ধর্মমতের মধ্যে আর একটা
নাম নতুন ধর্মমতের আধারানি ক'রে কাজ হল তা
নয়, তাহা খবর ভাগ ক'রে বহিঃ, কবির, ভলিল বা
অন্যনাম হয়ে গিয়ে এক ভাষাগত অপভ্রংশের বিজাতিক
বলি করল। বস্তুত তুর্কি ও মুগল-বিজয়ের সংচেয়ে
বক্ত কতি এখানে।

বাঙালি ঐষ্টানদের যারা বাংলা ভাষার নামকরণের
ক্ষেত্রে একজতি হয় নি। তারা ঐষ্টান নাম নিলেও
বাতুভাষার নাম রাখা বাঙালি ক'রে যেন নি। এইক্ষেত্রে
ও অন্ত নানা উদাহরণের পরিচয় পেয়ে বনামবস্ত কথ-
লাহিত্যিক পদ্যচর্চা চট্টোপাধ্যায় বাঙালি মুসলমানদের
সঙ্গে তুলনার বাঙালি বুদানদের উক্তনিত এশায়া করে-
ছিলেন। বস্তুত বাঙালি মুসলমানের বাঙালীত্ববদ বা
বাঙালীকত্ব তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন তারা ধর্ম
মুসলমান থেকেও বাতুভাষার নাম গ্রহণ করবে, যেমন
চীন, পারস্য, ইন্দোনেশিয়া ও আরো অনেক দেশের
মুসলমান লোক ইসলামি নামের সঙ্গে স্থানীয় বাতুভাষার
নামও নিয়ে থাকে। বাঙালি মুসলমান লোকও ঐ বুদান
বিলেন ইসলামের পবিত্রতাহারি কোন প্রথ উঠতে
পারে না।

বাঙালি মুসলমান যে বাংলা ভাষার একান্ত অছাঙ্গী,

তা'র উপযুক্ত প্রমাণের অভাব নেই। বাংলার নবাব-
বাদশাহা বাংলা ভাষা ও লাহিত্যের আত্মকৃতা করেছেন,
এমন বুদানও আছে। তাই আরও ভাষার সুবোধা
নাম রাখার হীতি পরিহার ক'রে আধুনিক ভাষাতত্ত্বিক
জাতীয়ভাষাবাদের যুগে বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষার নাম
গ্রহণ করবে, এটা আশা করলে সত্য্য হাবি করা হবে
না। যদি লজ্জকর ইসলামের ছেলেদের নাম অনিচ্ছ ও
দবালাচী হয়ে পালে, তা হলে কোন বাঙালি মুসলমানের
বাংলা নাম নেওয়া'র অপর্যন্ত কিছু থাকতে পারে না।

বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বাংলা নাম দু একটি
শোনা যায়। প্রায়ে অনতিজাত মুসলমানদের মধ্যে
ভোলা, কালু, বটু, ধরণের খাতি বাংলা নাম এখনও
শোনা যায়। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম বাংলা ভাষাকে কাণ
করতে পারে নি। তাহা ও ধর্মের যথেষ্ট পবিত্র তাহার
কর অবশ্রম্ভাবী।

বাংলাদেশে বিনয়সুখারের অধিষ্ঠিত অমুদ্যারে ইসলামের
আবির্ভাবের আগে মোটামুটি তিনটি প্রধান ধর্ম
ছিল : বৌদ্ধধর্ম, জাতিয় বা বর্ণপ্রাশ ধর্ম থাকে তুল করে
হিন্দু ধর্ম বলা হয় এবং লৌকিক ধর্মভার বা স্থানীয় আধি-
বাশীরা অংগোজিত কাল থেকে অবলম্বন ক'রে আলছিল।
বাংলাদেশে বৌদ্ধ, জৈন ও বর্ণপ্রাশ প্রধান তথাকথিত
হিন্দু ধর্ম টিক ইসলামের হতেই বহিঃগত উপাধান।
ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এখন দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণপ্রাশ
প্রধান হিন্দুধর্ম এবং মুসলিমধর্ম ছাড়া বাংলাদেশে অন্ত
কোন ধর্ম নেই বললেই চলে। এটা অবস্ত তুল বা
মোটামুটি হিসেবে বলা হল ; যুগ বিভাগে দেখা যাবে, কিন্তু
বৌদ্ধ, জৈন, ঐষ্টান, পারসিক এবং লৌকিক ধর্মভারী
এখনও ভৌগোলিক বাংলাদেশের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে
আছে, কিন্তু তারা ধর্মভার মধ্যে নয়। সুতরাং পাল
আমলের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক
বৌদ্ধ কোথায় গেল, সে-প্রশ্ন শুটে। বিনয়সুখারের হতে,
অ-বৌদ্ধ অ-হিন্দু দেশোচ্চাচী বাঙালিরাই বলে বলে ইসলাম
কবুল করেছিল। এই লক্ষ সাধারণ সংজ্ঞার এই যে,
পুণ্ডিতবস্তক বৌদ্ধভাও বহু সংখ্যার ইসলাম গ্রহণ করার
এক কিন্দুদের তুলনার মুসলিম লোকের প্রভাবুতি বেশি
হওয়াই বাংলাদেশে এখন মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

মূলদানবা লংকা গঠিত হওয়াতে অ-মূলদানবের ভূমিত্যগত হবার কোন ক'রও থাকত না যদি ইসলামে অ-মূলদানবের ব'তীর ক্ষেত্রে বিতীর্ণ বা তৃতীর্ণ প্রেক্ষিত নাগবিকল্পে গণ্য করার প্রত্যাবাস্য থাকত।

অন্ততম সেনার ধর্মরূপে ইসলাম ধর্ম যে পরমত-অসংযুক্ত দেখা যায়, তাই নব্বয় অ-মূলদানবের উপেক্ষার কারণ হয়ে থাকে। বিধে কোন মুসলিম গঠিত রাষ্ট্রে অ-মূলদানবের সহান অধিকার কখনও দেওয়া হয় নি এবং অদূর ভবিষ্যতে তা দেবার কোন লক্ষ্য আর পর্যন্ত দেখা যায় নি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান বা মুসলমান-অ-মূলদানব সমস্যাটির মীমাংসা করতে হবে।

বাংলাদেশের ধর্মীয় অসংগতি বিবেচন করলে দেখা যায়, বিমাতার শোণিত এখানে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে নি। উভবেক ও তুর্কোমান বিবেচনায় সবে অস্ত্র নানা জাতির মুসলিম এ-দেশে প্রবেশ ও বসবাস করে। হাবশি বা এথিওপীয় মুসলমানও কিছু দিন বাংলাদেশে বসবাস ক'রে গেছে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের ধর্মনীতিতে ঐ সব বিজাতীয় শোণিতের পরিমাণ শতকরা হারে প্রায় কিছুই নয়। এখানে সমস্যাও কারণ, বাঙালি মুসলমানের গোড়া হ'ল ধর্মবাহ্য। বাঙালি মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়রূপে সংগঠিত ও স্থাপিত। বাঙালি ঈস্টানও তাই, কিন্তু তাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই তার উদারতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে মুসলমান ও অ-মূলদানব, এই দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখা। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন যে, অ-মূলদানব বা নানা ছোট ছোট সম্প্রদায় বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে কোন মুসলিমগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা বিশিষ্ট এক জাতীয় মনোভাব নেই। হিন্দু সম্প্রদায় আসলে কোন একটি সম্প্রদায় নয়, বৈকল্য-সৌর-শৈব শাক্ত-গানপত্য ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সমাবেশ এক কোন হিন্দু "চার্চ" আর পর্যন্ত গ'ড়ে উঠে নি। স্তব্ধতায় বাঙালি মুসলমান সমাজ যত সংঘর্ষে একটি জাতীয় যন্ত্রি বা ইউনিটরূপে গ'ড়ে উঠতে পারে, বাঙালি হিন্দু তা পারে না এবং পারে নি। ভেবে যেখানে বৃষ্টিতে অধুনা নেই যে, বাঙালি মুসলমানের মুসলিমত্ব যত তীব্র এবং উগ্র বাঙালি হিন্দুর হিন্দুত্ব তেমন সচেতন ও সজীব

নয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা শতকরা হারে ও জনির ধর্মবাহ্য হিমেবে শুধু ক'য়েক নয়, নিশ্চিত সৃষ্টির সম্মুখীন। এই অসংগতি বঙ্গদেশে নবগোষ্ঠী ক্রমশ ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা ইসলামবিষয়ে জাতিগত-জমি ছেড়ে বিধে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ করা চলে না। বাঙালি হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা যতই ক্রটিপূর্ণ হোক, তার ধর্মবাহ্য অত্যন্ত উদার ও পরমতসংযুক্ত; ধর্ম-সমালোচনার বাঙালি হিন্দুর কোন গায় লাগ নেই। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু প্রগতির জাতিতে ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, প্রায় নাস্তিক বলা যায়। অ-বাঙালি হিন্দু, শৈব, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় এখনও বেশ ধর্ম-সচেতন; তা না হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামে চান্দা আহার ও অশাসনীয় আচরণ করা ছাড়া বাঙালি হিন্দুর আর কোন হিন্দুত্ব অবশিষ্ট নেই। এমন দুর্বল চিন্তামুক্তিসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যতই "প্রগতি" হোক, ধর্মের ওপর রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুতেই বাঙালি মুসলমানদের সবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পেরে উঠবে না। যদি সমস্ত ভৌগোলিক বাংলাদেশ নিয়ে একটি অঞ্চল বালা রাষ্ট্র গঠন করা যায়, তা হলে সমস্ত অকলতা মুসলিম প্রধান হারী মুসলিম লংকাগঠিত এখন একটি রাষ্ট্র হবে যেখানে অ-মূলদানব আর সমস্ত সম্প্রদায়ের বিশেষত বাঙালি হিন্দুর নিঃশেষ অবলুপ্তি হ'ল কিছু সময়ের ব্যাপার। তার ক্ষেত্রে মুসলিমদের আক্রমণাত্মক কর্মোদ্যোগ ও হিন্দুদের আত্মরক্ষার উদাসীন প্রগতিমূলক জীবনবোধ, দুই-ই সমন্বিত পরিমাণে হারী হবে।

যেদণ্ড শতাব্দীর প্রথম থেকে ইউরোপীয় আর্বিবা বাংলাদেশে আগতে শুরু করে। এরই মিনিউ জাতিগত দান একটি বর্ণগত সম্প্রদায় বা ট্যান-কিহিলিদের গঠন। বাঙালি ঈস্টান সমাবেশে এবং অপর্যায়ের থেকে গেছে। "গঠান," "বোগল" ও "ট্যান-কিহিলি"দের দুইটি থেকে প্রাচীন কালে অত্যন্ত বসবাসের বর্ণগতবোধের কারণে কি হয়েছিল, তা বোঝা কঠিন নয়। ১৭৫৭-১৯৪৭ সালে ১৯০ বছরের দীর্ঘপ্রত্যাপ ইংরেজশাসনের বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-ঈস্টানের মধ্যে এক হিন্দু বৈতাত্য শোণিত প্রবেশ করেনি বা শতকরা হারে এক জন ইংরেজিভাষীর উদ্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বক্তাবিদ্যে কোথাও কোথাও হয়ে থাকলেও বাঙালি জনসংগঠনকে

তা স্পর্শ করেনি।

স্বতন্ত্র্যে নির্ভয়ে এ-সিদ্ধান্ত করা চলে যে, বর্তমান বাঙালি আর্থসামগ্রিক প্রাচীন আল্পশী ও নৃত্তিক অর্থদেহই বংশধর, তারা অনার্য জাতিদের জাতিগত সংস্করণ নয়। মুগাটো, বেতিলো ও লামিনোদের মতো কিছু বর্ণবাদের উত্তর অবশ্যই হয়ে থাকবে বৌদ্ধ ও ইসলামি অশ্বশাসনের অবকাশে; নাম ভাঙিয়ে বা অর্থমূল্যে বিখ্যা পরিচয় কিনে বা তত্ত্ব ক'রে ও দীক্ষায়ত্তে কিছু অনার্য বর্ণপ্রভৌ অর্থ সমাজে ঢুক পড়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তার পরিমাণ খুব বেশি হবার কথা নয়। বাঙালি আর্থিক উত্তরে প্রত্যয়ে অনার্য কতকের শক্তি ছাপ গ্রহণ ক'রে অনেক বর্ণবাদের উৎপন্ন করেছিল। মূলত বাঙালি আর্থ জাতি ও অনার্য উপাধানের সহযোগিতায় উৎপন্ন বর্ণবাদেরই সমাবেশে গঠিত। এই জাতি প্রধাবাবি আর্থসামগ্রিক জাতি বহিষ্কার এদের আর্থসামগ্রিক উচ্চতায় পদ্ধতি অবশিষ্ট ভারত থেকে দূরত্ব : বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে আর্থ উপাধানে হত প্রবল, বর্ণবাদের পরিমাণ তত বেশি হবার কথা নয়।

তবে প্রবল কারণ, বর্ণবাদের বংশগত আল্পশী কারণে বেশি দিন হয় না।

ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে আগত অভিজাতী জাতি তিনটির সেমন্ত কিছু ভাগগত বা জাতিগত গুরুত্ব যে-বাংলা না একতায় বাঙালি মূলসমানের বৈদেশিক নাম নিয়ে কিস জাতীয় তথা ভিন্ন রাষ্ট্রীয় চেতনায় লগাণ হবার প্রবণতা ছাড়া। আগে বাঙালি, পরে মূলসমান জাতি বাঙালি মূলসমানের হলে পুত্র্য লাভ করে নি। শুধু বাংলাভাষী এলাকা নিয়ে রাষ্ট্র গঠনের ঠিকমত বন্ধন বিলে পদ্ধতীয় প্রথম দিকে দেখা গেল, তখনই প্রথম দেখা গেল, এক বল বাঙালি ভাষার বাঙালি হলেও ধর্ম মূলসমান হওয়ার গুরুতর জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষতি হয়েছে। এখন ভাষাভিত্তিক বিধে এই শব্দভার কেনন সীমাসংলগ্ন হতে পারে, হয়ে থাকে না হওয়া কথা, দে-আলোগেনা করা থাক।

সাধারণতঃ বিধে কাণ্ড ও মূলসমান ও অ-মূলসমানের এক রাষ্ট্র শক্তিতে বাস করতে পারে না; মুসলিমরা কোন একতায় অকলের কোণ্ড সংযোগিত হলে

মধ্যমে একটি নিম্নব রাষ্ট্র গঠন করার ক্ষেত্রে আশ্বশাসন করে, একতায় অকলের দর্শন তাদের সংযোগিততা থাকলে সমস্ত এলাকাটা মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়, কোণ্ড ও তাদের সংযোগিততা না থাকলে সংযোগিত শাস্ত্রায়ত্তে বিধে বর্ষীয় জুয়েদ-মুখিা দাবি করে। বিধে অত যে কোন দানের তুলনায় ভারতীয় মূলসমানদের মধ্যে এই প্রবণতাগুলি অনেক বেশি একটি; তার কারণ, ভারতীয়রা সাধারণভাবে বিধে বর্ষীয় সবচেয়ে ধর্মীয় হওয়ার তাদের একাংশ যে-ভাষাতীয় মূলসমানসাধন দে-সমান বিধে যে কোন দানের মূলসমানের চেয়ে বেশি বোঝা। বর্ষীয় ইসলামি জাহুর আর্থসামগ্রিক আর্থ সামাজিকই আর পদ্ধতি এক কতে পারে নি তবু অনেক মূলসমানের দৃষ্ট বিধ মূলসমান হতে একবা গড়ে উঠবে। মুসলিম রাষ্ট্রে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং হিন্দু সমস্ত ভাষা মৌলিকদের তৃতীয় শ্রেণীর সামাজিকভাবে সঙ্গ্য করা হয়। এমন-কি গোড়া মুসলিম ধর্মমত থেকে সামাজিক দ্বিতীয়ের মধ্যে মূলসমান হওয়া সম্ভব হয়। বাংলাই, কারিয়ান বা আর্থসামগ্রিকের মুসলিম রাষ্ট্রগত নিম্নবস্তাবে স্ট্রিচন করা হয়ে থাকে। স্বতরাং যদি কোন একতায় এলাকার একাংশ মুসলিমগণিত ও অপর অংশ অ-মূলসমানগণিত হয়, তা হলে ভৌগোলিক অঞ্চতা থাকলেও সেই এলাকা মুসলিম ও অ-মূলসমান দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে বাধ্য; অতরাং অ-মূলসমানের সৃষ্টি অনিবার্য।

ভৌগোলিকভাবে অঞ্চ অকল বাংলাদেশে হিন্দুই কেন এবং কতটা ক্ষতি, তা বোঝার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতের দৃষ্টায় পর এ-ক্ষেত্রে আগত একটি আর্থ-সামগ্রিক ও একটি আর্থিক অভিজানের ভাষাগত বোঝা দরকার।

আজমিনিক ১৪৮ সালে কানৌর থেকে কয়েকজন আর্থ জাহুর ও কার্য এ-ক্ষেত্রে আসেন। "গৌড় কাহিনী"-র লেখক শৈলেন্দ্রকুমার বোস মহাপর দে সমস্ত লিপ্যন্তর :

"জীবের আগমনের ফলে রাষ্ট্রের সমাজ-জগৎ নতুন রূপ ধারণ করে। সমগ্র গৌড়-ইতিহাসে এত বড় ভাষাগত বটনা আর কখনও ঘটে নি," (গৌড় কাহিনী, পৃষ্ঠা ১৩০)।

১২০ সালে হারিশচন্দ্রের দৃষ্টায় পর সাতার

বাংলাদেশ বীরে বীরে কানাকড়িভাষী ডায়েকিডায়াগোষ্ঠির লোক দেবদেবীদেবীর হৃদয়ে চ'লে যায়। এঁদের একজন হ'ল। বঙ্গালদেশে যাবল শতকে কৌলীগ্রন্থা প্রবর্তন করেন। এই দুটি ঘটনার দ্বারা বাঙালি হিন্দুর সমগ্র সামাজিক জীবন নিঃশিথ হ'য়েছিল।

বঙ্গালদেশের নামেই প্রথম যে, তিনি বাঙালি ছিলেন না। ১১৪৩-১২ শালের মধ্যে কোন সময়ে কৌলীগ্রন্থা প্রবর্তন ক'রে তিনি যে-অংশে পিতার পরিচয় বিধেছিল, তার কুলপ সমস্ত বাঙালি হিন্দুসমাজ পুরুষাণ্ড্রকে ভোগ ক'রেছে। তাঁর পরিচয়না ছিল, প্রতি দ্বিতীয় বছর অশ্বর ঐ প্রথা সত্যের করা হয়ে। কিন্তু তাঁর রাজ্য ঐ প্রথা প্রবর্তনের পর ৩৬ বছর রাষ্ট্রীয় হ'ল নি এবং তুমিহানি আক্রমণের ফলে তাঁর বংশধরগণ কোন সাক্ষ্যকার্য সত্তর করতে পারেন নি। হুহুবাং ঐ প্রথা সম্মত হ'য়ে গেল।

আদৌক্তিক জন্মগত কৌলীগ্রন্থা সমাজের উচ্চতম প্রাণপ্রসঙ্গী বংশে প্রচলিত থাকার গুণগত উৎকর্ষ মতে হল; সৌন্দর্যবদ্ধতা, বাস্তবতা, পারম্পরিক উদ্বোধন প্রভৃতি বৃক্স দেখা দিল। রাষ্ট্রপ্রণয়ী সন্ত্রাস্ত্রেরী যেমন রাষ্ট্রে কাছে সম্মানিত হয় তেমনি শাসকগোষ্ঠীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। কিন্তু বঙ্গালদেশ পৌর বা সম্রাটের ভিত্তিতে বোদ্ধা বা জুহাবীরের সাহায্যে কৌলীগ্রন্থা সৃষ্টি করেন নি। তাঁর প্রবর্তিত প্রথা মূল্যত বিবাহবিধি নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত হ'য়ে উচ্চ বর্ণের বাঙালি হিন্দু সমাজে ব্যাপক মৌন দুর্নীতি সঞ্চারিত হয় এবং হুদীন সমাজে অগণিত ভারত সত্যের উদ্ভব হয়। ঐ আর্দ্র-সমাগম ও কর্ণাতি রাজবংশ-প্রবর্তিত কৌলীগ্রন্থা বাঙালির জাতীয় সংহতি কলিবে দেয় এবং হিন্দু সমাজের গুণল ক'রে দেয়।

বাঙালির জাতীয় সংহতি এখন বিহু বা মূল্যের ধর্মভিত্তিক নয়, একান্তভাবে জাতীয়তাবাদ। বর্মের ভিত্তিতে বেশ ভাগ হয়ে গেলেও বাঙালি মূল্যমান এখন আগে বাঙালি পরে পাণ্ডিত্যনি; বাঙালি হিন্দুও আগে বাঙালি পরে ভারতীয়। কিন্তু বাঙালি মূল্যমান ঘটনিন আগে বাঙালি পরে মূল্যমান না হ'লে, ততদিন স্বাধীন জাতীয় সংহতি অসম্ভব।

মেশের সম্রাট হুদুদার বাঙালির জাতীয়তার বর্নন লক্ষ্যে লিখেছেন:—

“যে হাংবের অধিবাসীরা বা তাহার অধিক সংখ্যক লোক সামান্যতঃ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে, তাহাই বাংলাদেশ বলি। গ্রন্থক করা সম্বোধন। আপাতত আর কোনও নীতি অনুসারে বাংলাদেশের নীতি নির্দেশ করা কঠিন। যে ভূখণ্ড আজ বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত, প্রাচীন যুগে তাহার বিশিষ্ট কোন একটি নাম ছিল না এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত। অ'ল যে ছয় কোটি বাঙালি একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহাও মূল আছে তাহার ঐক্য। ভারতের অস্ত্র প্রবেশের অধিবাসী হইতে পৃথক হইয়া বাঙালি একটি বিশিষ্ট জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।” (বাংলা দেশের ইতিহাস।)

হুতরাং এখন এই ভৌগোলিক বাংলাদেশ কোন ক'রে প্রায়শ কোটি বাংলাদেশবোকে নিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিণতি লাভ করতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত মেওয়া যেতে পারে। বাংলা দেশের স্বাধারিক রাষ্ট্র পরিণতি লাভের পথে ভাষা পরব সম্বাদিকা, বিয় কোনমতেই নয়। বিয় দেখা য'ছে কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে।

সিদ্ধান্ত

যোগল সম্রাটো আকবরের নির্দেশে হুবা বাংলা বা বাংলা অধঃগত সৃষ্টিত হয়। যোগল সম্রাটের পেরাখে সৃষ্টিত এই রাজ্যে উচ্চতম অধঃকৃষ্টি ছিল কিন্তু আদায় ছিল না। ইংবেল অধঃকাবে দেশল প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়; আদায় এও অধঃকৃষ্টি না হ'লেও বিহার এও অধঃকৃষ্টি ছিল, বা যোগল আদয়ে ছিল না। হুবা বাংলা ও দেশল প্রেসিডেন্সি—দুটি সম্রাটিক প্রদেশই ছিল অ-মূল্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ। আদয়া যে-এলাকাটাকে ভৌগোলিক বাংলাদেশ বলছি, সেটাও ১৮৭১ শাল পর্যন্ত অ-মূল্যের-গঠিত অকল ছিল। কিন্তু তার পর সেটা স্বাধীন এবং হুনিষ্ঠিতভাবে মূল্যেরগ্রন্থান এলাকার পরিণত হ'য়েছে। অ-মূল্যেরদেব মধ্যে শিক্ষা এবং প্রগতির গুণে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা ব্যাপকভাবে প্রকৃষ্টি হওয়া উক্ত ব্যবস্থা-বিষয়ী মূল্যের সম্রাটের স্তন্যদায় অ-মূল্যেরদেব সংখ্যাগ-পাত জন্ম ক'রে যেতে বাধ্য।

যোগ্য-গঠিত বাংলা হুবা ও বিহাব হুবা ইংরেজের হাতে একত্র বাংলা প্রদেশে পতিত হওয়ার পর বাঙালি মূলধারায় ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক শিক্ষা সংকট বিহীন হয়ে থাকার চাহিদা ও আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুর সম্মেলন উপস্থিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহে সফলত্ব নীতি যোগে বাঙালি চিন্তা সেই হুবহুযোগে মনোবৃত্তি করে। তার পর ১৯০৪ সালে মতিলাল ইংরেজ-বিরাগী আন্দোলন আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত তার ভাষায় কি ঘটেছিল, সে-বিষয়ে শৈলেন্দ্রহুবার বিশ্লেষণে লিখেছেন :—

"ভারত জয়ের পর ইংরেজগণ তাদের প্রাচ্য সম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতার স্থাপন করার বাঙালি হিন্দুরা বক্তৃতা দিতে লাগত। কেবলমাত্র সরকারের চাহিদা গ্রহণ করে তাদের অনেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে—বৈদেশিক বহু বাঙালি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। আবার প্রদেশে পুনর্বাসনের ভাগে বাংলার ন্যায় বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার প্রতিবেদী অকল-প্তির উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ঘটে। দৃষ্টিতে ইংরেজ সিনিয়র এলেক্সান্ডার পতিচালনা করতেন, কিন্তু মন্ত্রণামণ্ডল ছিল বাঙালি কর্মচারীদের কংগ্রেস-গত। এই অতীতের প্রভাবের ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পরবর্তী জাতির আত্মবিকারিত প্রবণতা বহুতর ক্ষমিত থাকলেও বর্তমান সত্যের প্রথম ভাগে মন্ত্রণামণ্ডল আকারে আত্মপ্রকাশ করে।" (গৌড়-কাহিনী—ভূমিকা।)

ঐ মন্ত্রণামণ্ডল অর্থিক ঘোষণা নেতৃত্বে গুরুত্ব সহ; পূর্বে ঐ মন্ত্রণামণ্ডল নেতৃত্বে যে পতিচালনা ঘটে, সে-সময়ে হেমচন্দ্র কাম্বুজ, যোগিতলাল সঙ্কর, উপেন্দ্রনাথ বসোপাধ্যায়, মতিলাল সরকার, হেমচন্দ্রনাথ সরকার, বাগীচন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভৃতির বচনামণ্ডল পড়লে ঘোষণা হতে দেখি হয় না। কিন্তু এক্ষণে বাঙালিদের সাময়িক মনোভাব অত্র বিবেকে ১৯০৪ সালে নিশ্চিত হওয়াচলছে। মন্ত্রণামণ্ডল প্রত্যাবর্তনীয় বাংলা বাঙালি হিন্দুর সাময়িক কর্মপ্রয়াসকে নির্দেশ করে দেখেছিল। তা ছাড়া ব্রিটিশদের দ্বারা বাঙালিদের সাময়িক সিদ্ধান্তের সত্যতার অঙ্গীকার গ্রহণে নির্দেশিত মন্ত্রণামণ্ডল একাধিক দৃষ্টান্তে দেখাযায়।

যেহেতু। ইতিমধ্যে ইংরেজ কূটনীতিতে ভূতপূর্ব যোগে প্রেরিত ও নব-বিজিত বাংলা প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে পতিত হয়েছিল। এ-বিষয়ে শৈলেন্দ্রহুবার বিশ্লেষণ যথোপযুক্ত :—

"প্রশাসনিক প্রয়োজনে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে বাংলা-বিভাগ এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করার বিরুদ্ধে মন্ত্রণামণ্ডল পতিত হয়। তার ফলে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা পূর্ববিভাগে রূপ নেয়। কিন্তু বিজিত বাংলা শিখিত হয়ে বাঙালি হিন্দুর মন্ত্রণামণ্ডল একটি প্রদেশ হয়ে যায়। মন্ত্রণামণ্ডল এবং বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশভূমিতে তাদের পূর্ব প্রভাব অসম্ভব হয়ে পড়ে। মন্ত্রণামণ্ডল এবং নিজ গৃহে তারা হয়ে পড়ে পরবর্তী। মন্ত্রণামণ্ডলের ফলে বাংলায় উঠল মন্ত্রণামণ্ডল, অতীত হিন্দুসমাজও নয়।"

এখন ভৌগোলিক বাংলাদেশের ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র দার্শনিক বাস্তব অধীনে আছে। পাকিস্তানের অধীন সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা পূর্ব-পাকিস্তান নামে একত্রিত করায় মন্ত্রণামণ্ডল হয়ে আছে। কিন্তু ভারতের মধ্যে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা প্রথম থেকেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে : পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা। পূর্ব পাকিস্তান ভারত থেকে অ-ভৌগোলিক ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভাজিত হওয়ার ফলে মন্ত্রণামণ্ডল বাংলাভাষী এলাকাও এই ভাবে বহু থেকে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশভূমিতে বিভক্ত হয়ে আছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের প্রদেশগুলির সীমানাখনা পুনর্বিন্যাসের সময় এই বাংলাভাষী এলাকাকে অনায়াসে একত্রিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে লয়তে দেখা দেয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা দেখা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা মিশ্রণ ও আসাম প্রদেশভূমিতে ছড়িয়ে আছে। প্রস্তাবিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশে এই বাংলাভাষী এলাকাকে অনায়াসে সংযুক্ত করা যেত। কিন্তু ১৯৬২ সালেও তা করা হয়নি। তা ছাড়া আসামের ও

নিকোংর স্বীকৃতিপত্রটি পশ্চিম বাংলার অত্যাচারিত হওয়া উচিত।

বাণীন ভাবতে বাঙালি হিন্দু সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল। হুতরাং ভারতীয় ইউনিয়নের অধীন সমস্ত বাংলা-ভারী এলাকাকে ক্ষত-ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। কেন তা করা হয় নি, সে-সময়ে পরলোকগত বিখ্যাত নেতা নাতকড়িপতি বাবু লিখেছেন :—

“১৯১১ সালে যখন নতুনভাবে কংগ্রেস গঠিত হইল, তখন কংগ্রেস প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে হইয়াছিল। বাংলার কথাই বলি। প্রিট ও কল্যাণ্ড জেলা আলাদা প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া ইংরাজ শাসনাধীনে ছিল। সিংহ, মানিকুস জেলা, বিহার প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া ইংরাজ শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু এই জেলাগুলি বাঙালি-অধ্যুষিত বলিয়া ১৯১১ সালের বাংলা কংগ্রেস প্রদেশের অন্তর্গত হইয়াছিল। ইংরাজ চাটুড়ী করিয়া বাংলার হিন্দু সংখ্যা কম করিবার জন্য গোয়ালপাড়া, প্রিট ও কল্যাণ্ড আলাদা এবং মানিকুস ও সিংহ বিহারে রাখিয়াছিল। তখনকার কংগ্রেস শীকার করিয়াছিল বেশ বাণীন হইলে ঐ সব প্রদেশ বাংলার অন্তর্গত হইবে। তাই ১৯১১ সালের বাংলা কংগ্রেস প্রদেশের ঐ জেলাগুলি অন্তর্গত হইয়াছিল।” বাণীনজালালের পরে ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস হাইকমান্ডও কেমনভাবে পূর্ব প্রতিক্রিয়া দেখেছিলেন, তার বিবরণ বিধি নাতকড়ি বাবু লিখেছেন :—

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষগণ তাহারের ঘাবি দেশ করিয়াছিল। প্রিয়মদন্ত সিংহ সিংহ, মানিকুস, সীতেশ্বর পরম্পর খানিকটা, পূর্ণিমা জেলার খানিকটা, গোয়ালপাড়া ও কল্যাণ্ড জেলা ঘাবি করিয়া যে সকল অকাটা প্রমাণ বিদ্যমান, তাহা বিবেচিত হইলে ঐ সমস্ত বাঙালি ধারা অধ্যুষিত স্থান পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত না হইয়া যায় না। আর সব প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হইল। কিন্তু বাঙালির তৃতীয়া বাংলার অংশ বাংলায় লগ্নে সংযুক্ত হইল না। কেবল মানিকুসের পূর্বভাগ লইয়া সমস্ত মহকুমাটি আদিল এবং পূর্ণিমা জেলার সমস্ত অংশ। তা থেকেও বহুতরুতর বিধানচক্র বায় আশ্রয়পূর্বক টাটার হবিধার জন্য খানিকটা ছেড়ে দিলেন। ভাকার বিধানচক্র রাখকে যখনই এই সব কথা বলিয়াছি, বাঙালি-

অধ্যুষিত অংশ পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত হইল। করিতে বলিয়াছি, তখনই তিনি বলিয়াছেন, “ইহা প্রাথমিকতা”। আমি কেবল জাতিবাহি এই সব শিক্ষিত পুরুষের চিন্তার দ্বারা এমন বিকৃত কেন? ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হইতেছে এবং প্রদেশের সর্বজনীন উপরিতর জন্য ইহা অপরিহার্য। যে-সকল স্থান বাঙালি-অধ্যুষিত, তাহা পশ্চিম বাংলার মধ্যে আনিবার চেষ্টা প্রাথমিকতা আখ্যা দিতে এই সব শিক্ষিত ব্যক্তি ঘিঘা করেন নি। ভাকার গার বলিলেন, “আমি ও-সব পারবো না”। হুতরাং নেহেরু সাহেবের খোলায় অগ্রগণ্যে কাল হইল। (স্বতন্ত্র টুকরো, প্রবাসী, মার্চ, ১৯৭৪)।

বর্তমানে ভারতের অবস্থিত বাঙালিদের কর্তব্য হচ্ছে ভারতের বাংলাভাষী সমস্ত অকলমে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাচল প্রদেশগুলিতে সংযুক্ত করা। বাঙালি হিন্দু নেতাদের আত্মঘাতী ঐক্যমীত্র ও নিরুদ্ভিত্যর জন্য আজ পর্যন্ত একজন মন্তব্য হতে পারে নি। ভাকারপ্রদায় ১৯৩৭ সালে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের পর থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তার আচরণ বুঝির কোন চেষ্টা করেন নি। তিনি যে ‘মনসং’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ তা ভারতে যিনি সাম্রাজ্যবাদের সব চেয়ে বড় সমর্থক হল। ভারতের বাঙালিদের এখন কোন নেতা নেই। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায় নেতৃহীন এবং রাজনৈতিক দিক থেকে চেতনাবিহীন। শৈলেন্দ্রবাবু এই অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন :—

“পূর্ববঙ্গের সাংখ্যগণিত সমস্তের চেয়ে তাদের জীবন যাম হুবিহ্ব হায়ে উঠছিল, নেতারা তখন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার আঙনে সংযুক্ত বাংলা যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, এখানকার হিন্দু নেতারা তখন মিলনের মূর সন্ধীতে আকাশ-বাতাস ভরিয়া ভুলছিলেন! সেই সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে ধনি ওঠে—এ-পথ মরণের পথ, এ-পথে নৃষ্টি আলবে না। বাংলাকে বিভক্তিত করা, আঙন আপনি নিজে হবে। নেতাদের কাছে যখন আয়রা এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হই, তখনই বাতাসভার তাঁরা কই চলে ওঠেন; জনসাধারণ প্রভিত হয়ে যায়। সংবাদপত্রগুলি বহুবিভাগের অস্থানে কোন লেখা ছাপতে অস্বীকার করে।”

আজ এই বঙ্গবিভাগকে ভিত্তি করেই ভারতের বাঙালিদের অগ্রদূত হতে হবে। বঙ্গবিভাগকে অসীমতার করে বা চোখ-কান বুজে মূলশিল্পগঠিত অবিভক্ত বঙ্গ গঠন করে বঙ্গের সমগ্র প্রজন্মকে হারাতে হবে না বরং পুণ্যোনে। জুলুম পুনরাবৃত্তিই করা হবে।

ভারতে পূর্ণায়ত্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ণায়ত্ত পূর্বাচল প্রদেশ দুটি গঠিত হবার পর বাঙালিকে এই দুটি প্রদেশের সমস্ত সরকারি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে। আরও পশ্চিম বঙ্গে সমস্ত সরকারি কাজে বাংলাভাষা ব্যবহৃত হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে ইংরেজ আমলে বাংলা রাজতন্ত্র ছিল; এখন সেখানে কেন্দ্রশাসিত এলাকা বলে হিন্দি রাষ্ট্র-বাদ। এই সব জুলুম অবস্থার প্রতিরোধের জন্যে এখন বাঙালিকে সর্বশক্তি নিযুক্ত করতে হবে। যে সা. রাজনৈতিক হল এই প্রদেশের অগ্রদূত, বাংলাদেশে তাদের স্থান যাতে না হয়, বাঙালিকে তা দেখতে হবে। এর অর্থে চাই আবিষ্কারের কাঙ্গালারের মতো ঐতিহাসিক গবেষণা, কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক হল বাঙালির পক্ষে বিদ্যমান হবে।

পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্বাচল অস্বাভাবিকভাবে দুইভাগিত হবার পর ভারতের বাঙালির কর্তব্য হবে পূর্ববঙ্গ বাহীন রাষ্ট্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

পাকিস্তানের বাঙালিদের অর্থাৎ প্রধানত বাঙালি মূলধনীদের এখন একমাত্র কতক পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বঙ্গকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র গঠন করা যার নাম হবে বাঙালিহান। তারা একমুখ্য করে ভারতের বাঙালিদের মনে ঘোর আগ্রহ, স্বাধীনতাসম্প্রদায় তৃপ্তি পাবে এবং সব চেয়ে বড় কথা, পূর্ব বঙ্গের বাঙালি মূলধনীদের আত্মবিক্রয় ও সন্ধিহীন ভারতের বাঙালি হিন্দুদের বিশ্বাস ফিরে আসবে। আগে পূর্ববঙ্গ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত না হলে ভারতের বাঙালিদের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা অসুখপরাহত।

কর্তব্য মনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্ভাব্য বাঙালি মূলধনীদের পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কল থেকে স্বাধীনতা লাভ চাইছে, এটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তারা প্রতিক্রিয়া বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে লগ্ন্যবৃত্তিই হচ্ছে। এটা উপকূল প্রাধান্যবাদ। তা প্রমাণিত হবার আগে বাঙালি হিন্দুদের উদ্ভিষ্ট হবার অবকাশ নেই। স্বাধীন

পূর্ববঙ্গ পশ্চিমপাকিস্তানের কর্তৃত্ববিমুক্ত অবস্থায় বাঙালি মূলধনীর টিক কতটা বাঙালি আর কতটা মূলধনীর হবে তা দেখে তবে অগ্রদূত হওয়া বাঙালি হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হবে।

স্বাধীন জৈনগোলিক বাংলাদেশের ভাষা নির্ধারিত হবে পূর্ব বঙ্গের বাঙালি মূলধনীর আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুর প্রচেষ্টার দ্বারা। যদি পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হয়, তা হলে স্বাধীনবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাচল স্বাধীন হবে। ভবিষ্যতে জৈনগোলিক বাংলাদেশে তিনটি রাষ্ট্র দেখা যাবে; পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ ও পূর্বাচল।

স্বতন্ত্র মানবচেতনা ও মানবজীবন থেকে সমগ্রাচার-ভিত্তিক আত্মসম্মানকরিত্বের প্রত্যয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না হলে, ততদিন বাংলাদেশের পক্ষে অস্ত্র কোন পরিস্থিতিতে অব্যবহৃত। ইউরোপে শতকরা প্রায় একশো জন শিক্ষিত শ্রেণীর দেশ হতেও একমাত্র তিনটি রাষ্ট্র স্বতন্ত্রভাষার ঐক্য সাংগে যেমন যেমন ক্যাথলিক-প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মগত-বিভেদে ঘনো আগাধা হয়ে পাশাপাশি অবস্থিত : বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবুর্গ। সেই বঙ্গের আগামীকালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভূগণ্ডে দেখা যাবে তিনটি একমাত্র রাষ্ট্রকে যারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পূর্ব মৈত্রী ও স্বতন্ত্রভাষার ঐক্য স্থাপন করেও স্বাধীন স্বাধীনগঠিতার পেশব একত্রার সঙ্গে আগাধা থাকবে।

এখানে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের নিকট ভবিষ্যৎ হলেও দূরতর ভবিষ্যতে যখন অধিকাংশ বাঙালির স্বত্ব থেকে হাফা ও বিচ্ছিন্ন হতে চলে যাবে তখন বাঙালি নিজেকে আর, যথেষ্ট ও পরে বাঙালি এবং স্বাধীন বলে অস্বস্তি করবে, তখন সন্ধিস্থিত জাতিসংঘে একটি অংশ বাঙালি রাষ্ট্র দেখা দিতে পারে।

এর পর প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কেন পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাচলের স্বত্ব আসবে? উত্তর দেওয়া বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। বিস্তারিত পরিসংখ্যানকে সেই পূর্ববঙ্গ স্বতন্ত্র হতে দেওয়া হয়েছে। বাঙালি যদি আত্মস্থ হয়, তবে তাকে লাভ্য করা হবে অস্ত্র বহির্বিপক্ষ নিষ্ঠর এগিয়ে আসবে।

(সমাপ্ত)

বিবাহের বাজার খেলটা এমনিতেই একটু লেট করে আসে। তার উপর গৃহকর্তার টেম্পারার টেম্পারেট কোনে অস্থান করলে ভোঁ কথাই নেই। বঁটটার লোহার পানানীড়ে ডান পা খানা চেপে ধরে আনাজ ভরকারি কুটিকাটি করবার ফাঁকে ফাঁকে বিধু ঘোষের ছোট মেয়ের কেছা থেকে অসিস শূপারিনটেণ্ডেন্ট মল্লিক সাহেবের সমস্ত প্রাণব্রিত হাঃস্বজনক আইন কানুনের অদর্শকতার শাস্তি পর্যন্ত পার্শ্ব উপবিষ্ট স্বামীর মুখ থেকে শুভে হয় কুস্তলাদেবীকে। মোটুঝকী পারি আর কি? সুদীর্ঘ ছয়টা দিনের তুপীকৃত সংবাদ পরিক্রমা এই একটা দিনেই শেষ করে দিতে হয় হৃদয়কে সংসার অভিজ্ঞতার তরল পারদস্যের উত্তরীচু স্লেজেলের সামন্তত্ব বন্ধ করা। আসর ভরে ওঠে। বিরাম চিহ্নের যাত্রাধিক্য ঘটে। অধিকাংশই ভাড়াটে বাতীর অস্থঃপুত্রিকাধের সহাপরি অভিজাত্য বন্ধক সমুখ দরজাটার কড়াটার চক্কট। ওর বালাই না থাকলে বা কি হোত? নড়বড়ে বাইরের দরজাটার ঠটুকু আবরণ না থাকলেই সমস্ত বানেনা চুকে যেত কুস্তলাদেবীর। কিন্তু উপায় নেই। ওর উপরে নেতনজর হয়তো বাজী-মালিকানার বিবেচনার মূড়ুমুড়ি দেবে। অগায়ে সে চিহ্নেটা দিকের তুলে রেখেছেন কুস্তলাদেবী।

—প্রিয়তোষ বাবু ঘরে আছেন? বেহুবা দরজার কড়াটাই যেন তাইবরে বেলেস্তারা করে।

বীধাকপির খোলাকটা মেঝের উপর ছুঁড়ে রেখে শুদ্ধিবৎসে উঠে দাড়ান কুস্তলাদেবী। বতো হাতান্তের আগমন শুধু কি এ বাড়িতেই? মাথার কাপড়ের আঁচলটা তুলে নিয়ে ছিকিনিটা খুলে যেন কুস্তলাদেবী।

—প্রিয়বাবু কি বাজার থেকে ফিরলেন?

চক্ৰবর্তীর মাথার ঘোল চালেন আগন্তুক।

—কিছুক্ষণ হোল। আপনি এখানে বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি। উত্তর পরদুলি ফেলে ভেতর ঘরে চলে যান কুস্তলাদেবী। পাছে কাসবন্ধ মেজাজের বজ্জংজন শিথিল হয়ে পড়ে।

বাঃর হিসেবে তালগোল পাকান মাথাটা ঘুরে। হাতের ভাঁজে এলিয়ে দিবি আয়েস করে শুয়েছিলেন প্রিয়তোষ বাবু। চার পরদার মুলো আর দুপদার ধনে পাতার বাজার হিসেব। খাবি খেয়েও ভাসতে হচ্ছে। হোক না বিশ বছর। সহঃমিণীও কাছ থেকে বিবর্ষী অপবাদটা আজ বিশ বছর বাদে পৌরষের মোহগোড়ায় এসে কড়া নাড়বে এটা তিনি চাননা।

—কে এসে কুস্ত? জিমিত বেহটা কণিকের ভক্ত ভিজ্ঞাপ্ত দৃষ্টিতে তাকায়।

—আমি চিনি। এ নিয়ে চারবার হোল। বেশ কোন যুগপোড়া আবার এসে জুটেছে। হাণের প্রকাশটা যুগপোড়ার কণ পর্যন্ত না নিয়ে সমুখ বেয়ালে প্রতিক্রিয়ািত হয়ে ফিরবার মত সুমান্নিত। যুগপোড়াকে নেহাৎ উঠতে হয়নি। উঠলেন প্রিয়তোষবাবু। বাটের তলা থেকে গোটাচক্রে একানাবেলের বাটি বার করে সুতাবিধী উতকরণে 'নাঃ পছাঃ' অবলম্বন করেছেন।

যথাসময়ে আগন্তকের কাছ থেকে বস্ত্র সময়ের বিরতি নিয়ে স্ত্রীর সমুখে এসে পাড়ালেন প্রিয়তোষবাবু। বড়বাসের চোবীহুড়াটা কিরণকণের ভক্ত আলো ছাড়া হোক। ভজ্ঞলোঃ তার সহকর্মী। ওর আপিসের একটা চক্কটী কাগজ... ওতেই লেবে। অকল প্রাপ্ত থেকে চাবীহুড়াটা খুলে মেঝের উপর ছুঁড়ে যেন কুস্তলাদেবী।

বিলম্বের অজুহাতে বে-আকলে লোকটার

জুতো পায়েই রাস্তাঘরে ঢুক পড়ার প্রতিশ্রুতি মূলক যথাযোগ্য ব্যবস্থা।

জরুরী ব্যাপারটা সর্বোত্তম উপায়ে দেহের নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ঢাবীছড়াটার নিরাপত্তার জন্তু তাই এগিয়ে আসেন প্রিয়তোষাবাবু।

—বুকেল কুস্ত। এ টাকাটা যে কোনদিন কেহও আসবে না সেটা আমিও জানি আর থাকে দিলেম তিনিও ঠিক জানেন। তবুও দিতে হোল। আগন্তকের সমাজ মন্ত্রণাবাদে হোক কিংবা সহস্র আশীর্বাদে হোক সমস্ত ভয়কুষ্ঠা মন থেকে ভাড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয়তোষাবাবু। নিষ্ঠুর পদক্ষেপে এবার এগিয়ে আসেন জীবনসংগিনীর পাশে।

—টাকা। তুমি আমার টাকা দিলে তাকে? মোচাক সেবে বোঁরা লেগেছে। মৌমাছির খবর পরে হবে।

—আরে উনি মধুরাবু। তুমি ঠিক চিনবে না। লিন্সে কোম্পানীতে একসময়ে ওর সাথে কাজ করছি। ভক্তগোক শুনেছি এখন কোথায় একটা ব্রিটিশ কার্মে কাজ করেন। পছন্দ করছি আমার চেয়ে বেশীই পান। বনেশা যে কিছু আছে মনে হয় না। এতগুলো টাকা মাইনে কি করেন জগবানই জানেন। ওর বাড়ীতে সেদিন খরে নিয়ে গিয়েছিলেন। মাসের মাত্র দশ তাহিৎ। এখনই যা দুর্গতি দেখলাম। দিতেই হোল কুড়িটা টাকা। নাহলে হেলেমেড়েগুলো হরতো না খেয়েই থাকবে।

আগিলগুলো মনমজা নয়। চোখে দেখা। বর্ণনাতে বিরতি চিহ্ন বলিয়ে সক্ষেহ ভাজন সবার কোন প্রয়োজন হয়নি। জ্রোতার কর্ণধ্বরে হামার এনভিল তওক্ষেপে অশ্বাভাবিক ভালে ঠোকটুকি শুক করে দিয়েছে।

—এর চেয়ে আমাকে একটা দড়ি কিনে দিলেও পারতে। তোমার যে কি হয়েছে কিছু বুঝি না। মাসের মাইনে তো সবই শেষ করে এনেছ। গোটা জুতো সপ্তাহের গুটির পিতির চিকুটা এখন আমার বাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নির্ভাবনার দাঁতের আড্ডার মহড়া জমাতে পারবে। আমি পারব না, হাইপোডা ঘরসোদারে খেঁচা ধরে গেছে।

অক্ষরবাহিত চক্ষুর্ধ্বরে উত্ত শব্দমণ্ডরে প্রস্থানই অক্ষমতার চরম নিদর্শন জানিয়ে গেল। এর পরে গুণ্ডে থাকা শব্দ তরংগ সাতশ বাতীর ফুলকির মতই টুকরো টুকরো, অসংলগ্ন মাত্র চল্লিশটা। টাকা তিনি চুশিলাবে বেছেছিলেন। সবকটা দিয়ে দিলেই ভালো হতো। তিনিও নিশ্চিত, ইনিও নিশ্চিত। একবেলা খাবার দে। হেডেই দিয়েছেন, বিতীর বেলাটাও না হও জল খেয়েই কাটাবেন। ভগবান এত লোককে চোখে দেখেছেন, তাকেই তথু যথতে পাননা। তাহলে নিশ্চিত পানহজ চালাবেন। যেত। নীপিতার দিন মাসের কলেজের মাইনে বাকি পড়ে আছে সেদিকে এতটুকু ক্রক্ষেপ নেই। বড় বাগতির তলাটা খেয়ে আঁতরা হয়ে আছে, দশমিনিটও জল ডবে রাখা যায় না। কোলকাতা থেকে সতীন পুর দিয়েছে মণিকাকে নিয়ে এ মাসের শেষাংশেই আগার এসে জুটবে।

.....ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে কেটে পড়াটাই অভ্যাস করে নিয়েছেন প্রিয়তোষাবাবু। তবে পদ্ধতিটা গুটির পিতি সিদ্ধ হবার পরমুহুর্তেই নির্গম্যে সম্ভব হতে পারে, পূর্বমুহুর্তে নয়। সংসমিত। প্রাপ্ত এ অবস্থায় বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে থাকা সম্ভবিত হবে না। সাতালানো তরকারিটা বিতীরবার ইল্পনে চড়ান মরকার। বিবেককে শূন্যে ফুলিয়ে হংগমকে হোঁচট খেয়ে পুনরাগমন করেন প্রিয়তোষাবাবু। বিবেকের গলার ভলুম মকের সুরটাকে পার্টে দিতেও পারে।

—আহা তুমি এত ক্ষেপে গেলেন কেন কুস্ত। আরও তো কুড়িটা টাকা রয়েছে। চাওরালো বুড়োর কাছেও পনেরটা টাকা পাচ্ছ, ও তবে জানি বেবে বলেছিল।

—ও আর দিয়েছে। আমার মরব হলে যদি দেয়।

পটানিচামের টুকরো। জলের সংস্পর্শ পেয়েও জলেই উঠলো।

—পরন্তু হবে বলে টাকাটা নিয়ে গেছে। আমার জাঙ্কের সমস্ত না এলে ওর পরন্তু কোনদিন হবে না। মাল্লখগুলো যে এমন নিমকহারাম হতে পারে জানতাম না। টাকা তো দিয়েই গেল না। আজ প্রায় পনের দিন হয়ে গেল একটু চাপবন্ত

দিয়ে হারানি। আক্ষেপ করছিলেন কুন্ডলা দেবী। মোলারিত ঘুটি চেপে কান কালাপালা ঘটানস ধামাতে তৎপর হলেন প্রিয়তোষবাবু। অনন্ত-
কাহার মুখোশোনা সংঘর্ষটা তার অংশে এস। চা-
ওয়ালার স্বাভাবিক অবনতি ঘটেছে। হসপিটালে
ওকে দেখেছেন নাকি অনন্তবাবু। কুন্ডলাদেবীর
বিশ্বাস-ব্রিদ্ধায় এককম বহুগারই ভূব বোবার চেষ্টা।
কারেছেন প্রিয়তোষবাবু। এবারও তল খুঁজে আর
পাননি। ভেসে ওঠাটাট মজাগত স্বভাবে
দাড়িয়েছে। অত দম তাকে সৃষ্টিকর্তা দেখনি।
অর্থ হুং না দিয়েও উপায় নেই। হাবুডুব খেলেও
মিতে হবে।

—‘যাক’ এভাবে আমাকে লাভিয়ে বলে যেতে
তোমার মুখে এতটুকু বাধন?’ কি পাপ হয়
কোনদিন ভেবে দেখেছ?

সংসার নকে কমেডির একটুকুরো তির্যক দৃষ্টি-
পাত। সকলেই হাসে। কুন্ডলাদেবীও হাসেন।
না ভেসে উপায় কি? স্বচক্ষে গতকালও লোকটাকে
দেখেছেন কুন্ডলাদেবী। অগুহে বসে। হুড়হুড়
করে বাড়ীর পাশ দিয়ে এক পলকে কোথায়
অন্তর্ধান হয়ে গেল। আজ তাকেই একজনে
নিবিধানে হসপিটালের রোগী বানিয়ে গিলে।

—‘আমি লাভিয়ে বলিনি কুন্ড। সূতোকাটা
ঘুড়ির মত পাক খেতে খেতে হাঁপ চাড়ে
প্রিয়তোষবাবু। অনন্তকাহার কথাটা আমার
ঠিক মনে পড়ছে না। বুড়োর চেলেপিলে কারও
অনুশ হতে পারে। খাবি খেয়েও খেব চেষ্টাটা
করতে হচ্ছে। বিশ্বাস সাগরের তলদেশে
পৌঁছালেন কি না সঠিক জানা গেল না। আর
সেটা জানতে দিতেও কুন্ডলাদেবী নারাজ। শত
হলেও পুষকবাস্তবতা, হরতো মনে স্থাং পাবেন।

—‘যাক’ তোমার সাথে অগড় বগড় বকে আর
পলাকথা করতে চাই না। কোথায় বেরোবে
বলেছিল। বেরোও। দহকারটা একটু
ভাঙাভাঙি সেটাই এসো। নাহলে বেলা দুপহরের
আগে চুটো গিলতে পারব না। কীচে গহুং আর
করতে চাইছেন না কুন্ডলাদেবী। দরকার ছিট-
কিনিটা তখন হয়তো খুলে রাখা হয়নি। খোলা
থাকলে লোকটা হয়তো আসতো। ছিটকিনিটা
না থাকলেই ভালো হতো।

ওটির পিড়ির ভাবনায় আবিভোক্তিক
আলাপলো জুলে যান কুন্ডলাদেবী। খাড়ি ঘেয়ে-
টাকে দিতে কুটো গাছটি কাটবার উপায় নেই।
আর করতে গেলেও এটা ভেসে ওটা কেলে
একাধার করে রাখবে। হারামজাদা কেলেটা
নেই লাভ সত্যলো ঘুটি মুখে তঁলে বেরিয়ে গেছে।
পেটে টান পড়ায় আগে আর এমুখো হবে না।
যথাসময়ে খাবার তৈরী না দেখলে মুখে চিতের
আগুন খেলে তবে নিকৃতি।

—‘হুট ওখানে কী করছিল? বাস্পরুদ্ধ গলার
আড়টতা কাটিয়ে নিজ ঘেরেকে জিজ্ঞাসা করেন
কুন্ডলাদেবী।

—‘সেখনি একটা ভিকিটো কখন থেকে বলে
আছে। পড়ার ঘরে আর টিকতে গিলে না।
বিহস্তির রোদতাপ ঘেয়েটিরও চোখে মুখে।

—‘কি অনুকণে ঘেয়ে দেখ। হেশনের চালটা
সবে এনে রেখেছে, আমি ওটাতে হাত। কেন
তোদের ভাড়ায়ে হাড়িতে কী ভিক্ষের চালটুকুও
অবশিষ্ট নেই। বুদ্ধিও ছিট কবে যে হবে...।

গলার স্বরের বিঘটুকু ঘেয়ের গলাতে নিশ্চয়
নিক্ষিপ্ত হয়নি। হামোশাই এটাকে স্বভাবসিদ্ধ
ধেনে এসেছে মেয়েটি।

—Oh, extremely sorry, I was going
to do a great wrong হাতের চালমুঠোকে
যথাসময়ে রেখে লুপ্ত ভিসটা হাতে এক অগুহে দেহ-
ভাগী করে ভাড়ার ঘরের দিকে পা বাড়ায়-মৃত্যু-
পটায়নী। মায়ের ব্যবহারের হরিতকী তৈরী
হলেও মুখসিদ্ধি অর্থাৎ সংসার নিষিদ্ধে নাকি
ভাষি পরমন্ত। মায়ের বুকে এককদই শুনে থাকে
মেয়েটি।

—অগভীর জলে সতরী করফরাতে।
ভাগ্যিস কোনদিন কলেজে পড়িনি। তোদের
মত নতেলিচানা দেখলে আমাদের শুভর-ভানুরেরা
একদিনে কবে চুলের মুঠো ধরে পাছদরকার বার-
করে দিতেন।

মেয়ের গমনপথের বিকে বাফাস্থা বর্ষণ করে
নিজগাছে ফিরে আসেন কুন্ডলাদেবী। নাবিকের
দিগদর্শন যন্ত্রের কীটার মতই। দখপাক খাবার
পরেও উত্তরে রাধাবর আরম্ভনিয়ে ভাড়ার ঘর।
চার পলসার মূলো আর দু পলসার ধনেপাতার

সংসারের সর্বস্ব কর্মী তিনি। তা হোক। ভবও পরপ্রভাশায় থেকে হ্রস্ব জিরিয়ে নবার উপায় তাঁর নেই।

শীতের সকালী সূর্যদেব বেলা দশটার সময়ও মাঝমাঝে শরীরে বণে থাকেন। বেলাটা সঠিক বৃষ্ণের উপায় নেই। উদ্ভূত ভাতটা কুটে গেছে। হাতা দিয়ে কয়েকটা কুটন ভাত তুলে মাঝ পরীক্ষা করেন কুশলাদেবী। নতুন চালের ভাত। একটু বেশী কুটে গেলে কন্ডার খেতে অবশিষ্ট হবে।

ঠক ঠক ঠক ঠক। দরজার কড়াটা কে যেন আবার অবিশ্রান্ত পিঠিয়ে চলেছে। আর তার চেয়েও অবিকতর উচ্চ শব্দে 'মা মা' চীৎকার। বিশ্রুত বৈধ নেই আগন্তুকর। দিবিয়র করে কিরে এলেন কেউ। ভিত্তি বিহীন হয়ে যান কুশলাদেবী। ভাতের মাড় গাঙ্গেত গিয়ে কিছুটা স্নতপ্ত মাড় হাতের উপর ছিটকে পড়ে আল। বস্ত্রের দিয়েছে—নীপা, এই নীপা। কানের মাথা কি খেয়েছিল না কি? ওটা আবার চীৎকার করে মরছে কেন দেখ। সুযোগ বুকে একখানা মোটারকমের কেতাং খুলে বসে মেয়েটি। সীমা-হীন বিরক্ত খটাঘার কারণে বীরর ছোট ভাইটির পিঠে হুগার যা পড়ুক, এটাই বোধ হয় মনে মনে প্রার্থনা করছিল নীপাটা। পরীক্ষার অজ্ঞাতে একটু তিনি ঘোরা তুলসী, উপরন্ত হাতে পাঁজি—হাতে পাঁজি মংগলবার। অতএব তার রেহাই সুনিশ্চিত।

কুশলাদেবীকেই উঠতে হোল। বিদ্বাদ্বেষণে রায়ার থেকে বেরিয়ে ছিত্তিকিনিটা খুলে মেন তিনি।—মরণ হলো বাঁচি। কী, কী হয়েছ তোরা। ম্যা ম্যা করে চীৎকার তুলে মরছিল কেন পাভী কোথাকার।

—জান মা আমি না রানে কাই আর হাই-জাম্পে সেকো। আর এক ইকি হলে হাইজাম্পে ঠিক মেরে দিতাম। সুদীর্ঘ সম্বন্ধের চেপে রাখা সুসংবাদটি রানের মতই সাঁই সাঁই ধমে কেড়ে ফেলে দিবিয়রী বীর। কিন্তু বুধা। এককড় সুসংবাদও নিমেষে কালির ছোপ বসিয়ে দেয় জোড়ার চোখে মুখে।

—রাব তোর হাইজাম্প। পড়ার বই এর একইকি শিখার আগ্রহ থাকলেও না হয় হোত।

কি হেলেরে বাবা। একটা ময়লা গেজি গারে ফেলে সেই সকাল থেকে চাবার হেলের মত মাঠ-ঘাট চেষ্টে বেড়াচ্ছে। একটু লজ্জা-সরসের বালাই নেই।

—হুঁ গেজি পরে স্পোর্টসে গেছি বৃষ্টি। নীল শাটটা পরে দিয়েছি। প্রেক্ষিকের শিখিল বন্ধন ছাড়ে আকড়ে ধরে দিবিয়রী বীর। মায়ের সম্মেলনটাকে তুড়ি মেঘের সপর্বে উড়িয়ে দেয়।

—খাটটা আগার কোথায় ফেলে এসেছিল? অবৈধ প্রস্নে জানতে চান কুশলা দেবী।

হেঁড়া জামা কেউ পরে নাকি? দিয়ে দিয়েছি। অবিচলিত সংক্ষিপ্ত জবাবে মৌমাংসা করে দেয় অকৃত্যপরাধ দিবিয়রী।

তপ্ত হেলের জলের ফোঁটা আর কি? এক-মাসও হয়নি জামাটাকে কিনে নেওয়া হচ্ছে। তাকে বলে কিনা হেঁড়া। অস্থগীন মুখে আস্থান জানানো হোল দিবিয়রী বীরকে। জেরা মুক হোল। হিঁড়ল কি করে? কাকে দিয়েছে? কালকে কি পরে তুলে যাবে?.....ইত্যাদি। সুযোগ মত অজ্ঞের মহাপ্রতি নিক্ষেপ করে দিবিয়রী। কারা জুড়ে দেয়। অব্যর্থ এই অস্থটি তার দিবিয়রে প্রাচল্যই বাবস্তত হয়ে থাকে।—হুঁ হাইজাম্পে দড়িতে বেঁধে জামাটা হিঁড়ে গেল। আমি কী ইচ্ছা করে ছিঁড়েছি নাকি?

অত্র সংবরণ করে নিতে বাধ্য হলেন কুশলা-দেবী। দরজার কড়াটা আবার কে যেন বিরামহীন চুকে চলেছে। অপাংগ ইংগিতে হেলের বিচাঘের রায় আপাততঃ স্থগিত রাখে কুশলাদেবী। হোব-সিক্ত মুখের বহিঃপ্রকাশগুলোকে কাপড়ের আঁচলে ঠেকে ছিত্তিকিনিটা খুলে মেন তিনি।

—আচ্ছা এটা কী মি: সেনস্ত্রের বাড়ী?
—হ্যাঁ, আপনাতঃ কি দরকার?
—আপনি মানে কাইগুলি তাকে একটু ডেকে দিননা।

—তিনি বাড়ী নেই।
—বাড়ী নেই। তবে যে তিনি বসলেন.....
—হাতে আর কি। আপনাতঃ কি প্রয়োজন আমাকে বলতে পারেন। উত্তরবেশীকে আশ্রয় করেন কুশলাদেবী।
—প্রয়োজন আর কিছু নয়। উনি একটা

টিউশানির কথা বলেছিলেন। আতালি পাতালি করেন ভয়বশী :

—টিউশানি ? কোথায় ? আমার বাড়ী ?

না না আপনার বাড়ীতে নয়। সসজ্জ হাসেন ভয়বশী। আপনার বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটর আছেন সেটা আমি সেনগুপ্তবাবুর মুখে শুনেছি। এটা হয়তো অল্প কোথাও হয়ে।

টিউশানমুখের কথাটা স্বামীশ্রদ্ধার তুল্যগুণে কিছু ওজন বাড়িয়ে দেয়নি বলাই বাহুল্য। 'বাইরে কৌচায় পশুন ভিতরে ছুঁচোর কেন্দন।' অসামান্য ভয় বোধ করেন কুন্তলাদেবী। স্বামী শুধু তাকেই বানিয়ে কথা বলেন। নিজের দুর্ভাগ্য ঢাকা দেবার মিথো বুলি আরও পাঁচজন বাইরের লোকের কানে নিবিবাদে তুলে ধরেন ! তবু স্ত্রী হয়ে তার অমর্যাদা করতে বিবেক বাধে কুন্তলাদেবীর। পরিবেশ-টাকে সংকেত স্বাভাবিক করে নেন। এর পর অনেক কথাই হোল ! অনেক দুর্ভাগ্যের কথাই জানালেন টিউশানমুখো। বি-এস-সি কোর্স ইত্যাদের চার। সমস্ত পিছুতীন চরিত্রকে একে-বারে নিঃস্বল। একটা টিউশান না হোলে পড়া-শোনা ছেড়ে দেওয়া হাড়া উপাচাস্তর নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বামীর হাতবশের ডায়েরী তরতর করে খুঁজে কতকগুলো ভিন্নো ছাড়া আর কোন সংখ্যাই দেখতে পাননা কুন্তলাদেবী। টিউশানমুখো হয়ে এ লোকটা। বারংবার তার দরজায় এসে ছড়া নাড়ে, সেটাও বন্ধ বিচ্ছিন্নি মনে হল। 'একুনি কিছু একটা করলাসা করে ফেসবার জঙ্গ স্তম্ভকল্প হলেন কুন্তলাদেবী। জানিয়ে দিলেন এ বাড়ীর মটর বাস ছয়েকের দুট মজুর করে নিয়েছেন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আপাততঃ এখানেই টিউশান-মুখো তার বিজ্ঞ কলাতে পারেন। বাঁদর ছেলেটা না হলে এ রুমাসে হুমান সেজে কিচ্ছিয়া কাণ্ড সমাপ্ত করে রাখবে। স্বভাবসিদ্ধ গলাতেই অনভি-শ্রুত পূর্ব প্রোভাটর সামন্তশ্রুও বাগতে হয় কুন্তলাদেবীকে। বাই হোক, কিচ্ছিয়া কাণ্ডের কল্লাটা সবার নিম্ন করে দেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বিদায় নিলেন টিউশানমুখো। অসময়ে বিরক্তি ঘটায় জঙ্গ কমা প্রার্থনাও করে গেলেন।

মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই কাকদানটা

সেয়ে নিয়েছে দিহিঙ্গী বীর। বাড়ীটা আজকাল বড় স্নো যাচ্ছে, এরকম একটা মস্তব্য পেশ করে খাবার বারান্দায় আসন পেতে বসে পড়ে। খালি পল্লিবেশিত খাড়াবোর মনুনা দেখে তার চক্ষুর। কতকগুলো হাইপান দিয়ে ভাত খাওয়া তার অসম্ভব। দুধ দিতে হবে। লৌকিকতার চায়ের কলের রং পাট্টাতে একপোয়া দুধ এ বাড়ীতে নিভা আসে। মাহ নেই, তরকারি ঝাল ইত্যাদি অজুহাতে মাঝে মাঝে উক্ত একপোয়ায় বাড়ীর ছোট ছেলের দাবী জানায় দিহিঙ্গী বীর। ইতি-পূর্বে ডাংডাংয়ে গোবী অনাহুত একটা চারপেয়ে প্রাণীও সেরকম কিছু একটা দাবী নিয়ে এসেছিল। মায়ের চোখকে বিশ্বাস না করলেও ময়ের চোখকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে। আজকে কেন জানি ময়ের গোবুটোও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। একটা ভাংগা ঝটোর আঘাত খেয়ে ক্ষুরমনে পালিয়ে গেছে ডাংডাংয়ে গোবী। তা হোলই বা। বেড়ালে বুঝ দিয়েছে ওতে কিছু এনে যায় না। তরুর ওতে আপত্তি নেই। মা যতো অনাসুতি বাধিয়ে দিলেন। পক্ষ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ মারফৎ নানা তর্জন গর্জনের সমাহার ছড়াতে ছড়াতে খাবার কলে উঠে যায় দিহিঙ্গী বীর। প্রথমমনে ভাতের খালটা তুলে রাখেন কুন্তলা দেবী। পেটে টান পড়লে আপনি এসে খাবে, এরকম "একটা প্রসিপলের" উপর ভিত্তি করে থাক। নাকি অধিকতর নিরাপদ-জনক।

দিনমণি মাধায় এসে পৌছাবার পূর্বেই মাঝার ঘূটির শেষ চালটা সেয়ে নেন প্রিভোডাবাবু। বেলা বাড়লে মাঝার ঘূটির সংসার আবার বিপথগামী হবে। আর তার আকুল সেলামী দিতে হবে চাঁবতে চাঁবতে কিংবা অর্ধভুক্ত অন্নপাত্র বর্জনে। বিশ বছরের বরসংসারে বহু বিশ্বাসের থেটা হয়ে এসেছে। ঘরে ফিরে দেখতে পান ছেলেমেয়ে ছটোব একটিও ঘরে নেই। সীতের রবিবার। গায়ে পিঠে ভাল করে একটু সরষের তেল ঘষিয়ে নেবেন তা আর হচ্ছেনা। ছেলেটি সাধারণতঃ এসবের বাবে কাঁদে আসে না। 'হাত ব্যথা' কখনও 'ঘুর পাচ্ছে'। এক আঁধুটু আঁধাবার যেটাবার প্রাতিশ্রুতিতে বেরটেকে দিয়ে কিছু কাঁকরমাশ খাটিয়ে নেয়া চলে। ছেলে প্রসঙ্গে

পুরণো রেকর্ডখানা নিত্যপ্রাথমিক বাজিয়ে
শোনান কুন্তলাদেবী। দিনে দিনে বড় বয়স্কা
হয়ে উঠেছে। পাতে মাছ দেখতে না পেয়ে নবাব-
পুত্রর থালা ফেলে উঠে গেছিলেন। রেডিও-
এায়ের শোনার রেকর্ডখানা কেমন একটু
বোম্বুরে মনে হল প্রিয়তোষবাবু।... প্রান্তি-
বেশী নুপেনবাবুর মেজবৌর বেলের মুখে
ভাত। নুপেনবাবুর স্ত্রী এসেছিলেন। এবেলা
ওখানেই বাবে বলে শুরু আর নীপাকে নিয়ে
গেছেন।

নুপেনবাবুর দলও এসময়েই এসে থাকেন।
দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের পাতায় চোখ
বোলান প্রিয়তোষবাবু। না, মাসটা কেতুগায়ী নয়।

আনন্দ সংক্ষিপ্ত উপচারে দেবে বেন প্রিয়তোষ-
বাবু। খাভ্রব্য পরিবেশন করে আঘাড়ে পল্লের
ধিতীয় আসরের ব্যবস্থা করছিলেন কুন্তলাদেবী।
একঝলক ফিকে হাসিতে ধিতীয় আসরের ইচ্ছাধন
হোল। হাসছিলেন কুন্তলাদেবী।—সাহাধিন দরবার
আর দরবার। মুখে মাখার কাকের বাসা। আরও
কিছুদিন ওগুলো থাকলে উকুন পড়বে। আকর্ষ-
বিস্তৃত কাঁচা পাকা চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে
খড়কুটীর এলোপাতাড়ি কাকের বাসায় তৈরী
করেছিলেন প্রিয়তোষবাবু। 'কাটি কাটি' করেও
কাটা আর হয়নি। বাবার ঘুটির ভাবনাতেও
হতে পারে। একখানা কড়কড়ে একটাকার নোট
এত খীত্র সেলুন মানিষের হাতে তুলে দিতে
ইচ্ছে হচ্ছিল না।—আজ্ঞা তোমাদের আপিলে
সবাই কি এরকম বেশে যায়? জানতে চান কুন্তলা-
দেবী। সকলে যায় কিনা সঠিক জানেন না
প্রিয়তোষবাবু। কেউ কেউ যায়। তবে ই্যা
ফিরবার পথে সকলে একই বেশে ফেরে না।
উনিবেস্ট পরা দরজার পাশের লোকগুলো ঘাবের
দেখতে পেলে তিন ইঞ্চি বক্ষপ্রদারণ করে কাঁড়ায়।
সাহায্য, সঙ্গায্য সব সময়। সেভিটা আপিস-
কমেই ঘেরে নিতে হয়। বাবার ঘুটির দরবার
ভাবের গুস্ত নয়। বাবার ঘুটির আদালতে হাবুডু-
খেতেও হয়না। এসব কথা মেয়ে মাছুষকে বুঝিয়ে
কিছু লাভ নেই। আত্মপ্রদান পেতে চেষ্টা করেন
প্রিয়তোষবাবু। কোন সহজর না দিতে পেবে
পূর্বপ্রসঙ্গের হৃদ্যোভাগ করেন। স্ত্রীতের কথা।

বি-কম সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে। ঘাহোক একটা
চাকরী-বাকরী জুটিয়ে নিতে পারবে। বুড়োবাপ
অধিলগ্ন্য এবার গংগাস্তান করে নেবেন। সুত্রত-
প্রসঙ্গে অধিল হালদারের ছোট ছেলের সিন্ধুটা
তীত্র বিচ্ছা এনে দেয় কুন্তলাদেবীকে। স্ত্রীতের
মত ছেলের ভাই হয়েও কী রকম অদম্য মুখা।
খাকে যা মুখে আসে বলে যায়। বিচারবুদ্ধি
কিছু নেই একেবারে। মারও খায় ভেমনি।
বাপ যেদিন ধরবেন একেবারে আঘমড়া করে
ছাড়েন। কোথায় হরিষার আর কোথায়
তি জানি একটা উপমা ব্যবহার করতে চাইছিলেন
কুন্তলাদেবী। স্বামীর মুখাবলোকন করে ওখানেই
ইতি করলেন। প্রিয়তোষবাবুর বাওয়া শেষ হয়ে
গেছে। পাতে একমুঠো ভাত পড়ে রইল। ওলুটো
ভাত আবার কারও বেশী হয় নাকি? আপত্তি
তুলেছিলেন কুন্তলাদেবী। ভাত মুঠো ত্রীর পাতে
তুলে দিয়ে পেটে হাত বোলান প্রিয়তোষবাবু।
চের বাওয়া হয়ে গেছে।

ছি'টেফে'টা পলিটিকসের গন্ধও কখনো-
সখনো এ আসরের বাতাসে আনাগোনা করে।
দেশনেতাদের কথা। নাক দি'টকে নেন কুন্তলা-
দেবী।—রাখ তোমাদের দেশনেতাদের বাহাছনি।
পেটে ছুট্টো বদাদ চাল দিলে যেমন ডারও
আরও কাঁকড় পাখর হাবিআবি। 'ঘত ছিল
নড়াবুনে হল সব কেসু'ন' অভিযোগ তোলেন
কুন্তলাদেবী। নড়াবুনেদের গালভরা বুলির কেনা
যে কত অন্তঃসারহীন এগু'হর সর্বময় কর্তীট
প্রতি পরেপমেই সেটা টের পান। গোর'গার
ল্যাংক্টামিটার ডেনসিটির দাগমাত্রা নিতাই অবল-
বদল হচ্ছে। চারপয়সার ছুদিন আগেও এই
এতগুলো গরম মশলা নিয়ে আসতে; তরু। এখন
চারপয়সার মশলা আনতে দিলে অবনি পয়সাটা
ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বোকাবীর মুখ বি'চুনি
সুদতে সে নারাজ। নচনপুর না কোথায় সুধার
ভাউনয়ে পেটের সন্তানকে ঝাঙ্কড়ে ঘেরে ফেলছে
অভাগী মা। আজকের কাগজেই তো বেবলেন
মনে পড়ছে। পাশেও বাড়ীর দিদিও সেদিন
বলেছিলেন ভাড়াভালার তার বাপের বাড়ীর কাছে
কোন একভল্লোলকের বাড়ী। 'দিনেদুপুরে বগাবার্কী
কতকগুলো লোক ঢুক বাড়ীর ঘেরঘের উপর

বেইজুত করে সোনাদানা দিনতাই করে নিয়ে গেছে। এইতো দেশের অবস্থা। আমার বাপারীর জাহাজের খবরে কিছু এসে যায় না। এ তথ্যটা ভালই বোধেন কুস্তলাদেবী। তবুও অগাধ কষ্ট এসব দেশনেতাদের মুখে পোড়া ঘুটের ছাই আর কেয়াসিন তেল ঢেলে অগ্নিযোগ করবার সদ্ভিচ্ছাটা তিনি এরকম যে কোন আশারই নির্ভয়ে প্রকাশ করে থাকেন। ডি আই কলের কথাটা মনে পড়লেও।

কথায় কথায় টিউনানমুখো হাভাতে লোকটার কথাও বান যায় না। যার তার কাছে টিউনানি চেয়ে বেড়ায়। বি-এস-সি পরীক্ষা খেয়ে না কি ছাট করবে। সে চিকিৎসা টেড্‌জি পিটিয়ে আরও পাঁচজন মরণে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেটিকে একটি স্বল্পস্থায়ী কল্যেবস্ত করে দেয়া হয়েছে। হতো আপন আর কি। বলছিলেন কুস্তলাদেবী। কথ্যটা শ্রোতার বোধশক্তিতে বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছে একে দিল। দিনকয়েক পূর্বেরও ভিক্ষাপ্রার্থী কোথাকার একটা জ্ঞানাল মেয়েকে কি মতপবে জানি যেনে দিয়েছিলেন কুস্তলাদেবী। গতর আছে যখন তাকে না করে খেটে খেলেও পার বাছ—

এরকম কি জানি স্মরণও দিয়েছিলেন। কিন্তু দিন তিনেক বাপে বাজার করতে যেনা পরশা কটি নিয়ে ব্যাজারমুখো আর ফিরে আসেনি। এ বাড়ীর মার যা তেতোবুলি তাতে ঘরের মেয়েই মাঝে মাঝে বহুভাড়া হয়ে থাকে, পথের মেয়ের আর দেখ কি? প্রতিবেশী দিদরা আড়ালে-আবডালে এরকমই কিছু বলাবলি করেছিলেন। যাহেন যিনি রাখেনও তিনি অথবা চিন্তা নেই যার তিনিই চিন্তাযদি। ভাবছিলেন প্রিয়তোষাবাবু। স্তব্রাং প্রতিবাদ তার বে-একিয়ারে, অবিরচনা প্রস্তুত। তবু ভাবতে হয়। চার পরসার সূলা আর দু পরসার ধনে পাতার বাজার হিসেবের জটাই ভাবতে হয়। পুরণো রেওঁগুলো না হলে এ বাড়ীতে কোনদিন পুরণো হবে না। দাতাকর্ণ ছেলেটি নতুন জামটাকে কাকে দান করে এসেছেন। কি পরে কাল যে আবার সূলে যাবে ঠিক নেই। নীপিতার ভিন মালের কলোজের মাইনে বাকী। কোলকাতা থেকে ছোট ঠাকুরপো পত্র দিয়েছে এ মাদেনর শেষশেষি ছেলে বৌ নিয়ে বেড়িয়ে যাবে। নৃপেনবাবুর নতির

মুখে স্নাত্তে ওদের খেতে নিয়ে গেল। জুতার টাকার বাহোক কিছু কিনে দিতে হবে। চুল দাড়ি কেটে আর বরকাত নেই। বরকাত ছিটকিনিটা খুলে দেবার দরকার। কে জানি আবার বেথুকে পেটিয়ে যাচ্ছে। উঠতে হোল প্রিয়তোষাবাবুকে।

ডাকপিয়ন। জিজ্ঞাসু নৃষ্টিতে স্থান পেয়েছেন জীবন্তী কুস্তলা সেনগুপ্ত। মণিহর্ডার আর পোষ্ট-কার্ড। কিং অপ্রতিভ হচ্ছে পোষ্টকার্ডখানাই তুলে নেন প্রিয়তোষাবাবু। খিচী কান্টাতে ডাক-নৃতের আপত্তি। হোলই বা স্বামী। যিনি পাঠাচ্ছেন তারই বিশ্বাস নেই তবে আর ডাকনৃতের দেখ কি?

পূরনীয়া কুস্তলাদি,

প্রায় এগার বছর বাপে পত্রালাপ করছি। আপনারা যে শ্রামবাজার ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন সঠিক জানতাম না। সেদিন ঠিকানা সংগ্রহ করে ৪০ টাকা মণিহর্ডারযোগে পাঠালাম। আসপটাই শুধু। সত্যি সেদিন মুহূর্ত পথযাত্রী স্বামীকে বাঁচাবার জন্য যে অর্থ লান্ধা করেছিলেন তার স্মৃতি হিসেব করে আজ আর লান্ধা পেতে চাই না। সময় পেলেই একবার বেথা কোরব।

বেণুকা

পুঃ—একটা কথা চিন্তা করে পত্র সমাপ্তি রেখা কাটতে হচ্ছে। ভাবছিলেন পত্রে প্রবৃত্ত ঠিকানাতে টাকাটা যাবার ক্ষেত্রে না আসে। আজকে আমার দুটো ছেলেই সমর্থ। অভাব বলতে হয়তো ভেদম কিছু নেই। এ টাকাটা না পাটিয়ে সোয়াস্তিও পাচ্ছিলাম না। কিছু অশোভন হলে মার্জন্য করবেন।

মৌন নৃষ্টিটা পত্র থেকে তুলে ছাপা এগিয়ে আসেন প্রিয়তোষাবাবু। —কুস্ত, তোমার নামে কে একটা মনি অর্ডার করেছে।

বিস্ময় চেতনায় মুহূর্তকাল স্বামীকে পর্যবেক্ষণ করে অপেক্ষমাণ পত্রাবাহকের কাগজে প্রান্তি-বীকার জানিয়ে টাকা কয়টি নিয়ে চলে আসেন কুস্তলাদেবী।

—এভাবে আমার কত টাকাই যে তুমি সরিয়েছ তার ঠিক আছে। যান হেসে পত্রখানা জীব হাতে এগিয়ে দেন প্রিয়তোষাবাবু।

—সরিয়েই যদি থাকি এবার ক্ষেত্র দেখিছি।

হোল ভো। কুসুম কুণ্ডিত হস্তে টাকগুলো
স্বামীর বিকে ছুঁড়ে দেন কুন্তলাধরী।

বিশ্ববন্দে অবাধ করা শিতক্কে ত কিয়ে
ছিলেন প্রিয়ভোষণা তার বিশ্ববন্দের জীবন-
সংসিনীর বিকে। খোলা দরজাটা হঠাৎ নজরে
পড়ায় কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

জাকপিরন চল গেছে। ভাড়াটে বাড়ীর
অন্তঃপুরিকাদের আবাক রক্তক লম্বা দরজাটা
সটান খোলা রয়েছে। রঙটা ছিটকিনিটা চিত্ত
ধরা ওপাশের কপাটের আড়ালে। রোষান্বিত
কোন রমণী হস্তের বারংবার টানা হেঁচড়াতেও

অক্ষত হয়েছে। ছিটকিনিটা আজ আর
আটকে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না প্রিয়ভোষণাব্যব।
পৃথিবীর কোড়ুলী দৃষ্টিগুলো এই অবগুষ্ঠনের
জন্তই অন্তঃপুরবাণিনীর অস্থির প্রবেশের কোন
বোঝাই রাখতে পারেনি। দরজাটা খোলাই রইল।
দমকা বাতাস এপথে শুধু খুলোপাণি ছড়াতেই
আসেনা, শীতার্ঘ্য বেহটতে রোসের অগ্নিহুঁত
কখনো কখনো দিগে যায়। হয়তো, তার পরস্পার
খুলো আর দুপল্লার ধনেপাতার বাজার বিশেষ
বাড়াতে আসে। মেলাতেও আসে।

বাংলা ভাষা

বেলা দেবী

যেদিন প্রবহ ঘুরে আসে পড়েছিল আমার জুগোষে
বাতাস প্রবহ দিল লকারি নিঃশ্বাস বায়ু বৃকে
দাড়িয়ে তিরিয়ে বসনা
যে ভাষার উচ্চারণ কেবলি প্রবহ লব—‘আ’
সে ভাষা বাংলা ভাষা, সে ভাষা আমার
বর্ষে বর্ষে বৃক্ষফল, পৌষ শ্রাব বাংলায়।
আমার সমস্ত হৃদে স্পন্দন আমার
সমস্ত চেতনা ভরে শিথ ল্পর্শে ছুঁতে ছুঁতে যায়
কোন্ বানী কোন্ হৃদে কোন্, সে লবীত
কোন্, ইতিহাসে ভরা মুখর অতীত
অমির নিবাই বানী, কানীদাস কবি কতিধাস
অরবাহুল কাব্য বিভাগতি আর চৌধাস
যে ভাষার কাকিলিতে ভরীতে হরীতে ভোগে

অমৃত বসাব

সে ভাষা বাংলাভাষা সে ভাষা আমার।
বংন অমৃত হৃদে কঠে আসে পলক উজ্জ্বল
কিবো বংনীর অতি বংন প্রকাশ
হৃদয়ালে মনুতে অহরণে তির্য লভ্যবন
গভীর মনতা দিয়ে বংনই যা কবি উচ্চারণ
প্রাণের স্পন্দ সে যে বর্ষে বর্ষে বৃক্ষফল ভাষা
আমার চোখের আলো, সে আমার মন তানব্যা
সমস্ত দবা দিয়ে অহরহ যার ল্পর্শ পাই
যংক অকীকার করে আমার অতিথি কিছু নাই
যে ভাষার বিশ্বকবি অকলি অকলি অংলো
পৃথিবীকে দিল উপহার
সে ভাষা বাংলা ভাষা, সে ভাষা আমার।

স্বাস্থ্য, শ্রম ও উৎপাদন

জীননী ভঁটাচার্য্য

স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রত্যেক মানুষেরই জাতি বর্ম নির্বিশেষে কতগুলি সমস্ত থাকে বা, ভৌগোলিক সীমা, আবহাওয়া বা আচার-বিচারের উপর নির্ভর করে না। বিশেষকরে বায়ু বিষয়ে সমস্তগুলির তপ প্রত্যেক দেশেই প্রায় এক প্রকার। এই উপলব্ধির উপর নির্ভর করেই ১৯৪৮ সালের ১ই এপ্রিল জেনেভাতে বিশ্বের প্রায় সব জাতি মিলিত হয়ে 'বিশ্ববায়ু সংস্থা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি 'বিশ্ববায়ু দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

বিশ্ব সমস্ত প্রতিকরের দ্বারা প্রকারে প্রভাবিত থেকে পূর্ণাঙ্গ বংশের আগে বিশ্ব বায়ু সংস্থার মতই একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক সংস্থা সংস্থাপিত হয়। এই বংশের এই সংস্থার পূর্ণাঙ্গ বংশের পুতি উৎসবের প্রথম বিশ্ববায়ু সংস্থাও তাদের এ বংশের আলাদা বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, "বায়ু প্রতিক ও উৎপাদন"। এই বিষয়ের তাৎপর্য হলো প্রতিকের বায়ুর উপরই নির্ভর করেছে শিল্পের উৎপাদন ও দেশের সমৃদ্ধি। কোন প্রতিক যদি প্রাচীনিক বা মানসিক অনুভব হন তবে তিনি তাঁর কানে কখনও মনোবোন্দী হতে পারবেন না। তাতে একটিকে যেমন উৎপাদন ও কালের ব্যাঘাত ঘটবে তেমনি দেশের সমৃদ্ধিও ব্যাহত হবে।

শিল্পকলার বিকাশের পর থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে কারখানা স্থাপিত হয়েছে অনেক, উৎপাদন কেন্দ্রে প্রচুর। নতুন নতুন শিল্প ও প্রসারিত হয়েছে দেশের। সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে কলকারখানা জনিত নানা অসুখ-বিষ। উন্নত দেশগুলিতে প্রতিক দ্বারা বজায়

প্রকারে প্রতিক অনেকগুলি আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী কারখানার প্রতিকের ক্যান্টিন, বাথরুম, ডিঙ্কিংনার সুযোগ প্রভৃতি বেওয়ার বাধ্য করা হয়েছে। জীবন বীমা, বাধ্যতা ভাতা, স্ত্রী প্রতিকের প্রদরকালীন ছুটি ইত্যাদিরও সুযোগ বেওয়ার হয়েছে। অবশ্য আমাদের মত অনগ্রসর দেশে এই অপরিহার্য সুযোগগুলি অনেকাংশেই এখনও পর্যন্ত প্রতিকৃতির জবে রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৪ হাজার ২ শতাংশটি কারখানা রয়েছে, তাতে প্রতিদিন ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার (৮,৮৭,০০০) প্রতিক কাম করছেন। তা'ছাড়া ২৮৪টি কারখানা খনিতে কাম করছেন ১ লক্ষ ৩২ হাজার ২শো ৬৭ (১,৩২,২৬৭), বন্দর প্রতিক সংখ্যা হলো ৪০,০৮১, তা'ছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প, চোটেস, হেট্টেটে প্রতিকৃতির সংখ্যা হলো প্রায় ২,২৪,৭২১, তাতে কাম করছেন ৪,৪৬,৭০৪ জন প্রতিক। এ ছাড়া, এই রাজ্যের ৩ শিল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ ৩ প্রতিক নিযুক্ত। এই সংখ্যাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আমাদের জনসংখ্যার বেশ একটি বৃহৎ অংশই প্রতিক হিসাবে জীবিক। অর্জন করছেন। এদের উপরই নির্ভর করেছে কারখানার উৎপাদন, দেশের সমৃদ্ধি। কিন্তু দেখা যায় আমাদের শিল্পক'গুলিতে বহু অভাবের এখনও পর্যন্ত দ্বিগুণ ও অস্বাভাবিক বসতি রয়ে গেছে। কঠোর পরিশ্রমকারীদের প্রতিক উপলব্ধ খাদ্য, বিস্রামের বাধ্যতা ও যোগ প্রতিকের বাধ্যতা এখনও করা সম্ভব হয়নি। আবহা আনি করলার খনিতে গোথের যোগ, হাণানী, গম্মা,কেইজন্ম লিকেন্স ইত্যাদি হয়। ক্যান্টিনগুলিতে গোথের যোগ, লিউকোমিয়া, লেড, পরলমনি, টিউনেল

প্রভৃতি যোগ হয়ে থাকে। তা বাখান গুলিতে বহু
তথ্যই ও নানাবিধ সর্ব রোগ চা' শ্রমিকদের নিত্য দলী।

গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গ ২ কোটি ১০ লক্ষ ১ হাজার
পাঁচশ ৬২ টাকা যোগ অনিত সাহায্য দেওয়া হয়েছে।
মহিলা কর্মীদের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৩শা ২৯ টাকা প্রশং-
কালীন সাহায্য দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের আত্মকাল
দব বন্ধন চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং যুগ্ম পর পরিবারিক
ভাত্য দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একথা অবশ্যই
স্বীকার করতে হবে, প্রয়োজনের তুলনায় এই সব
সাহায্যে বন্দোবস্ত অপ্রতুল এবং এক বিরাট সংখ্যক
শ্রমিক এখনও পর্যন্ত এই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

সম্প্রতি গ্রেটব্রিটেনে এক পতীক্ষার দেখা গেছে যে,
শ্রম বিবেচকের দৃষ্টে যদি এক মিনিট নষ্ট হয়ে থাকে, তা'
হলে নয় মিনিট নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন ব্যবসার দুর্ভিত্য এবং
দু'শতাংশও বেশী লম্বা নষ্ট হয়েছে অর্থব্যয়ের বক্ষণ। এ
বেশেও এ' চিত্রের দু'ব বেশী তারতম্য হয়ে না। খুণা,
গরম, আগুয়াম, বিদ্যুত্ গ্যাস, ইত্যাদি এবং স্রাস্তি এ'
ভূমির প্রতিফ্রিয়া হতে লক্ষ লক্ষ উপপত্তি করা যায় না
কিন্তু এই লবণগুলিই শ্রমিকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এক
হিগারে একটা কারখানাকে একটা দুচ্চক্ষের লক্ষ তুলনা
করা চলে। কোন্‌ ব্যবসার শিল্প পদ্ধতি অসুদরন করা
হচ্ছে, তার গুণের নির্ভর করে শ্রমিক স্বাস্থ্যের স্থিতিগুলি
অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে। কাজেই শ্রমিক স্বাস্থ্যের
উন্নতির জন্য কারখানার শুষ্ক অস্থিত্য বা দুর্গতি নিবারণের
বিকে লক্ষ রাখলেই চলেবে না, কাজের পরিবেশের উন্নতির
বিকেল লক্ষ রাখতে হবে। বহুশাতিক বাল্লবের লক্ষ
খাপ খাওয়াতে হবে, যতদূরক বহুশাতির লক্ষ নয়। নিম্ন
সীমা তৈরী, সোথন ও বহন, ছাপাখানা, ইলেক্ট্রোলাইটিক্
মেশিন, জ্যোমিক অ্যাপিড উৎপাদন, ইলেক্ট্রিক্ এন্ড-
মুপেটার তৈরী ও সাহায্য, কাঁচের কারখানা ও বৃন্দ্যক্রের
কারখানা প্রভৃতি বিশেষকর কাজকর্মের ক্ষেত্রে পতর্কতা-
বৃদ্ধি ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রধান গুরুত্বপূর্ণ
হচ্ছে, শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত ক্যাটিন ও অবসর
বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা এবং স্রাস্তি ও একঘেয়েমী দূর
করাব অন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। সেই
লক্ষ কাজের খট্টাকেও এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাকার

যাতে বক্ষতা বিন্দুবার কথিগ্রন্থ না হয়।

প্রশংসক্রে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এবং
আমাদের শ্রমিক ভাইদেরও অগ্রসর করছি, তাঁরা যেন কার
খানান্তেভত্রে যে লম্বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ,
সীমাবদ্ধভাবে হলেও, আছে তা' যেন তাঁরা অবশ্যই গ্রহণ
করেন। কারণ অনেক লম্বা আদায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা
না গ্রহণের জন্যই দুর্ভিত্য ঘটে। তা' দৃষ্ট্য নিরাপত্তা
ব্যবস্থা না গ্রহণের জন্য হরহরো বর্তমানে আপনায় কোন
ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু দল বৎসর পরে দেখা দেয়া,
সেটা' আপনায় অস্থিত্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
করকার খনি, লোহা পাগাই গ্যাস প্রভৃতি কারখানায়
চোকার লম্বা এবং প্রতি ১১ দিন অন্তর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য
পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এই নিয়মিত ব্যস্থা পরীক্ষার
কোন যোগ হলে তা' সহজেই ধরা পড়ে। আত্মকাল
প্রত্যেক কারখানায়, খনিতে শ্রমিকদের নিয়মিত ব্যস্থা
পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে, তা' ছাড়া কোন অস্থি হলেই
বিনামূল্যে সব বন্ধন চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে।
কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা যতদূর চিকিৎসকের কাছে যেতে
চান না। কারণের খট্টা নষ্ট হবে, কিম্বা রোগ বহু শঃপে
কাল করতে দেওয়া হবে না, এই ভেবে যোগ বতক্ষণ না
বেনী হয়, ততক্ষণ তাঁরা যোগ গোপনের চেষ্টাই করেন।
এতে তাঁর নিজের যেমন ক্ষতি হয়, অন্যর আর পাঁচজন
দক্ষকর্মীও তাঁর যোগে লক্ষ্যাহিত হতে পারেন। নিজের,
পরিবারের এবং আর পাঁচজনের কথা চিন্তা করে যোগ
কখনও গোপন করবেন না। বনশ, কলো, টাইফয়েড,
প্রভৃতি যোগ প্রতিযোগক টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে,
সেগুলোও আপনাকে অগ্রণী হয়ে গ্রহণ করতে হবে।
আপনার কারখানায় ক্যাটিনে লম্বা খাবার পাবার যে
ব্যবস্থাটিই রয়েছে, এই সব ব্যবস্থা সম্প্রদায়িত করার জন্য
কলকারখানায় মালিকদের যে হাতিয়ে রয়েছে, তাঁদের সে
হাতিয়ে পালন করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিকেও
এমন উপযুক্ত কর্মদৃষ্টি নিতে হবে।

প্রশংসক্রে আর একটি কথা উল্লেখ করছি। বর্তমানে
কারখানগুলিতে যে পরিবার শ্রমিকদের ব্যবস্থা হয়েছে তা'
গ্রহণ করুন। বহু লম্বা হল শ্রীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে,
অর্থনৈতিক দৃষ্টে দেখা দেয়, কলে শ্রমিকদের মানসিক

শাস্তি ব্যাহত হয়। কারখানার কাছে অধঃযোগ্য হওয়ার স্বতন্ত্র ভূমিমাণ্ড খসে পড়ে। আজ বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসে আদি শ্রমিক তাইসেই অসুস্থতা কবো তাঁরা যেন নিজস্ব স্বাস্থ্য সংরক্ষণে হন এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রে সব স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের পরিবারের এবং দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। অসুস্থতা ও ভূমিমাণ্ড কারখানা তাঁরা যেন এড়িয়ে চলেন। কারখানা ও শিল্প-মালিকরা যেন একথা স্মরণ রাখেন অসুস্থ ও ক্রান্ত শ্রমিক-দের অসুস্থতা ও ক্রান্তি কহার প্রচেষ্টায় উপর উপাধন বৃদ্ধি এবং তা অম্লানত রাখাও নির্ভরশীল।

তিমতি পঞ্চাশতিকা পরিকল্পনা আধারের দ্বারা উন্নতির বহু পথে ব্যয় হয়েছে প্রথমটিতে ১৪,২০ কোটি, দ্বিতীয়টিতে ১৪ কোটি এবং তৃতীয়টিতে ২২ কোটি টাকা। কিন্তু তা সবেও শ্রমিকদের অসুস্থতার সমস্যা আজও যেটেনি। এ' বাণ্যেও স্পষ্টতঃ বেশকি পরিবেশ অনেক বেশী পড়েছে হঠাৎ উঠেছে, কিন্তু তা' সবেও সমগ্র বিশ্বে প্রতি

বছর প্রায় ১ কোটি 'শ্রম বিবল' শ্রমিকদের অসুস্থতার প্রস্তাব আছে। কাজেই উন্নতিশীল দেশ হিলাবে আশাধের কর্তৃপক্ষকে এবং শ্রমিকদেরও তাঁদের নিজের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সজাগ হতে হবে, তা না হলে আমাদের উপাধন বৃদ্ধি হবে না, দেশের সমৃদ্ধিও ব্যাহত হবে।

উপসংহারে, পূর্বে বলা হলো যেটি বৃহৎ 'শ্রমবল' তা হলো যোগ্য প্রভিধনক ব্যবস্থা, এবং তাইই পাশাপাশি রোগ হবে না এমন একটি স্বাস্থ্যকর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ আশাধের মত দেশে পড়ে তুলতে হলে, বর্তমান সমাজের আনুগত্য স্বাস্থ্যকর কথ্য ভাষাতে হবে, নতুন সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলার লক্ষ্যের দিকে এগুতে হবে। যে সমাজে দায়িত্ব ও স্বাস্থ্য জগত, বর্ষ ও দেশীয় বৈষম্যের স্বপক্ষক্ষেত্রে অবিকল্পে দায়ব্ধ যেখানে স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠিত না, সেখানে রোগ মুক্ত, স্বাস্থ্য স্ববাহ্য প্রতিষ্ঠিত মানব গোষ্ঠীর কল্পনা নিছক কল্পনা-বিলাস মাত্র।



অন্য-প্রাথমিক-আন্দোলন

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাণী দেওয়া এককালে প্রচলিত বা ভ্যাতিবীষেই একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু এ যুগে এক শ্রেণীর লোকের পেশা হয়ে উঠিয়েছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাণী দেওয়া—কিন্তু তাঁরা কেউই প্রকটে বা ভ্যাতিবী নন। তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ শাস্ত্রবিদ (futurologist) বলে আখ্যাত করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন নব-বাসনাবাদীগণ (neo-utopians)। তাঁদের একমতের পরিকল্পনা অল্পমাত্রেরে হৃদয় বহুরে অর্থ-ভিত্তিক অর্থনীতিক কাঠামো স্থাপন হয়ে থাকে। তৃতীয় বছরের শেষে বিনামূল্যে সন্তান প্রসূতি ও পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা থাকে। অষ্টম বর্ষে সন্তানের মস্তিষ্ক বিনামূল্যে কেস্ট্রিনে খাদ্য পূরণ করা হবে। নবম বর্ষে ভাল, অল্প, ফলের রস আদি বিনামূল্যে সন্তানকে দেওয়া হবে। কিন্তু চতুর্থ বর্ষের আগে বিনামূল্যে বিবাহ বিতরণ ও গর্ভধারণ বর্ষের আগে সন্তানকে সর্বাধিক দেওয়া সন্তান হবে না।

নব-বাসনাবাদীগণের স্বপ্ন করে নারিক হয়ে দেই আশার অপেক্ষা করছি।

— রুশিয়া সামন্ত
হপ্পী

অন্য-প্রাথমিক-আন্দোলন

সমগ্র জগতে আজ ছাত্রলীদারের বিশৃঙ্খলিত বর্তমান। ছাত্রলীদার সব দেশেই সবসময় বিপ্লবের পুরোভাগে বর্তমান ছিল। কিন্তু বর্তমান কালের ছাত্ররা যে কোনও বিপ্লব পরিচালনা করছেন তা নয়। এক এক দেশের ছাত্ররা এক এক বিষয় নিয়ে মূল্যায়ন করে শিক্ষা ব্যবস্থা

বিনাশ করে দিয়ে বীজ বপন করেছেন। স্থানে স্থানে তাদের ভাষা এমন যা সত্য ভাষা মানব সমাজের মধ্যে শোভা পায় না। অ্যামেরিকান ছাত্র সমাজ—নিগ্রোছাত্র সমাজ তাদের যুদ্ধে mother কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করেছে, পেনো যাচ্ছে। সম্ভ্রান্তিকালে 'Look' পত্রিকার প্রকাশিত একটি পৃষ্ঠে Leo Rosten নামক লেখক ব্যাখ্যা করেছেন এই ধরণের কৃত্রিম গালি প্রয়োগ করার অন্তর্য। তিনি বলেছেন এই ধরণের নিষ্ঠুর গালির কথা দিয়ে তোমরা তোমাদের নিজেদের অনেক ক্ষমতা হারা-গণ আমায় উপর প্রতিফলিত করছ। এরকম প্রতিফলনেই বৈজ্ঞানিক নাম "প্যারা-বোইজ"।

আমাদের দেশেও কিছু শোক এই ধরণের গালির ভাষা বিপ্লব-বিপ্লবে ছাড়াই ব্যবহার করে থাকে। তাদেরও কি তবে "প্যারা-বোইজ"র মত চিকিৎসার প্রয়োজন আছে? চিকিৎসকগণ এবিধের চিকিৎসা করলে সমাজ-সেবকগণ সন্তি পাবেন।

—মুহাম্মদ স্টোপোভার
কলিকাতা

পশ্চিম পাকিস্তান তৈরী হন টেনের একটি মৌক্য চড়ে ২৪০০ মিলিয়ন অতিথি Thoró Heyerdahl হলেন। উপস্থল থেকে অন্তর্গত মহাদেশের বকে পাড়ি জরিয়েছেন। তাঁর গন্তব্যস্থল ১০০০ মাইল দূরত্ব মধ্য আমেরিকা! ১০ বৎসর ব্যস্ত এই অতিথিগণ সবই হয়েছেন আরও ছয় জন নাবিক এবং একটি বানর।

মিশরে ফারাওদের স্মৃতিস্তম্ভে, অর্থাৎ ১০০০ বৎসর আগে উত্তর আমেরিকা থেকে গেলো তাঁরা

মৌকায় অন্ত্যাত্মিক মহাসাগর পেরিয়ে বক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে “ইত্যা” ও “আলটেক” সভ্যতার জয় হিরেছিল বলে একটি মত প্রচলিত আছে। icyerdahl সাহেব সেই পুথ্যাণো দ্বিনের অহুত্ববৎ বিশালপরিমাণ পাতার মৌকায় চড়ে স্বতাক্ষ সাগর পাড়ি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন ঐ মতবাদ সত্য হতে পারে কি না।

পূরণ হতে পরীক্ষা করার কি অন্তিম প্রচেষ্টা! একেবারে হাতে নাতে করে দেখতে চান সত্য হতে পারে কি না! আশাধের পূরণ কারো আছে বীর হুমান এক লোক সাগর (ছোট্ট অবত) সেখানে লগায় গেছিলেন। এ মতটা কি কোনও বকমে পরীক্ষা করে দেখা যায় না?

—শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা

গ্রেসমের পান

একটি বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকায় নিম্নলিখিত গ্রেসমের পানটি প্রকাশিত হয়েছে।—

Mabel was a
Table
Lovely table
On the table
(Mabel)
Lay a flower
Named cyn'l.

পানটি যে গ্রেসমের ভাষায় সন্দেহ নেই। খুব জটিল এবং বেগ—গ্রেসমের বেগ। পাঠক-পাঠিকার। এর অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন নিম্নের। —প্রণব চক্রবর্তী

জোরহাট, আসাম



মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণঐশ্যায়ন শ্রীমতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব

বঙ্গানুবাদ : স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাক্যাক্ষয়ং তথোগ্রং হওপাক্ষ্যামেব চ ।

আত্মনো নিগ্রহত্যাগো ঘর্ষধ্বংসেব চ ১৩১

কথার কটুতা, উগ্রতা, ঘণেব কটোরতা, কাহাণ্যেব নিকেশ, বেশ থেকে বিভাটন ও অর্থহীন—এই ছয়টি কোষ জনিত ব্যসন ।

হয়ানি বিবিধান্যেব ক্রিয়ার্থেনাং চ বর্ণিতাঃ ।

অবসর্য, প্রতিবাদ্যতঃ কেতনানাং চ স্তম্ভম্ ১৩২

নানা প্রকার বস্ত্র ও তাহেব ক্রিডাও বর্ণিত হয়েছে ।
পক্ষয় চাট্টিকে উৎপীড়ন করা, তাব সেনাবাহিনীকে আঘাত হানা ও তাহেব বাসস্থান ভেঙে বেওয়ার প্রাণাশীর্ষ বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে ।

চৈত্যা ক্রমাৎসম্পন্নং ত্রোহঃ কর্ণামুশাসনম্ ।

অশ্বদ্বয়োহিব বসনং তথোগ্রাশ্ব্যতঃ বর্ণিতাঃ ১৩৩

পক্ষয় রাজধানীস্থিত চৈত্যবৃক্ষ সমূহেব ক্ষণেব করা, তাব বাসস্থানও নগরেব চারিদিক বেঠন করা—কৃষি ও শিল্প আদি কর্ণেব উপদেশ, রথের বিভিন্ন অংশ নির্মাণ, গ্রামে ও নগরেব বাস করিবার নিয়ম, তাহরণ জীবন নির্বাহেব অনেক উপায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ।

পদবানকশখ্যানাং তেত্রীণাং চ বুধির্বিব ।

উপার্জনে চ অধ্যাপাং পরিমর্শক ভানি য়ৈ ১৩৪

বুধির্বিব । চোপ, বাগদা, পংখ, ভেড়ী প্রভৃতি পদবান বাধান,—বণি, পত, পুতী, বস্ত্র, বাগদাসী, স্বর্ণ এই ছয় প্রকার অর্থ নিজেব ক্ষত্র উপার্জন করা—আব পক্ষপক্ষের এই ছয় অধ্যায় করে বেওয়ার কথাও এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে ।

লভত চ গ্রন্থনং সত্যং চৈবোত্তিপূজনম্ ।

বিষভিত্তিকোভ্যাতক বানবোহবিবিজ্ঞতা ১৩৫

সমলপিত্তনং চৈব শরীষ্ত প্রতিক্রিয়া ।

আহাংবাহোজনং চৈব নিত্যভ্যতিক্রমেব চ ১৩৬

নিম্ন অধিকারে সংগত বেশে পাণ্ডিহাশন করা, দ্য-পুস্তকদেব সংভাব করা, বিধান্বেব দক্ষ বেলাবেণা বাক্যানো, বান ও বেহেব বিধি জানা, মাসলিক দ্বন্দ্ব পূর্ণ করা, শরীষ্তেব বস্ত্র ও অলঙ্কার পরা সজ্জিত করা, আহাংবেব বাহন্য করা, সর্গদা আত্মিক বৃদ্ধি রাখা—এই দশকলেই বর্ণন হয়েছে এই গ্রন্থে ।

একেন চ যথোথেরং সত্যং যদুতা গিরঃ ।

উৎসবানং সমাজানাং ক্রিয়াঃ কেতনমাস্তব্য ১৩৭

মাহুৎ একা হযেও কিতাবে উন্নতি করে এর বিচার, সত্যতা, উৎসব ও সমাজে যদুত ভাব্যেব ব্যবহার,—ও গুরুদয়তীয় ক্রিয়াকর্ম—এই দশকলেই বর্ণন হয়েছে ।

প্রত্যাক্ষাৎ পরোক্ষাৎ সর্বাধিকরণেব ।

বৃহত্তেবতশাঙ্গুদ নিত্যং চৈবাবঃসকপম্ ১৩৮

যে ভগবৎশোভনসিহ বুধির্বিব, সমস্ত বিচারশালায় যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিচার হয়ে থাকে, সেখানেব রাজপুস্তকেবা কেমন হবে—তা প্রতিদিন নিরীক্ষণ করতে হবে । এবংও উল্লেখ রয়েছে এই শাস্ত্রে ।

অধঃপ্রাণ্য চ বিপ্রাণাং যদুতা বওনিশাতনম্ ।

অগ্রজীবিসমাজিত্যো গুণেত্যাক সমুৎস ১৩৯

ত্রাশ্বদেব হও না বেওয়ার, অগ্রজীবীকে বও বেওয়ার, অগ্রজীবী, বজাতি ও গুণবান পুস্তকদেব উন্নতি করার উপায় এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে ।

বক্ষণং চৈব পৌঃপ্রাণ্য হাটুয়া চ বিবধনম্ ।

হওলহা চ যা চিত্তা বাঙ্গু বাধন ভ্রামিকা ১৪০

বাঙ্গু । পুরবানীয়েব বক্ষা, বজোব বৃদ্ধি, তথা বাধন বাধনওলের চিত্তা, তাওও উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে ।

বাসপ্রতিবিধা চৈব শরীষ্ত প্রতিক্রিয়া ।

বেশভ্যতিক্রমানাং চ ধর্ম্যঃ সমুৎসবর্ণিতাঃ ১৪১

আহাংবেব শাস্ত্রেব অন্তপারে বাসন্ত্য প্রকার শরীষ্তিক

চিকিৎসা তথা দেশ, জাতি ও কালের ধর্মও ভালভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মসংক্রান্ত কামন্দ মোক্ষসংক্রান্তানিভাঃ।

উপাসনাসংক্রান্তি চ বিবিধা কুরিৎকিৎ ১৭২

প্রচুর ধর্মসংক্রান্তা মুখ্যতঃ, এই গ্রন্থে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এ সকল প্রাপ্তির উপায় ও নানা প্রকার ধর্মসংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে।

ব্রহ্মকৃত নীতিশাস্ত্র গ্রন্থে ভগবান্ উপাসতি নংকর গ্রহণ করেন। তিনি মাছুষদের মৌর্যকাল হ্রাস পাচ্ছে দেখে এই শাস্ত্রকে সংকলন করেন—ভাগ্য নান্য হাথা ধর্ম 'বিশালাক'। তার পর ইন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য পুত্রপর প্রত্যেকে এই শাস্ত্রের সংকলন সংগ্রহ প্রচার করেন।

মহাভারতের শান্তিপর্বে রাজধর্মের যে উপদেশ রয়েছে

তা সর্বকালের ও সর্বদেশের রাষ্ট্রনায়কগণের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। কৃতকৃত্য রাষ্ট্রনায়ক হতে হলে মহাভারতের উপদেশ মেনে চলতেই হবে।

ভীষ্মদেব ধৃতিশ্লোকে রাজধর্মের সার উপদেশ দিয়েছেন :—

ধর্মাধর্মবিভোদেন মর্ষেয়াং শ্রিয়মচিহ্নয়েৎ।

মহারমিতি রাজা যঃ স পর্বত ইবামলঃ ১২৪।১২০

রাজার উচিত সকলের শ্রিয় কাঁচ করা, কিন্তু ধর্মের যাতে বাধা না আসে। যে রাজা প্রজাদের নিষেধ শ্রিয় লোক বলে মনে করেন, তিনি পর্বতের মত অবচল থাকেন।

এদেশের রাষ্ট্রচালকগণ মহাভারতের উপদেশ মেনে চললে দেশের সমল হোত। [ক্রমশঃ]



সাগর থেকে ফিরে

“নাবিবক”

Engine Room :-

‘অব ক্যা হোপা সাহাব !

আমিও তাই ভাবছি……কি হবে ?

সাহাব :- !

চূপ রহো …চেষ্টায়েই উঠেছিলাম হয়ত। শুভা চূপ করেছে !

আমি কি আশঙ্কিত কি হবে।

চারবিকেক বন অন্ধকার। বশ গন্ধ দূরেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কেবল বৃষ্টিতে পারছি আমার ভাইনে বীয়ে লামনে শিঙনে ওগবে নিচে—চারবিকেক জোলপাড় হচ্ছে—বহাগ্রাস শুক হয়ে গেছে, জানিনা আমার কোথায় ? শুধু জানি এখনও বেঁচে আছি এবং যতক্ষণ বীচবো সংগ্রাম করতে হবে। আমারই অস্তিত্ব সমগ্র সমাপ্ত। তাই আমার সংগ্রাম করছি। বীচ ছিঁর এবং অবিচলিত হয়েছি। কারণ একটু ভুলের মাত্রল এতগুলো প্রাণ।

চারবিকেক জল আর জল। ডেকের ওপরে জল; ডেকবিনে জল,……। চেষ্টা আর বাতাসের নির্ধর আশ্রয়, কান কাটাচোরা শুষ্ক গর্জন। দাকে মাকেই চেষ্টাগুলো গোটা জাহাজটাকে ভুলে আছাড় দিচ্ছে। এখনই বোববই ইকিন কেনে চুরমার হয়ে যাবে। বরষারগুলোতে জল ঠিক রাখা যাচ্ছে না। ইকিন রূপ দর্শন আল বোকাই হয়ে গেছে।

শুধু আমার সংগ্রাম কবে চলছে, প্রকৃতির সঙ্গে সাহাবের সংগ্রাম। এর শেষ কোথায়…… ?

কিন্তু সস্তি একলমর সে সংগ্রাম শেষ হয়েছিল। আর

প্রকৃতি শেষ অবধি আমারই কণ্ঠেই বিজয়লাভ ঘিরেছিল পরিবেশ। “টাইফুন” মৃত্যু জঠর থেকে মুক্তি পেয়েছিল আমার। কিন্তু সে কথা পরে হবে। আগে “টাইফুন” কথা বলে বেশি।

‘টাইফুন’ সমুদ্রের ঝড়। সাহাবের কাছে চিহ্নকালই শুধু বসত। আমারই মত ঝড় মনের উপর ভেঙ্গে বেড়াক, উত্তরা সকলেই ‘টাইফুন’কে সমীহ করে চলে। কিন্তু ‘টাইফুন’ নামটা সার্বজনীন নয়। এই সামুদ্রিক ঝড়কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন বঙ্গোপসাগরের ও আরব সাগরের ‘সাইক্লোন’। আমেরিকার ‘হারিকেন’, ইংল্যান্ডের ‘গেগ’ আর জাপানে ‘টাইফুন’।

জাপানগামী জাহাজীদের সমীহই ‘টাইফুন’ কথা মনে রাখতে হয়। জাপানের সমুদ্রকে সমীহ শুধু করে চলে কারণ প্রায় শতাধিক বছরই জাপানের সমুদ্রে এখনি তড় থাকে। আর কখন যে ঝড় উঠবে তা বলা বড়ই মুশকিল।

জাপান যাত্রার নামে জাহাজীরা পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু লগের কথা মনে পড়লেই অনেক অভিজ্ঞ লাহনী লোকও কেনন চূপ করে যায়।

Typhoon বেশীর ভাগে আরব সাগর এর পর থেকে, চলে প্রায় ভিলেব অবধি। এ ঝড়ের বেশীর ভাগে আমেরিকা ফিলিপাইন আর বেনীলার শিরন থেকে। তারপর বীয়ে বীয়ে বেগ বাড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করতে থাকে। কিছু গোটা এসে চীনের মূল ভূখণ্ডে লাগা দেখা। তার পর ঘুরে ঘুরে জাপানের পথে।

প্রতিবছর এর ঝড়টো বা কতি হয় তা চোখে না

হেলে বিখাল করা সম্ভব নয়। হাজার হাজার বায়ু, শত শত হাজারী আর সহস্রের পর সহস্র নিঃশব্দ হয়ে যায় চিরদিনের মত।

প্রতিবন্ধক 'টাইফুন' কবলে পড়ে জাপানের বা কতি হতে দেখেছি, আমরা তাতে ভয়ে শীতল হয়ে গেছি। কিন্তু কি বিচিত্র এবং কদম্বকি! ধ্বংসাত্মক ওপরে আবার গড়ে তোলে নতুন সহর। এত কঠিনতমও এদের হানিমুখে বিধাতার ছায়া নাশতে দেখিনি। যেন এই ভাঙ্গা-পড়াই বাস্তবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের জীবন পাথে। তাই প্রজ্ঞা অংকিত করে ওদের সামনে আশাঘের মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে।

সব বছরে প্রধান 'টাইফুন' হয় না। তবে প্রতি বছরই অন্তত দু'খণ্ড থেকে বাহো বায়ু এদের আগমন হয়। দ্বাভাংগত আগন্তক পর থেকে বেশী 'টাইফুন' হয়, আর এ সময়ের 'টাইফুন'ই সব চেয়ে বেশী দাবাদাক।

'টাইফুন'কে অনেকটা ব্লিক্‌ডের বা হাণ্ডার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মাকে মাকে এর গতি ঘটায় ১২০ মাইল অবধি হয় আর পৃথিবী প্রায় ৪০০০-৬০০০ মাইল। তাই একে এড়িয়ে নিবিড়ে গভীরস্থলে পৌছন প্রায় অসম্ভব।

'টাইফুন' যতই বারাদাক হ'ক না কেন এদের নাম-গুণো কিছু বেশ দুন্দর। যেমন নান্দী, ভেড়া, অলপা, মেয়ী ইত্যাদি। কত যে জাহাজ, বাছ ধরাব নৌকো এয় কবলে পড়ে চিরদিনের জন্য নদী-সমূহী লাভ করেছে তার কোন হিসেব নেই।

বতর্দিন পৃথিবী থাকবে ততদিন এই সাংঘ্রিক ভড়ক থাকবে আর আমরাও তাইই মাকে তবী বেয়ে যাবো।

এবারে আবার সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা কিয়ে আসা দাক। জাহাজের জানালা বা porthole থেকে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। সামনে বিখাল নীল সমুদ্র। অকালে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। জাহাজ এগিয়ে চলেছে লাগবের চল চিহ্নে। কত শান্ত, কত দুন্দর, কত হীন।

মাকে মাকে 'উড়ে' যাচ্ছে 'কাক'গুলো চোখে পড়ছে। দু'বে একটা জাহাজ এগিয়ে চলেছে। আমরা চলেছি জাপান অভিমুখে।

কলকাতা ছেড়েছিলাম আগন্তকের শেষে। জানি কায় দুখ বেধে বসনা হয়েছে। তবে তখন হো কিছু বুঝতে পারিনি। কতবার তো এই পথে যাতায়াত করেছে। এবারও বজাপাগার ছিল যাকারি। "পাহাযার" জাহাজ নিয়ে আমরা চলেছি জাপানে।

'নিংগাপুর' পার হয়ে আমরা পড়লাম জাপান সাগরে। নিংগাপুর এর পর থেকেই আকাশ মেঘ ঢাকা আর হায়ে মাকে বৃষ্টি আরম্ভ হল। তাহলেও সমুদ্রকে মদ লাগছিল না। গীতের আভাস পাচ্ছিলাম।

তারপরে একদিন আমরা 'হংকং'কে বিহার জানালার। বহুদিন পর হৃর্ষের দুখ দেখছি। হৃর্ষ তখন পাহাযের পনপারে অদৃষ্ট হয়ে গেছে। বীরে বীরে সমুদ্রের বুকে অদৃষ্টার ঘনিবে আসছে। কিন্তু আলোর দালা গলার পরে 'হংকং' তখনও দুখ থেকে বিহার জানাচ্ছিল। আমাঘের চতুর্ভাঙ্গা জানিয়ে pilotও বিহার নিয়েছে। তখনবতী হংকং অদৃষ্ট হয়ে গেল। আমরা বীরে বীরে প্রবেশ করলাম গভীর সমুদ্রে, গভীরতর অদৃষ্টারের মাকে। বাইরে শুধু উদ্ভিদালায় অবিসার নৃত্য আর ভেতরে ইঞ্জিনের বিহারবিহীন ঘরান্দীত।

দিন চলল হয়ে, আমরা চললাম এগিয়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা afterdeck এ দাঁড়িয়ে আমরা কত গল্প করছিলাম। আগেচনা ছিলাম জাপানে পৌছে কে কি তাহে সময় কাটাবে, কি কি জিনিষ কেনা হবে, কোথায় কোথায় থাকবে হবে, আত্মো কত আলাপ, কত আলোচনা। জাহাজ এগিয়ে চলেছে বেশ ভালো ভাবেই। মাকে মাকে কতের খংখংবর পাচ্ছিলাম। কিন্তু তাতে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ বটেসি।

এখন সময় 'Radio Officer' এসে জানালেন "ভেয়া এবং নান্দী" নামে দুটো 'টাইফুন' এগিয়ে আসছে। আমাঘের গয়েছ আমরা পরিত্রা পদর হয়ে উঠসো। অন্তিচারণ চলল—কে কবে কিভাবে টাইফুন-এ পড়েছিল ইত্যাদি। অংগেবে এক সময় লাক্সা আলর শেষ হল।

রাত ১২টার ভিটটি শেষ করে কেবিনে কিয়ে এলাম। বাইরে ঘোর অদৃষ্টার। af erdeck খালি। কর্তৃত কন্নীয়া ছাড়া সবাই পাড়ছে ঘুমিয়ে। জাহাজ চলছে এগিয়ে।

পাটঘিনের একটানা পাড়ি। Yokohama আমাদের প্রথম বন্দর হবে জানেন। অমরা কাল “ওকিনাওয়া” গার করবো। porthole দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে; উঠে বস করে নিলাম। পায়ে কয়েক কদম দিতে বাহাদুর ফুলে বাগনি দেখছি।

কখন ঘুমিয়ে পড়ছিলাম খোয়ায় নেই। হঠাৎ কেন জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। হাত এখন কটা হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হ’ল জাহাজটি বেশ দুপড়ে। বাইরে বেন কেমন চকলতা, লোকজনের আসা যাওয়া আর তাকাতাকি কথা কানে আসছে।

Male-এর পলা সুনাম। ঐ সব ঠিক শে বাছো, আগে বসন্ত জোর তুফান আতা হার। Chief Engineer এবং 2nd Engineer কি বেন বলছে বুঝলাম না, তবে দুজনকেই বেশ ব্যস্ত মনে হল।

বিমানের গুণে উঠে বসি। তাড়াতাড়ি বাইরে আদি। কাপ্তান সাহেব থেকে আরম্ভ করে সবলকেই দেখলাম। সবাই বেশ ব্যস্ত এবং চকল। আমাকে দেখে সবাই বলে উঠলেন get ready Typhoon approaching.

আমি কিছু মোটেই বিচলিত হলাম না। কারও একমুখ বিশেষ পড়া নতুন নয়। কার্ণকমে কিছুই করার নেই। সুনাম ‘নান্দী’ আহাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ‘ভেগা’ অস্ত পথে ঘুরে গেছে। ঠিক হল জাহাজের গতিপথ পরিবর্তিত করা হবে। আহাদের এনে গুরে পড়লাম।

জাহাজে ফুলেই চলেছে। হাওয়ায় গতিও যেন বাড়ছে। আহারা চলেছিলাম উত্তরপূর্ব দিকে, ‘টাইফুন’ আসছিল পূর্ণ পন্ডির থেকে। হাত তিনটেই পর থেকে জাহাজ-এর গতিপথ পরিবর্তিত করা হ’ল। ‘টাইফুন’ বেরিয়ে যাবার পর আহারা আবার নিশেষের পথে ফিরে আসে। জাহাজকে তড়ের কদম থেকে বাঁচাবার জন্য একমুখ গতিপথের বদল-বদল হামেলগাই করতে হয়। কিছু টাইফুনের প্রধান লোহ হল সেও পূর্ব তাড়াতাড়ি নিজে গতিপথ পাশে ফেল। আর গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। এক বেশী কাছাকাছি দিয়ে এ বড় চলে যে মাঝে মাঝে এর আওতা বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেও বেরিয়ে

যাওয়া সম্ভব হয় না।

‘দ্যাত বজ্রগিহা সাহাব’।

বাহাদুরের ডাকে পূর্ব ভাগলো, সে চা রেখে গেছে।

জাহাজ এখনও দুপড়েই। যেন একটু বেশী কয়েই দুপড়ে। তখন একভাবে দুপড়ে বলেই গুরের গোলামাগ হয়নি।

বাইরে তাকালাম। ডেউগলো বেশ বড় হয়ে উঠেছে, হাওয়ার গতিও বেড়েছে।

ইতিনকুম-এ এসে দেখলাম সব জিনিষপত্র বাহাদুরে রয়েছে। সুনাম ‘বেগরানী আতা হাং সাহাব’।

হামেলার, বদলার, “ক্যা, ভর লগ গিয়া”।

‘সাহাব, জাপান কা হরিয়া বহত খবাব হাং অব পূর্ণা ভবোলা। দুপদ সাহেবের কাছ থেকে ভিউটি বুকে নিলাম। তিনি জানানেন জাহাজ অস্ত পথে চলেছি। মনে হচ্ছে টাইফুনকে এড়িয়ে যেতে পারবো।

টেলিফোন বেধে উঠলো, বড় সাহেব জানালেন টাইফুন আবার দিক পাশেটেছে। ফল আমাদেরও দিক বদলাতে হল। ইতিন-এর গতি একটু কম করার নির্দেশ দিলেন।

বেলা ১০টার পর থেকে জাহাজ ভীষণ দুপড়ে আরম্ভ করে বিল। একজন কল্যাণালা এসে জানালো “হরিয়া কা বেহরা বদল গিয়া সাহাব বেখলে সে ভর লগতা—গাওয়া তরফ অষ্টম্বা সা হো। গয়া হার। Skylight-এর দিকে তাকালাম, সতি কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার মনে হচ্ছে।

ইতিনকমে আর মোজাভাবে গাড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। সবাই জাহাজের সঙ্গে তাল বেধে ধরে ধরে চলেছে। মাঝে মাঝে ইতিন ভীষণভাবে আওয়ান করছে, মনে হচ্ছে সব চূর্ণা হয়ে যাবে। আহাদের বাটুনি আতো বেড়ে গেছে, সব সমর লগাণ থাকতে হচ্ছে। Crewরা বেশ একটু ভয় পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আহারাও ভয় পেরেছে কি?

আমার কয়েক বছরের দাদাভী দীর্ঘবে গড় কিছু নতুন

নয়। ইতিপূর্বে আমি বহুবার জড়ের মধ্যে ঘূর্ণি হয়েছি। মাঝে মাঝে এছটান-নয় ছটান জড়ের সঙ্গে সাগ্রাম করতে হয়েছে। তাই আমি আজ খুব বেশী বিচলিত হবার কথাই না।

এমন সময় আমার 'টিওন' এলে হার্মিড। বেশ দ্রুত হয়ে গেছে, তবে ভীষণ আত্মবে লোক। চট্টগ্রামে বাজী। দ্বীপের উৎকর্ষিত সঙ্গে জানালো তার ২৪ বছরের সংগর জীবনে সাগরের একদল ভরাবহ রূপ আর যে কখনও দেখে নি। আমি ইতিনকরে রয়েছি বলে সাগরের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারছি না।

চট্টগ্রাম Skylight দিয়ে ইতিনকরের ভেতরে একটা ডেট এনে আছড়ে পড়ল। তারপরে আর একটা ডেট তারপর মাঝে মাঝেই...। বঙ্গোপ সন্মুখের একই অবস্থা। আগের শাস্ত্র চালু করা হয়েছে। বঙ্গোপ ষ্টিক মত চলছে না। চারদিক বিস্তারিত অগোচরে ভরে উঠেছে। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ জাহাজটাই কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

আমাদের Crowরা সবাই জাহাজের শিরোন দিকে থাকে। কিন্তু আজ জাহাজ থেকেই সবাই এলে ঘরা হয়েছে ইতিনকর। আমরা Steering flat-এ যাচ্ছি এবং Crowরা তাদের Cabin-এ যাচ্ছে Tunnel-এর ভেতর দিয়ে। কয়েকজনই ইতিপূর্বেই বসি আরম্ভ হয়ে গেছে। অগোচরগোচর ছেড়ে দিয়েছে অনেক। দু'একজন তো একবারে গুবে পড়েছে। বরেন তো কান্নাকাটি আরম্ভ করেছিল, বরক পেয়ে চুপ আছে। কে কাকে বোঝাবে, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। জাহাজ বহিরা হলেও মাঝা ঘুরছে, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তবুও দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। হস্তস্বর সত্তর পাণ্ডতাবে কাজ করে যাচ্ছি। বিপদে অসীম হলে চলবে না।

বঙ্গোপেরও নিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জানালেন আমাদের কান্না বোঝার পারাপ। বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও 'মান্দ্রী'র হাত থেকে বোঝাই পাওয়া গেল না। এখন আমাদের বড়বড় ভেতর ঢোকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

এখন আর আমাদের কোন ষ্টিক ডিউটি বলে কিছু নেই। সবাই প্রায় ইতিনকরে। উপরেও তাই, কাপ্তান সাহেবও সব সময়ই Bridge-এ। 'সেট' চারদিকে

মোড়ামোড়ি করছেন। সবাই ব্যস্ত।

ইতিনকর থেকে একটু দূরীত্ব পেলাম। উপরে এসেছি। একি ব্যাপার? চারদিক অন্ধকার। জাহাজের আগে পিছনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ডেক-এর উপর দিয়ে শুধু অলমের ভেড়ি ঘরে চলছে। আর বাতালের কি তারকব আওয়াজ আর চেউয়ের শব্দ। তাকাতো ভয় করছিল। ধরে ধরে নিশ্বাস ধরে এসে ঢুকলাম। সব কিছু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। টেবুল, চেয়ার, কান্নাকাতি। বহুও বলে জলাকাহ।

বাহাজের পাশে বেধা হল। জানালো, খাওয়া হাওয়া বন্ধ, কারণ হাওয়া করা সম্ভব নয়। কৌটোর খাবার খেয়ে থাকতে হবে। তখন অবশ্য ককরাই খাওয়ার অবস্থা নেই।

হুত এসে জানালো পাঁচ-নব্বই সাংঘের হাল খুব খারাপ। এখন আর খলিপারে ছাড়া ডেকের ওপর দিয়ে চলার উপায় নেই। অনেক কষ্টে পাঁচ নব্বই অর্থাৎ ফিক্ণ ইতিনিয়ারের বরে এলাম। সমস্ত কেবিনে জিনিষ পর ছড়ানো। বিজ্ঞানার উপর উত্তর হয়ে পড়ে আছে নব্বই সাংঘে।

"কি ব্যাপার? কি হল?" সে কীভাবে। সারা দ্বীপের ভয়ে নীল হয়ে উঠেছে।

কিছুকণ পরে কান্না খামিরে বলে, 'কাল থেকে জীবন বসি আরম্ভ হয়েছে। কিছুই খেতে পারছি না, বস্ত্র ভয় করছে। কি হবে বসুন তো? জাহাজ বাঁচবে তো?'

কেনন করে তার এ প্রশ্নের উত্তর হবে। আমরা কেউ জানিনা কি হবে। তবু বলি, 'তবু পাচ্ছেন কেন? Try to get up, কিছু খেয়ে নি। বসি হ'ক তাত্তে কি? না খেলে তো এরনি সাতা পড়ে যাবেন।' পকেট থেকে কিছু কিছুট বের করে দিলাম। এই ওর প্রথম সাগর বাজা। অনেক আশা, অনেক আশ্বস্ত হয়ে এ যাত্রা আরম্ভ করেছিল। ওকেই বলতে শুনেছি— "What a nice life!"

আজ শুধু দিকে তাকাতোও দুঃখ হচ্ছে। এই-ই হয়। সাত সমুদ্রের উপর দিয়ে তেলে ঘাওয়ার দরদ খোঁজাই যায়না সমুদ্র কত ভয়ঙ্কর হতে পারে।

আমরা বেশী ১২ মাসের ঠিক 'টাইমুপের' করলে প্রবেশ করলাম। এর লড়াই। চারিদিকে অন্ধকার। টেটুলো ২০০-৩০০ ফুট উঁচু হয়ে চারদিক থেকে কাহাঝের উপর এসে পড়েছে। হাতে হাতে মনে হচ্ছে আঘাত পুড়ে, দুইদিকে ধাঁধ আর তার দুপাশে উঁচু টেটুলোর পাখ্যাক আঘাতের খিঁচ কেপুছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা জানিনা আঘাত কোথায়, কি ভাবে, কেমন ভাবে আছি।

হঠাৎ ভীষণ শব্দ করে কাহাঝের মাংস ভেঙে পড়ল।

হাতে হাতে কাহাঝের সামনের ভাগ সম্পূর্ণরূপে নিচে ডুবে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বোম্বের শেষ। আমাদের মতই কাহাঝও তার দরংকর শক্তি নিয়ে এই কাজে সুকাবিলা করে চলেছে।

চারদিকে অর্ন্তনাম আর করণ কর্তে ঈশ্বর বন্দনা।

কেউ বা ভাবছে 'গড', কেউবা ভাবছে 'খুদা', কেউবা 'ভগবান'। অনেকই হঠাত কোনও মিন গীর্জা মন্দির কিবা মন্দিরের কাছাকাছিও যাননি। তবু আজ এই অসংখ্য মুহূর্তে তাঁরা সেই গতিভ্যক্ত ঈশ্বরের শরণাগত হয়েছেন। শক্তিমত্তে মত মাহুৎ যখন নিজের শক্তি-হীনতার পরিচয় পায় তখনই সে ঈশ্বরের প্রকৃত শক্তি উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মাহুৎয়ের প্রয়োগনেই যথোক্ত ঈশ্বর এমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দৃষ্টি করে যাকেন।

হাতে হাতে S. O. S. (Save Our Soul). আসছে। কিন্তু এখন কে কাকে ধোঁকাবে? সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। পরে তখনেছিল পাঁচ থানা কাহাঝ মাথা পড়েছে। কাউকেই হঠাত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

'টাইফুন' আবার গতি বহলালো। এবার আম ধোঁকা অম্বা আরো ব্যাঙন হয়ে উঠলো। এতক্ষণ আমাদের কাহাঝ তবু মাহুৎ বটীর মাইল পানেক করে এতখিল কোন মতে। এবার খবর পেলাম কাহাঝ পেছুতে আরম্ভ করেছে। মাত্র ১০ মাইল পিছুনে পাড়া। এবার কান্টান সাহেবও বেশ দাবড়ে গেলেন। বড় হুলে বিরাট চকলতা লক্ষ্য করছি আর বাব বাব আনোচনা। এতক্ষণ তবু কীপ আশা ছিল। এবারে

সেটুকুও আর অবশিষ্ট হইল না। আর বন্ধা নেই।

দুটো মাহুৎই ভেঙে কাত হয়ে পড়ে গেছে। কাহাঝ সিঁড়িগুলো ভেঙেই আমাদের বেকে বেকে গেছে। 'ট্রীক'-এর একপাশ ভেঙে গেছে। চারদিকে চলছে ভাঙ্গার লাগা। যা ভাঙেনি, তা ভাঙবে, যা আছে, তা থাকবেনা। আঘাতও আর থাকবেনা এ অগতে। শেষের সেহিন মমগত।

রাত তখন ৯টা, আবার বজ্রগাধের নিচে নেমে এসেন। মূখ দেখেই বজ্রগাধ তিনিও স্তব্দ পেয়েছেন। বললেন, আর হঠাত কাহাঝ ইঁটানো গাধ না। তবে কেউ যেন এ খবর না জানে। 'Pray to God and fight upto the last', বলেই তিনি চলে গেলেন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে বইলাল। কারও মুখেই কোন কথা নেই। সবাই আমায়ই মত ভাবছে নিজের কথা, বাড়ীর কথা, ঘরের কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চিরদিনের মত এই সাগরে তলিয়ে যাবো, কেউ জানবে না কেমন হবে আঘাত তলিয়ে গেলাম। কেই জানবে না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করছি। শুধু জানবে আমরা ছিলাম—আমরা নেই।

আর স্তব্দ পাচ্ছি না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে আর ভালো লাগছে না। কথা বলতেও ভালো লাগছে না। কেউ কথা বললেও ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। তাই আপন মনে উদ্বেগহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। আমরা জানি কি খবর হবে। সকলের মুখের দিকে একবার তাকালাম। দেকের ইন্টিনিয়ার কোন তুলে কোন দিলেন। আমরা দখাই অপেক্ষার তাকিয়ে আছি, কি হয়?

কিন্তু একি? ঠিক দুখ ৪টা ২৫ মিনিটে ভবে উঠেছে। টেলিফোন বেজে আনবে টেটুলে উঠেন "God Soved us, we might win. Pray more." জনগাম 'টাইফুন' দিক পালটেছে এবং যদি গে এ ভাবে চলে তা হলে আঘাত বেড়ে যাবে। আমরা বাঁচবে। দখাই টেটুলে উঠেছিলাম। Crewদের দিক তাকিয়ে বললাম, ভরো মত, হুম লোগ বচ থাকবে। টান উঠাও। আনবে হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। কৃতজ্ঞকর্তে আল্লাহ

জগৎ'ন গেয়ে ওঠা আবার উঠে দেন। জীবন ও মৃত্যুর
সন্ধিক্ষণ অতিগাহিত। আরও মৃত্যুর জগৎ থেকে
জীবনের দুঃখনে শৌছে গেছি। মৃত্যুর কত ভালোবাসে
নিজেকে। কবি দতাই বলেছেন—'মরিতে চাহিনা,
আমি মুক্ত হুবেম, ম'হুকের মাঝে আমি বাঁচিয়াবে চাই।'

সে যে কি আশঙ্কিত প্রকাশ করে তাই আমায়ের
নেই। আরও তখন বীরে বীরে এজুত আশঙ্ক করেছি।
তবে বাইরে তখনও স্বপ্ন চলছেই। কিন্তু দুঃখের পাথরি
তার হৃদয়টুকুতেই কমে আসছে। তাইলে তো আমায়
হবে পাপের পাতি দিয়ে জীবনটুকুতে কিংবা চলছে।

বহুক্ষণ পর ছুটি পোয়া। কেবিনে এসে গিয়ে
পড়লান, এবারে বিশ্রাম করবার।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না।
ঘুম থেকে পেল। কে যেন ডাকছে, চোখ মেলে তাকাই।
তা হলো কোনো দুঃখবোধ? না, বাহ্যিক চা নিয়ে এসেছে।
তাড়াহাড়ি উঠে পড়লাম। জাহাজ তো ঘুগছে না।
দাঁড়তে কষ্ট হচ্ছে না। বাহাদুর হাসছে। বলছে 'বাহায়

বাহিয়ে।' পেটটোয়াল দিয়ে বাইরে তাকালাম। দারা
লম্বিতের বৃত্ত ভরে উঠেছে ভোয়ের আলোর। প্রত্যন্ত
সুখের প্রথম পরশে হুলীল সাগর বাতাস হয়ে উঠেছে।
শেই মায়াবতীর উপর দিয়ে আমায় চলছে এগিয়ে।
ধীরে ধীরে কত দূর না বাতাস কয়েক ঘণ্টা। আলোর তার সেই
ভাঙারী হাকানী রূপ।

বাইরে এসে দেখি after deck ভরে উঠেছে সাগরের
হাসি আর আনন্দ উৎসবে। সবাই আজ নৃতন জীবনের
আনন্দে হাতোত্তরা, আজ সত্যি আনন্দের দিন।

জাহাজের কত-বিস্তৃত চোরাগা দেখে মুগ্ধ হলাম। সেও
সকল ক্ষতি স্বীকার করে আমায়েরই মত দুঃখ করে গেছে
টাইফুনের সঙ্গে। জাহাজ, ভগবানের অশ্রী কতখান।
সেই সঙ্গে সকল শ্রমজনের আত্মকিক শুভকামনাও
জড়িয়ে বসা। নইলে সদিন মুহূর্ত ছিল অবধাতিত।
সেদিন ভয় পাইনি, কিন্তু আজ সেই টাইফুনের কথা মনে
হলে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠে। এ শিহরণ স্বাভা-
বিক চিরজীবন।





হাতের কথা

স্বরাচার্য

এক কল্লোলিক অন্ন বহনে মাতৃহারা হন। কাঁচের টাং পিতৃবেব (দ্বিতীয় বর দাব পবিত্র কল্লোল) টাংক মতায় ভাল বাসতেন। পিতৃবেবের অবস্থা সজ্জন, ছেলের আদর আবিদার সন্ত কল্লোল অহুবিবা হতো না। খুঁড়ি, লাটাই, বন ঘাট, সূতবল ঘন বা প্রাচীন, ছেলে বচাই এনে যেত। অবশ্য অগাধ বাপারে টাংক অনেক কৃপণ আখ্যা দিতেন। তিনি অবশ্য ঠিক কৃপণ ছিলেন না। কৃপণের মত কাজ করে ফেলতেন মতো মতো এই বা, ঘাইহোক ছেলেকে পুণী বাথতে তিনি সত্যিই অকৃপণ ছিলেন।

ছেলের লেখপড়ার মন ছিল না, হৃদিত বুদ্ধি ছিল যথেষ্ট। মোটবেলা থেকেই কিলে মোটা পয়সা পাওয়া যায় সেই দিকেই ছিল তার নজর। কাঁচের টুলের বইয়ের ভিতর বেথা যেত খোঁড় খোঁড় খেলায় বই। পাড়ার তিনি Private Bookie খুঁজে বের করলেন। প্রথমে আন্তঃ হোল পাঁচ আনা মন আনা করে লাগাতে। পরে বড় হয়ে হাতে টাংক পেয়ে খোঁড় খোঁড়ের মাটে পাঁচশ, ছায়ায় পথায় খেলছিলেন শোনা যায়। একবার তিনি প্রথম বাজীতে ১০০ টাংক বত পান। তখন তিনি দ্বিতীয় বাজীতে পুরো টাংকটাই খেল ফেলেন। তাতে তিনি প্রায় ৪০০ টাংক বত পান। কিন্তু তাঁর

সন্তোষ কোথায়? তিনি সব টাংকটা অর্ধাং লাভের ও ঘরের টাংক চাইই দ্বিতীয় খোঁড়ার লেগে বৈদে দিলেন। বেথা গেল মাক বাস্তা পর্বত ভাল দুটে খোঁড়া উটোদিকে তড়কে চম্পট দিল। কাঁচের উটোলোকের খুব আশা হড়কে গেল। তাঁর মটনক বস্তু ঘন টাংক মগান জান দিতে গেয়েন, তিনি বললেন 'মারি ত হাতী, লুটিত জ'হা'। অর্থাৎ তিনি অন্ন লাভে হাত মট করতে রাজী নন। আদলে টাংক হার অত্যন্ত পোড ছিল এবং কিলে বাস্তারি বড়লোক হওয়া যায় দেখিকে ফিকির ছিল দিনবাত, কাঁচের টাংক, খোঁড় খোঁড়, জটিকা belting সব বিয়েই তাঁর আদর্শ ছিল বলবান।

পিতৃবেবের জীবিত অবস্থায় পিতৃবেবের অনেক পয়সা মট করে ফেলেন পুত্রের। আর বাকী দেউলু ছিল সেও আত্মনিক তিন লক্ষ টাংক, তাও পিতৃবেবের মৃত্যুর পাঁচ বৎসরের মধ্যে 'পয়সা পয়সা পয়সা হরি' হয়ে গেল। তিনি মৃত্যুর পরে জন্মহস্তবদ্ধ ছোঁড়ার বেথে বেশদহে মতিয়ে গেলেন। নিজে দুঃখবাস ভোগ করে সুখবাসে চলে গেলেন। এখন এই উটোলোকের হাতের বেথাই আদ্য থাক। বেথা যাবে তাঁর ছোট করলে লখা লখা আদ্য। ছোট করলে বত বচ ilcas বেদ। অল্পলগলি

লগ্না থাকায় অনেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতেন, লক্ষ্য করতেন। আঙ্গুলগুলি ছিল কতকটা উন্টোদিকে ব্যবহৃত বা থাকান। এবং ক'র হারে বলে বিভিন্ন দিকে ঝড়িয়ে গড়েছিল। কাজেই তাঁর Principle-এর বাগানই ছিলনা। তবু সহ ছিল সুবিধাবাসিতা। অতি চোখের বা হৃৎ, তাঁরও তাই হলো। তিনি যখন বাস্তবিকই উড়িয়ে ফেলেন, তখন তাঁর হেলেবা হুড়বে কি? তার এই যে অর্থ লাগলো তার হস্তবোধ্য স্পষ্ট লেখা ছিল। তাঁর হাতের রেখা ছিল এই ধরনের।



ক-ভীষনী রেখা

খ-মস্তক রেখা

গ-হৃৎ রেখা

ঘ-ভাগ্য রেখা

ঙ-স্বাস্থ্য রেখা

চ-স্ববি রেখা

কৃত্তিক

ছ-স্রবণ রেখা

জ-ব্যবসা রেখা

দৈহিক ধূল সাধারণতে পাবেন না। সকল প্রকার সুখসুবিধাতে বিশুদ্ধ আশুপ্তিক ছিলেন। তাঁর কয়েকজন সত্যকারের বন্ধু থাকলেও তিনি নিজে ছিলেন সুবিধাবাসী বন্ধু। কাজেই কিছুদিন বাবে তাঁর বন্ধুতা তাঁর আসল পরিচয় পেয়ে একে একে বড় হলেন। শড়ে বইল কয়েকটা খোলাসুখে কোরন। তাঁর বুদ্ধিতে আতো কিছু নষ্ট প্রতী হোল। জীবদ্দশার পিতৃবেব বিশেষ করে শেবেব বিবেক যন্ত্রির নিধান ফেলতে পারেননি। কিন্তু তখন আর আকস্মিক করে লাভ কি? ছেলের মনে পোড়ের পাঁকা বং ধবে গেছে। কাজেই অতিমোতে তাঁর নষ্ট হোল।

এখন তাঁর বুদ্ধিবোধ্য যদি দেখেন শু মন্বরে পড়বেন যে এটি যথো অস্বাভাবিক ভাবে ঘিগতত্ব। একটি ঘটনা অধিক মোটে নেবে করনা প্রবণতার কাঙ্ক্ষ অপরটি উর্দ্ধমিকে গাথিত হতে অর্থ পোপুণ্ডার প্রবল কারণ। কাজেই নানান ফিকিরে অর্থ যোগ্যবাসী ছিল কথ্য। এই দুই বিপরীত গামী পাখা তাঁহার বিচারের যৌক্তিকতা ও সন্দেহ নষ্ট করে দিয়েছিল। তার উপর বৃদ্ধাশ্রম অত্যন্ত নমনীয় কাজেই Principle-এর দৃঢ়তা হল না। দীর্ঘ হস্তায় বাড়লো কেবল ঘেহ। কাকর বুদ্ধি তিনি বড় নিভেন না। তিনি ছিলেন সমতপ্রধান। অল্প পরি-সরের কবতল হস্তায় বড় বড় Ideas মাথার দুবতে লাগলো। বিমুখী মস্তিষ্ক রেখা তাকে বেশ জানতে পারলো না। হৃৎ রেখায় high Sentiments কিছু ছিলনা। বং ছিল স্বাধীনতা এবং কতকটা পর-কাত্ততা। অনাধিকা দীর্ঘ থাকার জীব টা lottery খেলা বলে ধরে নিয়েছিলেন। কাজেই মোড়ের মোড়ে পড়ে তিনি প্রকৃত্ত অর্থ নষ্ট করে ফেলেন নানান অপচেষ্টায়। পরে হুখে, কোতে ও চিহ্নায় পীড়িত হয়ে ইধাধম বেবেক বিষায় নিলেন। এব অতে হারী কে? শুধু কি তাঁর অর্থলোভ? বাল্যো উপবৃত্ত লালন পালন বলে এই দুর্বলতা কি কেটে যেতনা? অমৃত্ত অনেকেটা কমে যেত এটা বলা যায়। হাতের রেখার স্পষ্ট বার্তা ছিল। কেউ কি সে বার্তা পড়লো না পড়তে চায়?

জ্যোতিষ

জ্যোতিষের গ্রন্থাবলি অধিকাংশ ভাল Constanc-

হাত আসল। কাজেই ভোগবিলাস ও ব্যবহারিক ভীষনী হস্ত পূব সঙ্গগ ছিলেন। তাঁর হস্তপুষ্ঠে এবং অনুলীর চোড়া ছিল মোমহী ও মদন। কাজেই তিনি

live কার্ভগুলি এগোতে থাকবে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা এসে পড়ে সাময়িক কতকটা Stalemate অবস্থা এনে দেতে পারে। এবং প্রসঙ্গের দিকে আশা থাকলেও অনেকগুলি গ্রহ বড়ী থাকার কাজ মধ্যে মধ্যে দিচ্ছিল যেতে বাধ্য। ১৭১০ই যে নাগান কোন কোন রাজসরকারকে অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে নামেহাল হতে হবে। কোন কোন প্রতিষ্ঠিত মানী ব্যক্তি হঠাৎ অস্থায়ী হয়ে পড়বেন। এ মানে থাকৃতিও বৈশী। কিন্তু যদি একত্রিত হওয়ার কনটাকশন কম হবে এবং তাৎক্ষণিক মধ্যে একাগ্রতা, একমুখীতা অধিক দেখা দিতে পারে। জনগণের চাকলা অপেক্ষা দৃঢ়তাই অধিক দেখা যায়। কাজেই যে যে মনে তাঁরা কোন কর্তৃত্ব নেননি তাতে তাঁরা অপ্রতিবন্ধক হয়ে এগোতে চেষ্টা করবেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁদের যাবত কম আপত্তি না। এ মাদাটা শিল্পের পক্ষে ভাল নয়। তাৎক্ষণিক আত্মাধি, চিকিৎসা, পান-পানন ইত্যাদি ব্যাপারে বড় লড়াই প্রয়োজন। কারণ এ মানে তাৎক্ষণিক অধিক ভোগস্বাদ কথা। তাই কোন Epedemic হোগে আক্রান্ত হতে পারে।

এবার ব্যক্তিগত মানসল বিচার করা যাক।

বৈশাখ—

বৈশাখ মাসে ঝাঁদের সময় তাঁদের জ্যৈষ্ঠমাস কেমন হবে শুধু। শনিষ্ঠাক্ষর যদি বাপিতে কিছুদিন হোল এসে পড়েছেন। যদি শনি পিতা পুত্র। পশ্চিম পশ্চিমের ঘোর শত্রু। কাজেই লড়াই প্রস্তুত; আঘাত হবে গেছে। পিতা পুত্রের লড়াইয়ে পিতারাই পরাজয় দেখা যায়। সমাধি, যজ্ঞভাষ্য ও মনর বৈশাখ হোগ এম কাব্যে এর জুড়ি জুড়ি নবীরা পাওয়া যায়। যদি হারলেন লব কুণের কাছে, অর্জুন হারলেন বক্রহাটনের কাছে, শোভাব হারলেন কত্তরের কাছে। কাজেই যদিও প্রতি শনির দ্বারা ভিত্তিত। যদি আলো, শনি অন্ধকার। কাজেই বৈশাখ মাসের পোড়ের আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে কি করে? অবশ্য এটা বৈশাখ শিকার সময়। বৈশাখ মাসের পোড় বড় হ্যাগ ত্রিভীক্স দেখাতে পারবেন ততই তাঁরা লংগান-লংগ ফলের আশা করতে পারেন। ব্যত হলে ওলবে না। এখন

offensivetের সময় নয়। এখন প্রয়োজন গঠন ও প্রতিরোধ। এই অবস্থা অনেকদিন চলবে প্রায় দুই মাসের। ঝাঁদের বর্ষা বৈশাখ হতে ১২ই বৈশাখের সময়, তাঁরাই উপস্থিত চাপ থাকেন বৈশী।

সাংসারিক ব্যাপারে অনেক জটিলে থাকতে হবে, উপায় নেই। যে সব পারিবারিক কাজ করে কেমনে মনস্থ করবেন, তাই লাকপায় ওর পথ ঠিক পরিষ্কার নয়। শুধু চেষ্টা চাড়াবেন না। বাগানিত্যের শত্রুর মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। সে সব avoid করুন। টাকা পরমা সময় হতে এসে যাবে।

জ্যৈষ্ঠমাস—

জ্যৈষ্ঠমাসে ঝাঁদের সময় জ্যৈষ্ঠমাস তাৎক্ষণিক মনে যাবেনা। অর্থাৎপায় ভালই হবে, অবশ্য অনেক স্থখহুবিগ ভোগ করবেন। বৃত্তি বিবেচনা পরিষ্কার থাকবে। কর্তব্য উত্তম বাজালে লাভবান হবেন। টাকাকড়ি সহজেই হাতে এসে পড়বে। মাতার দ্বারা মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত হয়ে হবে।

পারিবারিক বিশৃঙ্খলাও মধ্যে মধ্যে দেখা দেবে। জ্ঞানি আত্মীয় কাগেব বায় বাহুগা, তাঁদের লজ্জা হতে পারে। ঝাঁড়া পেখাপড়া করছেন, তাঁদের বিজ্ঞান আগ্রহ বৈশী হবে, দেখা যায়। ঝাঁরা বিবাহিত এবং সন্তান সন্ততি আছে, তাঁরা সন্তানদের বিষয়ে অধিক যত্নানু হবেন, মনে করি।

আষাঢ়—

আষাঢ় মাসে ঝাঁদের সময় জ্যৈষ্ঠমাস জ্যৈষ্ঠ উপর ভাল যাবে। অস্বস্তি হবে, কর্তব্য স্থখ হুবিগ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞান কৃতকার্য হতে পারবেন। ব্যাবহিক আটকাতে পারবেন না। সাংসারিক কাগেব বায়, মাতা ও শুধু লজ্জা যায়, নিজে অতিক্রম অগ্রবর্তী বায়, আত্মীয়ের জন্য বায়, বানান্তর গমনাগমনের লজ্জা বায় খটবে। নিজে যেমতটা কিছু গরম থাকবে। পেটের গোলমাল কিছু কিছু হবে। শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে। শত্রুগ্রস্ত করতে হতে পারে। নিজে কী করে ঝাঁড়াবেন সেই চিন্তা বলবতী রয়েছে এবং দুইমাসের কাল থাকবে। কর্তব্যপাঠের ভাল সময়। ঝাঁদের কর্তব্য নাই, তাঁদের

কর্ম প্রাপ্তি হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। খাতি অবিবাহিত তাঁদের বিবাহের যোগাযোগ চলেবে।

সংক্ষেপ—

হাঁদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তাঁদের জ্ঞান আশ্রয় হলে। কর্মের কড়াট চলেছে দখল, কিন্তু যোগাযোগ, জ্ঞানপ্রিয়তা থাকবে, এই মাঝে কর্মের উন্নতি প্রদান। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগাযোগ ভালই হাঁদে বাধ্যতায় সাময়িক চান এই মাসেই নৈবেদ্য পড়ুন। সম্ভাবনামূলক কারণে ব্যক্তি শিক্ষণ হলে। শুদ্ধচারিত্র্য মাধ্যমে আছে। পেন্সি উচ্চায় করতে পারবেন। হঠাৎ বনপ্রাপ্তি দেখা যায়। সম্ভাবনামূলক অনেক বনপ্রাপ্তি হবে।

কাজ—

কর্মের উন্নতি ও প্রচেষ্টা দুইই আশা করতে পারেন। অর্থ যোগাযোগ ভালই হবে। কিন্তু অর্থচিন্তা চলবে। মতো মতো অর্থিক ব্যয় সামলে উঠতে পারবেন না। কর্মের কড়াট থাকবে, মতো বহনীয়ও করা উঠতে পারে। অন্ততঃ সৌভাগ্য না করে উপায় নাই। বাড়ী, ঘর বা বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু করার আগ্রহ থাকলে কাজে নেবে পড়ুন। আগনি যদি বিবাহিত চন, পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। কাজের ক্ষেত্রে partnership ব্যবস্থায় টপ করে নেবে পড়বেন না। পেশার ভাল রকম যোগাযোগ করে তবে একত্র ব্যবসা করবেন। জাতি আত্মীয়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। তাঁদের মন ব্যয়ও মন হবে না।

আধিনি—

হাঁদের ১০ আধিনি পর্যন্ত মন, তাঁদের কড়াট একটু বেশী। সাধারণভাবে আধিনি মাসে জাতকের এমন এক একটা কড়াট এসে যায় যে নিশ্চিত বাক্য সম্ভব নয়। কাজেই একটা উচ্চ ভাব চলছে। বিজ্ঞান জ্ঞান নয়। বেশী খাতি বরফাক এখন কি অল্প কৃতকার্য হতে চলবে। শত্রু যদি বেশী চালাকি করে তিলক হয়ে পড়বে। আশ্রয় তরফ থেকে অবশ্য পছন্দ avoid করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। নচেৎ ক্ষতি হলে আশ্রয় পাও কথো গিয়ে নিজেই খানিকটা নান্দেহাল হয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সম্ভব ভাল নয়। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ দেখা যায়।

খাতি সম্ভাবনামূলক খাতি বা খাতি। তাঁদের সম্ভাবনামূলক উৎসে অপারিত এখন অনেক দিন চলবে। কাজেই হাঁদে হাঁদে তাঁদের সম্ভাবনামূলক নেওয়া প্রয়োজন।

কাজ—

আশ্রয়মূলক খাতি মাসটা বিশেষ সুবিধামূলক নয়। অর্থব্যয় প্রচুর হবে। দক্ষিণ অর্থ হালকা হয়ে যাবে। মানসিক স্থখ শান্তি তত বেশী না। অর্থের যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যোগাযোগ খটতে পারে। কর্ম-চিন্তা বিজ্ঞানচিন্তা প্রদান হতে পারে। এই সময় ঠিক করে রাখুন ভবিষ্যৎ জীবন কেমন কাটবে। কারণ এই সময় Career সম্বন্ধে চিন্তা আগ্রহ করা। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ এলেও হঠাৎ নিজে খেতেই গিয়ে যেতে পারেন। আর এবং আগ্রহ সম্বন্ধে চিন্তা আগ্রহে পারে। স্বাস্থ্যের চাপ থাকবে। এ মাসটার চূর্ণ করে Plan করুন, পরে কাজে কাঁপিয়ে পড়বেন।

আগ্রহ—আশ্রয়মূলক চিন্তা কোন কারণ নাই। জৈষ্ঠমাস খোঁজাট ভালই হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ এলে ছাড়বেন না। চাহুরী কর্ম করলেও চিন্তার কারণ নাই। অবশ্য খাতি বাড়বে, মতো মতো যোগ্য গরম হবে। উচ্চ করলে ভাগ্যলাভ, তাও আশঙ্কিত। কিন্তু আর খাতি বেশী না। অবশ্য আশ্রয়মূলক পতিত্বিত হওয়া শক্ত। আশ্রয়মূলক আশ্রয়মূলক বেশী যোগ দেবেন না। কারণ সম্ভাবনামূলক হয়ে যেতে পারে। নিজের ব্যক্তিগত ঠিক রাখুন, কিন্তু অর্থ stubborn হবেন না। গৃহ-সংসারের আবহাওয়া এখনও ঠিক অস্থূল নয়।

স্বাস্থ্যের ব্যয় বাধ্যতায় পড়বেন না হতে পারে।

শৌখিন—কাজকর্ম মতই করুন এখন ঠিক খাতি বা খাতি পারবেন না। উৎসে চলছে এবং আরও কিছুকাল চলবে। হাঁদের শৌখিন মাসের ১০ জাতিগত মতো মতো জ্ঞান তাঁদের বিশেষ করে কর্মের হঠাৎ কড়াট কায়েল এলে পড়ায় নাড়া-নাড়া হয়ে পড়তে হবে। খেতে উচ্চ উৎসাহ নিয়ে কার করা বরফাক, তবে ভাষা খানিকটা ফিরবে। সম্ভাবনামূলক উৎসে অপারিত দেখা যায়। খাতি দেখাখাতি নিয়ে আছেন ওঁদের বিজ্ঞান হালকা লাভ সম্ভব সম্ভব নয়। কাজেই অর্থেরা করবেন না। খাতি খাতি খাতি খাতি থাকবেন। নচেৎ উচ্চপীড়া ভোগ করতে হবে। খোঁজ

মাসে আপনাদের বাধ্যতাব্য বোঝা যায়, লক্ষ্য করাই শক্ত। জাতি আত্মীয়ের বাধ্য। ভাল না থাকতে পারে এবং সে কারণে আপনাদের দুঃখিত। তেঁদের হতে পারে। যানবাহন বা যুগ্মি ব্যাপারে আপনাদের আত্মি থাকিট। দিচ্ছ হতে পারে।

বাহ—জ্যৈষ্ঠমাস আপনাদের যত্ন নহ। যে কয়েকটি আত্মক আপনাদের আত্মক থাকতে পারবেন। বাহ্যিক দিকে লক্ষ্য রাখবেন, কারণ *invariably* দেখা যায়। প্রায় বহুত দুঃখ বাধ্য লক্ষ্যে লক্ষ্য থাকে প্রয়োজন। বাহ্যিক আত্মবাহিত্য ওঁদের বিবাহ বোঝা দেখা যায়। আত্মীয় স্বজন নিয়ে থাকিট। অনেকে কাটাতে পারবেন। আত্ম জ্ঞানই হবে। ব্যবস্থা বাণিজ্যের বোঝাযোগ ভাল। অবশ্য প্রচুর পরিচয় করতে হবে। সত্যনিদের বাধ্য ভাল দেখি না। সর্ব বিষয়ে ওঁদের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কর্তে দায় দায়িত্ব থাকছে। প্রায় বহুত দুঃখ টানতে হবে, উপায় নাই। যুগ্মি তীক্ষ্ণ থাকবে, তাই কোয়েই অনেক কামেলা পার হবে বাবেন।

দ্বাদশ—বাহ্য ও শক্ত চিন্তা জ্যৈষ্ঠমাসে থাকবে। বাধ্য গুরু করবেন না। মন্তকতার উপর চন্দ্র। আপনাদের আশে পাশে শক্ত। অধিক ব্যয় চলছে, আরো কিছুকাল

চলবে। অবশ্য টাকার অভাব হবে না। জাতি আত্মীয় নিয়েই বেশী থাকবেন। ওঁদের ব্যবহার অনেকলম্ব্য মনঃপূত হবে না। কর্তে কড়াট চলছে, এবং চলবে। আপনাদের করবেন না, মাংসে তর করে কাজ করুন। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। বাঁদের শিখা জীবিত, ওঁদের শিখার বাধ্য ভাল দেখি না, অনেক ধরল পিতাকে সহ করতে হবে। বিজ্ঞান স্তম্ভল আশা করতে পারেন।

চৈত্র—

আপনাদের জ্যৈষ্ঠমাস শুভাশুভ। বাটতেও হবে, আত্মীয়ও পারবেন। লোকের সঙ্গে মেলাবেশি যোগে যান। ব্যবহারের চেষ্টা করুন। কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসবে লক্ষ্য নাই। কিন্তু বৈশাখ যোগে থাকলে কল্যাণ জুনিষ্ঠিত। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বেশী দেখা যায়। বাহ্যিক বিবাহিত মন ওঁদের বিবাহের বোঝা দেখা যায়। অবশ্য ওঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় অল্প গ্রহণ বলে আছে। কাজেই লম্বা কপালের উপরে ছেড়ে না দিতে, চেষ্টা চালিয়ে যান। অর্থচিন্তা এখানে ঘটেই হবে। যতই ব্যয় লক্ষ্যে করুন, টাকা সম্বন্ধে পারবেন না। বাহ্যিক সঙ্কীর্ণতা কলা বিজ্ঞান উৎসাহী ওঁরা উৎসাহ বাড়ালে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবেন।

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি ?

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর পেয়েন সুযোগ্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানালে। যাদের জন্মকাল, গ্রহের কুট, বিশেষত্বের কথা যা চন্দ্রে তা পান আছে তারা একটি লিখে পাঠালে, নীচ উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri's Ephemeris বা বিগ্গিন্স সিদ্ধান্ত পদ্ধতি অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ সুযোগ্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। জুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পুরের সংখ্যায় পাঠবেন অথবা খুব বেশী অল্পবয়স এসে গেলে পরের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আন্তঃ আন্তঃ পুরের সংখ্যাস্থিতিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সংখ্যে এই পাতার শেষে যে "কুপন" আছে সেটি চিহ্নে পাঠাতে হবে। প্রতি কুপন-এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

আপনি যদি প্রশ্নের উত্তর গোপনীয় ভাবে চান তাহলে ডাকটিকিট ও ঠিকানা সহ ভারতবর্ষ-এর ঠিকানায় অল্পবয়স জানাবেন। দেখেই সুযোগ্য মহাশয় সরাসরি আপনাকে উত্তর দেবেন। পর লেখার সময় ও তারিখ পত্র থাকলে অনেক সময় বর্ধার উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপ পাঠাতেও পারেন প্রশ্নের রহস্যস্বাভাবের সহায়তা হিসাবে। জুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ মেগার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না; Stamp padink-এ চন্দ্রে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগতে হলে কাঠের বা রবারের বোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। কুঝো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে

দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের হৃদয় ছাপ নেওয়া যায়। নতুন ব্যবহার করলে বুঝা খেঁচ বৃদ্ধি হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশতঃ প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও সুযোগ্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় বা গুরুতর, বা জ্ঞানীর আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে বলনা করে প্রশ্ন বার করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক! কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। একজন প্রশ্নটি একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট করে জানাবেন

ধরুন আপনার বাজারে কিছু বেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে কেলেতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "বেনা শুদ্ধে পারবে কি?" "বেনা শুদ্ধে কত সময় লাগবে?" "বেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে"—এই সব। কিন্তু লটারী পাবার জন্য মন শুধাই ব্যাকুল থাকলে তখন ভিজ্ঞেন করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক ভাবে মিলে গেলে সুযোগ্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

ভারতবর্ষ

গ্রহ-জগৎ

জ্যোতিষ ভারতী পণ্ডিত কুমার শঙ্কর শাস্ত্রী

জন্মত্রী চন্দ্রপুৰ্ত্তী

চৌথট্ট নম্বৰ দুশ্ৰেণ বহু এতিমিট আৰু আমাৰ
জীবন স্তুতি পুষ্ঠাৰ একটি উজ্জ্বল আখৰিত টিকানা।

বহুশ্ৰেণৰ নিত্য আনন্দোন্মাদিত মন আৰোহণ আগমন
ঘটে—প্রত্যহৰে প্রহৰে প্রহৰে। এখানে যে ঘণ্টাৰ বেদী
প্রতিষ্ঠিত—তা আগ্রত—বেদী কালী হাতাৰ। প্রতি পনি-
বাবে—বহু তত্ব সহায়মে—পনি পুৰাণৰ একটি বিশেষ
অমুষ্ঠান উদ্ঘাশিত হয়—প্রবল ভক্তি সহকাৰে।

একদা এখানে সম্ভবতঃ আমাৰ আগমন ঘটেছিল—
কতকটা বৈবাকৰ্ণে। ইতিপূৰ্বে এ পৰ ঘিৰে আমাৰ
জীবনৰ বহু পদক্ষেপই—উদাৰীনতাৰ এগিৰে পেছে।
কখনো জানিনা, এই—আগ্রত অধিষ্ঠান বেদী চম্বৰ,
আমাৰ জীবন পতিৰ একটি পঠীৰ ইশাৰা নিয়ে ফিৰে।

এখানকায় পদম ভক্ত-বৈষ্ণৱিক নদাচাৰী সংল-
গাঢ় পণ্ডিত কুমার শঙ্কর শাস্ত্রী—যিনি তত্ত্ব প্রাবল্যে
আত্মহারা, সাধনায় সাধিক, সাধাৰণ জীবনে—অতি
সাধাৰণ, যিনি পরমুৎকণ্ঠত, দ্বিভিন্ন বেদী—উদায় চিত্ত-
স্তুতি স্পায়—ওঁকে আৰু কলমেৰে কটি লিপিতে—হয়তো
উজ্জ্বল আখৰে আঁকতে পাৰে না। একত্ব একমন মানব
সেবক—অনবহৰীৰ ছব্ব—সীমানাৰ অতিথকে দিয়েছে
—অসীমেৰ অনন্তে মিলিয়ে—সেখানে আনি তত্ব,
নিৰ্বাক। ভাষাধীন—এক অবাধ সাহস।

এমনি অবাধ সাহসেৰে ভক্ত বেন সমুদ্রেঃ অসংখ্য
উত্তৰকৰে মন বিপাল হয়ে উঠেছে। এখানে—ভক্ত
স্বায়—আৰ্হ কান্তৰ কুৰীজন। এখানে ভক্ত হয়—
কৌতুহলী জনতাৰ। পনি পুৰাণৰ—হস্তপুণ্ড—প্রতিপলো
—বেন অবাধ আকৰ্ষণে লবাইকে এখানে ভেৰে আনে।
আত্মান জানায়, এলো—তোমরা এখানে শাস্তিৰ প্রাপ্তি,
সুখিৰ অকনে।

কি শাস্তিৰ প্রাপ্তিৰ বাৰা বহু হয়—সেই বাৰা

হেন মানে চোখেৰে দ্বিভিন্ন, তাৰেব—অন্তৰে। প্রাপ্তিৰ
কোটৰে।

এই পবিত্র কুটীৰেই অবধান কৰেন কোষলপ্রাপ
কুমার শঙ্কর শাস্ত্রী। তাম্র দুৰ্ভুত থেকে—পাণ্ড নিশীথেও
—তিনি তাঁৰ দেহকৰ্ম্ম অটল নিষ্ঠায় পালন কৰেন।

ভাৰত বিখ্যাত জ্যোতিষ আচাৰ্য্য শ্রীমোহিনীমোহন
শাস্ত্রীৰ যোগ্য পুত্র ইনি। জ্যোতিষ পদনায় পতিত
কুমারশঙ্কর শাস্ত্রীৰ অসাধাৰণ সূত্ৰপত্তি সাত ঘটেছে
শিত্ৰেৰে শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রীৰ নিকট হতে।
শিত্ৰেবৰও শুণু জ্যোতিষদাসৰ ছিলেন না মানবিক সেবা-
বৰ্ণে যেমন তাঁৰ স্বয়ং, উদাৰতা ছিল, তেমন বৈষ্ণৱিক
সহ্যচাৰী তাম্র বিশেষেও হৃদয়চিত্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীম-
ঠাকুৰেৰ সাধিবালাকে অধ্যাত্মিক উপাশনায় তাঁৰ
উদ্যোগীকৃত জীবনৰ পাশেই স্বীকৃতি হৰে উঠেছেন তাঁৰ
হৃদয়্য পুত্র শ্রীকুমারশঙ্কর শাস্ত্রী।

শিত্ৰবাৰায় সাহায্যকে অবলম্বন কৰেই বৰ্তমান
কালেঃ একমন শ্ৰেষ্ঠ জ্যোতিষ ভাৰতীয়ে পতিত কুমার
শঙ্কর শাস্ত্রী হৃদয়ৰে ব্যাতি। উদ্যোগীকৃত বুদ্ধি
পাছে।

ইনি বৰ্তমান ভাৰতীয় জ্যোতিষ শিত্ৰেবৰ সহকাৰী
সম্পাদক। বাটি হিম্মুৰ্ণে কীৰ্তিত বৈষ্ণৱিক তাম্র কুমার
শঙ্কর শাস্ত্রী হৃদয়ৰে বলেন আমাৰেৰ সাহচৰ্য্যও মূৰ্তি-
পূৰ্ণা যে বৰ উপেক্ষা কৰে সেই বৰ্ষে যোক জান লাভ
সম্ভব হানি। মূৰ্তি পুৰাণ হৰোই তেলে অগ্নে প্রকৃত
দেহতত্ত্ব, দান, বাৰণ, সেবা বৰ্ষ, যোক ও মূৰ্তি।

সংজ্ঞানী কুমার শাস্ত্রী হৃদয়ৰেৰ ধৰ্মী বিশেষিত
আলোচনায় আমাৰ প্রকৃত সম্মান পাই, তাঁৰ ইবৰানিষ্ট
হৰেব। অস্ব উপদৰ্শিৰ প্রজ্ঞান সত্যটিৰ শুণু প্রতিষ্ঠিত
তাঁৰ মূৰ্ত্তি মন্তব্য। আত্মিক অমুষ্ঠানৰ অহংপ্রবণ

ঐর দ্বারে ভক্তিচাষের প্রাণশো প্রবাহিত হলেও ঐর কোনরকম ধর্মীয় স্থপত্যস্বাক্ষর পৌঁছানো নেই।

বিস্তারিত বতাবাণে উল্লিখিত অতিব্যক্তিগে তিনি কঠোর সত্যবাদন এবং অত্যন্ত শঠবাহিতার ঐর দ্বারা আবেগিতকর কঠোর। কোনরকম ভতামী মিথ্যাচার ও ছলনাকে তিনি প্রশংসা না দিয়ে কঠোর ভাবায় সমালোচনা করেন। কোন ভক্ত শিল্পের ভোখাধকী নীতিকেও, বিন্দুমাত্র পছন্দ করেন না। প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন সত্যিকারের 'হাস্য' হিসেবে সকল মনের তত্ত্ব মানসিকতার উজ্জ্বল এক প্রতীকরূপ। আর এখানেই তিনি হস্ত! তিনি সার্বক! তিনি পথিক্রমকর।

চিত্র কর্মব্যস্ত জনদ্বন্দ্বী পণ্ডিত কুমারেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বহুতর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধা ভাবে হুক্ত। ঘা, বালী রামমণি মিশন, 'নি'বি বৈক্যব সন্নিগনৌ' 'সাধারণ ক্যাডেট কোর' (অধ্যক্ষ আশ্রম পণ্ডিতেরী) 'আবাসবাগ সাধককবি রামলাস দ্বিতীয়কালমিতি', 'বঙ্গীয় পণ্ডিত বগদৌ', 'নিবিল বক পৌরাক মহাপ্রভু পঞ্চমত বারিকী অমর্তী কমিটি, নিবিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সংসদন, চৌতালগা ছাত্র প্রাথমিকবাহার

মিশন সন্নিগনৌ, জীবন বঙ্গ, বালীগঞ্জ বিজ্ঞান সঙ্কীভ সন্নিগনৌ, ভাবেন্দ্রপ্রদায় সঙ্কীভ বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ মহাজ কর্মী পথিব্য, ইউনাইটেড জোসিয়াল ওয়েল কোর, বিলিক ওয়েল কোর কোর ইত্যাদি মানান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐর একনিষ্ঠ কর্মজীবনের সন্ধ্যা!

ঐর জীবনের উত্তরোত্তর জীবিত ও খ্যাতি লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রচারিত। তথাপি ঐর বঙ্গবিপ্লবের কোন মোহ-আনন্ড নেই বিন্দুমাত্র। ঐর জীবনের কর্মজীবনের সন্ধ্যাই যোগ দেবা ধর্ম। তিনি মনে করেন আত্ম প্রচারণাই নিক্রম দেবা-ধর্মের সাধ্যমেই যে কোন হাস্যের চরিত্র গঠিত হয়। শুধু সাধন ভজনপুত্রনেই প্রকৃত ভক্ত বগয়। আর না। সেইই সবচেয়ে বড় ভক্ত যে ধানবন্দোয়ার প্রকৃত আনন্দোৎসর্গ করতে পেরেছে।

ঐর এই বানীধর্মের মধ্যে বীর জীবনের যে মহত্ত্ব সাস্ত্র পেতেছি তা তুলনা হোম। অতুলনীয় এই মহান চবিত্তের কথা কতটুকু প্রকাশ করতে পারলাম জানিনা।

শুধু জানি গর্ভতা হতেই সাধা হুটক বা-পাথর বেদনার শুধু সার্বকতা আছে লুকিয়ে পরম অহস্তের মাঝারে। সেখানেই তিনি উত্তরক!





রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

নীলা বিজ্ঞান

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কবি বলেন পুরুষকে লক্ষ্য করেই বিবাত। নারীকে স্তম্ভি করেছেন। যিনি মহেন্দ্র, যিনি পরম বীর, সেই পরম বীর্যবান দেবতা পুরুষকে বীর্যে লোকা দেবার জন্তেই নারীকে মঙ্গলারে পাঠিয়েছেন।

"নারী সে যে মহেন্দ্রের ধান

এসেছে ভগত তলে পুরুষেরে

হানিতে লক্ষ্যন।"

টিক যেমন আশ্বিনের ঘেমে নীতাকে পেতে হলে হর-ধনু ভক্তের বীর্য। পরীক্ষার জরাজাভের কথা আছে তেমনই ইউরোপেও শ্রেষ্ঠ বীর তার বীর্যের পুংকার শ্রেষ্ঠ হৃদয়কে প্রণতি জানিয়ে তার হাত থেকে গ্রহণ করত।

কবি বলেছেন পুরুষকে বীর্যের পথে প্রেরণা দিতেই এসেছে নারী। নারীর বোহনস্তপের কাছে পুরুষ আপন বীর্যের পরিচয় দিয়ে তার চোখে নিঃক্ষেপ দৃশ্যবান করে দেখাতে চায়। প্রকৃত পক্ষে সে তার প্রেম আকর্ষণ করত চায়। নারী যদি এমন বোহন এমন সোভন না

হত, তা হলে পুরুষ তার অন্ত হৃদয় বীর্যের পরীক্ষা দেবার কষ্ট স্বীকার করত না। এই জন্তেই মহেন্দ্র নারীকে অমন যোচন হৃদয় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ হৃদয়ীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর্যেরই জন্তে। হানকস্তার বৈ-মাণ্যের দাবী আছে হানপুত্রেরই।

কবি লিখেছেন—নারীকে আভরণে সাজাবার জন্ত পুরুষ নেমেছে লাগরের অন্তরে মণিদুকো আভরণ করবার জন্তে, নেমেছে খনির গভীরে মণি অহরণের জন্তে, উঠেছে পাহাড়ের দুর্গর শিখরে কুসাহসের পরিচয় দিয়ে নারীর চিত্তে লক্ষ্যনের আগুন অবিকার করবে বলে। পুরুষের এই পৌরুষ যে সে কঠিন বীর্য দিয়ে সৃষ্টি করে নারীর হৃদয় জয় করেছে।

সংসারের অপোভান মোক্ত যখন লব তিলু অসম্ভব করে তুলেছে তখন কবি আপা করেছেন যে হৃদয়ী নারীই পাবে এই চাহপাশের অসম্ভবকে হৃদয় করে তুলতে, অপোভান মোক্ত সংঘত করতে। "রক্ত করী"তে নন্দিনীর এই ভূমিকা। বনভ্রমিক লক্ষ্যের ধনিক যখন

ধনের দোহে উন্নত হয়ে তার চারণারের হাছকে পীড়ন করে নিজের ঐশ্বর্য। গতে কুলছে, হাছকে দাবিয়ে চেখে তার কাছ থেকে নিজের কাম সাধাঃ কহাই তার উদ্দেশ্য, তখন সে নিজেকে সাধারণ হাছের কাছ থেকে আলাদা করে রাখে। সে যে সংসারের সঙ্গে কথাব্যর্জিত আদান-প্রদান করে সে এই জালের আড়াল থেকে। তার কথাব্যর্জিত শুণ্ড প্রয়োজনের দাপে দাপ। হৃদয়ের, অপ্রয়োজনের কোনো বাস্তব তার মধ্যে নেই। সে হল নিত্যকই কালের কথা। অনিশ্চয়ের আগাপন নয়।

এই জালের আড়াল থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে নারী। বাইরের লহর সংসারের সঙ্গে তাকে ভালো-বাসার বিন্দনে বিস্তারিত ধিতে পারে নারী। জালের আড়াল তের করে যেখানে আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না সেখানে নারী প্রবেশের পথ পায়। নারীর স্বপূরী আকর্ষণে হৃদয় একদিন এই জালের অন্তরাল দিতে যাবে কবির এই আশা। এই মহৎ গৌরব কবি দিয়েছেন নারীকে। নারীর প্রতি কবি আবেশ করেছেন এক মহৎ দাবি অকল্পকে সমবেদনার করণ করে তোলায়, অকল্পকে স্থল করে নেবার। যা ছিল তুই 'নির্মল নক্ষিত্র নিহুঃ প্রকাশ, তাকে সবার কল্যাণে নিযুক্ত করে নেওয়া, নিহুঃ নক্ষিত্রানের ঘাতে হাত ছেঁবে ভার্য্যে সবার সঙ্গে সমবেদনার আত্মীয়তার নিদ্রিবে নেওয়া, এই হ'ল নারীর দৌন্দর্য্যের মহৎ দাবি। যেখানে নারী এই দাবির প্রদর্শন করেন সেখানে কবি নারীকে বিচার দিয়েছেন। 'রক্ত করবী' বইতেই পাই—সর্গারনীরের প্রতি কবির বিচার। এই সর্গারনীর হ'ল ধনভাতিক সমাজের বিলাসিনী নারী। তারা কলসনে লালসম্ম। গতে ধনভাতের লসাপূজা করে বসে বাগান বাড়ীতে উৎসবে চল। তাকে রূপ, ভাস্কর্য্য লাল-দম্ম, কর্ণকরের গোব দাবিরে দেয়। চারণারের মানব পীড়ন আর হৃদয়ের প্রতি উদ্বাসন নারীর এই উৎসবসম্ম কবির চোখে নিষাক্ষ নিহুঃ বলে লেগেছে।

ধনভর্য্য যখন একদল হাছকে শোষণ করে তাকে অসাহসের পর্যায়ে কলে নিজের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়ে চলছে, তখন নারী কেমন করে এ ঐশ্বর্য্য এ হৃদয় ভোগ করে, কেমন করে সে এই উৎসবে যোগ দেয়, নারীর প্রতি

কবির এই অভিযোগ।

'রক্ত করবী'র স্বপূরীর যখন নিয়ম হয়ে গেল যে কাণ্ডিগরী ভাস্কর্য্যে সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে আনতে পারবে না, তখন কাণ্ডিগালের স্ত্রী চম্ভা গ্রহণ করে, কেন, ওদের নিজেদের ঘরে কি স্ত্রী নেই? তাকে বিভাগল জবাব দেয় ওদের স্ত্রীরা যে দোনার দোহে ওদের দাবীদেয় ছাড়িয়ে যায়।

নারী যদি দোহী, নীচ আর দাবীদেয় হয় তা হলে তার দাবীদেয় পূর্ব্বের দাবীদেয়তাকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কবি প্রতীক্ষা করেছেন নক্ষিত্র নত নারী নারীঃ। কবি আশা করেছেন লগতে এমন কোন হৃদয় আড়ালে নেই যা তের করে নক্ষিত্র তার আনন্দে ছোঁয়া দিয়ে, তার অশ্রু বৌবনের দাঁত দিয়ে দেই আবেশ তের করে অকল্প নিহুঃ সংসারের মধ্যে কল্পা ও কল্যাণের স্বার্থে টেনে আনতে না পারে। স্বপূরী, যৌবনশালিনী নারীর প্রতি পূর্ব্বের যে আকর্ষণ, নারী সেই আকর্ষণকে সংসারের কল্যাণে নিয়োজিত করুক, তবেই একদিন সংসারের মধ্যে জীবনের, যৌবনের, হৃদয়ের ও প্রেমেয় লয় হবে রক্ত করবীর নক্ষিত্র, যেহেতু প্রতি কবির এই গভীর আবেশন বহন করছে।

এ যুগের ইউরোপের প্রেষ্ঠ লেখক লর্ড বার্নড শ'ও এ রকম কথা বলেছেন। ব্যাকটু যথুগো বইতে তিনি হাছের তারী কালের যে ছবি একছেন সেখানে তিনি নারীর কথা বলেছেন যে যেদিন সে দলন পালনের দাবি থেকে মুক্তি পাবে, সেদিন তার কাছ হবে তুই পূর্ব্বকে বৌবনের পথে অগ্রপ্রেরণা বান করা। লগতের জন্মদানকে বার্নড শ'ও কোন দৌবনের চোখে দেখেন নি। নারীর মাতৃ কোন গৌরব করবার জিনিষ নয়, সেটা হাছের জীবনের নিরন্তরই একটা চিহ্ন। হাছের জীবন যেদিন আরো উজ্জ্বল উঠবে, সেদিন নারী আর যা থাকবে না, সে হবে পূর্ব্বের প্রেরণাশালিনী নক্ষিত্র— এই কথাই বার্নড শ'ও লগতে দেয়েছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে আনন্দ কানুৎস আরো বারী নারীর কাছ থেকে কোন অগ্রপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারে না। তারা নারীর সঙ্গে আনন্দ পায় না। তারা হৃদয় শাস্ত্রের বিধান অগ্রাহ্যে নারীকে কেবল লগতের

জননী, তার উত্তরাধিকারীর অঙ্গাধারিতা বলেই দূলা দেব।
নারীর স্বাধীনতা, তার মন, তার আনন্দরূপের প্রতি তারা
অন্ধ।

দুই বিধানের মধ্যে সত্যানের অঙ্গাধারিতা নারীর
কাঁজ। কিন্তু তবু এই ক্ষেত্রেই তার সমস্ত দূলা নহে।
এ ছাড়াও তার নিজের দূলা আছে। এই বিশ্বের দুই
বিধানের মধ্যে এই নিয়ম যে দুইবিধাভা আনন্দের পথে
সৌন্দর্যের পথে নিজের সমস্ত উদ্বেগ সিঁচ করে নেয়।
দুলাই বহি উদ্বেগ নাও হয় তবু দুলা ফোটারোতে প্রকৃতির
আলস নেই। ফুলের বর্ষ, তার পাগড়িতে বিভিন্ন লেখা,
মৌমাছিকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা, যে মৌমাছি পরাগ-
ধেনু হয়ে নিয়ে গিয়ে কল ফলানোর কাজ এগিয়ে বেবে।
কিন্তু তবু ফুলের অঙ্গ কোন দূলা নেই, স্বাস্থ্য ক্লমকে তবু
কল ফলাবার উপায় জানেই বেঁচে, প্রকৃতির মধ্যে এ
কথা লভা নহে। ঠিক তেমনি নারীরও একটা আনন্দরূপ
আছে। সেই আনন্দ থেকে যে নিম্নেও বঞ্চিত করে,
সে নারীকে তো দুঃখ দেই, নাকে লাগে নিঃশ্বাসের বঞ্চিত
করে।

সমস্তাঙ্কের একটি গল্পে কবি এমনি এক সন্তান-মোড়ী
অসহিষ্ণু, আনন্দ-বিম্ব পুরুষের কাহিনী বলেছেন।
বিয়ের অনতিদীর্ঘ পরেই সন্তান না জন্মাবার মত সে
অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। তার কেবলি দুচ্ছিন্না কে তার
সম্পত্তি ভোগ করবে। স্বীর কিন্তু তখনো সন্তানের মত
কোন ব্যাকুলতা নেই। সে ফুলের মত আপন যৌবন,
আপন সৌন্দর্য নিয়ে ছুটেই দ্বন্দ্বী। সে চায় স্বামীর মন,
তার আদর। কিন্তু সন্তান-মোড়ী স্বামী তার মনে কল
স্বাধীন করে।

কিন্তু তার নবযৌবনের সৌন্দর্য্য দৃঢ় করল তার
স্বামীর বেগমকে। সে যখন একদিন গুলে নির্জনে গেয়ে
এগার নিবেদন করতে এল, তখন সে হৃৎ ওর স্বামীর
ঘড়ের একদলীর চোখেপড়ে গেল। দলীর মুখে ধব ধব গেয়ে
স্বামী নিরুপরাধ ব্রীকে তাকিয়ে ছিল। তারপরে সে
খিঁচী বাব বিয়ে করে সন্তানের আশার পাখি সন্ন্যাসীয়েব
জেক এনে তারের দেকা করতে লাগল। তখন একদিন
প্রাক্ষণেব একদারের একদিন এল এক ভিখারিনী একটি
শিশুর হাত ধরে। কবি লিখেছেন সন্ন্যাসীরা যখন বিখ্যা

আশার প্রদূষ করে ওর অঙ্গ ভাগ বদাচ্ছিল, তখন ওর
একমাত্র লক্ষ্যনকে ও তার জননীকে ওর বারোহান দুই দুই
করে তাকিয়ে ছিল।

নারীর প্রতি পুরুষের এই বিবল মন মোড়ী চিত্তকে
বিভার দিয়ে কবি এই গল্প লিখেছেন।

এই গল্পে কবি নারীর চরিত্রের একটা দিকের কথা
বলেছেন। সে হ'ল এই যে নারীর প্রকৃতি, সে নবনারীর
এগারমোলা দেখতে ভালোবাসে। তখন সে আর অগ্র-
পক্ষাৎ বিবেচনা করতে পারে না। নীতিবশত তার মনে
থাকে না। নীতি বিপরীত প্রবর্তনীলাকেও সে উৎসাহ
দিয়ে আনন্দ পায়।

ঐ গল্পে দ্বন্দ্বী নিজের বেগমের মৃত ভাব লক্ষ্য করে-
ছিল। এই বসন্ত মৃত্যু লম্বাছেই নারীর চোখে পড়ে।
কিন্তু সে দেখেও সে নিজের মনকে দাবানান করেনি বা
নিজের বেগমকে ভিতরকার করেনি।

কবির বর্ণনা পড়ে মনে হয় কবিও নারীকে তার
এই মহাকাব্য রূপপ্রতিভার ক্ষমতা কঠিন বিচার করতে পারেন
নি, তার এই দুর্বলতাকে প্রস্তাবেই চোখে দেখেছেন।
আবার এর একটা বিপরীত দিকও কবি অন্তর দেখিয়ে-
ছেন। গহবোবনা স্বামী মৃত্যুর প্রতি চিহ্নিত হয়ে
গঠে। সে তখন তার প্রেমের বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্বোধনা
ভুলে যায়। 'নিপিকা'-বইয়ের একটি কবিতার লিখেছেন—
তুঙ্গী ছাড়ের কোণে বসে গোপনে তার চিঠি পড়ছিল,
এমন মাঝে তার শেফনে এসে মাদ্রাস এক জোড়া, যার
হাতে মোটা কাঁকর, মোটা মি'বিয়ে মোটা করে মি'সুও
লেনা। যেন কপোতিকে এসে হেলি নিহ্নর স্তন পাখী
অভর্কিতে। সে এসে ওর চিঠি চোঁ মেরে নিয়ে গেল,
ওর চাত থেকে। এর পরে তবু হবে ঐ অপরাধের মত্রে
ওর কঠিন শাস্তি।

বিবদ-চিহ্ন পুরুষের হাতে নারীর প্রেমের বর্ণনা
আদর পাই 'মুক্তির উপায়' গল্পেও। নারী লম্বাছেই
জীবন রঙ্গের বদিক। সে বঙ্গ প্রিয়, বহু প্রিয় ও আনন্দ
প্রিয়।

যে স্বাস্থ্য আনন্দ বিম্ব সে অনেক সময় ধারকতার
আড়ম্বর করে। সে স্বর্গ-বাসিত্যগ্রস্ত হয়ে ওঠে। জীবনের
স্বাধীনতার স্বভাব নেই বলেই সে সন্ন্যাসী হ'তে চায়।

হৈমবতী নীরব প্রকৃতির ফকিরাটোয় হুঁতুই থা।
ফকিরাটোয়ের নীরব প্রকৃতিও বর্ণনা ক'ব কবি বন্দোছেন,
অল্প বয়সেও তাকে কখনো বুড়োদের মতো যেমানান
লাগত না। হৈমবতী তার নবযৌবনের উজ্জ্বলতা নিয়ে
কামীর সঙ্গে যে বহুলাপাণ করতে চায়, ফকিরাটোয়ের
ভাতে মন নেই। সে হৈমবতীকে নীরব বর্ষগ্রহ পড়ে
শোনাতো ঘাট, তার কাছে শাশন প্রণালীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা
করতে চায়।

বিবশতি পুরুষের হাতে পড়ে নারীর দুর্গতি কবির
মুখবন্দনা ঘাপিয়েছে। কবি লিখেছেন—অবিভ্রান্ত আবেশ
উপদেশ ধর্মমতি এবং বসন্তোত্তির ধারা অধঃপথে হৈম-
বতীর দুখের ছাদি মনের হৃৎ এবং যৌবনের আবেগ
একভাবে নিঃসর্ব কবিতা ফেলিতে কামী-দেবতা সম্পূর্ণ
কৃতকাণ্ড হইয়াছিলেন।

বহিমুদ্রা যেমন আনন্দের শাস্তি ও কল্যাণীর ছবি
এক নারীর দুই রূপ দেখিয়েছেন, এক রূপে সে আত্ম-
বিসর্জন পরায়ণ, অস্তরূপে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা দুটোই,
তেমনি বীজনাথও নারী-চরিত্রের এই দুটো বিকের
কথা বলেছেন।

চন্দ্রক উপজায়ে কবি নন্দাবাগার আর দ্বাদশীর
বর্ণনায় নারী চরিত্রের এই দুই বিপরীত স্বভাব বেশ স্পষ্ট-
ভাবেই দেখিয়েছেন।

[ক্রমশঃ]



সুপর্ণা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নারীর রূপ-সৌন্দর্য ও বেধ-চর্চা সংক্ষেপে আলোচনা
প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই বলেছি যে মেয়েরা নারের আত্ম-
বংশের না, সমাজের না। কাবণ, নারের স্বাধীনতা সত্যনের
স্বাধা, সমাজের স্বাধা। পাচাত্তোর অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ

আধুনিক-রূপচর্চা-বিশাচকোণ হলেন যে—Women
are the backbone of the nation. তাই তাঁরা
অভিন্নত প্রকাশ করেন যে নারীর বেধ হুঁচলে পড়ে শুঁঠা
চাই লকল দিক দিয়েই। বিশেষতঃ, তার ভগ্নরই মখন
ঘেনের ও ঘেনের ভবিষ্যৎ-জীবন আর সমার-বেধের
হুঁতুই নির্ভর করে একান্তভাবে।

কিন্তু দুখের বিষয়, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে
আমরা একেবারে লক্ষ্যহীন। তাইই বলে, আমাদের
রক্তপুর আর অম্মাছার মানি-অশাস্তিতে ভরে উঠেছে—
ব্যাধি, অকাল-মৌলিকতা অধিকাংশ মেয়েদেরই রূপ-লাভ্য,
বেধ-মন পীড়িত-কষ্টকু হয়ে উঠেছে। তাই এ বিষয়ে
ভাঁড়ের সচেতন করে তোলা এবং স্বঃ-সংসারের বৈদগ্ধিন
কাজবন্দীর অবসরে নিত্য-নিরমিতভাবে নিত্য ঘোঁরা
ছাঁদের সংল ও সংল-সংল কিছু কিছু বৈধিক-ব্যায়াম
অনুশীলনে আগ্রহান্বিত হবে তোলায় উদ্বোধিত আমাদের
এই ধারাবাহিক প্রসঙ্গালোচনার সামান্য প্রয়াস।

ইতিপূর্বে মেয়েদের বৈধিক স্বাধা ও রূপ-লাভ্য হু-
হুস্ব স্বাধার উপযোগী যে সব ব্যায়াম-চর্চার হৃদিশ
দিয়েছি, এবারও গ্রীবা বা ঘাড়ের গঠন-মৌলিক বলায়
স্বাধার সংক্ষেপে তেমনি ধরণের আবেগ করেকটি ব্যায়াম-
পদ্ধতির মোটামুটি আলোচনা করছি।

হায়েশাই নম্রের পড়ে—রূপসজ্জা করতে বলে মেয়েরা
মুখ, চোখ, হাত, কেশ-বিশ্রাণ—এ সবেরই পরিচর্চা ও
প্রশাধন করেন, গ্রীবা বা ঘাড়ের সংক্ষেপে ঔপাসীজের সীমা
নাই। তাই অনেক সময়ই দেখা যায় যে বহুমেয়েদেরই
গ্রীবা বা ঘাড়ের পিছন-দিকের মেহাংশের বর্ধ থাকে
মলিন, অপরিচ্ছন্ন, কুঞ্জী। কাবণ, সান বা গা-বোয়ার
সময় ঘাড়ের কোনোমতে একটু সানান হবে বল ঢেলেই
তাঁরা দায়বৃত্ত হন। এই অস্বস্তি অবস্থায় বলে, গ্রীবা
বা ঘাড়ের বর্ধ, মুখ বা বেধের বর্ধের পাশে যে বর্ধতে
পারে না, তার আল কায়ণ গ্রীবা বা ঘাড়ের স্বাধা-
হীনতা। তাই নিত্য নিরমিতভাবে গ্রীবা বা ঘাড়ের
ব্যায়াম প্রয়োজন। এদিকে মনোযোগী হলে, ঘাড়ের
বর্ধ কমাতে মলিন বা অপরিচ্ছন্ন হবে না এবং বয়োবৃদ্ধির
সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের কবর্ধা কুঞ্জী একপ্রাণ যের চমকে ঘাড়-
গর্দানে হুঁচকায় ও মজাবনা থাকবে না। ঘাড় ক্রমশঃ হয়ে

উঠবে হুম্বর হঠাৎ ঘরাল গ্রীবার হতোই কুকনীন, হঠাৎ সাংলীল হুই ও বর্ষাত।

গ্রীবা-পরিচর্যায় অবহেলা-প্রবাসীভবন ফলে, কোনো কোনো নারীর ঘাড়ের পশ্চাতে যেহেতু কখনো কখনো ঘাড় হয়ে ওঠে কাপালো-পুত্ৰ হুইবে, কাতো বা অস্ব-স্বা (Scrawny) কৌণ-দুর্গল। এ প্রসঙ্গে পাক্তভার অতিভ-বিচক্ষণ ভগদর্শী বিশারদেতা বলেন যে—“A neck will tell your age quicker than your birth-certificate and probably add a few years!” অর্থাৎ, ঘাড়ের গঠন-দোঁঠের নষ্ট হলে কম-বয়সের নারীকে দেখার অধিক বয়সী নারীর হতো। কাজেই যে সব মহিলা স্রাবী হিলাবে পরিগণিত হতে অভিল্যাবিনী, তাঁদের পক্ষে শুধু ঘুণে হাতে সাবান ধবে বা ক্রম লিপিক্ত পাউটার ব্যবহার করে কৃত্রিম রূপসম্মার সাধনায় না যেতে, বরং নিত্য নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ বৈদিক ব্যায়াম চর্চাও দিকে সময় দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

গ্রীবা-পরিচর্যায় লক্ষ্য উপায় হলো নিয়মিতভাবে নিত্য কয়েকটি বিশেষ ধরনের লক্ষ্য সরল ব্যায়াম পদ্ধতি অঙ্গুলীন করা। যে সব ঘোষের বেহ কৌণ বা গোণা ধরনের নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অঙ্গুলীন ছাড়াও পান-তোজন লক্ষ্যেও তাঁদের সচেতন থাকে প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রতিদিন এমন খাওয়া ও পানীয় গ্রহণ করা চাই যাতে মেঘের পুষ্টি ও ‘Tissues’ সৃষ্টি সংস্কারিত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে, শরীর স্থর মল ও ক্রমশঃ হঠাৎ হুইবে গঠিত হয়ে উঠবে। এছাড়াও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে যে কয়েকটি ব্যায়াম ভগ্নী অভ্যাস করা দরকার, আপাততঃ তাইই মোটামুটি আদান দিই।

গ্রীবা পরিচর্যায় প্রথম উপায় হলো চলা-ফেরা, বসা-ছাড়ানোর সময় ঘাড় বা গলায় যেন ‘কোঁচ’ কিংবা ‘বঁজ’ না পড়ে যেদিকে দয়া লজাগ সৃষ্টি হাথা প্রয়োজন। খোজাল রাখবেন—ভিবুক বেন বুকে উপর হুঁকে বা স্টেটে না থাকে। এ অভ্যাগতি বস্ত্র ব্যবহার লক্ষ্য বিধি হলো—প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অস্ত্রতপকে পনেরো-তুড়ি মিনিট-কাল সাধারণ উপরে সূর্যকথানি তাত্তী মোটা বঁধানো বই কিংবা খাতা চাপিয়ে, দেওদিব ‘খ্যালাল’ বা ‘ভাব-দায়া’

বতার হেপে দীর্ঘ দীর্ঘে ঘবে পাগড়াবি করে বেড়ানো এবং ঘাড় দিবা-খাড়াভাবে তুলে কিছুক্ষণ চল-বেরা করা। এই ব্যায়াম ভগ্নী অভ্যাগতের ফলে গ্রীবার গঠন হুম্বর ও সাংলীল হয়ে উঠবে এবং ঘাড়ো বা গলায় ‘কোঁচ’ বা ‘বঁজ’ পড়বে না।

গ্রীবা পরিচর্যায় দ্বিতীয় বিধি হলো হাতের—পথ্যগ্রহণের পূর্বে নিত্য নিয়মিতভাবে ঘুণে ঘাড় ও গলা সাবান জলে বেশ ভালো করে ঘুণে তোলালে ঘুণে ঘুঁষে নেবেন। এভাবে তোলালে ঘুণে ঘাড় ও গলা ঘুঁষে নেওয়ার ফলে বস্ত্র-চালন ক্রিয়া আর শেণীগুলি মজিব-বহু হয়ে ওঠে।

গ্রীবা-পরিচর্যায় লক্ষ্যে আপাততঃ এটুকু হুইব দেওয়া হলো। আগামী লক্ষ্যের গ্রীবা-পরিচর্যায় উপযোগী বিশেষ ধরনের কয়েকটি লক্ষ্য লক্ষ্য ‘বঁজা’ ব্যায়াম পদ্ধতির পরিচয় দেবার বাসনা হইলো।



শিশুদের পশমী কেটি

শোভনা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ঘর-মহোলের বৈদিকিন কার্যকর্মে অসুখ যে সব মহিলা সৃষ্টিশিল্পের চর্চা করেন, নানা ধরনের নতুন-নতুন নকশা-নমুনা আর বিভিন্ন সেলাইয়ের পদ্ধতি লক্ষ্যে তাঁদের আগ্রহ অল্পাংশ অপরিণীত। সৃষ্টিশীলরাঙ্গাশিল্পী মহিলাদের সুবিধার্থে এবারে তাই লক্ষ্যে অকলের সুবিধায় ‘চিকন’ সেলাইয়ের লক্ষ্যে মোটামুটি ভাবে কয়েকটি প্রসঙ্গালোচনা করছি। লক্ষ্যে অকলের দৌধিন-হুম্বর ‘চিকন’ বা ‘চিকনকাবি’ সৃষ্টিশিল্পের প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই এই বিভাগে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, তাই এ লক্ষ্যে

আমরা কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয় তো নিম্নলিখিত অংশের মধ্যে ন।

প্রাচীন ইতিহাসে নিম্নলিখিত গবেষণা করেন তাঁদের অনেকেরই অভিমত—হুট-শিল্পের ব্যাপ্তি প্রচলিত হয়েছে যুরোপ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। কারণ তাঁরা প্রমাণ পেয়েছেন যে সেকালের মানুষ পোছার ছুঁচের ব্যবহার করতেন হাতের তৈরী বিভিন্ন অভিন্নর ছাঁকের সেলাইয়ের ছুঁচ। পরবর্তী আমলে প্রাচীন মিশর-বেঙ্গের লস-লুপ থেকে লক্ষ্যন মিলেছে তামা আর তিনের সংমিশ্রণে বাঁকু দিয়ে তৈরী আরো নকশাকৃত ধ্বংসের ছুঁচ। প্রাচীন রোম-সাতোড় ইতিহাসেও প্রমাণ বেলে যে তৎকালীন সময়ে হুট-শিল্পকলা বিভিন্ন একটি পৌরসভায় স্থান অধিকার করেছিল। তবে সামুদ্রিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই অভিমত—হুট-শিল্পের আদি হুসনা হয়েছে প্রতীক্যে নয় প্রাচ্যবেশে—লক্ষ্যতঃ, হুসনা-প্রাচীন চীন-বেশে এবং ভারতবর্ষে। ভারতীয় হুট-শিল্পের প্রচুর উল্লেখ—নির্দান পাওয়া যায় প্রাচীন বৈবিক সাহিত্যে আর বিভিন্ন মহাকাব্যে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের তাম্রা-শৈলীতেও ভারতীয় হুট-শিল্পের ব্যাপ্তি অনেক নির্দান মেলে। হুসনার শাসকদের আমলে ভারতে পারস্তদেশের হুট-শিল্পের প্রবর্তন হয় এবং সেই নিদানী ধারায় লক্ষ্য দেশীয় সেলাইয়ের পদ্ধতির বিভিন্ন সংমিশ্রণের ফলেই লক্ষ্যতঃ সৌধিন হুসার অভিন্নর ছাঁকের ‘চিকন’ বা ‘চিকনকারি’ হুট-শিল্প পদ্ধতি ক্রমশঃ প্রচলিত হয়েছে আমাদের দেশে। অনেক আবার ভিন্ন সত্তর প্রকাশ করেন—তাঁরা বলেন যে ‘চিকনকারি’ হুট-শিল্প পদ্ধতির প্রচলন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে থেকে অথবা সম্রাটের সৌধিন পুণ্ড্রোৎকর্ষের আর উৎসাহে লক্ষ্যতঃ প্রচলিত হয়। এছাড়াও লক্ষ্যতঃ কোনো কোনো কৃত্তিক ‘চিকনকারি’-শিল্পেরও ব্যাপ্তি ‘চিকন’ সেলাইয়ের কাল স্মৃতি হয়েছে আমাদের বাংলাদেশেরই হুট-শিল্পের অল্পতম পীঠস্থানে স্মৃতিস্বাক্ষর পাঠে তৎকালীন হুসলখান নগরবর্ষে উৎসাহ-আচরণ ও পুণ্ড্রোৎকর্ষের ফলে।

কিন্তু এ সব তো হলো ‘চিকন’ হুট-শিল্পের ঐতিহাসিক তথ্য, আগ্রহতঃ যদি মিহি কাপড়ের উপর ছুঁচ-হুট-হুটের ফোঁড় তুলে ‘চিকনকারি’ সেলাইয়ের কাল কিস্তি করে করা যাবে তাই কথা।

‘চিকনকারি’ হুট-শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিম্নলিখিত হাতে নির্মিত হুসার ছাঁকে মিহি কাপড়ের উপর হুট-হুটের ফোঁড় তুলে সৌধিন অভিন্নর নকশা সেলাইয়ের কাল করা। কাজেই ছুঁচ-হুটের ব্যবহার করে হুস-হুস সেলাইয়ের কাল কি উপায়ে করতে হবে সেখিকে দৃষ্টি রাখা এতটা প্রয়োজন।

‘চিকনকারি’ বা ‘চিকন’ হুট-শিল্পের কালে লক্ষ্যতঃ তপকি, কাটাও, বেষ্টা, বুকি, কান্দা এবং জালি এই ছয় রকম সেলাইয়ের ফোঁড় তোলাই হুট-শিল্পের প্রচলিত আছে।

তপকি সেলাইয়ের ফোঁড় তোলায় কাল লক্ষ্য-লক্ষ্য। সাধারণতঃ, চিকনের সামগ্রী বাঁকায়ে বা প্রচুর লম্বায় গড়ে, সে সব অধিকাংশই এই তপকি সেলাইয়ের কাল। তপকি সেলাইয়ের ফোঁড় তোলায় পদ্ধতি অনেকটা গ্রিক বিলাতী কেরার একত্রভাষী হুট-শিল্পের ‘Stem Stitch’ ধরণেরই হতো।

‘বেষ্টা’ সেলাইয়ের ফোঁড় তোলায় পদ্ধতি হলো—বিলাতী কেরার একত্রভাষী হুট-শিল্পের ‘Back Stitch’ আর ‘হুট-বোন্-স্ট্রিচ’ ধরণের—‘চিকনকারি’ সেলাইয়ের লক্ষ্যতঃ সৌধিন-লক্ষ্য হুট-শিল্পের পদ্ধতি।

‘কাটাও’ সেলাইয়ের ধরণ—অনেকটা গ্রিক বিলাতী হুট-শিল্প পদ্ধতির ‘কাটা-ওয়ার্ক’ বা ‘এয়ারিকের’ ধরণের পড়ে। এ কালে অনেক লম্বা সেলাইয়ের কাপড়ের উপরে আলোয় কাপড়ের ইচ্ছা-পাঠি যদিও বিলাতী-কেরার ‘Stem-Stitch’ হুট-শিল্পের ফোঁড় তুলে নিম্নলিখিত ছাঁকে বোনাযুক্তভাবে মোড়া বেঁধা হয়।

‘কান্দা’ আর ‘বুকি’ সেলাইয়ের পদ্ধতি হলো—বিলাতী কেরার একত্রভাষী হুট-শিল্পের লক্ষ্যতঃ কেরার ‘কেক-নট’ হুট-শিল্পের হুট-শিল্পের পদ্ধতি অল্পতম করা হয়, অনেকটা গ্রিক ভারতীয় অল্পতম।

‘জালি’ পদ্ধতিতে ‘চিকনকারি’ সেলাইয়ের হুট-শিল্পের বিলাতী একত্রভাষী-কেরার ‘Drawn-Thread’ প্রণালী হুট-শিল্পের জালি হুট-শিল্পের ধরণের। ‘চিকনের কালে লক্ষ্যতঃ ‘নিম্নলিখিত’, ‘কলকাতা’, ‘মাস্তানী’ প্রভৃতি কেরার বিভিন্ন ছাঁকে ‘জালি’ রচনা করা হয়ে থাকে।

এবারে ‘চিকনের কালের লক্ষ্যতঃ মোটামুটি এই ছয়টি হুট-শিল্পের ধরণের। ব্যাখ্যার, এ লক্ষ্যতঃ আটো কিছু ছবি দেওয়া ইচ্ছা রয়েছে।

মাটির ঠাকুর

কুমারেশ ঘোষ

[শিলাইদহ স্মৃতি বাড়ি। সুসজ্জিত একটি ঘরে টেবিলে রবীন্দ্রনাথ একমনে লিখছেন। সুখে অন্ন হাড়ি-পোক কাঁচা। হাতে দাঁধি করা বোকাড়ানো কালো চুল। অনেকটা যৌতু ঐশ্বর্য মতই দেখতে। তাঁর এ ছবিত অনেক দেখা যায়।

একটু পরেই চোবের হাত এদিক ওদিক বেগতে বেগতে ঢুকলো খালি গারে পণ্ডিত-বেশী একটি পোক— চক্রবর্তী। তাঁর কাপড় ভিলে। রবীন্দ্রনাথের একপাশে এসে হাত আঁড় করে দাঁড়ালো।]

চক্রবর্তী। (ভয়ে ভয়ে) বাবুশায়া!

রবীন্দ্রনাথ। (বাড় ভুলে) কে ?

চক্রবর্তী। আজ্ঞে আমি এই গীয়েই বাকি। চকোতি। আবাক সবারই চকোতি বলেই জাকে।

রবীন্দ্রনাথ। তা তোমার কাপড় যে ভিলে !

চক্রবর্তী। আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে আপনাব সঙ্গে তো দেখা করা খুব দক্ষ। আমলাদের বেড়া ডিড়িয়ে আগাই যায় না। একজন বসলো, বাবু পদ্মার ঘোটে বসে সেখাপড়া করেন— সেই সবর সঁতারে পেছন থেকে ঘোটে উঠে জোর কথা সব বলিল। তা বাবুশায়া, আপনাকে ঘোটে না পেয়ে মরিগা হয়ে এখানেই ছুটে এসেছি। কেউ বোধহয় বেগতে পারনি—

রবীন্দ্রনাথ। কী এমন কথা যে—

চক্রবর্তী। আবারে আর কী কথা বাবুশায়া, জুখ-কট্টাই কথা। সাংসার আর চলে না বাবুশায়া। এবার বোধহয় না খেয়ে মরতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ। তার আগেই তো দেখছি নিউমোনিয়ায় মরবে। বাত, বাত, কাপড় ছাড়ো পে বাড়ি গিয়ে। বসো, কী বলবে ? কী কবো জুনি ?

চক্রবর্তী। আজ্ঞে, পূজা-আজ্ঞা করি।

রবীন্দ্রনাথ। ময়-চয় জানা আছে তো।

চক্রবর্তী। নিশ্চয়ই বাবুশায়া। শুনবেন ? শুধু—

শিতা হব শিতা স্বর্ণ শিতাহি পরম তপ—

রবীন্দ্রনাথ। বাঃ বেশ তো !

চক্রবর্তী। (উৎসাহিত হয়ে) ঋগ্‌স্বত্বে সংকল্য কান্তাপেয়ঃ মহাহুতিম্—

রবীন্দ্রনাথ। চমৎকার !

চক্রবর্তী। (হৃদবড় করে) আজ্ঞে আছে বাবুশায়া।

পণেশ্বর শ্রবঃ বর্ষাঃ শুলভসুঃ গণেশ্বরবনং—দণ্ডাঘাত বিদ্যাস্রিতাদি—

রবীন্দ্রনাথ। তা এ সবের মানে জানো তো ?

চক্রবর্তী। তা বাবুশায়া একটু একটু জানি। অল্পত অল্প পণ্ডিতদের চাইতে ভালই জানি। কিন্তু তাতোও যে পেট চলে না।

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু দেখছি জুনি তো বা-তা পণ্ডিত নও, একবারে শিবোম্বি মশায়।—(হাঁক দিলেন) ওরে, কে আছিল, নায়েবশাখকে একটু ভেত দে।

[নেপথ্যে পোনা গেল 'আজ্ঞে বাই' এবং নায়েবের প্রবেশ। স্বভূগ্য গারে। হাতে কলম।]

নায়েব। আজ্ঞে বলুন।

রবীন্দ্রনাথ। আজ থেকে এই চক্রবর্তীশাখ শিবো-ম্বি মশায় হলেন। এঁকে পাঁচ বিধা জনি বিনা নজরে দেবে। এবং বেথো খেন কোন অহুবিধা না হয়।

নায়েব। (অবাক হয়ে) আজ্ঞে—

রবীন্দ্রনাথ। আর আজ্ঞে নয়, বাও। (চক্রবর্তীকে) হান বাড়ি গিয়ে ভিলে কাপড় ছেড়ে কেন্দ্র পে।

চক্রবর্তী। বেঁচে থাকুন বাবুশশায়। আপনাকে জয় হোক।

[শুষ্ক চক্রবর্তীর প্রস্থান এবং হৃৎস্পন্দ করে লালা পাগলার প্রবেশ। খালি গা। কাপড়ের খুঁটি মাথার বেণুয়। পাগলের মত চেহারা।

লালা। এই যে বাবুশশায়। শাইছি। পেছান হই।

নায়েব। এট, তুই এখানে কেন। যা পালা।

রবীন্দ্রনাথ। না না। থাকতে দাও।

লালা। ঠিক করেছেন হজুর। (নায়েবকে) আমি কি হজুরের পেরজা নই? (হেসে) জানেন হজুর, আমি নাকি পাগল। যারা বলে তারা সব ছাগল! (হাস করে) "

হজুর, আমি হাতি পাগল,

আমার মধ্যে গায়ের লোকের মাথার ধরে গোল।"

রবীন্দ্রনাথ। বাঃ। তুমি তো বেশ কবিতাও জানো?

লালা। জানি বৈকি হজুর। আপনি কবি হাজুর তো—তাই আপনাকে কবিতা শোনাবের আইলায়। শোনেন—

"লতি কথা হজুর

আমি আপনার হজুর।

শাকা দাড়ি ধরে

মিথো কথা কবো কেনন করে?

দুহাল চিনে সবাই যেতার মতো।"

নায়েব। (সবিনয়ে) বাবুশশায়, আপনার সময় নষ্ট করচে।

রবীন্দ্রনাথ। ককক, ককক। নানা কাজের মধ্যে একটু অব্যক্তও তো ব্যবহার।

লালা। (সানন্দে) ঠিক করেছেন বাবুশশায়। আপুনি কাজ করেন, আমার আমার সঙ্গে অব্যক্তও করেন। আর ওরা সব সময় কুতাব করে।

রবীন্দ্রনাথ। (হেসে) আচ্ছা, তুমি এখন দাও।

লালা। যাবো কি বাবুশশায়। আমার আসল কথাই তো বলা হলো না। এই ভাষ্যচেন পরনের এই ময়লা কাপড়খান দিয়ে দিয়েই শীত কাটাতে হয়। একটা কল দিয়া বাবুশশায়?

রবীন্দ্রনাথ। (নায়েবকে) একে একটা কল এনে দাও।

[নায়েবের প্রস্থান]

লালা। (সানন্দে) লতি! আমারে কল দিয়া? ওরে শোন তোহা, কে কোথায় আচিল। বাবুশশায় আমারে কল দিবার কথেনে। বাবুশশায়, তবে আর একটা কথা কই?

রবীন্দ্রনাথ। বলা।

লালা। শোনেন তবে। বাড়ীর লোকেরা না—আমাদের মতো, খাতি দেয় না। গালিগালাজ করে। অর্ধেক দিন প্যাটে কিছুই পড়ে না।

[এমন সময় বোটের জিবেনী ছাতির প্রবেশ]

জিবেনী। বাবুশশায়, কোন বোটখানা আপনার ছাতি তৈয়ের হবে রাখবো? চিতা না, আন্তেই।

রবীন্দ্রনাথ। (হেসে) নাঃ। তোকে আর পেখাতে পারলাম না জিবেনী। তুই নিম্নেকের 'জিবেনী' করে রাখলি আর বোটগুলোও তোর কাছে চিতা বা আন্তেই হোল না। অর্ধেক তুই আমার বোটের পুর্বোদ মাঝি।

লালা। সুখসুখ জিবে কিনা। এখনও কিবির আঁচ ভাঙেনি।

জিবেনী। ভাষ্যচেন বাবুশশায়, লালা পাগল কী কইচে?

লালা। এই, আমাকে পাগল কইবি না। জানিল, বাবুশশায় আমারে কল দিবার কইচে। জানিল আমি বাবুশশায়ের ছাতিয়া। (রবীন্দ্রনাথকে) আর তুই আমার বাপ।

রবীন্দ্রনাথ। শুনি তো জিবেনী? কানেই এখন থেকে বিধে গেলেই লালা বোটের কাছে ধাবে আর তুই ওকে খেতে দি।

লালা। (আনন্দে নেচে নেচে) কী মজা কী মজা! এখন থেকে বোট গেলেই প্যাটের ভাবনা থাকবে না রে মন।

রবীন্দ্রনাথ। (জিবেনীকে) তুই আমার 'পদ্মা' বোটটাকে বাটে বেঁধে রাখ। আমি সময় মত যাবো।

জিবেনী। আচ্ছা বাবুশশায়, চলি তবে। মুলটা, শুপনী ওদের বলিগে পদ্মা বোটটাকে ধরে মুখে রাখতি।

[জিহবাবীর প্রস্থান শু কবল হাতে নায়েবেব প্রবেশ]

লালা। ঐ যে, কবল আঁটছে।

হরীজনাথ। (নায়েবেব হাত থেকে কবল নিয়ে)

এই নাও লালা, গায়ে দিহো।

লালা। আগে আপনাব পায়ে তো পড়ি।

[হরীজনাথের পায়েব কাছে টিপ টিপ করে প্রণাম করলো পূবে কবল নিয়ে নিম্নের মাথার ঠেকালো।]

ভাখছেন তো নায়েবশাখ! বাবুশাখ কেন হানীর হান বলেন। আর আমি থেকে জেনে রাখেন, এই লালা রিকা বড় সোজা লোক নয়। আমি আগের জন্মে কবীর বাবুশাখ ছিলাম, মরে বাবুশ হইচি। এবার মরে বাবুশাখেরে চেপে হয়ে জন্মাবো। কেব আমারে পাগল বলি ঘোরা করণি মাঝেটা ঠাল করে এক চড়ু।

হরীজনাথ। ও কি কথা লালা?

লালা। ইন্। ভুল হই গেছে বাপ! ছোটলোকের মুখ তো, বাইবিরে পড়িছে। ঠিক আছে বাপ। তুই দেখিল, আমি ভাল হয়ে বাযো। (কবল হুহু হাত তুলে গান শুক করলো)।

‘আমার বহাল জমিদার,

(ছাঃ) নাই তুলনা তাঁর।

তাঁর মুখানি হয় তাঁয়ের নাপালু

হাত মুচি সোনার।’

[লালার প্রস্থান]

হরীজনাথ। বেড়াটা! (নায়েবকে) ভোঁরাটা ওর উপর একটু নম্র রেখো।……কাল কথা, আজ তো পূণ্যাব হবে বিকালে। সবাইকে খবর দিয়েচো তো।

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরীজনাথ। আজ্ঞা তুমি যাও।

[নায়েবেব প্রস্থান। হরীজনাথ আবার লেখার মন বিলেন এবং একটু পরেই উঠে পাখচারি করতে করতে কবিতাটি ঘোরে পড়তে লাগলেন। হাতে কলম ধরা।]

কবিতাটির নাম কি যেওয়া বাঃ? (একটু ভেবে) ‘দুলা মন্দির’—

‘ভজন পূজন সাধন আরাধনা, সমস্ত থাক পড়ে
কড়ভাবে হেবাশয়ের কোণে, কেন আছি—ওরে।’

অত্যায়ে লুকিয়ে আপন মনে

কাহারে তুই পুন্নি সংগোপনে

নয়ন যেনে বেণু, ঘেঁষি তুই চেয়ে দেবতা সেই ঘরে।

তিনি গেছেন খেখার মাটি ভেঙে, করছে ঢাষা ঢাষ—

পাখর ভেঙে কাটছে খেখার পথ, বাড়িছে বায়োবাগ।

যৌত্র-জলে আছেন মগর সাধে

বুলা ভাড়াও লেগেছে দুই হাতে—

উঁচি মত ভটি বসন ছাড়ি, মাঝেবে বুলাই ‘পবে’।

মুক্তি? ওবে মুক্তি কোখার পাখি, মুক্তি কোখার আছে।

আপনি প্রভু সৃষ্টিবাধন ল’বে বাবা মবার কাছে।

যাখো যে ঘান, থাকবে মূলের জালি,

ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক বুলাবাগি—

কর্মযোগে তাঁর সাপে এক হয়ে বর্ষ লভুক করে।

[হরীজনাথ খানিকক্ষণ চোখ বুজে বইলেন। একটু

পরকেই পেছনে এসে হাঁড়ালো ভৃত্য উদ্বাচরণ]

উদ্বাচরণ। (অশ্রুচোখে) বাবুশাখ।

হরীজনাথ। কে? ও, উদ্বাচরণ!

উদ্বাচরণ। আপনাব খাখার দেওয়া হয়েছে।

হরীজনাথ। চলো বাই।

[হরীজনাথের প্রস্থান। একটু পরেই অত্যন্ত তৃত্য বিনিন, শ্রমর, ভোলানাথের প্রবেশ। সব তৃত্যবেই গায়ে জামা। ভোলানাথের পরিপাটি বোঁক। সকলের হাতে একখানি করে চেয়ার এবং বিনিনের হাতে মস্তকি]

বিনিন। নে, নে, সব ভাতাকান্টি কহু। তোরা চেয়ারগুলো ঘরের বায়ে বায়ে সাজিয়ে দে। আমি মস্তকিটা মাটিতে পেতে দিই।

সবাই চেয়ারগুলো সেইমত সাজালো। বিনিন মস্তকি মাটিতে পাটলো।

ভোলানাথ। বাবুশাখের জেতে এই কাল চেয়ারটা।

এইটা মাকখানে থাকবে (নিম্নের হাতের চেয়ারটা সেই মত রাখলো) জানিন্ তো, আমি বাবুশাখট্টে সঙ্গে ইংলণ্ডো, ইরোপ, আমেরিকা, জাপান সব ঘুরে এলছি। আরে তুই, বাবুশাখের দেখানে কী মান! জামোঁনীতে লাহেব মেঘবা বাবুশাখকে পেয়ে টিপ্‌টিপ্‌ করে পেছান করতে লাগলো। আর বাবুশাখকে দেখবার জেতে

কী ভীড়—কী ভীড়। কেউ কেউ আবার বাবুশশ্যকে
বীত ঝিই বলতো।

প্রশ্নঃ কেন? কেন?

ভোলানাথঃ বাবুশশ্যকে নাকি ঐ বকস দেখতে!

বিশ্বিনঃ সত্যি, বাবুশশ্যের তপ্তপের আর দেখ
নেই। নে, নে। সব বরফাগুলো সব বেড়ে ফেল।
আর আবার পুণ্যাহ। এখানকার সব গণ্ডিমান্নি
ব্যক্তিরা আসবেন। তাঁদের জন্যে এই চেয়ার—আর
সাব্যবসায়ের পেরণারের জন্যে ঐ সতরকি।

[এমন সময় সাধারণ ক্যান বেওরা পাঠাবী পায়দামা
পরা কটিক শেষের প্রবেশ। সুখ দুঃ গল্পীর কীমো-কীমো।
এসে একশাশে দাঁড়ালো]

ভোলানাথঃ কী গো। কটিক দেখ। খুঁড়ি, বাবু-
শশ্যের পেরণারের বাবুচি লাহের! সুখানা অমন থমথমে
কেন?

কটিকঃ তাই, বাবুশশ্যের কাছে কে বেন আমার
নামে বখানা করে লাগাইচে।

বিশ্বিনঃ কী লাগাইচে?

কটিকঃ আমি বাবুশশ্যের খাস বাবুচি তো! বড়
বড় সারেরবা এলে তো আমায়ই খোঁজ পড়ে। যা
ঠাকরেন আমারে নিজে হাতে রান্না শিখাইছেন। ভা
বাবুশশ্য আর কি কইলেন মানো?

প্রশ্নঃ কি কইলেন?

কটিকঃ কইলেন, কটিক, তোম হাতে আমি আর
খাবো না। তোম হাতে খেলে আমার পাপ হবে। তুই
যা, বাড়ি চলে যা—আমার হৃদয় থেকে চলে যা।...এর
চাইতে বাবুশশ্য যদি তুঁখা মৃত্যোর বাড়ি মারভেন
তাও আমি সহ করতে পারতাম।

বিশ্বিনঃ সত্যিই। মিত্রিকবার বহুনি বেন মৃত্যোর
বাড়ির চাইতেও বেশি লাগে!

প্রশ্নঃ হ্যা, এটা গায়ে লাগে না তো, মনে
লাগে।

ভোলানাথঃ কিম্ব বাবুশশ্য তো কাউকে এমন করেও
বলে না? কি করেছিলি তুই?

কটিকঃ মানে, জানিস তো। বাপ-বাক্স-বিবি নিয়ে
আমায়ও বিবাত সেনার। তাই এট কটিক-বাড়ির বি-মরখা

চিনি বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। সে কথাটা—

বিশ্বিনঃ মানো না বাবুচিলাহের পেরের দ্বারা না বলিয়া
গইলে চুঁরি কথা হয়?

ভোলানাথঃ বাবুশশ্য তো কটিক সারেরের নিজের
লোক, তাই না বলেই—কী বলে বাবুচি লাহের?

[এমন সময়ে উম্মাচরণের পুনঃপ্রবেশ। হাতে এক-
ছড়া পাকা কলা।]

কী? চুঁরি?

উম্মাচরণঃ এজ্ঞে না।

বিশ্বিনঃ তবে?

উম্মাচরণঃ বাবুশশ্যের পেরণা।

প্রশ্নঃ মানে?

উম্মাচরণঃ দুদিন আগে ঐ যে ঝারি বিধান—

তিনি বাবুশশ্যেরে খাবার বস্তি সেনার বাগানের গাছের
বড় এক কাঁধি সবুজি কলা আর কচি কাঁঠাল দিয়ে
দেছিলেন। তা এবার তো যা ঠাকরেন বা ছেলেপুলেখা
কেউই আসেন নি। বাবুশশ্য আর কত খাবেন! আর
পাকা কাঁঠালের গুড়ে সারা বাড়ি দ-ম করছিল।
বাবুশশ্য কইলেন—‘হায়ে উম্মাচরণ, কাঁঠাল-কলা-
গুলো সব পরিচের নই করছিস কেন? তোরা কি পেরণালি
জানিসনে। শুকলো নিয়ে যা, তোরা সব ভাগ করে
নে গে যা।’

ভোলানাথঃ প্রকৃতি। (সময়ের) তাই নাকি?

উম্মাচরণঃ এজ্ঞে। ভা-এখনি বেখচি তোমের জিব
দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তবু তো আগল কথাটা বলাই
হয়নি।

প্রশ্নঃ আগর কি কথা?

উম্মাচরণঃ বাবুশশ্য সেই সঙ্গে খুঁটি-বাড়ি
মুণ-বি-ঠমঠনকে অর্ডার দিয়ে বেচেন—যন দুখ আর
গম্ভাণ্য পাণের দুকান বিকে লক চিঁড়ে আর নদেশও
যেন কিনে যেন।

বিশ্বিনঃ তুই বলিস কী যে?

উম্মাচরণঃ এজ্ঞে। যা কইচি, সত্যি কইচি। হলপ
করিয়। বসিতোছি বিখ্যা ছাড়া পতা কহিব না; খুঁড়ি, সত্য
ছাড়া বিখ্যা কহি নাই। আর কি কহেচেন জানিস?

বিশ্বিনঃ কি?

উদাহরণ। এই যে ঘটক দেখ, তার কথা কয়েছেন।
কয়েছেন ওকণ্ড মেন ভাগ দেওয়া হয়।

ঘটক। (দানবে) বাবুদশার কয়েছেন? আমার
কথা কয়েছেন? বড় বাবুদশার! আপনাত ছিটবলে
পোয়ার।

[রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম করলো। এখন
সময় হুটীবাতির মানেভাঙের প্রবেশ। প্রৌঢ়। পুতি
পাঞ্জাবি পরা। কাঁধে চাখর]

মানেভাঙ। কীবে? তোদের বর লাভানো হলো?
না, এখনও গুল করছিল। আর সময় নেই কিন্তু।

বিশি। হ'বে গেছে বাবু। এই ভাবেন না—

মানেভাঙ। (সব দিক দেখে) শংখ, ফুলের মালা,
হুল-দীপ সব কই? নিয়ে আর।

[মানেভাঙ ছাড়া সকলে চলে গেল। এবং একটু
পরেই পূণ্যাহের স্তম্ভ এক এক করে প্রসার। অসংখ্য
লাগলো। তাড়ের মধ্যে বাবা গরীব, ভাতা মাটিতে স্তম্ভ-
বকিতে বসলো এবং বাবা বন্ধিত উল্লসে এসে ভাতা
বললেন চোখো। মানেভাঙ যথোপযা খাতির করে
সবাইকে বললেন। বিশি এম শংখ ইত্যাদি টেবিলে
বেছে গেল। দুপকানিতে হুল আলিয়ে ধিল। একটু পরেই
নেপথ্যে সানাই বাজেতে লাগলো।]

মানেভাঙ। আহন, আহন, বহন। এই যে, এলে
গেচো, বসো, বসো। বাবুদশার আলবেন এগুলি... আর
পূণ্যাহের দিন ঠাকুর এটিএর বহনিনের বাপার। তাই
বাবুদশার এবার কলকাতা থেকে ছ' চারদিন আগেই
এলেন। পূণ্যাহ স্তম্ভ এই প্রথমবার আসছেন। বাবু-
দশার কলকাতার থাকেন বটে তবে গ্রাম বাংলার কথা
জেনেন নি। পদ্মার বজ্রতে কত কবিতাই না লেখেন।
বলেন, কলকাতার বড় জায়গায় চাটতে পদ্মার বুক
বজ্রতে থাকতেই তাঁর ভাল লাগে।...ঐ, এই যে বাবু-
দশার আপনেন।

[মানেভাঙ সপ্নময় লবে দাঁড়ালেন এবং পোষাক
বলো দিকের হুতি-পাঞ্জাবী পরে চাখর কাঁধে রবীন্দ্রনাথ
কিতাব ঢেকেই খসকে দাঁড়ালেন। ওকণ্ড চুকে মেনে
সময়ে সবার উঠে দাঁড়ালো।]

রবীন্দ্রনাথ। এটি মানেভাঙবাবু? এ কী বকম
ব্যবস্থা হয়েছে?

মানেভাঙ। আজ, প্রতি বছরেই তো এইভাবেই—

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পূণ্যাহ স্তম্ভ এই ব্যবস্থাক্ষেপ
বদলার ব্যবস্থা কেন? বাজারের বদলার ক্ষেপে এত
বিভিন্ন বকমের আয়োজন?

মানেভাঙ। এই ব্যবস্থাই বর্নিয়েদের আরম্ভ থেকে
চলে আসছে বাবুদশার। নতুন কিছুই কথা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ। এখন একটি স্তম্ভ উৎসবেও আদর্শের
মিলনে এত বাধা, এত স্তম্ভবদ্ধ থাকবে? বেগুন, আমর
অগ্রোধেই সব উচ্চাঙ্গ উঠিয়ে নিল। আমর সবাই
একাসনে বসবো। তবেই হবে এট স্তম্ভ উৎসবে
মিলনের সার্থকতা।

মানেভাঙ। মামী, অবনী, তাম্বল, নুস, মূললান সব
একাসনে?

রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ। এটা যে মিলন স্তম্ভ, অমিয়ারী
বদলার নয় তো।

মানেভাঙ। এ নিশয় যে শুধু বহনই নয়, আপনায়
শিতাময় শ্রিল থাকানায় ঠাকুরের সময় থেকে—

রবীন্দ্রনাথ। বেশ, আমি তবে বসবো না। আপনায়
যা ভাল বনে হয় করুন। সাধারণ প্রসার তো এই মিলন-
উৎসবে অপমানিত বটে থাকেনি—

মানেভাঙ। কিন্তু অমিয়ারী সময়?

রবীন্দ্রনাথ। অমিয়ারী সময় এত হীনকো নয়। এতে
ভেঙে পড়বার ভয় নেই। আমি বা বললাম, আগেই দেই
স্বত ব্যবস্থা করুন।

সাধারণ প্রসার। অর হোক, বাবুদশারের অর
হোক। রবীন্দ্রনাথের অর হোক।

মানেভাঙ। তবে তাই হোক।...ওবে বিশি,
ভোলানাথ, প্রথম—

[বিশি ভোলানাথ, প্রথম এসে চোখাবললো সত্বরে
নিরে গেল। পুরো স্তম্ভকি পাঠা হলো। মাকখানে
কাপটি ও তাকিয়া বেগুনা হলো রবীন্দ্রনাথের ক্ষেপে।
রবীন্দ্রনাথ বেলে এসে বসলেন।]

রবীন্দ্রনাথ। আপনায় এবার বহন। স্তম্ভ হোক
পূণ্যাহ—

[একজন বৃদ্ধ প্রসার ওঠে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের মাখনে-
তায় খালাস টাক। বেছে প্রণাম করলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর
কপালে চপনের টিপ ও গলার মালা পরিয়ে দিলেন।
নেপথ্যে শংখ বেজে উঠলো।]

[পর্দা ধীরে ধীরে নামলো। শ্রীপতী নাম অমিয়ারীর
'লক্ষ্মণাচর রবীন্দ্রনাথ' থেকে ঘটনাবলী অবলম্বনে।]

কথা কও কবি ! কথা কও ।

নরেন্দ্র দেব

এবার বহু, হয়েছে সবট,
কথা কও, কবি কথা কও !
হেন নীরবতা মাঝেনা তোমারে
তুমি তো বহু ! মুক নও !
অচেতন বেশে তুমিই তো এসে
জেরেছো জড়তা গেয়ে গান,
দে গানের হৃদে অশাড় এ পুরে
উঠেছিল যেগে শত গ্রাম ।

দুঃখ তুমি, তুমি নির্ভীক,
যৌবন মধে উদ্ভত
হুনিয়ার কাখে চক্কর আঁধারে
কতোনি কখন পির নভ,
তোমার বহুকণ্ঠে শুনেছি
রূপহংকার ঘন বাজে,
দুটেছিলে তুমি সমরাজ্যে
শত্রু নানিতে বীর লাগে ।

এসেছে আবার দুর্দিন বেশে
গরমে শত্রু চারিদিকে,
এসো বিস্রোহী ! জনগণ কুণ্ড
বীৰ্যময় হাত লিখে ।
ভাক দিয়ে হত মোহানে শোনাও
মরণ বরণে নাহি ভয়,
কুমারিকা হতে চিমালয় শিখা
উল্লাসে দিক তব ভয় !

নিজ্ঞান বেশে দলীয়নের
মস্রোকাবি এসো ছুটে,
ঘনী ও বাঁপক বজ্রাঘা ঘিলে
গরীবের ঘন নের শূটে ।
স্বভাব তব ঘূঢ়াও ঘূঢ়াও ।
হে চারণ কবি ! জাগো, জাগো !
অধিবীণায় তোলা কংকার
উজ্জীবনের যজ্ঞে লাগো !

আজ যে তোমাকে বড় প্রয়োজন,
মৌনতা আর নাহি লাগে,
শোনো উত্তরে-পূর্বে-পশ্চিমে-
রূপ-রংকার ঘন বাজে ।
অবিদ্যাবীণে শাসিতে শাসিতে
শব তুলে তব হাতিয়ার,
অলস আবেশে অচেতন বাবা,
ডেকে বসো মবে-হুঁসিয়ার !

তোমার শাসকে শয়েছা হোক
দেশের বাহাধ্য জনজাণ ।
যত বজ্রাতি জাল জালিহাতি
রক্ত আখাতে কঠো নাশ ।
তব যৌবনে তাকুণ্য পাও
জড় বহাতিরা ব্যঙলাফ,
হানো নজরুল তোমার জিন্দা !
অশাড় থাক কি শোভা পায় ?



॥ পুরস্কার ॥

শ্রী'শ'—

"বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন্"—এর ৩২তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব গত ২০শে মে "রবীন্দ্র সনন" ভবনে লাড়করে অনুষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় সভা ও বেতার সভাী প্রত্যাগাত্যে সিংহ অলুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন 'অনুভবাকার' ও 'অনুভব' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীত্বারকারি ঘোষ। "বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন্" (বি, এফ, জে, এ,)-এর সভাপতি 'অনুভবাকার' ও 'দেব' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার লকলকে যাগত জানান। বি, এফ, জে, এ-র সম্পাদক শ্রীবাণীশ্বরী তা এবং পুরস্কার বিতরণ অলুষ্ঠানের চেয়ারম্যান শ্রীসেবাত্রত গুপ্ত হুঁতাবে অলুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। বি, এফ, জে, এ-র সকল সভ্যের সক্রিয় সহযোগিতায় সিনেমা ভগতের এই ভারত বিখ্যাত পুরস্কার বিতরণ উৎসব সাক্ষাৎ সন্তিত হয়ে ওঠে।

এবারের পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

প্রথম শ্রেণী স্ত্রী—

- ১) আগমনজন
- ২) হকদি দিদি
- ৩) ছোট্ট জিআল
- ৪) সংঘর্ষ
- ৫) আদর্শ
- ৬) চোরকী
- ৭) বাবুদী
- ৮) রাজা আউর বাহ
- ৯) হামবাহ
- ১০) চাষকবি দুহ্ম দাস

বাংলা চিত্র—

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : শ্রীমৌর্য চট্টোপাধ্যায় ("বাঘিনী")
 শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : শ্রীমতী হুম্মিরা দেবী ("তিন অধ্যায়")
 শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : সমিথ ভট্ট ("আপনজন")
 শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী : শ্রীমতী সন্ধ্যা রায় ("তিন অধ্যায়")

হিন্দীচিত্র—

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : শ্রীদিলীপকুমার ("বংশব")
 শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : শ্রীমতী গুয়াহাতি প্রহমান ;
 ("নীল কবল")

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : শ্রীমন্ত ("গণেশ")
 শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী : শ্রীমতী রম্যভার ("ব্রহ্মচারী")

শ্রেষ্ঠ পরিচালক : বাংলা—শ্রীতপন সিংহ ("আপনজন")

হিন্দী—শ্রীহরিকেশ মুখোপাধ্যায়
 ("বকলি বিবি")

বিদেশী—ক্রাস্টোফ্রা ক্রোকা
 ("কারেনহাইট ৪৪১")

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনা : বাংলা—শ্রীতপন সিংহ
 ("আপনজন")

হিন্দী—শ্রীহরিকেশ মুখোপাধ্যায়
 ("বকলি বিবি")

শ্রেষ্ঠ নেপথ্য সঙ্গীতগায়ক : বাংলা—শ্রীভাবমি
 ("আপনজন")
 ও

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
 ("চৌরঙ্গী")

হিন্দী—আমরা দে ("সেয়ে রজু")
 ও

শ্রীমতী পূজাধরেশ্বর
 ("রাজ অউর রাজ")

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচনা : বাংলা—শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
 ("বাপুচরী")

হিন্দী—শ্রীসাহিব লুবিয়ান্ডি
 ("হামবাক")

শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রদর্শন (ভালো-শাখা) : বাংলা—শ্রীবিজল
 মুখোপাধ্যায় ("আপনজন")

হিন্দী—শ্রীমোহন গাধারী

("বকলি বিবি")

এ ছাড়া বিশিষ্ট পুরস্কার লাভ করেছে শ্রীমান প্রসেনজিৎ
 "ছোট বিজলা" চিত্রে হৃদয় অভিনয়ের জন্য।

অবসর অবলম্বিত :

বাংলায় বিখ্যাত নট ও চলচ্চিত্র অভিনেতা
 অরব গঙ্গোপাধ্যায়

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেছেন। অভিনয়
 ক্ষেত্রে পুরাতন ও নতুন যুগের যোগসঙ্গত রূপে যে সৃষ্টিস্বৈর
 কয়েকজনের নাম করা যায় অরব বাবু ছিলেন তাঁদের মধ্যে
 একজন। ধাপে ধাপে তিনি অভিনয় জগতের শীর্ষে
 আরোহণ করেন।

কিছুকাল হলে অভিনয় করবার পর "হানসরী গাঙ্গুল"
 নাটকে ও চিত্রে অভিনয় করেই তিনি খ্যাতিমান হয়ে
 ওঠেন। তারপর বহু নাটকে ও চিত্রে অরব বাবু সাক্ষ্যের
 সঙ্গে অভিনয় করে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে
 গেছেন। পরিণত বয়সেও তিনি "কান্ট্রিবিদ্যাবাণ"
 হলে অভিনীত "এটরী কবিবাণ" নাটকে ভোলা বরোয়া
 ভূমিকায় বৃত্তাস্ত্রীত সহযোগে যে অনবদ্য অভিনয় করেন তা
 অনেকেরই অনেকদিন মনে থাকবে। অরববাবুর দৃষ্টান্তে
 বাংলা বেশ একজন সত্যকার অভিনয় শিল্পীকে হারাল।

* * *

হলিউড-এর প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা হবার্ট টেলর-এর
 মৃত্যু হয়েছে। ক্যান্সার রোগই তাঁর মৃত্যুর কারণ।
 কয়েক বৎসর আগে বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারি কুপারেরও
 এই ভয়ঙ্কর ক্যান্সার রোগে মৃত্যু হয়।

হবার্ট টেলর গ্যারি কুপারের মতন 'স্টার্লিং' ছবিতে
 অভিনয় করেই খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বহু চিত্রে
 সাক্ষ্যের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকমনরঞ্জন করে এগিয়েছেন।
 এছাড়াও তিনি বিশেষ অভিনয় না করলেও তাঁর মৃত্যুতে
 যাকিন চিত্র জগতের বিশেষ কষ্ট হল।

* * *

সেনা গেল (টিক "বোম্বার দ্বন্দ্ব" থেকে না হলেও) এক বিখ্যাত চিত্রাঙ্কিত প্রবন্ধে (কারণটি প্রকাশ্য নয়) কৃত্তবিকৃত হওয়ার "মুটিং"-এ বোম্ব বিতে পারেন নি, এমন কি একটি অল্পটানে তিনি উপস্থিত হয়েও সর্বদমকে আসতে চান নি। দুটো বোম্বের হয়েছিল যেন হয়। আসিয়া এই তারকার সর্বদমক ক্রম ও জবিধা, নিবপত্রা কাশনা করি।

আগরের মাতৃদানে একদিকে "শুক-দারী" চিরেও নাভিত। প্রিয়তা অমনা কৌমিককে বলগা—নাথকেও পবিত্রাত্ত বান্ধি তোলাগাও জন্তে আপনায় পুঙ্খের ক'ণ

বেগাটা চরৎকার হয়েছিল। আপনি যে লম্ববদনটানৌ তা জানতাম না। উত্তরে একগালে হেঁদে অমনা বলগেন—কি যে কাশন! নাভার জানি না কি? সেই কবে ছোট বোম্বার একটু হাত পা ছুঁতে শিখেছিলাম। আর ঐ বান্ধি কুপতে আরকে বেশ কথেক ঢোক পুঙ্খের মল গিলতে হয়েছে, কারণ বাওয়া করে বান্ধিকে ধরেতে হয়েছে। অভিনয়টা অত সোজা নয়, বুঝেন। হয়ত তাই—উত্তর বিগাও, আরও বলগা—অভিনয় আপনায় লজাই হৃদয় হয়েছে, মানে কষ্ট করে কষ্টে (উত্তরকৃত্তার ঐক্য সেজে অভিনয় করেছেন) পেয়েছেন আর কি! উপস্থিত লকলের দাখে অমনাও লম্ববে হেঁদে কেলেন।

মাগরপারের প্রপদী চলচ্চিত্র

অিন্নরেশচন্দ্র বসু

ব্রাহ্ম

১৯২৭

Bene Clair এর পরিচালিত চিত্রগুলিতে অনেক প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ যেকোনো প্রভাবের প্রতি Clairএর আহুগতা এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে প্রভাবের প্রতি প্রবণ আকর্ষণ। চিত্র জগতে এখানেই তার বৈশিষ্ট্য। ১৯০২ খ্রি: Academic Française তাঁকে সত্যাপদে বরণ করে তার প্রতি প্রভা প্রদর্শন করেন। এই সম্মানসূচক তার জীবনের এক বিশেষ ঘটনা। তিনিই প্রথম চিত্র নির্মাতা যিনি এই সম্মান পেয়েছেন। না, কিন্তু তিনিই প্রথম যিনি প্রকৃত সিনেমা আর্টিষ্ট রূপে বরণীয় হলেন। Jean Cocteau যখন লজাপদ লাভ করেন তিনি তখন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও চিত্র নির্মাতা।

Marcel Pagnol চারটি চিত্রে নির্মাতা যখন ঔপন্যাসিক রূপে হুপ্রতিষ্ঠিত, তখনই তিনি লজাপদ পান। Bene Clair এর চিত্র পরিচালনার জীবন সুদৃশ্যতীর্ণ

নয়। হুপ্রতিষ্ঠিত যখন এবং দেখলে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি কাটানো সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট হন। অভিনেতাধর তার হাতে জীবনকেও অবস্থা। এমন কি Italian Straw Hat-ও এর ব্যতিক্রম নয়। অথচ পৈত্র, অসত্যের পতি, মেঘভায়াভাষ্য মহিলা ইত্যাদি চিত্রে ব্যবহারিক সাফল্যের চিত্রাঙ্কিত পর ধরে অগ্রসর হন নি। অতীতের লুপ গোঁব উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিদ্যাবে প্রেমের ব্যক্তি "ভাবকা"র ভাবেই। বাম্বিকবে রত তিনি পুঙ্খ-লুপ অভিনেতাধর প্রতি প্রেমপ্রবণ হলেও জীবন মৃত্যুর পরোচানা নিয়ে তিনি তারে প্রতি যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন।

ওঁর অতুত একটা কথতা ছিল দার বাবা তিনি অভিনেতাধর বাবা ওঁর মনোমত বাম্বা দৃষ্ট করাত পারতেন। একটা অবাধ্য পুত্রী, বাবা ভাবপ্রবণ কিন্তু অলৌকিক লগন নয় এবং এই শক্তির স্রষ্টা চিত্র বোম্ব হয় ওঁর The Italian Straw Hat, এখানে অভিনেতাধর

প্রাকৃত ঘটনাবলী বা বর্তমান যের কোনটিই উপস্থিত নাই। চিত্রের ঘটনা কিছু অসংগত ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বয়স ও কনের মনের বিভিন্ন বিন্যাসিক হওয়া করা হয়েছে। বয়সীত্ব অঙ্গনস্থানের বয়স একটি খণ্ডের টুপি যোগাড় করবে, কারণ টুপিটি বয়স ও কনের বোড়ার সাজীর বোড়াটি খেয়ে ফেলেছিল। যদি টুপি যোগাড় করতে না পারে তবে বয়সী কনের শ্রিহস্তের সংলগ্ন বস্তুতে কনকে কাবণ টুপিটি কনকেই গেছে। এই প্রকার ঘটনা চিত্রের দৃশ্য সুচরিত্রগতিকে অথবা তারাক্রান্ত করেছে।

Rene Clair এর সাটায়ার (Satire) A Nans la Liberte পর্যবেক্ষণে নিমিত্ত হয়ে জন সন্দর্ভনা লাভ করেছিল। সমাজের ব্যবহারীত্বল যখন কানপনের টাকার উপর দৃষ্টি খেয়ে পড়েছে, সেই টাক। বাতালে উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং অসুষ্ঠানগত বস্তু হয়ে যেতে বাধ্য হোল। দ্বিত্বের লোভের চরম পূর্বস্বার এই চিত্রে দেখা যায়। এবং একথা সত্য "Not Chaplin himself had a defter hand than Clair with sheer hilarious nonsense."

ফ্রান্সে যাত্রা চর্যার সঙ্গে কিছুকণ

জীমতী চর্যিকা সেন

প্রঃ নবীন পরিচালকের অন্তর্ভুক্তি কি বর্তমান সংস্কৃতির দৃষ্টি করেছে ?

উঃ ইহা সত্য, কিন্তু পুরাতন পরিচালকেরাও কতিপয় হয়েছেন। ফ্রান্সে ভাগও শেষ হয়ে যায় নাই। প্যারিসে ফ্রান্সে ভাগের দু'জন প্রযোজক Branuberger এবং Beauregard এখনও ব্যবসা করছেন যদিও বাজার ভ্রমণ Jean-Paul Guibert, Gabin এর সব চিত্রের প্রযোজকের এখন স্তায় হ'ল। Guibert ১০০,০০০ পাউণ্ড অথবা তার চেয়ে বেশী Le Bateau d' Emile চিত্রে কতিপয় বীকায় করেছেন বাহা অসংল Beauregard এর তিন-চারিখানি চিত্রের ক্ষয়-ক্ষতির সমান হইবে বলিয়া মনে হয়। অত্যন্ত দুঃখ হয় যখন ফ্রান্সে প্রেসের কয়েকটি প্রবন্ধ বাহাতে Le President, Le Bateau d' Emile অথবা Un singe en hiver প্রভৃতির ব্যর্থতার কাবণ বস্তু বাহা বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল তাহা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। ইহা ব্যতীত প্রচেষ্টাও একদম ভাবে

পরিচালনা করা হইয়াছিল বাহাতে মনে হয় চিত্রগুলি আর্থিক সাফল্যলাভ করিয়াছে। La Fazzetteর সম্বন্ধেও একই কথা। বর্তমান সময়ের মধ্যে ঐ চিত্রের ব্যর্থতা আকাশ প্রমাণ। ইহা তার পূর্বা বাজেটের আর্থে প্রায় পাঁচলক্ষ পাউণ্ড কতিপয় বীকায় করিয়াছে।

প্রঃ ইহা হইতেই কি মনে হয়না যে বণিকের কতিপয় পরিবর্তন হয়েছে ?

উঃ La Bateau d' Emile প্রচুর ব্যয় করে তোলা লক্ষ্যেও বর্ণক মনোরঞ্জন ব্যর্থ হয়। কারণ চিত্রটি বর্ণকদের এমন নতুন কোন কিছুই বাহা দিতে পারে নাই বা তাহারা টেলিভিশনে দেখে নাই। ফরাসী দেশের চিত্রশিল্পে বাস্তববাদের উপর নির্মিত এই চিত্রের ব্যর্থতা অত্র চিত্র টেলিভিশনে সম্ভারে অন্তঃস্থ দুই তিনটি দেখা যায়। টেলিভিশনে অংশ গ্রহণকারী নাগরিকবাহিনী বাহা-জাহা ভাষক। না হইলেও তাহাদের একদল ভুল আছে।

যথা বাউক ফরাসীদেশের একটি বড় শহরে হইলক্ষ

হিন্দু পোকেস যথা পনেরো হাজার ছাত্রছাত্রী আছে।
যখন *Vivre Sa vie* একটি চিত্রপুর্বে প্রদর্শিত হইতেছিল
তখন প্রায় দশহাজার ছাত্রছাত্রী ইহা দেখিতে গিয়াছিল।
সমালোচকের এই বিবেচনা স্পষ্ট আকৃষ্ট হয় এবং তাহার
এই নিয়ে যত্ন। কংগ্রেস ছাত্রসভা বিদ্রোহ হয়। কিন্তু
ছাত্রসভার নিকট, *Le Bateau d'Emile* দেখিতে
কেন তাহারাই যাইবেন। তাহা দাবী করা যায় না। এবং
এখানেই আশায় কথা।

প্রঃ পরিবেশন ব্যবস্থা কি অভ্যস্ত ব্যাপার নয় ?
এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার আশ্রয়ের চিত্রের অন্তর্ভুক্ত কি করা-
হয় নাই ?

উঃ ইহা সত্য কথা, কিন্তু প্রতিকূল কারণে আমি
পরিবেশন ব্যবস্থা পুঙ্খ করার বিরোধী। এবং একটা
দল বা শাখা প্রাথমিক ভাগের চিত্রগুলির ওপর অব্যাহত আরও
বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশেষত্ব হবে, তা'ও চাই না। আমি
মনে করি না কোন চিত্র স্পষ্টতঃ দর্শকের মনোভাবের
অন্তর্যামী হবে, কারণ সেটা চলচ্চিত্রঃ ইন্দ্রিয়ের বিকল্পই
হবে। আমিরা যখন দর্শক আকর্ষণের জন্য বসেছি তখন
যাহাতে সর্বাপেক্ষা বেশী দর্শক আকৃষ্ট হয়, সেইদিকে লক্ষ্য
 রাখতে হবে এবং প্রতিটি চিত্র যেন পরিবেশনের ব্যাপারে
 সমান সুযোগ সুবিধা পায়। তাই বলে চিত্রপুর্বে ব্যান-
 কার তার দ্বারা এই ব্যাপারে দাবাবে না একথা বলছি না।
মনে করা যাক দর্শকরা পশ্চিমী চিত্রগুলির উপর খুব
 সুকোমল, সেইজন্য ব্যানকার যদি হঠাৎ "Lola" চিত্রটি
 প্রদর্শন আরম্ভ করেন তা হলে ব্যানকার দর্শক এবং
 চিত্র সব এক আদর্শের অধীনে পড়বে এবং বর্ধিত হবে।
আদর্শগত ভাবে বলতে পারি যারা পশ্চিমী চিত্রসমূহ পছন্দ
 করে তারা নিশ্চয়ই "Lola" দেখবে এবং পশ্চিমবাসীরাও
 এই দেখেন চিত্র সমূহ দেখবে। পরিবেশনব্যবস্থার
 এইগুলি জানা উচিত। জুন্সের বিবরণ তাহা এইগুলি
 জানে না। যদি পরিবেশকের মনে হয় সমালোচকেরা
 কোন চিত্রকে সমালোচনার জালে কত বিস্তৃত করবে
 তবে সেক্ষেত্রে সহজে নাকের গ্রামে বা সপ্তমের পার্শ্ববর্তী
 অঞ্চলে সুস্থিতি স্থান করাই শ্রেয়। যদি মনে হয় চিত্রটি
 সমালোচকের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হবে তবে সেক্ষেত্রে
 পায়ী সহজেই সর্বপ্রথম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রঃ আমি কি চিত্র দর্শকের কথা চিন্তা না করেই
 আমনার মনস্তত্ত্বের ক্ষমতা ছবি তৈরী করেন ?

উঃ আমার নিজের তত্ত্বের ক্ষমতা ছবি তৈরী করার
 মত উৎসাহ কখনও পাইনি। কেউ যদি না দেখে,
 তাহলে ছবি তৈরী করা এমন কথা আমি জানতেও
 পারি না। "অত্যন্ত আনন্দ পরিবেশন করছি"—এ
 অল্পভূতি ছাড়া আমার পক্ষে ছবি করা কখনই সম্ভবপর
 ছিল না। আমি যখন কোন কাজ করি তা সকলে মিলে
 মিলে করতেই ভালবাসি এবং সর্বদা মনোযোগ রাখি যে
 দর্শকসমূহ এই বিভাগ করবে। আমার পূর্বাভাসই যদি
 জানতে পারি যে এ ছবি সফল হবেই তাহলেও সে অবস্থার
 আমার পক্ষে ছবি করা সম্ভবপর হোত না। আমার
 প্রত্যেকটি ছবি তাগোথ হাতে হাতে মিলিত হওয়ার মত।
 আমার মতে একটি ছবি কংগ্রেস দাবী দাবী করা একই
 পদ্ধতিতে পড়ে। অনুসরণে আমার নির্দিষ্ট Jules et
 Jim ছবির চিত্র ব'লেও শেষ পর্বের বিতৃষ্ণা প্রকাশ
 করেছে। অপর ছবি *Les Quatre Cents Coups*
 এর সম্বন্ধেও একই কথা। এই চিত্রে আমি একটি
 চৌর্যবৃত্তিপরিচয় বাস্তবকে এমনভাবে উপস্থাপিত করার
 চেষ্টা করেছি যাতে লোকের সহানুভূতি সে আশায় করতে
 পারে। এটাই আমার মত বড় সুখি গ্রন্থ ছিল।
 আশাযে বলা হয়েছিল, লোক কখনও এমন চরিত্রের
 প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। কিন্তু আমিও তখন
 বুঝিনি শিশুর মত অপরায়ণত সকলে ক্ষমা করে, যোগ
 দিয়ে পড়ে তার পিতামহাতার ওপর। ছবিটিতে প্রথম
 থেকেই দর্শক, বালকের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একীভূত
 করে দেখেছে এবং সেক্ষেত্রে চিত্রটি দর্শক মনোভাবের সমর্থ
 হয়। এই সময় রবার্ট ব'লেগোয়াসীর "The lady in
 the Cave" দর্শকের অমল্য প্রশংসা বুড়াচ্ছে এই
 চিত্রে একটি লোকের চোখে দ্বিধার সমস্ত ঘটনাটি দেখানো
 হয়েছিল। *Les Quatre Cents Coups* এর পরে
 Tirez sur le Pianiste জুসি এবং ইহা দর্শক মনো-
 ভাবের সমর্থ হয়। যদিও এই চিত্রটির সম্বন্ধে আমি খুব
 আশাবিহীন ছিলাম তার কারণ *Les Quatre Cents*
 Coups এর সাক্ষ্য। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিষয় আছে
 যে একজনের বিজ্ঞান চিত্র প্রথম চিত্র অশংকা নিশ্চয় হয়।

প্রথম ছবি কেউ যখন করে তখন সে অনিশ্চিতের মধ্যে কাঁপিয়ে পড়ে। সে তখন ভাবে হয়ত: জীবনে আর বিত্তীয় ছবি করতে পারবো না এবং সেই ২২ই চুঃশাহসী হয়। বিত্তীয় ছবির বেলায় তা নয়। তখন প্রথম ছবির শাকশেষ পর বিত্তীয় ছবির কাল কয়েক, তার দুই তিনই বহলে গেছে। সেই ২২ বিত্তীয় ছবি প্রথম ছবির মত একটি প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে লুই হয় না। বিত্তীয় ছবিতে উচ্চাভিলাষ ও কম। তৃতীয় ছবি আমার বিত্তীয় ছবি অপেক্ষা ভালো হয়। কারণ তা প্রথম ও বিত্তীয় ছবির সহযোগে গঠিত এবং ভবিষ্যৎ গড়ার সোপান। আমার *Tirez sur le Pianiste*

চিত্রে স্যান্ডব্যাংক পদ্ধতি ব্যবহার করি। এই প্রদর্শকে Braunberger কে বলি যে Les Mauvaises Rencontres, Lola Montes, The Barefoot Contessa প্রভৃতি চিত্র এই স্যান্ডব্যাংক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই হয়ে গিয়েছে। একটা কথা স্বয়ং গ্রাফা ব্যবহার, জনসাধারণ একটি বাস্তব চিত্র যদি অভিনাটকীয়তার পরিসরাপ্তি ঘটে তাকে গ্রহণ করতে চিৎ করে না, কিন্তু কোন চিত্রের আরও অভিনাটকীয়তা থাকে আর চিত্রটির পরিসরাপ্তি যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে কখনই গ্রহণ করে না।

[ক্রমশঃ]

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

সম্মেলন শৈল্প—গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টার্স, এটালি
সাগিনা সাহাতোব পরটা আনতে চাই। সাহাতোব
ও বিনীপকুয়ার কি কলকাতাতেই আছেন না স্নেন
হাতহাত করছেন ?

০ পৌরকিশোর ঘোষের লেখা সাগিনা সাহাতো
বইখানি বাম্বারেই কিনতে পারেন। কিনে পড়ে দিন।
সাহাতোব ও বিনীপকুয়ার হটিং থাকলে কলকাতায়
আসেন।

প্রথম সেনসুপ্ত—গৈরন অমির আদি এন্টিনিউ—
কলিকাতা

সৌমেন মুখার্জির পরিচালনার আর কোন ছবি কেন
বেশা যায় না? জি, জি, (সৌমেন গান্ধী) যে ছবি
তুলছিলেন তার কি হোল ?

০ বর্তমানে সৌমেন মুখার্জি কোন ছবি পরিচালনা
করছেন না বলেই বেশা যায় না। ইমানীকালে ডি জি
কোন নতুন ছবিতে হাত দিয়েছিলেন বলে জানা নেই।

বাবল বস্ত্র—গাঙ্গী হানখনি বাহারি বোড—কলিকাতা
শিনাকী ও ডিউকের ভিত্তি করে আন্দারন সফরের
পর বাঙাল্যেণের ভিত্তি ও কলকাতায় যেন নতুন কোন
গ্যাভভেকার আগবে কি ?

০ কলকাতায় গ্যাভভেকারের স্ত্রীভাঃ ইমানীং পাড়ার
টেকাই দার হয়ে উঠেছে। এর পরে বেশ ছেড়ে পালাতে
হবে কিনা কে জানে ?

বিশ্বনাথ দাস—বাংলা বর্তমান কলোনি—বাংলাপুং
সেখানে সেখানে কোলহুলী বলতে কি বোঝায় ?

০ টিক বলতে পারব না। তবে সীমান্ত নিয়ে
রাশিয়া ও চীনের সংঘর্ষটা এই পর্যায়ে কেনা যায় কিনা
সেটা একটু চিন্তা করে বলতে হবে।

ছন্দা রায়—হাছবা সেন—কলিকাতা

“আগন্তুক” নামে যে চিত্রটি তোলা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য
তৃপ্তিকার কে অভিনয় করছেন ?

০ সম্ভবতঃ তত্ৰপ বাঃ করিতে পারেন। তবে বতসুর
জানি অগম্যক নামে কোন ছবি বর্তমানে তোলা হইছে না।

সন্তোষ কুমার কোঁটার—বাহুবলপুত্র—২৪শ্রবণ
সত্যজিৎ বায়ের পরবর্তী ছবি কি ?

০ অরণ্যের দিনরাত্রি

দীনেশ চক্রবর্তী—গড়পাথর রোড—কলিকাতা

সংগোষে একশণ ইলেকশানের পেটাইর ও বহু ভুলতে
একা হেঁগড়া ভিত্তিগানেই বেলে কোম্পানীর ধার তিন
লক্ষ টাকা খরচা হবে। নতুন করে টেননের নাম
লেখাবার খরচ। এর মধ্যে খরচ হইবে না পেটা আগা
পড়বে ?

০ আশাদা। গুণমাত্র বহু ও গোষ্ঠীর ভুলতেই
তিন লাখ টাকা পড়বে। টেননের নাম লেখাটা কি আর
অন্ত সম্ভার মধ্যে হবে। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে
ভাববারই বা কি আছে ? খরচ ঘাই পড়ুক না কেন
পছিতে ধারা আছেন ভারা ট্যান্স ব্যঞ্চিত্তি বা টিকিটের
নাম ব্যঞ্চিত্তি যেভাবেই হোক না কেন এ টাকাটা ভুলে
যেবেন। অনাগারগণের টাকার অনাগারগণের সংকতি
করা হবে। দেশের দেবা করবার ক্ষেত্রেই তো আমরা
অনেক ভোটা দিবে পছিতে বসিযেছি। সামান্য ওই কটা
টাকার ক্ষেত্রে অত ভাবনা কেন ?

যোগেশচন্দ্র দাস—নিগোষ বিহারী মল্লিক রোড
—কলিকাতা

উত্তরকুমারের হেলের সঙ্গে হুগ্ৰিগা যেখার দেখে
একটু ইয়ে ইয়ে মতন শুনিছি। খবরটা কি সত্যি ?

০ জানিনা। ওগব ইয়ে-বর্কা খবরের ইয়ে ককন
না।

জয়া ভাণ্ডারী—মলিক লাল ঘোষ গেন—কলিকাতা
নীতা সেন আমকাল প্রে ব্যাক রাইছেন না কেন ?

০ পূব সম্ভবতঃ পারিষদ অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে।

দ্বিবাঙ্গী ভট্টাচার্য্য—টেনশন রোড—চাকুবিয়া

“শ্রেষ্ঠ শিল্প অভিনেতা পুংকজ” চাপ হওয়ার পর

১৯৯০ সালের শ্রেষ্ঠ শিল্প অভিনেতা হিসাবে প্রসেনজিতের
ছোট সিন্ডিকার লক্ষ পুংকজ পাওয়া উচিত নয় কি ?

০ নিশ্চয়ই উচিত।

জয়ন হুদা—ক্যানাল পাউর রোড—কলিকাতা

বহুদর দ্বিবাঙ্গী চ্যাটার্জি নাকি অভিনয় করা ছেড়ে-
দিয়েছেন ?

০ সেইরকমই শোনা যাচ্ছে। দ্বিহের পর আপাততঃ
উনি গদ্যলেখ্য নিয়েই ব্যস্ত আছেন।

দ্বিবাঙ্গী হুগ্ৰিগা—কৈলাশ কবিরাজ গেন—কলিকাতা
নারা পৃথিবী জুড়ে এত সব রাজনীতিকরা রয়েছেন
তবু পৃথিবীতে এত অশান্তি কেন ? কবে শান্তি আসবে
বলতে পারেন ?

০ বহু রাজনীতি করেন তাদের নিজেদেরই কোন
নীতির বালাই নেই, একেবারে অশান্তি ছাড়া আর কি
দৃষ্টিও আসা করে ? বর্তমানে পৃথিবীর আবহাওয়া
যেবে মনে হচ্ছে ততীয়া মহাব্যুৎসব আগে শান্তি আর
আসবে না।

শোভনা বিশ্বাস—প্রদুর্ভাষ সংকর গেন—

কলিকাতা

হুগ্ৰিগা যেখী প্রযোজিত উত্তরকুমার পরিচালিত ছবি
খবর কি ?

০ কোন খবর নেই। উত্তর-হুগ্ৰিগা জুটি আগে
চিহ্নক তারপর ওগব করা ভাবা যাবে।

পত্রলেখ্যা বায়ানার্জী—লেক ভিউ রোড—কলিকাতা

“শবিল” নটী বিনোদিনী “বহু” চুক্তিতে “দ্বিবা”
করছে কেন ? “দেবদাইড” হবার ভয়ে নাকি ?

০ দ্বিবা আভরের সঙ্গে ইভনিং ইন্, গ্যারিগের
ইহাতি কোনখিনই চলে না এটুকু কি আপনার জানা
নেই ?

মল্লেশ সঁউল্লা—বৈকুণ্ঠচাঁটা—বাহুবল, কলিকাতা

অনেকদিন আগে পবেশ বান-জি নামে একজন
চিত্রাভিনেতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি কোথায় এবং
কি করছেন ?

০ জনেছি বর্তমানে তিনি এখানে বাসে থাকেন।
করেছেন। এখানেই নাকি তিনি হাবির বোঝান
করেছেন।

কমল গোঁস্বামী—করবাণা টায় পেন—কলিকাতা
“গণী” নামের বাসা বাসেন ছবিটির সৃষ্টির ব্যাপারে
সংরক্ষণ সমিতি হেরে গেলেন কেন ?

০ ভুল নেতৃত্বের জন্তে মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে
সংরক্ষণ সমিতির বিবোধীরা যে কুটরপন্থিতির পরিচয়
দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

যে পাঁচজন বিখ্যাত পরিচালক সংরক্ষণ সমিতি
পরিভ্রমণ করেছেন আমি কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধন করি।
ছবি সৃষ্টির ব্যাপারে আর জনজন পরিচালকদের সঙ্গে
বা মতন পরিচালকদের সঙ্গে তাঁদের একসঙ্গে বসান
উচিত নয়।

০ বিখ্যাত বলেই যে তাঁদের ক্ষেত্রে পূর্ণতাত্ত্বিক
নিরম বাস্তব করে দিতে হবে এরকম কোন বিষয়
পৃথিবীর কোন দেশেই নেই। এতই নিরম সবাইয়ের
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং একই স্বাভাবিকভাবেই সমান
ভাবে দিতে হবে। আজকে যারা বিখ্যাত হয়েছেন
একদিন তাঁরাও অধ্যাত ছিলেন। আজকে ধীরে অধ্যাত
আছেন আগামীদিনে তাঁরা যে কেউ বিখ্যাত হবেন না
এরকম কথাই বা কে বলতে পারে ?

একসময়ের বিখ্যাত পরিচালক বেবকা কুন্সার বহু,
বহু বহু, হুম্মার দাদগুপ্ত, নীতিন বহু, নীরেন লাহিড়ী
প্রভৃতি—এরা আজ কোথায় ? খেতেও নেই। একদিন
এরা বিশ্বস্তির অতলে হাবিরও যাবেন। তেরনি আজ
ধীরে বিখ্যাত পরিচালক একদিন তাঁরাও হাবিরে যাবেন
সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। শিল্পপটের পৃথিবীতে কে
এলেন বা কে গেলেন নেটা কোন বড় কথা নয়, তাঁরা
কি বেথে গেলেন আগামীদিনের মানুষদের জন্তে সেটাই
হচ্ছে এক মাত্র কথা এবং আগামীদিনের মানুষ তাঁদের
নাম কতখানি প্রচার (?) সঙ্গে উজ্জরণ করবে সেটাও
একটা চিন্তার কথা হয়ে থাকছে আজকের দিনের মাত্রের
কাছে।

পূর্ণা বস্তু—হিম্মতান পার্ক—কলিকাতা

আপনারে পত্রিকার এত বেশী ছাপার ভুল থাকে
কেন ? সময়ে সময়ে কথার মানে পঠাও বদলে যায়।
আপনারে কি কোন প্রকৃতির ভুল নেই ?

০ আছেন। তবে তাঁর ওপর মালিকপক্ষের কড়া
নির্দেশ দেওয়া আছে যে সম্পাদকের নামের যেন কোন-
বকর ছাপার ভুল না হয়। ওইটুকু টিক থাকলেই হল।
যাকীটা শঠক পাঠিকারা কষ্ট করে পড়ে নেবেন। তিনি
মালিকপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন, তাঁর
কি দোষ বস্তু ?

মালভূমী সেমস্তপ্ত—লেক ভিউ রোড—কলিকাতা

রবীন্দ্র সর্বাঙ্গের মাত্রা নির্ণয়তনের ঘটনার আলম
বহুতটা কি বলতে পারবেন ?

০ না। আমি বহুতভেদী ব্যোমকেশ নই। তবে
একটা কথা বলতে পারি যে রাজার রাজার মুখ হলে
উলুখাণ্ডার প্রাণ যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।
পুরুষের বাধাবানী চিরকাল মেরেবের সহ্য করতে হয়
এটা কি আপনার অজানা ?

প্রদীপ্ত কান্স—মহেন্দ্র গোঁস্বামী পেন—কলিকাতা

কিন্তু পোস্টাইটি গড়ার পার্থক্য কি ?

০ জানি না। তবে আবারে মেরে কিন পোস্টাইটি-
জলো হবার পর খেকেই বাংলা ছবির দর্শকরা সব
ইনটেলেঙ্গুচুয়াল হয়ে গেছেন এইটুকুই বলতে পারি।

প্রদীপ্তা সেনস্তপ্ত—কোমরাগো বোড—কলিকাতা

হীরাচন্দ্রের ‘মহাব্রত’ কি হিন্দী ভাষায় কখনও
চিত্রিত হয়েছিল ?

০ হয়েছিল। পরিচালক ছিলেন অমর মল্লিক।
নাথক-নারিকার ভূমিকায় ছিলেন তালপাত বাহুবল ও
ভারতী দেবী।

— চিত্রলেখা —



(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা। সন্ধ্যার্তেই যেন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। জাউবনে অবিবাহ শেঁ শেঁ আওয়াজ। গাছগুলো এক একবার হুলে হুলে প্রায় হাটতে ছুবে পড়ছে পবনগেই আবার চাফা ঘিরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

মত্ত হাতির মত সমুদ্রের ঢেউগুলো পাড়ের উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

জনবীন লম্বা দৈকত। বহরুরে সমুদ্রে একটি নৌকা ও একজন লোককে দেখা যায়।

লোকটি পক্ষপেশবানী। একই হুজ, কপণ ও অশক্ত। বিরূপভাবে তাকিয়ে থাকে লোকটি। দৃষ্টি তার দুডতার ভরা। দ্বাধ হাবো বছর পবে এই প্রাসেবই একজন হতভাগ্য, যে ছ-বাসেব মধ্যে ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল—শেই নিতাই ফিরে এসেছে তার জন্মভূমিতে একদিন পবে।

অশক্ত, অফালবুদ্ধ, কপণ নিতাই নীচ হায়ে একমুঠো বালি জুলে নেয়। বাগিন্ধা হাঙলি কপালে মাঝার চোপে ধবে সে। চোপ ঘিরে ধরবিগলিত বাগায় জল গড়িয়ে পড়ে। অশক্ত পা দুটিকে কোনকমে টেনে নিয়ে সে চলতে থাকে।

কাউবন। উপরে তাকিয়ে দেখে নিতাই। এই সেই কাউবন; বারো বছর পবে দেখা, ছেসেবেলায় কত হুখ হুখের এই কাউবন, সব কিছুই মরবে আসে। জল নেনে আসে নিতাইয়ের চোপ ঘিরে। একটা বালির চিগিতে পা লেগে হোচট খেয়ে পড়ে যায় নিতাই। কোন বকবে উঠে আবার চলতে শুরু করে।

বাড়ির দামনে এসে দাঁড়ায় নিতাই। ভেউ নেই। কেবল মৃত্তিটা পড়ে আছে। ভাঙা তুলসী মক প্রায় ঢেকে গিয়েছে বালি ও আগাছায়। উদ্ভাসিত পৃষ্ঠিতে তার পৃষ্ঠভিতার দিকে তাকিয়ে থাকে নিতাই।

ছুখে, অবলায়ে নিতাই বলে পড়ে তার ভাঙা ভিটার একধায়ে। মনে পড়ে যায় কাউবনে পদ্মকে সে একদিন বলেছিল—

নেশখো নিতাইয়ের কঠ—

“আমার বীজকে হালধি করতে হবে না? না খাটলে
চলবে কেন?”—

ডুকবে ডুকবে কাঁদতে থাকে নিতাই। মাটিতে
মাথা কপাল ঘষতে থাকে।

শুভ দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকে নিতাই।
এখন কি করবে সে? কোথায় যাবে?

যাত্রি। দাঁইবারেই আড়ৎ। হৃৎকাত কানে তুলে
কেহোপিনের আলোটা বাইরের বোড়ো হাওয়ার অবিগত



নিতাই ও পদ্ম

✱

কোথায় পদ্ম? কোথায় বীজ? মিশাহারা হয়ে-
যায় নিতাই। মনে পড়ে বাতায় আগ্নেী ক্রন্দনরতা
পদ্মকে সাধনা দিয়ে বলেছিল—

নেপথ্যে নিতাইয়ের কণ্ঠ—

“আর এক হাশিক আলছে তাকেও তো হালধি করতে
হবে………………কিরে এসে বীজকে কত বেশবিশেষের পদ্ম
বলবো—”

হালাক্য করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নিতাই। ছলতে
মাটি ঢেলে কৈঁধে ওঠে। কত কণ্ঠে বলে—

নিতাই। ভগবান, এই জন্মোই কি এতদিন আমার
বাটিয়ে রেখেছিল? এই অবস্থা দেখাতেই কি আমার
এখানে নিয়ে এসে?

দুলতে থাকে। দাঁইবার কাশ বাজের তাল। বুলে কাগল
খাতা পত্র ইত্যাদি বেধে দেয়। তারপরে হাই তুলে
তুড়ি হিতে হিতে দাঁইবার বলে—গোবিন্দ, গোবিন্দ।

বাইরে বোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকায়। দাঁই-
বার শোভার উজোগ করে। সামনে রাখা লঠনটা
নিভোবার ঘনো ছাত বাড়তেই কে বেন হুড়মুড় করে
হরজা টেলে ঘরে ঢুকেই পড়ে যায়। তার পেয়ে দাঁইবার
বলে ওঠে—

দাঁইবার—কে? কে?

কণ্ঠ অশক্ত নিতাই মেথেনে পড়ে থাকে।

অন্তর্গত দাঁইবার নিতাইয়ের লামনে এসে দাঁড়ায়।
নিতাইকে চিনতে পারেনা সে।

দুর্ভিক্ষগ্রাস নিতাই পড়ে থাকে।

স'ইয়ার ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে থাকে। চোখে বিষম।

বীয়ে বীয়ে নিতাই তাকায়। বহুকাঠে বলে—

নিতাই—জল, এবটু জল—

স'ইয়ার জল আনতে পাশের ধরে যায়।

নিতাই নির্জীবের মত পড়ে থাকে।

কুছো থেকে একটা পেগালে জল চলে স'ইয়ার নিতাইকে এনে দেয়। নিতাই দু-হাত বাড়িয়ে পেগালটি নিয়ে চকচক করে সবটুকু জল পান করে ফেলে। কথ বয়ে কিছুটা জল গড়িয়ে পড়ে। জল পান করে অবশর হয়ে চলে পড়ে নিতাই।

আগন্তুক নিতাইয়ের অবস্থা দেখে বিচলিত হয় স'ইয়ার। কি করবে ভেবে পারনা। লঠনের শিখাটা বাড়িয়ে ওকে আরও ভাল ভাবে দেখে।

বাইরে অশান্ত বাড়িবন। দূরে সাগরের গর্জন। লঠনের শিখা বাতালে কাঁপতে থাকে।

স'ইয়ার আগন্তুক নিতাইকে চিনতে পারে না। দীর্ঘ বাতায় বহু পরে এই অবস্থায় দেখে নিতাইকে কেই বা চিনতে পারবে? কাঁপতে থাকে নিতাই। স'ইয়ার ওর কপালে হাত ঘেঁষে। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—

স'ইয়ার। ইস, গা বে গুড়ে যাচ্ছে—

নিতাই বীয়ে বীয়ে চোখ তুলে স'ইয়ারের দিকে তাকায়। স'ইয়ার বলে—

স'ইয়ার। তুমি আর এখানেই থাক বাবা এই রাত—

নিতাই অর্ধশায়িত অবস্থায় কাম্পিতহৃদে স'ইয়ারের হাত বাড়িয়ে ধরে শির দৃষ্টিতে স'ইয়ারের মুখের দিকে

তাকায়। বীয়ে বীয়ে তার হাতে আলগা হয়ে যায়। যেকোনো পড়িয়ে পড়ে দে।

পাশের ঘর থেকে কাঁধ ও বাড়ি নিয়ে এসে বেছেতে পেতে নেয় স'ইয়ার।

কলকতত দু' বিতে বিতে লঠনের আলো একটু কহিয়ে দেয় স'ইয়ার। অদূরে কাঁধ পাশে দিয়ে বাড়ির ভয়ে আছে নিতাই। আকাশে বিদ্রোহ ও সাগরের গর্জন ক্রমাগত বেড়েই চলে। চৌকীর একধারে বসে স'ইয়ার তামাক টানতে থাকে।

নিতাই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ! লঠনের অগ্নি আলোয় কীভাবে দেখা যায় স'ইয়ারকে। দূরে বসে আছে। দুর্বল কণ্ঠে নিতাই বলে—

নিতাই—এখানে নিতাই বলে কেউ থাকতো।

স'ইয়ার কিরে তাকায়। বহুবিনয়ের পুরোনো এক দৃষ্টি তুলে ওঠে। একটুকু চূপ করে থেকে আপনমনেই স'ইয়ার বলে—

স'ইয়ার—আহা, ছেলেটা যে কোথায় হাথিরে গেল।

অস্বস্তি হয়ে যায় স'ইয়ার। হ'কোর দু-একটা টান দিয়ে আপনমনেই আবার বলতে শুরু করে—

স'ইয়ার—অমন মোরান ছেলেটা সমুদ্রে হাথিরে গেল.....অমন হুম্মার সংসার। পশুর মত বৌ, বৌর মত ছেলে.....সব পড়েই গেল।

বহুবার কাছে ফোনান আগেটা দুলতে থাকে। বাইরে দু-একবার বিদ্রোহ চমকায়।

স'ইয়ার বলে—এই গুপের বাজা বৌটাকে নিয়ে কি কঠি না পশু লগেচে। জাল বেতানত করে, এটা সেটা করে কত কটে দিন গালিয়েছে। ওর কঠি আর চোখে দেখা যেত না।

নিতাই উদ্ভীষ হয়ে চেয়ে থাকে।

স'ইয়ার বলে—শেষে বাঁচলো। ওই যে ওর বন্ধু
লোটন, নিতাইয়ের বন্ধু, সেই ওদের বাঁচালো!

নিতাই চেয়ে থাকে। স'ইয়ার বলে—

স'ইয়ার—নতুন সংসার পেতেছে, বীকটা ইকুনে পড়ে,
সাহুং হচ্ছে।

নিতাইয়ের চোখ দুটি একটু অলস উঠেই নিতে যায়।
অবশ হয়ে সে পড়ে থাকে!

স'ইয়ার অতিভূত হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। হঠাৎ কি
ভাবে শান্তিত নিতাইয়ের কাছে এসে বসে; জিজ্ঞাসা
করে—

স'ইয়ার—তুমি কে বাবা? তুমি, তুমি আশ্রয়ের
নিতাইকে চেন?

নিতাই নির্বাক। শুধু হয়ে পড়ে থাকে। নিঃশব্দের
উপান পত্তন বোঝা যায় না। ঘেন একটি প্রাণহীন
শব্দ!

যাত্র হয়ে স'ইয়ার নিতাইকে মাড়া দেয়, বলে—
স'ইয়ার তুমি—নিতাইকে চেন?

নিতাই কোন সন্ধ্যা দেয় না। প্রবলবেগে কানতে
থাকে। কানতে কানতে সে বিপদগ্রস্ত হয়ে যায়।
মাথাটা একদিকে হেলে পড়ে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘেঁষ
বেধা দেয়। সে আবার কানতে আঙুল করে। স'ইয়ার
তার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে কষ্ট সাধ্যের চেষ্টা
করে।

কানতে কানতে নিতাই উপুড় হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ
পর কাশি বামলে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ে নিতাই। ঘুমন্ত
মুখে একটা বিগট অবদারের ছায়া।

স'ইয়ারও যথাতথ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যির
করে আজ যাতে শুকে আর বিরক্ত না করে কাল সকালে

জিজ্ঞাসাবাদ করবে। উঠে দাঁড়াই সে।

গঠন অলসে। চিরনিতে কানি অবছে।

পাশের ঘরে শুয়ে আছে স'ইয়ার। নিতাইয়ের।

বাইরে কোড়ো হাওয়া। কাউনন চলে চলে উঠছে।

নিতাই ভয়েছিল। একটু নড়ে ওঠে। ঘরে ঘরে
মাথা তুলে ঘরের চারদিকে দেখে নে। পাশের ঘরের
খোলা দরজা দিয়ে নিতাইয়ের স'ইয়ারকে দেখা যায়।
ঘরে ঘরে উঠে বসে নিতাই।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকায়। নিতাই উঠে অতিদ্রুত ঘর
পারে বহুতরর কাছে আসে। স'ইয়ারের দিকে কিছুক্ষণ
তাকিয়ে থাকে। পরে মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে
ক'ণ তুলে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বাইরে অন্ধকার। কাউননে কোড়ো হাওয়ার শব্দ।

অন্ধকার ভেদ করে নিতাই এগিয়ে যায়।

চতুর্ভুজার পাশ দিয়ে বাবার সময় বুড়ো বটগাছের
শিকড়ে ছোট্ট খায় নিতাই। যন্ত্রণার অশ্রুট আর্জনার
করে ওঠে সে।

দূরে লোটনের বাড়ি দেখা যায়। নিতাই লোটনের
বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

লোটনের বাড়ির একটা ঘরে আলো জ্বলছে। পাশের
দিকের জানালাটা খোলা। জানালার পাশে বেড়ার কাছে
এলে দাঁড়ায় নিতাই। বিজলভাবে তাকিয়ে থাকে
ভিতরের দিকে।

জানালার ঠাক দিয়ে ভিতরে দেখা যায় লোটন
হিসাবের খাতা নিয়ে ব্যস্ত। শিখরের একটা চৌকীতে

বীক দুইয়ে আছে। পদ্ম ধবের ভোগে বলে কাঁথা
সেলাই করছে।



পদ্ম

হঠাৎ হুমকা একটা। কাশি আসতেই নিতাই মুখ চেপে
হবে। অভিকর্মে সাংলগ্ন্যর চেষ্টা করে। সামলে নিয়ে
বিছল চোখে তাকিয়ে থাকে ভিতরে।

হুমকা বড় ওঠে। ঘবে লঠনের শিখা কঁপে কঁপে
ওঠে। গোটিনের হিসেবের কাগজপত্র করতর করে উড়ে
হবর ছড়িয়ে যায়। বীর কর্তে গোটিন বলে—

গোটিন বেখতো, বোবহর বড় উঠলো।

পদ্ম হাতের সেলাই বেখে উঠে আসে জানালার দিকে।

নিতাই একটু সরে আসে জানালা থেকে। একটা
তোপ সামনে রেখে নিজেই আড়াল করে।

পদ্ম জানালা বন্ধ করে দেয়।

অন্ধকার হয়ে যায়। একবার বিভ্রান্ত চমকায়।
বেখা যায় মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশি রোধ করবার

চেষ্টা করছে নিতাই কোণের পাশে দাঁড়িয়ে। জানালা
বন্ধ।

অন্ধকার। সমুদ্রপাড়ে কোড়া হাওয়া অশান্ত হয়ে
ওঠে। কালো আকাশে বাকের বাকের বিভ্রান্ত চমকায়।
দূরে কাশির আওয়াজ শোনা যায়।

অন্ধকারের মধ্যে দূরে ইবরের উদ্ভেদে এক আবেশন
শোনা যায় নিতাইয়ের কর্তে। আর্ককর্তে আবেশন করে
নিতাই—

“ভগবান, তুমি ওদের শান্তিতে রাখো—

.....গোটিনা আমার বাঁচিয়েছে—”

আকাশে বাতাসে প্রতিশ্রুতি হতে থাকে এই
আবেশন।

পতাল। সমুদ্রবেলা। বেখে ঢেকে আছে সূর্য।
নির্জন সমুদ্র সৈকতে দূরে একটি বাড়ি নৌকা। নৌকার
কম্বা অবস্থায় অশান্ত চেউয়ের তালে তালে উঠছে আর
নামছে। বীক হুম্বর একটি স্থিরক কৃত্রিয়ের পাথ। সন্ধ্যের
ছেলেটি সেটা নিতে চায়। বীক নৌড় দেয়। সন্ধ্যের
ছেলেটিও তার পিছনে নৌড়ায়। হঠাৎ সামনে কি একটা
বেখে আঁতকে উঠে হুগাত তুলে বীক আচমকা দাঁড়িয়ে
পড়ে।

প্রচণ্ড চেউয়ের ঠেলা সেগে একটা দূতবেহ একপাশ
হতে অপবশ্যে গড়িয়ে পড়ে। উল্টো চেউ বাড়ি দিয়ে
দূতবেহটাকে ওখিক হতে এখিক নিয়ে আসে। হতভাগ্য
নিতাইকে নিয়ে উদ্ভাস সাতনে মেতেছে এই বিস্মৃত ভগ-
বান। নিতাইয়ের স্মৃতিশব্দ হাত থেকে কি যেন একটা
আচমকা বেড়িয়ে পড়ে যায়—

বিদ্যায়ের সময় পদ্মর বেরা চণ্ডীতলার ভূমবেলপাতা
ভরা সেই ছোট্ট কোটোটা; চেউএ ঠেলে মেলে দেয়
দিক বাসুকাবেলায়। একটা ছোট চেউ এনে কোটো-
টাকে ভুড়িয়ে দেয়।

জেলের ছোট একটা ভীত অমেছে দূতবেহটাকে
ধরে। দূতবেহ নৌকা কম্বা নৌকাটি উদ্ভাস হয়ে উঠেছে।
চেউয়ের অবিস্মার আঘাতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে।

লোঠন, বীক ও অ্যাবো কয়েকজন জেলে হুঁকে পড়ে
বেশছে মৃতদেহটাকে । চিনতে চেষ্টা করছে কোন ভিনবা
থেকে এসেছে লোকটা ।

লোঠন চিনতে পারে তার বালাবন্ধু বিভাইকে । শক্ত
হাতে বীককে চেপে ধরে নে । চকিতে আকাশে দুখ তোসে
—হুবিধু ওম ঠিকঠিক করে ওঠে তার চোখে — দড়িয়ে
পড়ে গাল দিয়ে ।

সমুদ্রের দিক বেলাজুড়ি, পাড় ঘেঁষে উড়ে বাছ-কাঠাল
পাখীরা—দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি—বালুকাবেলা—কাউবন
—নীল আকাশে একটা চিল চক্রাকারে উড়তে উড়তে
বেলাজুড়ি, বালুকাবেলা, কাউবন ছাড়িয়ে উড়ে যায়—
মিলিয়ে যায় দু' নিলীমার—

সমাপ্ত

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০০৮/১১, বিধান সড়ক, (পূর্বতন কর্তৃত্বমালিন ষ্ট্রীট
—নিকটায় ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

প্রফুল্ল রায়ের

নতুন বিরাট উপন্যাস

মহাভারত
কাহিনী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে হগলী জেলার পূর্ব অভ্যন্তর থেকে একটি যুবক জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। তার জীবনের একটিমাত্রই মন্ত্র ছিল, 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।' সারা বাংলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতা জুড়ে তখন অন্ধকারের সাধনা চলেছে। একদিকে ব্রিটিশ, মহামারী, কালোবাজারি—এদের ফলশ্রুতি হিসেবে ভিক্ষুক আর গণিকা। অন্যদিকে মুক্তাঙ্গীতির কল্যাণে উদ্ভাস ভোগবাদের প্রথম উৎসব। তৃতীয় আরেকটি দিক ছিল যেখানে আঁবাড়ের পর আঁবাতে লম্বা পুরানো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা আপদের মত হাঙ্গুলি নিয়ে হাঙ্গা এসে গেল—কলকাতার 'গ্রেট কিলিং'। তারও পর খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ষিয়ে।

যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাংলাদেশের এই বিশৃঙ্খল অধ্যায়টি ঘিরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে যুবকটি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডোবা তার হ'ল না।

এত যে অন্ধকার আর দৈরাঙ্গা তবু এরই অন্তর্ভুক্ত কোথায় যেন আলোর ক্ষীণ একটি ধারা ধীরে ধীরে বইছিল। যুবকটি হঠাৎ তা আবিষ্কার করে বসল। দশম উনিশ শতকের রামমোহন, বিজ্ঞানাগর থেকে আজ অবধি অসংখ্য মানুষ সেই ধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছেন এবং আশ্চর্য তাঁদের উত্তরাধিকার তার ওপরে এসে পড়েছে।

জীবিকার খোঁজে যে যুবক এসেছিল, কলকাতা তাকে জীবনের মহত্তর সন্ধান দিয়েছে।

এই বিশাল ঋণী উপভাস সাম্প্রতিক কালের একটি অনন্ত সংযোজন।

দাম—দশ টাকা

এই লেখকের আরেকটি উপভাস : নোনা জল মিঠে মাটি (দ্বিতীয় সংস্করণ) দাম : ৮.০০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩-২০২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট -- কলিকাতা - ৬

শক্তিগদ রাজশ্রুর বিপুল-কলেবর নুতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

একদিকে কালজীর্ণ পুরাতন জমিদারী-ভবনের পতন—অপরদিকে শিল্প-সমৃদ্ধ নুতন ব্যক্তিক যুগের
 উত্থান। প্রাচীন আরণ্যক পরিবেশের স্বর্গরাজ্যে স্বপ্নাসুর! হারানোর বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দে
 কল্পমান, ভাঙা আর গড়া, সমস্তা ও সমাধানের অভিনব বৈচিত্র্যে দোহুল্যমান একদল নর-নারী।
 তারকরত্ন আর অতুল কামার, অশোক আর শ্রীতি, ভুবন আর কদম-বৌ, গোকুল আর পাহাড় দাস,
 কারিগর আর মিষ্টি, অবিলাশ আর নিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রশান্ত আর রামি, সত্যীশ আর
 এমোকালা, সনাতন আর গঙ্গামণি—এ রকম আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিত্তি করে এসেছে।
 প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে দাগ কাটার মত। কিন্তু ভাষাহীন নারায়ণ ঠাকুর লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি।
 পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের নুতন মূল্যায়ন।

জেমা-জানা পরিবেশে নুতন ও নৃশ্রু দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্যাস অনেকদিন
 বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌষ টাকা

অন্যান্য উপন্যাস—

গৌড়জববধু (১৪৮) ৫-৫০

কাজল গায়ের কাহিনী (১৪৮) ৫-

মণিবেগম (১৪৮) ৬-২৫

কুমারী যব (১৪৮—চামাচির বগাচির) ৬-৫০

জীবন-কাহিনী (১৪৮—চামাচির বগাচির) ৮-৫০

প্রবন্ধন চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
 ২০৩-৮-১ বিহারী ঈশ্বরী • কলিকাতা • ৩